ইসলামি জীবনব্যবস্থা
মুফতি তারেকুজ্জামান
RUHAMA
PUBLICATION

ইসলামি জীবনব্যবস্থা

মুফতি তারেকুজ্জামান

সূচিপত্র

❋ দুটি কথা | ২১
❋ ইসলাম পরিচিতি | ২৭
❋ ইসলামের বুনিয়াদ | ৩৩

প্রথম অধ্যায় : ইসলামি আকায়িদ

❋ প্রাককথন | ৪১
❋ ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহ | ৪৩
- এক. আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান | ৪৩
- দুই. ফেরেশতাদের প্রতি ইমান | ৪৪
- তিন. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান | ৪৫
- চার. নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান | ৪৫
- পাঁচ. কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান | ৪৭
- ছয়. তাকদিরের প্রতি ইমান | ৪৮
- সারকথা | ৪৯

❋ 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ' এর সংক্ষিপ্ত আকিদাসমূহ | ৫৩
- এক. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত আকিদা | ৫৩
- দুই. ফেরেশতা সম্পর্কিত আকিদা | ৫৪
- তিন. আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কিত আকিদা | ৫৪
- চার. কিতাবসমূহ সম্পর্কিত আকিদা | ৫৫
- পাঁচ. মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত আকিদা | ৫৫
- ছয়. জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত আকিদা | ৫৫
- সাত. সাহাবা সম্পর্কিত আকিদা | ৫৬
- আট. মুমিনদের সম্পর্কিত আকিদা | ৫৬
- নয়. শাসকদের সম্পর্কিত আকিদা | ৫৭
- দশ. বিবিধ বিষয় সম্পর্কিত আকিদা | ৫৭

❋ তাওহিদ পরিচিতি | ৫৮
➤আভিধানিক অর্থ | ৫৮
➤পারিভাষিক অর্থ | ৫৮
➤তাওহিদের প্রকারভেদ | ৫৯
◆এক. তাওহিদুর রুবুবিয়্যা | ৫৯
◆দুই. তাওহিদুল উলুহিয়্যা | ৬১
◆তিন. তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত | ৬২
❋ তাওহিদ বা ইমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ | ৬৬
➤এক. গাইরুল্লাহর ইবাদত করা | ৬৬
➤দুই. রুবুবিয়্যার ক্ষেত্রে শিরক | ৬৭
➤তিন. অকাট্য কোনো বিধান অস্বীকার করা | ৬৯
➤চার. হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম মনে করা | ৭১
➤পাঁচ. ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া | ৭৩
➤ছয়. দ্বীনের কোনো বিধান অপছন্দ করা | ৭৪
➤সাত. দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা বা গালি দেওয়া | ৭৬
➤আট. গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা | ৭৮
➤নয়. আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন করা | ৮১
➤দশ. মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাগুতকে সাহায্য করা | ৮৪
❋ আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা | ৮৬
➤'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আভিধানিক অর্থ | ৮৮
➤'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর পারিভাষিক অর্থ | ৯০
➤'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর প্রায়োগিক প্রকারভেদ | ৯১
➤শরিয়তে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর দলিলসমূহ | ৯৪
◆ কুরআন থেকে | ৯৪
◆ হাদিস থেকে | ৯৭
◆ ইজমা থেকে | ৯৯
◆ কিয়াস বা যুক্তি থেকে | ১০০
➤'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ও তার বিধান | ১০২
১. কাফিরদের ভালোবাসা ও মিত্র হিসাবে গ্রহণ করা | ১০৩
২. কাফিরদের ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা | ১১৫
৩. মুসলমানদের বিপরীতে কাফিরদের সাহায্য করা | ১১৯
৪. কাফিরদের নিঃশর্ত আনুগত্য করা | ১২৮
৫. কাফিরদের কাছে মুসলমানদের গোপন তথ্য ফাঁস করা | ১৩৫
৬. কাফির ও তাগুতদের কাছে বিচার চাওয়া | ১৪০
৭. দ্বীনের ব্যাপারে কাফিরদের সাথে নমনীয়তা দেখানো | ১৪৭
৮. দ্বীন নিয়ে হাসিঠাট্টা ও বিরোধিতার মজলিসে বসা | ১৫০
৯. প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাফিরদের নিয়োগ দেওয়া | ১৫১
১০. কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখা | ১৫৪
১১. কাফিরদের দেশে বসবাস বা সফর করা | ১৫৮
১২. কাফিরদের উৎসবে শরিক হওয়া | ১৬৪
১৩. কাফিরদের জন্য রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করা | ১৬৮
➤'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর সারকথা ১৭১

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামি শরিয়াব্যবস্থা

❋ প্রাককথন | ১৭৫
❋ দেহ ও রুহের মাঝে সম্পর্ক | ১৭৭
➤দৈহিক রূপ | ১৭৭
➤আত্মিক রূপ | ১৭৭
➤উত্তম গুণাবলি অর্জনের উপায়সমূহ | ১৭৮
❋ ইসলামে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিচারব্যবস্থার বিধান | ১৮৪
❋ মানসিক রোগ থেকে আরোগ্য | ১৮৪
❋ আল্লাহর ওপর ভরসা | ১৯২
❋ মুসলমানের উদ্যমতা | ১৯৭
❋ ইসলামে শান্তির ভিত্তিমূল | ২০২
➤আকিদা | ২০৩
➤তাকওয়া | ২০৪
➤আখলাক | ২০৫

❋ শান্তির ধ্বজাধারীদের মিথ্যাচার | ২০৬
➤উপনিবেশবাদী | ২০৭
➤খ্রিষ্টবাদী ক্রুসেডার | ২০৭
➤কমিউনিস্ট | ২০৮
❋ শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম | ২০৯
❋ ইসলামের সর্বজনীনতা ও মানবতা | ২১৭
❋ ইসলামি শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ | ২২০
➤প্রথমত, শরিয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপকতা | ২২০
➤দ্বিতীয়ত, ইসলামি শরিয়ত সংস্কার থেকে মুক্ত | ২২২
➤তৃতীয়ত, ইসলামি জীবনব্যবস্থা স্পষ্ট | ২২৪
➤চতুর্থত, ইসলামি জীবনব্যবস্থা মানবপ্রকৃতির উপযোগী | ২২৭
➤পঞ্চমত, ইসলাম দলিলনির্ভর জীবনব্যবস্থা | ২৩১
➤ষষ্ঠত, ইসলাম মানুষের কষ্টকে লাঘবকারী | ২৩৫
➤সপ্তমত, ইসলাম মানুষের কল্যাণকর বিষয় বাস্তবায়নকারী | ২৩৭
❋ শরিয়ত প্রতিষ্ঠায় ইসলাম | ২৪০
➤এক. নামাজ | ২৪১
➤দুই. রোজা | ২৪৩
➤তিন. জাকাত | ২৪৪
➤চার. হজ | ২৪৭
➤পাঁচ. অন্যান্য ইবাদত | ২৪৮
◈ক. জিহাদ | ২৪৯
◈খ. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার | ২৪৯
◈গ. অপরকে সহযোগিতা | ২৫০
◈ঘ. আত্মীয়তার সম্পর্ক | ২৫১
◈ঙ. ইলম অর্জন | ২৫২
◈চ. প্রতিবেশীদের সহায়তা | ২৫৪
◈ছ. পরিবারের দেখাশোনা | ২৫৫
◈জ. মীমাংসাকরণ | ২৫৫
◈ঝ. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীকরণ | ২৫৬
◈ঞ. উত্তম ব্যবহার | ২৫৭

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামি শাসনব্যবস্থা

❋ প্রাককথন | ২৬১
❋ শাসনব্যবস্থার নীতিমালা | ২৬৩
➤আভিধানিক অর্থ | ২৬৩
➤পারিভাষিক অর্থ | ২৬৩
❋ প্রথম মূলনীতি : সার্বভৌমত্ব আল্লাহর | ২৬৪
➤আল্লাহর আইনের বিপরীত বিচার করার বিধান | ২৭২
➤ইবনে আব্বাস ﵄-এর উদ্ধৃত كفر دون كفر এর ব্যাখ্যা | ২৭৫
➤কাফির, ফাসিক ও জালিম বিচারক কারা? | ২৮৬
❋ দ্বিতীয় মূলনীতি : শুরা ও পরামর্শ | ২৮৭
➤আভিধানিক অর্থ | ২৮৭
➤পারিভাষিক অর্থ | ২৮৭
➤শুরার গুরুত্ব | ২৮৮
◈পরিচর্যাগত গুরুত্ব ২৮৮|
◈সামাজিক গুরুত্ব | ২৮৯
◈রাজনৈতিক গুরুত্ব | ২৮৯
◈অর্থনৈতিক গুরুত্ব | ২৯০
◈সামরিক গুরুত্ব | ২৯০
➤শুরার শরয়ি হুকুম | ২৯০
➤নবুওয়াতের যুগে ও খুলাফায়ে রাশিদার যুগে পরামর্শ | ২৯৫
➤পরামর্শ করার পদ্ধতি | ২৯৭
❋ তৃতীয় মূলনীতি : ন্যায়পরায়ণতা | ২৯৯
❋ চতুর্থ মূলনীতি : সাম্য ও সমতা | ৩০৬
➤দাস-দাসীর বিষয়ে ইসলামের সাম্যনীতি | ৩১১
➤একাধিক বিবাহের যৌক্তিকতা | ৩২০
➤পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষদের, নারীদের নয় | ৩২৪
➤মিরাসি সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার | ৩২৬
➤নারীদের সাক্ষ্যের মূল্যায়ন | ৩২৮
➤জিজিয়া-করের বিধান | ৩৩১

※ পঞ্চম মূলনীতি : আনুগত্য ও মান্যতা | ৩৩৪
➤আমিরের আনুগত্য করা ফরজ | ৩৩৫
➤সাধ্যের ভেতর আনুগত্য | ৩৩৮
➤আমিরের বিরুদ্ধে অন্যায় বিদ্রোহ | ৩৩৯
➤আমিরের আনুগত্য হবে বিনয়ের সাথে | ৩৪০
➤আমিরের স্বল্প ত্রুটিতে করণীয় | ৩৪০
➤আমিরের মাঝে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখলে করণীয় | ৩৪১
➤আমিরের ভুল হলে করণীয় | ৩৪২
※ ষষ্ঠ মূলনীতি : বাইআত | ৩৪৪
➤বাইআতের শরয়ি ভিত্তি | ৩৪৫
➤বাইআতের গুরুত্ব | ৩৫১
➤কাকে বাইআত দেওয়া হবে | ৩৫২
※ ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান | ৩৫৪
※ মুসলিম শাসকের দায়িত্বসমূহ | ৩৫৫
※ যে সকল নামে রাষ্ট্রপ্রধানকে ডাকা হবে | ৩৫৭
➤ক. ইমাম | ৩৫৭
➤খ. খলিফা | ৩৫৮
➤গ. আমিরুল মুমিনিন | ৩৫৮
➤ঘ. মালিক বা বাদশাহ | ৩৫৮
※ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন | ৩৫৯
※ খলিফা হওয়ার শর্তসমূহ | ৩৬১
➤ক. মুসলিম হওয়া | ৩৬১
➤খ. পুরুষ হওয়া | ৩৬২
➤গ. আদালত ও ন্যায়পরায়ণতা থাকা | ৩৬৩
➤ঘ. ইলম থাকা | ৩৬৪
➤ঙ. দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়া | ৩৬৫
➤চ. কুরাইশি হওয়া | ৩৬৬
※ খলিফার মেয়াদ | ৩৬৬
※ মন্ত্রী পরিষদ | ৩৬৭
※ প্রাদেশিক শাসনকর্তা | ৩৬৯
※ আমির বা গভর্নর | ৩৭২
➤আমির নিয়োগের পদ্ধতি | ৩৭৩
※ বিচারকার্য | ৩৭৪
➤কাজি নিয়োগদান | ৩৭৬
➤কাজি হওয়ার শর্তসমূহ | ৩৭৬
※ ইসলামি সমরব্যবস্থা | ৩৮০
➤ফরজে কিফায়া ও ফরজে আইন জিহাদ | ৩৮৭
➤যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার গুরুত্ব | ৩৯১
➤যুদ্ধের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি | ৩৯২
◈প্রথমত, শক্তি অর্জন | ৩৯২
◈দ্বিতীয়ত, উত্তম প্রশিক্ষণ ও দক্ষ সৈনিক সংগ্রহ | ৩৯৩
◈তৃতীয়ত, একনিষ্ঠ উত্তম সেনানায়ক নির্বাচন | ৩৯৩
◈চতুর্থত, মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা | ৩৯৩
◈পঞ্চমত, অর্থনীতিতে উন্নয়ন | ৩৯৪
※ ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য | ৩৯৬
➤এক. প্রয়োজনমতো সামরিক শক্তি ব্যবহার করা | ৩৯৬
◈ ক. নফিরে আমের ঘোষণা | ৩৯৭
◈ ক. কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ | ৩৯৮
◈ খ . মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ | ৪০২
➤দুই. জাতি ও সমাজকে ইসলামের রঙে রাঙানো | ৪০৩
➤তিন. দণ্ডবিধি কার্যকর করা | ৪০৫
◈ ক. কিসাস | ৪০৫
◈ খ. হদ | ৪০৮
১. চুরির হদ | ৪১০
২. জিনার হদ | ৪১৪
৩. মদপানের হদ | ৪৬০
৪. অপবাদের হদ | ৪১৯
৫. ডাকাতির হদ | ৪২১
৬. জাদুর হদ | ৪২৪
৭. সমকামিতার হদ | ৪২৫

◈ গ. তাজির | ৪২৭
১. রমজান মাসে দিনের বেলা প্রকাশ্যে আহার করা | ৪২৯
২. রাস্তাঘাটে মহিলাদের উত্যক্ত করা | ৪২৯
৩. অহেতুক মানুষকে কষ্ট দেওয়া | ৪২৯
৪. ধূমপান করা | ৪৩০
৫. অরক্ষিত মাল চুরি করা | ৪৩০
৬. নিসাব-নিম্ন সম্পদ চুরি করা | ৪৩০
৭. গালি-গালাজ করা | ৪৩১
৮. জিনার নিম্নবর্তী গুনাহ করা | ৪৩১
➤চার. সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার-প্রসার করা | ৪৩৩
◈ ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ৪৩৪
◈ খ. ইলেকট্রিক মিডিয়া | ৪৩৫
◈ গ. প্রিন্ট মিডিয়া | ৪৩৬
◈ ঘ. বইপুস্তক প্রকাশ | ৪৩৬
◈ ঙ. অনুবাদ কর্ম | ৪৩৬
◈ চ. দায়ি প্রেরণ | ৪৩৭
➤পাঁচ. জাকাত উসুল ও দারিদ্র্য দূরীকরণ | ৪৩৮
➤ছয়. বিচারকার্য পরিচালনা | ৪৪৩
➤সাত. বিবিধ দায়িত্ব | ৪৪৪

চতুর্থ অধ্যায় : ইসলামি সমাজব্যবস্থা

❋ প্রাককথন | ৪৪৯
❋ ব্যক্তির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক | ৪৫২
➤এক. আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশে মুমিন ব্যক্তির পূর্ণতা থাকা | ৪৫২
➤দুই. আল্লাহকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা | ৪৫৩
➤তিন. একনিষ্ঠ হয়ে একমাত্র রবের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা | ৪৫৩
❋ মুমিনের সাথে রবের সম্পর্কের স্বরূপ | ৪৫৫
❋ আপন সত্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তির করণীয় | ৪৫৮
➤আত্মহত্যা ভয়াবহ এক সীমালঙ্ঘন | ৪৫৯
➤আত্মহত্যাকারী আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকারকারী | ৪৫৯
❋ মুমিনের শক্তিশালী হওয়া | ৪৬২
➤অসুস্থতা থেকে আরোগ্য | ৪৬৩
❋ সামষ্টিক পটভূমিতে ব্যক্তির অবস্থান | ৪৬৭
❋ যেমন হবে একজন মুসলিম | ৪৬৮
❋ পরিবার | ৪৭৩
➤বৈবাহিক বন্ধন | ৪৭৩
➤স্বামী | ৪৭৫
➤স্ত্রী | ৪৭৬
➤স্ত্রীর পক্ষ থেকে আসা কটু আচরণে করণীয় | ৪৭৭
➤সন্তানসন্ততি | ৪৭৯
➤পক্ষপাতিত্বহীন প্রতিপালন | ৪৮১
➤মেয়ে সন্তানকে ছেলে সন্তানদের মতো সমান তত্ত্বাবধান করা | ৪৮২
➤মেয়ে সন্তানের তত্ত্বাবধান | ৪৮২
➤কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানানোর জন্য পিতাকে প্রস্তুত করা | ৪৮৩
➤কন্যা সন্তানের উত্তম প্রতিপালন | ৪৮৩
❋ মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ | ৪৮৭
➤ইসলামে মাতা-পিতার মর্যাদা ও সম্মান | ৪৮৭
➤সদাচরণ করা | ৪৮৮
➤মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া | ৪৮৯
➤সদাচরণের সর্বোচ্চ হকদার হলেন মা | ৪৮৯
➤মাতা-পিতার প্রতি অভিশাপ দেওয়া | ৪৯০
➤মৃত্যুর পর মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করা | ৪৯১
❋ তালাক | ৪৯২
➤তালাকের পথে প্রতিবন্ধকতা | ৪৯২
◈এক. উত্তম উপদেশ দেওয়া | ৪৩৯
◈দুই. স্ত্রীকে বিছানায় ত্যাগ করা | ৪৯৩
◈তিন. হালকা প্রহার করা | ৪৯৩
◈চার. বিচার করা | ৪৯৫
➤তালাকের প্রকারভেদ | ৪৯৬
◈এক. তালাকে রজয়ি | ৪৯৭

◈দুই. তালাকে বাইন | ৪৯৮
◈তিন. তালাকে মুগাল্লাজা | ৪৯৯
❋ আল-জামাআহ | ৫০১
➤সমস্ত মুসলমান এক উম্মাহ | ৫০১
➤আত্মীয়তার সম্পর্ক | ৫০৫
➤সামাজিক সহযোগিতা | ৫০৬
➤জাকাত ছাড়াও সম্পদে আরও অধিকার আছে | ৫০৮
➤নিত্যব্যবহার্য বস্তু | ৫১২
➤সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের গূঢ়তত্ত্ব | ৫১৪
➤সদাচরণ ও নসিহতের স্বরূপ | ৫১৮
➤সদুপদেশ প্রদান | ৫২২
➤রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর বিধান | ৫২৩

পঞ্চম অধ্যায় : অর্থায়নব্যবস্থা

❋ প্রাককথন | ৫২৯
❋ সকল কিছুর মালিকানা আল্লাহর | ৫৩০
❋ মালিকানার পরিচয় | ৫৩৬
❋ মালিকানার প্রকারভেদ | ৫৩৭
❋ ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি | ৫৩৯
❋ নিজ অধিকারের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হওয়া | ৫৪১
❋ মালিকানা অর্জনের মাধ্যম | ৫৪৮
➤এক. ব্যবসা | ৫৪৮
➤দুই. বর্গাচাষ | ৫৫১
➤তিন. অর্ডার বা নির্মাণচুক্তি | ৫৫৪
➤চার. যৌথব্যবসা | ৫৫৬
◈ ক. মালিকানায় অংশীদারত্ব | ৫৫৮
◈ খ. চুক্তিতে অংশীদারত্ব | ৫৫৮
১. شركة الابدان - দৈহিক অংশীদারত্ব | ৫৫৮
২. شركة العنان - সমঅংশীদারত্ব | ৫৫৯
৩. شركة الوجوه - মর্যাদায় অংশীদারত্ব | ৫৬২
৪. شركة المفاوضة - সমান অংশীদারত্ব | ৫৬২
৫. شركة المساهمة - অংশীদারত্বের চুক্তিতে ব্যবসা | ৫৬৬
➤পাঁচ. মুদারাবা | ৫৬৮
➤ছয়. চাকরি | ৫৭০
➤সাত. মিরাসি সম্পত্তি | ৫৭১
➤আট. উপঢৌকন ও দান | ৫৭৭
➤নয়. ভাড়া দেওয়া | ৫৭৮
➤দশ. স্বাধীন পেশা | ৫৭৮
❋ পরিশ্রম ও পারিশ্রমিকের মাঝে সমতা | ৫৮০
❋ উপার্জনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা স্বাভাবিক | ৫৮২
❋ মালিকানা অর্জনের অবৈধ পন্থাসমূহ | ৫৮৪
➤এক. সুদ | ৫৮৪
◈ সুদের পরিচয় ও প্রকারভেদ | ৫৮৬
➤দুই. মজুতদারি ও গুদামজাতকরণ | ৫৯০
➤তিন. জুয়া ও বাজি ধরা | ৫৯১
➤চার. ঘুষ | ৫৯৩
➤পাঁচ. সম্পদ মজুদ করা | ৫৯৪
❋ বিভিন্ন বাতিল চুক্তি | ৫৯৫
❋ ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উৎস | ৫০৩
➤এক. الزكاة - জাকাত | ৬০৪
◈ জাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ | ৬০৬
◈ জাকাতের নিসাব | ৬০৭
◈সোনা, রুপা ও অর্থের জাকাত | ৬০৭
◈ ব্যবসার জাকাত | ৬০৮
◈ নিসাব পরিপূর্ণ হওয়ার সময় | ৬০৯
◈ গবাদি পশুর জাকাত | ৬১০
◈ উটের নিসাব | ৬১০
◈ গরুর নিসাব | ৬১৩
◈ ছাগলের নিসাব | ৬১৩

◈ ফসল ও ফলফলাদির জাকাত | ৬১৪
◈ ফসল ও ফলের নিসাব | ৬১৫
◈ অসাকের পরিমাণ | ৬১৬
◈ জাকাত আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | ৬১৬
◈ জাকাতের খাতসমূহ | ৬১৭
➢দুই. খারাজ | ৬২৮
➢তিন. ওশর | ৬৩২
➢চার. ফাই | ৬৩৪
➢পাঁচ. গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ | ৬৩৬
➢ছয়. জিজিয়া | ৬৩৮
➢সাত. খনিজ পদার্থ | ৬৪১
➢আট. পানি সম্পদ | ৬৪৫
➢নয়. প্রয়োজনীয় কর | ৬৪৬
➢দশ. সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ | ৬৪৮
❋ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ | ৬৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : বিভিন্ন মতবাদ ও তার আগ্রাসন

❋ প্রাককথন | ৬৫৭
❋ পূজনবাদ | ৬৫৮
➢এক. জাতীয়তাবাদ | ৬৫৮
◈ দেশপ্রেম | ৬৫৮
◈ ভাষাপ্রীতি | ৬৬১
➢দুই. রক্তসম্পর্ক ও বংশপরম্পরা | ৬৬২
➢তিন. হিন্দুধর্ম | ৬৬৬
❋ ধর্মনিরপেক্ষতা | ৬৬৮
➢ধর্মনিরপেক্ষতা কী? | ৬৬৮
➢ধর্মনিরপেক্ষতার রূপসমূহ | ৬৭০
◈প্রথম রূপ : সরাসরি নাস্তিকতা | ৬৭০
◈দ্বিতীয় রূপ : পরোক্ষ নাস্তিকতা | ৬৭০
◈সারকথা | ৬৭১
➢ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীদের শ্রেণিভাগ | ৬৭২
➢ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবতা | ৬৭২
➢ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষতিকর দিকগুলো | ৬৭৪
❋ পুঁজিবাদ | ৬৭৭
➢পুঁজিবাদের উদ্ভব | ৬৭৭
➢পুঁজিবাদের প্রকৃত রূপ | ৬৭৮
➢পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ | ৬৭৮
◈ জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি | ৬৭৮
◈ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন | ৬৭৮
◈ অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা | ৬৭৯
◈ অবাধ অর্থনীতি | ৬৭৯
◈ ব্যক্তির নিরঙ্কুশ মালিকানা | ৬৭৯
◈ গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন | ৬৮০
➢পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী | ৬৮০
➢সংক্ষেপে পুঁজিবাদের বর্তমান চরিত্র | ৬৮০
➢পুঁজিবাদের ফলাফল | ৬৮১
➢পুঁজিবাদে কল্যাণ আছে কি? | ৬৮২
❋ কমিউনিজম | ৬৮৫
➢কমিউনিজমের উৎপত্তি | ৬৮৫
➢কমিউনিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ | ৬৮৬
◈দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ | ৬৮৬
◈ধর্মের উৎখাত | ৬৮৭
◈ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ | ৬৮৮
◈নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি | ৬৮৮
◈রাষ্ট্রীয় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা | ৬৮৮
◈শ্রেণিহীনতা | ৬৮৯
◈সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন | ৬৮৯
➢কমিউনিজমপ্রীতির কারণ | ৬৮৯
◈জুলুম-নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া | ৬৯০
◈ধনীদের প্রতি ঈর্ষা | ৬৯০

◈প্রাচুর্যময় জীবনের লোভ | ৬৯১
◈বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ | ৬৯১
▸কমিউনিজমের মূলনীতিসমূহ | ৬৯২
◈দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রুপ ৬৯২
◈সব উন্নতির মাধ্যম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি | ৬৯৬
◈ব্যক্তি মালিকানা বলতে কিছুই নেই | ৬৯৭
◈শ্রেণি বিভাজনের মূলোৎপাটন | ৬৯৮
▸সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বর্তমান বৈশিষ্ট্য | ৭০০
❋ গণতন্ত্র | ৭০২
▸গণতন্ত্রের সূচনাকাল | ৭০২
▸গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও স্বরূপ | ৭০৫
▸শরিয়তের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র | ৭০৮
◈কুরআন থেকে দলিল | ৭০৮
◈হাদিস থেকে দলিল | ৭০৮
◈ইজমা থেকে দলিল | ৭০৯
◈কিয়াস থেকে দলিল | ৭১১
▸সংখ্যাগরিষ্ঠতা কি হকের মানদণ্ড? | ৭১২
▸গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অপব্যবহার | ৭১২
◈বিশ্বাসের স্বাধীনতা | ৭১৩
◈মত প্রকাশের স্বাধীনতা | ৭১৪
◈মালিকানার স্বাধীনতা | ৭১৪
◈ব্যক্তি স্বাধীনতা | ৭১৫
▸ফিরাউনি ব্যবস্থার আধুনিক সংস্করণ | ৭১৬
❋ ক্রুসেড | ৭২০
▸ক্রুসেড কাকে বলে? | ৭২০
▸ক্রুসেড নামে নামকরণের কারণ | ৭২০
▸ক্রুসেডের কারণ বিবৃতি | ৭২০
▸একাদশ শতকে ক্রুসেড সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহ | ৭২২
▸ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ | ৭২৬
◈প্রথম ক্রুসেড | ৭২৬
◈দ্বিতীয় ক্রুসেড | ৭২৮
◈তৃতীয় ক্রুসেড | ৭৩১
◈চতুর্থ ক্রুসেড | ৭৩৩
◈পঞ্চম ক্রুসেড | ৭৩৩
◈ষষ্ঠ ক্রুসেড | ৭৩৩
◈সপ্তম ক্রুসেড | ৭৩৩
◈অষ্টম ক্রুসেড | ৭৩৪
◈নবম ক্রুসেড | ৭৩৪
◈অন্যান্য ক্রুসেড | ৭৩৫
◈দশম ক্রুসেড | ৭৩৭
▸চরম উপনিবেশকৃত উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ | ৭৩৭
▸সাধারণ উপনিবেশকৃত দেশসমূহ | ৭৩৮
▸উপসাগরীয় অঞ্চলে সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্রসমূহ | ৭৩৮
▸আরব উপদ্বীপের দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহ | ৭৩৯
▸চলমান ক্রুসেড | ৭৩৯
▸কাফিরদের সাথে মুসলিমদের আচরণনীতি | ৭৪০
❋ উপসংহার | ৭৪২
❋ গ্রন্থপঞ্জি | ৭৪৫

দুটি কথা

একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলার পথে সামগ্রিক যে দিক-নির্দেশনার দরকার হয়, সেটাই হলো জীবনব্যবস্থা। পৃথিবীতে মৌলিকভাবে দুধরনের জীবনব্যবস্থা বিদ্যমান। একটি হলো, আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশিকা, যাকে বলা হয় ইসলামি জীবনব্যবস্থা। আরেকটি হলো, মানবরচিত জীবনব্যবস্থা, যা বিভিন্ন শ্রেণির দর্শন ও যুক্তিভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন : হিন্দুইজম, সেক্যুলারিজম, ডেমোক্রেসি ইত্যাদি।

এত এত জীবনব্যবস্থার মধ্যে ইসলামি জীবনব্যবস্থা একেবারেই স্বতন্ত্র ও অনন্য। কারণ, তা এমন এক মহান সত্তা-প্রদত্ত জীবন নির্দেশিকা, যিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়ে অবগত। এর বিপরীত মানুষের জ্ঞান ও গবেষণা ক্ষুদ্রাতি থেকে ক্ষুদ্র। স্বাভাবিকতই উভয়ের প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার মাঝে থাকবে আকাশ-পাতাল ব্যবধান; বরং তার চেয়েও অসংখ্য গুণ বেশি।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি জীবনব্যবস্থা এমন এক সুদৃঢ় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার স্থায়িত্ব কিয়ামত পর্যন্ত গ্যারান্টিপ্রাপ্ত। সর্বযুগে, সর্বক্ষেত্রে ও সর্বশ্রেণির মানুষের জন্যই এর বিধিবিধান সমভাবে প্রযোজ্য। এর বিপরীত মানবরচিত জীবনব্যবস্থা হয়ে থাকে সাময়িক ও পতনোন্মুখ। বর্তমান হিসাবে একটি নীতি তৈরি করলেও কিছুদিন পর অবস্থার পরিবর্তনে সে নীতিকেই পদতলে পিষ্ট করে আবার নতুন করে আইন তৈরি করতে হয়।

তৃতীয়ত, ইসলামের প্রতিটি বিধান ন্যায় ও সুষমভাবে প্রণীত। এতে নেই কোনো প্রান্তিকতার ছোঁয়া। নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, ধনী-গরিব, আরব-অনারব; সবার জন্য উপযোগী করেই তৈরি করা হয়েছে নীতিমালা। কারও প্রতি সামান্য পরিমাণ অযাচিত কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি। অগ্রাধিকারের জায়গায় অগ্রাধিকার, সাম্যের জায়গায় সাম্য, কঠোরতার

জায়গায় কঠোরতা এবং ক্ষমার জায়গায় ক্ষমার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর বিপরীত মানবরচিত জীবনব্যবস্থার কোনোটির নীতিমালায় শিথিলতার ছাপ দৃশ্যমান, কোনোটিতে কঠোরতার ছড়াছড়ি, কোনোটিতে সাম্য ও ব্যাপক সমঅধিকারের মিথ্যা দাবি আর কোনোটিতে রয়েছে বৈরাগী জীবনের দীক্ষা। এমন আরও অনেক পার্থক্যই বলা যাবে, যা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, উভয় জীবনব্যবস্থার মাঝে রয়েছে অসীম ব্যবধান।

কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হলো, অন্যান্য জীবনব্যবস্থা থেকে ইসলামি জীবনব্যবস্থার যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা শত গুণে এগিয়ে থাকলেও শুধু ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণেই মানুষ এর প্রকৃত সৌন্দর্যের দেখা পাচ্ছে না। অথচ তারা শান্তি ও মুক্তির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানবরচিত জীবনব্যবস্থার কষাঘাতে আজ তারা চরম হতাশ হয়ে পড়েছে। তারা এখন পুরোপুরি দিগভ্রান্ত, একেবারে দিশেহারা। এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে, কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না শান্তির দেখা। একবার এ দলে, একবার সে দলে; কখনো এ পথে, কখনো সে পথে। এভাবেই সে মুক্তির খোঁজে পাগলপারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

স্বাভাবিকত মানুষ যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন খাবার খোঁজে; যখন তৃষ্ণার্ত হয়, তখন পানি খোঁজে; যখন পোশাকহীন হয়, তখন কাপড় খোঁজে। অনুরূপ মানুষের জীবন থেকে যখন শান্তি বিদায় নেয়, তখন সে সব জায়গায় গিয়ে স্বস্তি খোঁজে। তার বিশ্বাসের জায়গাগুলোতে সে সাধ্যমতো ধরনা দিতে থাকে। কোথাও শান্তির আভাস পেলে তজ্জন্য সে উতলে ওঠে, জানপ্রাণ বিলিয়ে দিতে চায়। মানুষের মাঝে এ অবস্থা এখন ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। সর্বত্রই আজ মানুষের হাহাকার আর আহাজারি শোনা যাচ্ছে। মানবসমাজে আজ কেমন অসহায়ভাব বিরাজ করছে! সবাই যে মুক্তি চায়! সবাই যে বাঁচতে চায়; ইজ্জত ও সম্মানের সাথে, ইমান ও দ্বীনদারির সাথে!

এমতাবস্থায় আলিম সমাজ যদি তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য ও মহানুভবতার বাণী তুলে না ধরে, তাহলে আর কবে এসব আমানত তাদের নিকট পৌঁছাবে? মানুষ শান্তি খুঁজলেও তো তাদের জানা নেই, কোথায় পাওয়া যাবে এ শান্তির দেখা। মুক্তি চাইলেও তো তারা জানে না, কোন

পথে তাদের মুক্তি। তাই মানুষের এহেন করুণ মুহূর্তে আমরা তাদের নিকট ইসলামের শাশ্বত বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছি। যেন তারা এর সুশীতল ছায়ায় পূর্ণরূপে আশ্রয় নিয়ে জীবনের সব ক্লেশ দূর করতে পারে এবং ইসলামের দীপ্ত আলোয় আলোকিত করতে পারে নিজেদের জীবন ও সমাজ।

মানবরচিত জীবনব্যবস্থার কুফল, স্বৈরাচারিতা ও অপূর্ণতা দেরিতে হলেও আজ সমগ্র বিশ্ব অনুধাবন করছে। ইউরোপ, মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, ভারত উপমহাদেশ, পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ—সর্বত্রই আজ মানুষ চলমান কুফরি জীবনব্যবস্থার প্রতি বিষিয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা ঝেড়ে ফেলে নিজেদের মৌলিক বিশ্বাস বুঝতে শুরু করেছে। আল্লাহর ভূমিতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করার চেষ্টা করছে। তাদের দৃঢ় ইমানি চেতনা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনেক স্বৈরশাসকের ভিত কাঁপিয়ে দিচ্ছে এবং পশ্চিমাদের অনেক হিসাব-নিকাশ পাল্টে দিচ্ছে।

ইসলামের এই পুনর্জাগরণ মুসলমানদের ঘরে ঘরে এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে যে, পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আবারও ইসলাম ফিরে আসছে। এই মুহূর্তে মুসলমানদের করণীয় হচ্ছে, বৈশ্বিক এই সংগ্রামে পূর্ণ আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞার সাথে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করা। আর এ কাজের পূর্বশর্ত হিসাবে আমাদের অবশ্যই বিশ্ব-মুসলিমের সমস্যাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। কুফরের সাথে ইসলামি বিপ্লবের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে হবে এবং ইসলাম যে মানুষের সমস্যার পরিপূর্ণ ও সঠিক সমাধান দেয়, এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর তাই ইসলামি জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের থাকতে হবে স্পষ্ট ধারণা ও স্বচ্ছ জ্ঞান।

এ মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এবারের সংকলন 'ইসলামি জীবনব্যবস্থা'। ব্যাপক চিন্তা ও সুদূরপ্রসারী ভাবনা থেকে বইটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। বস্তুত একটি বইয়ে ইসলামের সব বিধিবিধান বিশদভাবে সংকলন করা কখনোই সম্ভব নয়। তাই এতে ইসলামের কিছু বিষয়ের আলোচনা এসেছে বিশদভাবে, আর অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ ধারণা

দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, কুফর ও ইসলামের সংঘাত, ইসলামি শরিয়াব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, সমরব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থায়নব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, ফৌজদারি এবং বিভিন্ন বাতিল দর্শন ও মতবাদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, আমাদের সমাজে এগুলোর প্রয়োগ তো নেই-ই; এমনকি এসব নিয়ে ওয়াজ বা সাধারণ আলোচনা পর্যন্ত কোথাও করা হয় না। আর তাই মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য, সূক্ষ্মতা ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে একেবারেই অনবগত। এ ব্যাপারটি ভালোভাবে অনুধাবন করলে তারা খুব দ্রুতই আবার ইসলামের দিকে ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়; যেমন সন্তান স্বীয় জন্মদাত্রী মাকে চেনার পর তার কোলে ফিরে আসে। পাশাপাশি ইবাদত, তাকওয়া, আখলাক, ইনসাফ, তাওয়াক্কুল, তাজকিয়া, হুকুক, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি বিষয়েও প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। কারণ, এসব বিষয়ে মুসলিম জনসাধারণ কমবেশি কিছুটা হলেও অবগত আছে। পুরোপুরি না হলেও তাদের আংশিক ধারণা রয়েছে। তাই এসব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়নি। যদিও প্রয়োজনভেদে কিছু কিছু জায়গায় একটু বিশদ আলোচনাও এসেছে। এসব আলোচনায় শুধু মৌলিক দিকগুলোর প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে; যদিও এতটুকু থেকেও মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা পাবে বলে আমরা আশাবাদী।

কুরআন-হাদিসের নুসুসের পাশাপাশি তাফসির, ফিকহ, উসুল, ফালসাফা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমরনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের শতাধিক প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থকে সামনে রেখে বক্ষ্যমাণ বইটি সংকলন করা হয়েছে। গ্রন্থটি সংকলন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনেক কিতাবই উপকারে এসেছে। আকায়িদ ও শরয়িব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ, তাফসির ও ফিকহে মুদাল্লালের ওপরই কেবল নির্ভর করতে হয়েছে। শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর নুসুসের পাশাপাশি আন-নিজামুস সিয়াসি ফিল ইসলাম, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা, নিজামুল ইসলাম, সিয়াসাতুত তাদাররুজ থেকেও বেশ উপকৃত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। অর্থায়নব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিতাবুল খারাজ, আল-মালু ওয়াল হুকুম ফিল ইসলাম, নিজামুল ইসলাম-সহ আরও বেশ কিছু প্রাচীন ও আধুনিক কিতাব

সামনে ছিল। সমাজব্যবস্থা ও বিভিন্ন বাতিল মতবাদের ক্ষেত্রে কিতাবুশ শুয়ুইয়্যাহ ওয়াল ইনসানিয়্যা, আল-মাওকিফ মিনাদ দ্বীন লি-লেনিন, আসালিবুল গাজওয়ায়িল ফিকরি, আল-আলমানিয়্যাতু ও সামারাতুহাল খাবিসা, নাশআতুল আলমানিয়্যা, মা-জা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, আল-মাদখাল ইলা নাজরিয়্যাতিল ইলতিজামিল আম্মাহ ফিল ফিকহিল ইসলামি, তারিখু ইবনি খালদুন, মানাহিজুশ শারিয়াতিল ইসলামিয়্যা, মাজাহিবু ফিকরিয়্যাতিম মুআসিরা-সহ বিভিন্ন কিতাব থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি উপকারে এসেছে ড. আমির আব্দুল আজিজ বিরচিত 'নিজামুল ইসলাম' গ্রন্থটি। বক্ষ্যমাণ বইটির বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনেকাংশে উক্ত গ্রন্থটিরই অনুসরণ করা হয়েছে। আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, আল-মাকতাবাতুল কামিলা ও জাওয়ামিউল কালিমের পাশাপাশি বিভিন্ন দ্বীনি ওয়েবসাইট ও অনলাইন মাকতাবার সাহায্যও অনেক কাজে লেগেছে। ইসলামি গ্রন্থাদির পাশাপাশি কিছু জেনারেল লেভেলের বই ও উইকিপিডিয়া থেকেও প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থটিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহর দলিল আনয়নের প্রতি। যথাসম্ভব শরয়ি নস থেকে দলিল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যেন প্রতিটি মাসআলার ব্যাপারে পাঠকের অন্তরে পূর্ণ আস্থা ও প্রশান্তি আসে। কারও মনে যেন কোনো সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ না থাকে। গ্রন্থটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে উদ্ধৃত সব হাদিসের মান নির্ণয় করে দেওয়া হয়েছে। যেন পাঠকরা জানতে পারে, কোন দলিলের শক্তি ও মান কেমন। প্রয়োজনবশত সামান্য কয়েকটি জইফ হাদিস থাকলেও এতে অধিকাংশই সহিহ ও হাসান হাদিস আনা হয়েছে। মওজু বা অত্যাধিক দুর্বল হাদিস পুরোপুরি পরিহার করা হয়েছে। কেননা, এ দুপ্রকারের হাদিস মাসায়িল বা ফাজায়িল কোনো ক্ষেত্রেই দলিলযোগ্য নয়। সহিহ বুখারি ও মুসলিমের সব হাদিসই সহিহ হওয়ায় এসব হাদিসের সাথে ভিন্নভাবে কোনো মন্তব্য উল্লেখ করা হয়নি। এ দুটি ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের হাদিসগুলোর উদ্ধৃতি শেষে তার মান সংযুক্ত করে দেওয়া আছে। মুআমালা বা লেনদেন সংশ্লিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে চার মাজহাব সামনে

রেখে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও ইখতিলাফ থাকলে ইখতিলাফ বর্ণনা করে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি সুন্দর ও নিভুল করার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এতে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই এতে কোনো ধরনের ভুল নজরে পড়লে অবহিত করার অনুরোধ রইল; যেন পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেওয়া যায়।

শেষে সকল পাঠকের উদ্দেশে বলতে চাই, পুরো বিশ্বজুড়ে আজ ইসলাম আবার জাগছে। এ জাগরণ থেকে বাড়ছে মানুষের জানার আগ্রহ। ব্যাপক অনুসন্ধিৎসু অধ্যয়ন থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের জ্ঞানের পরিধি। অথচ মুসলিম হয়েও আজ আমরা জানি না—নিজেদের দ্বীনের মর্মবাণী। উপলব্ধি করি না—ইসলামের সৌন্দর্য ও স্বকীয়তা। বুঝার চেষ্টা করি না—ইসলামি বিধিবিধানের সর্বজনীনতা। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কী আছে? বিশ্বের এ জাগরণকালে যারা পিছিয়ে থাকবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাত সব জায়গায়ই পিছিয়ে থাকবে। মহাবিশ্বের মহাধর্ম ইসলামের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে তাই আমাদের জানার কোনো বিকল্প নেই। যেভাবেই হোক জানুন, যেভাবেই হোক বুঝুন। তবে জানার উৎস যেন হয় নির্ভরযোগ্য এবং বুঝার মাধ্যম যেন হয় আস্থাযোগ্য। ইসলামের পূর্ণ ছায়ায় ফিরে এসে আপনার জীবন হয়ে উঠুক আল্লাহর রঙে রঙিন। আপনার চলন-বলন হয়ে উঠুক ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত। বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে এ দুআ ও প্রত্যাশাই করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমিন।

তারেকুজ্জামান
১০/০৩/২০১৯ ইং

ইসলাম পরিচিতি

আভিধানিক অর্থ :

'ইসলাম' শব্দটি আরবি শব্দ, যার অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা। এটা سلم থেকে নির্গত হয়েছে। সিন, লাম ও মিমযোগে গঠিত শব্দ অধিকাংশ সময় সুস্থতা ও নিরাপত্তার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম ধর্ম যেহেতু অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণভাবে মেনে চলার নাম, তাই অর্থের মূল ধারণ করায় 'ইসলাম' নামটি আভিধানিকভাবে যথার্থ।

ইমাম ইবনে ফারিস রাজি ﷺ বলেন :

(سَلِمَ) السِّينُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ مُعْظَمُ بَابِهِ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ ; وَيَكُونُ فِيهِ مَا يَشِذُّ، وَالشَّاذُّ عَنْهُ قَلِيلٌ، فَالسَّلَامَةُ: أَنْ يَسْلَمَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْعَاهَةِ وَالْأَذَى. قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ هُوَ السَّلَامُ ; لِسَلَامَتِهِ مِمَّا يَلْحَقُ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْعَيْبِ وَالنَّقْصِ وَالْفَنَاءِ. قَالَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ: {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} [يونس: ٢٥]، فَالسَّلَامُ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَدَارُهُ الْجَنَّةُ. وَمِنَ الْبَابِ أَيْضًا الْإِسْلَامُ، وَهُوَ الِانْقِيَادُ ; لِأَنَّهُ يَسْلَمُ مِنَ الْإِبَاءِ وَالِامْتِنَاعِ.

'سلم (সালিমা)। সিন, লাম ও মিমযোগে গঠিত অধিকাংশ শব্দে সুস্থতা ও মুক্তির অর্থ রয়েছে। কখনো ব্যতিক্রমও হয়; যদিও এর সংখ্যা নিতান্তই কম। অতএব, سلامة (সালামাহ) অর্থ বিপদ ও কষ্ট থেকে মানুষের নিরাপদ থাকা। উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা হলেন سلام (সালাম)। যেহেতু তিনি দোষ, ত্রুটি ও বিনাশ হওয়া থেকে মুক্ত, যা মাখলুকের গুণাগুণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর আল্লাহ আহ্বান করেন শান্তি-নিরাপত্তার আবাসের দিকে"। [সুরা ইউনুস : ২৫] আল্লাহ হলেন শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা এবং জান্নাত হলো তাঁর আবাস। এ শব্দ থেকেই এসেছে, الإسلام (আল-ইসলাম)। এর অর্থ মান্য করা, আনুগত্য

প্রদর্শন করা। (সুস্থতা ও নিরাপত্তার অর্থের সাথে ইসলামের অর্থের পুরাই মিল রয়েছে।) কেননা, এটা অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতা থেকে (মুসলিমকে) নিরাপদ করে।'[১]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ জাইনুদ্দিন রাজি ﷺ বলেন :

وَأَسْلَمَ دَخَلَ فِي (السَّلَمِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الِاسْتِسْلَامُ.

'আর أَسْلَمَ অর্থাৎ সে আনুগত্যে প্রবেশ করল। 'ইসলাম' এর অর্থ হলো, আত্মসমর্পণ করা ও অনুগত হওয়া।'[২]

আল-মুনজিদে 'ইসলাম' এর অর্থ এভাবে বলা হয়েছে:

اَلْاِنْقِيَادُ لِأَمْرِ الْآمِرِ وَنَهْيِهِ بِلَا اعْتِرَاضٍ

'কোনো প্রকারের আপত্তি ছাড়া হুকুমদাতার আদেশ-নিষেধ মান্য করা।'[৩]

এভাবে প্রায় সব অভিধানবিদই الإسلام (আল-ইসলাম) এর অর্থ 'আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পন করা' লিখেছেন। আর এটাই তার মূল আভিধানিক অর্থ। এ অর্থেই কুরআনে এসেছে :

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾

'যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তাকে জবেহ করার জন্যে শায়িত করল।[৪]

মোটকথা, আভিধানিকভাবে الإسلام (আল-ইসলাম) শব্দটি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করার অর্থ বুঝায়। চাই মাখলুকের আনুগত্য হোক বা খালিকের, দ্বীনি বিষয়ে হোক বা পার্থিব, স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্যতামূলক; সকল ক্ষেত্রেই তাকে الإسلام (আল-ইসলাম) বলা যাবে।

১. মাকায়িসুল লুগাহ : ৩/৯০ (দারুল ফিকর, বৈরুত)
২. মুখতারুস সিহাহ : পৃ. নং ১৫৩ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত)
৩. আল-মুনজিদ : পৃ. নং ৩৪৭ (আল-মাতবাআতুল কাসুলিকিয়া, বৈরুত)
৪. সূরা আস-সাফফাত : ১০৩

পরিভাষিক অর্থ :

পরিভাষায় ইসলামের দুটি প্রকার রয়েছে। যথ : কাওনি বা ব্যবস্থাপনাগত ইসলাম এবং শরয়ি বা বিধানগত ইসলাম।

এক. কাওনি বা ব্যবস্থাপনাগত ইসলাম

আল্লাহর সৃষ্টিব্যবস্থা ও নিজামের সামনে সকল মাখলুকের আত্মসমর্পণ করার নাম কাওনি বা ব্যবস্থাপনাগত ইসলাম। আল্লাহর নির্ধারিত সৃষ্টিব্যবস্থার সাথে কেউই বিদ্রোহ বা বিরোধিতা করতে পারে না। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সব মেনে নিতে বাধ্য থাকে।

কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾

'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্যতামূলক একমাত্র তাঁরই আনুগত্য প্রদর্শন করে। আর সবাই তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।'[৫]

ইসলামের এ সংজ্ঞানুসারে আল্লাহর প্রতিটি মাখলুকই মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী। কেননা, তাদের আল্লাহর নিজামের বাইরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। সুস্থতা-অসুস্থতা, জীবন-মৃত্যু, সচ্ছলতা-দীনতা ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সব—মেনে নেয়। কেননা, এ ছাড়া যে তাদের ভিন্ন কোনো উপায় নেই!

বস্তুত এ ইসলাম শরিয়তের উদ্দিষ্ট নয়। এর জন্য কোনো প্রতিদান বা শাস্তি নেই। এ ইসলামের সাথে জান্নাত-জাহান্নামেরও কোনো সম্পর্ক নেই। যেহেতু এ ইসলামে কাফির-মুশরিক, মুমিন-মুনাফিক সবাই অন্তর্ভুক্ত। সকল মাখলুকই এ ইসলামে প্রবেশ করে।

৫. সূরা আলি ইমরান : ৮৩

দুই. শরয়ি বা বিধানগত ইসলাম

আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধ ও তাঁর সকল আইন মেনে নেওয়ার নাম হলো শরয়ি বা বিধানগত ইসলাম। এটা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক একটি দ্বীন। এটা গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা হয়নি। ইসলামের আহ্বান জানানোর পর যার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করে দুনিয়া-আখিরাতের সফলতা অর্জন করবে, আর যার ইচ্ছা হয় গ্রহণ না করে জিজিয়া-কর দিয়ে জিল্লতির সাথে বেঁচে থাকবে। এ জন্যই এর সাথে প্রতিদান বা শাস্তির বিষয়টি জড়িত। এ ইসলামের সাথেই জান্নাত-জাহান্নামের সম্পর্ক। আর শরিয়তে এ ইসলামই মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন :

وَالْإِسْلَامُ بِمَعْنَى الْإِيمَانِ والطاعات، قال أَبُو الْعَالِيَةِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ

'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর আনুগত্য করার নাম ইসলাম। ইমাম আবুল আলিয়া ﷺ বলেন, "এটাই অধিকাংশ বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মত।"'[৬]

এটি ব্যাপক অর্থবহ একটি সংজ্ঞা, যার অধীনে আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের জীবন পরিচালনার পদ্ধতি, ইহকালীন ও পরকালীন সকল বিধিবিধানের প্রতি বান্দার আন্তরিক সত্যায়ন এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যসহ যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এটিই হলো প্রকৃত ইসলামের বাস্তবতা ও তার মূলভিত্তি।

'আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা'-তে এসেছে :

هُوَ اسْتِسْلاَمُ الْعَبْدِ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَل بِاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّهَادَةِ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ، وَالْعَمَل بِالْجَوَارِحِ.

৬. তাফসিরুল কুরতুবি : ৪/৪৩ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)

'ইসলাম হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত শরিয়তের অনুসরণ, যথা তাওহিদ-রিসালাতের মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শন করা।'[৭]

এ শরয়ি বা বিধিবিধানগত ইসলাম আবার দুপ্রকার। এক. আম বা ব্যাপক। দুই. খাস বা বিশেষ।

ক. আম ইসলাম

সকল নবি-রাসুল সমষ্টিগতভাবে যে বিধান ও দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তাকে আম ইসলাম বলা হয়। যেমন : তাওহিদ- রিসালাত, আম্বিয়া-ফেরেশতা, কিতাব-তাকদির, কবর-কিয়ামত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নামসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা; পাশাপাশি কুফর, শিরক, চুরি, ব্যভিচার, জাদু, জুলুমসহ সব ধরনের নিষিদ্ধ কাজ ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এসব এমন বিধান, যা সকল নবি-রাসুলেরই দাওয়াতের অংশ ছিল। ব্যাপকভাবে তাঁরা এসব বিষয়ের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। এগুলো কোনো যুগ বা স্থানের সাথে বিশেষিত নয়; বরং সর্বযুগে সর্বস্থানে এসব বিধানাবলি চালু ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এতে কোনো রদ-বদল হবে না। কুরআনে এ আম অর্থে 'ইসলাম' বা 'মুসলিম'-এর ব্যবহার প্রচুর পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা নুহ ﷺ-এর ব্যাপারে বলেন :

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّٰهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

'তারপরও যদি বিমুখতা প্রদর্শন করো, তবে আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হই।'[৮]

৭. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ৪/২৫৯ (অজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যা, কুয়েত)
৮. সুরা ইউনুস : ৭২

আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম ﷺ-এর ব্যাপারে বলেন :

﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴾

'ইবরাহিম ইহুদি ছিলেন না, খ্রিষ্টানও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম।'[৯]

আল্লাহ তাআলা ইসা ﷺ-এর হাওয়ারিদের ব্যাপারে বলেন :

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

'অতঃপর ইসা যখন বনি ইসরাইলের কুফরি উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী-সাথিরা বলল, আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকেন যে, আমরা হলাম মুসলমান।'[১০]

খ. খাস ইসলাম

শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত দ্বীন ও শরিয়তকে খাস ইসলাম বলে। রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদিসে জিবরিলে এ খাস ইসলাম এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন :

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

'ইসলাম হলো, তুমি এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল, নামাজ প্রতিষ্ঠা

৯. সুরা আলি ইমরান : ৬৭
১০. সুরা আলি ইমরান : ৫২

করবে, জাকাত আদায় করবে, রমজান মাসের রোজা রাখবে এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ করবে।'[১১]

সুতরাং যেকোনো আনুগত্যের নামই ইসলাম নয়; বরং আনুগত্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে। আবার শুধু বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে আনুগত্য করাই যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তা শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরিয়তের অনুকূলে হবে। অতএব, প্রকৃত ইসলাম রাসুলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আনীত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নাম। এতে যে কমবেশ করবে সে প্রকৃত ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

ইসলামের বুনিয়াদ

প্রতিটি জিনিসেরই মূল কিছু বুনিয়াদ থাকে, যার ওপর ভিত্তি করে সে অস্তিত্ব লাভ করে। বুনিয়াদ না থাকলে জিনিস বিনষ্ট হয়ে যায়। বুনিয়াদ দুর্বল হলে সে জিনিসও দুর্বল হয়ে যায়। ইসলামেরও তেমনই কিছু বুনিয়াদ আছে, যার পূর্ণতায় ইসলাম পূর্ণ হয়, আর অস্পূর্ণতায় ইসলাম অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ইসলামের বুনিয়াদ হলো পাঁচটি। যথা : তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, রোজা রাখা, জাকাত দেওয়া ও হজ করা।

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

'ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। যথা : এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত আদায় করা, হজ পালন করা ও রমজান মাসের রোজা রাখা।'[১২]

১১. সহিহ মুসলিম : ১/৩৬, হা. নং ৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
১২. সহিহুল বুখারি : ১/১১, হা. নং ৮, (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

প্রতিটি মুমিনের মাঝে এ পাঁচটি বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে; নচেৎ সে প্রকৃত অর্থে মুমিন নয়। পাঁচটির কোনোটিই না থাকলে তো সে পরিষ্কার কাফির। আর যদি কিছু থাকে আর কিছু না থাকে তাহলে হুকুম আরোপের দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য হবে। কেননা, হাদিসে বর্ণিত পাঁচটি ভিত্তিমূল সমমানের বা একই মর্যাদার নয়। এগুলোর মধ্যে শ্রেণিগতভাবে কিছুটা পার্থক্য আছে।

সুতরাং প্রথমটি অর্থাৎ তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য না থাকলে সে ইসলামের যত আমলই করুক না কেন, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সে কাফির হিসাবেই বিবেচিত থাকবে। আর প্রথমটি ঠিক থাকার পর যদি বাকি চারটি বা কোনো একটি না থাকে, তাহলে হানাফি মাজহাবমতে সে কাফির তো হবে না বটে, কিন্তু তার ইমান ও ইসলামের অবস্থা হবে অত্যন্ত দুর্বল। অবশ্য এ চারটির মধ্যে নামাজের বিষয়ে বেশ শক্তিশালী মতানৈক্য রয়েছে। অনেক মুহাদ্দিস ও ফকিহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ পরিত্যাগকারী কাফির হয়ে যায়। অনেকে তো নামাজের সাথে জাকাত, রোজা ও হজকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَهُوَ كَافِرٌ وَأَمَّا الْأَعْمَالُ الْأَرْبَعَةُ فَاخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا وَنَحْنُ إِذَا قُلْنَا: أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِالذَّنْبِ فَإِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ الْمَعَاصِيَ كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ وَأَمَّا هَذِهِ الْمَبَانِي فَفِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ. وَعَنْ أَحْمَد فِي ذَلِكَ نِزَاعٌ. وَإِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: إنَّهُ يَكْفُرُ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَابْنِ حَبِيبٍ. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَقَطْ وَرِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إذَا قَاتَلَ الْإِمَامَ عَلَيْهَا وَرَابِعَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ. وَخَامِسَةٌ: لَا يَكْفُرُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهُنَّ. وَهَذِهِ أَقْوَالٌ مَعْرُوفَةٌ لِلسَّلَفِ.

'সকল মুসলিম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেবে না, সে কাফির। তবে বাকি চারটি আমলের কোনোটির পরিত্যাগকারীকে কাফির সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তাঁদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আর আমরা যখন বলে থাকি, "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, গুনাহের কারণে কাউকে কাফির বলা যাবে না" এদ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য থাকে গুনাহের কাজ, যেমন জিনা, মদপান করা ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের এ চারটি মূল ভিত্তি পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে, তা তো প্রসিদ্ধ। ইমাম আহমাদ ﷺ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। এক মতানুসারে এ চারটির কোনোটি পরিত্যাগ করলেই সে কাফির হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু বকর ﷺ ও কিছু মালিকি মাজহাবের আলিম, যেমন ইবনে হাবিব ﷺ-এর নিকট গ্রহণীয় মত। দ্বিতীয় মতানুসারে শুধু নামাজ ও জাকাত পরিত্যাগের কারণে কাফির হবে। তৃতীয় মতানুসারে নামাজ পরিত্যাগ করলে এবং জাকাত পরিত্যাগের ভিত্তিতে খলিফার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে কাফির হবে। চতুর্থ মতানুসারে শুধু নামাজ পরিত্যাগ করলে কাফির হবে। পঞ্চম মতানুসারে এ চারটির কোনোটি পরিত্যাগের কারণেই কাফির হবে না। বস্তুত এগুলো সব সালাফে সালিহিনের প্রসিদ্ধ মতামত।'[১৩]

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি ﷺ বলেন :

وَقَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ: تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ، لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ. وَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَحَكَى إِسْحَاقُ عَلَيْهِ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْعِلْمِ! وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

'ইমাম আইয়ুব সাখতিয়ানি ﷺ বলেন, নামাজ পরিত্যাগ করা কুফর, যাতে কোনো মতভেদ করা যাবে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের একটি

১৩. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া : ৭/৩০২ (মাজমাউ মালিক ফাহাদ, মদিনা)

বড় দল এ মতই পোষণ করেন। এটাই ইমাম ইবনে মুবারক ﵀ ও ইমাম আহমাদ ﵀-এর মত। ইমাম ইসহাক ﵀ এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমার দাবি করেছেন। মুহাম্মাদ বিন নাসর মারুজি ﵀ বলেন, এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের মাজহাব।[১৪]

আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতে বলা হয়েছে :

وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا - وَهِيَ: تَرْكُ الصَّلاَةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلاً لاَ جُحُودًا - فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَل حَدًّا أَيْ أَنَّ حُكْمَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فَيُغَسَّل، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛... وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ تَكَاسُلاً عَمْدًا فَاسِقٌ لاَ يُقْتَل بَل يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ تَكَاسُلاً يُدْعَى إِلَى فِعْلِهَا وَيُقَال لَهُ: إِنْ صَلَّيْتَ وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ، فَإِنْ صَلَّى وَإِلاَّ وَجَبَ قَتْلُهُ وَلاَ يُقْتَل حَتَّى يُحْبَسَ ثَلاَثًا وَيُدْعَى فِي وَقْتِ كُل صَلاَةٍ، فَإِنْ صَلَّى وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا، وَقِيل كُفْرًا، أَيْ لاَ يُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. لَكِنْ لاَ يُرَقُّ وَلاَ يُسْبَى لَهُ أَهْلٌ وَلاَ وَلَدٌ كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ.

‘আর দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ নামাজের আবশ্যকীয়তা অস্বীকার না করে অলসতা ও উদাসীনতাবশত নামাজ পরিত্যাগ করলে তার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম মতভেদ করেছেন। মালিকি ও শাফিয়ি মাজহাবের মতানুসারে তাকে হদস্বরূপ হত্যা করা হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর তার বিধান মুসলিম মাইয়েতের মতোই—গোসল করানো হবে, জানাজা নামাজ পড়ানো হবে এবং মুসলমানদের কবরে দাফন করা হবে। ...হানাফি মাজহাব মতে, অলসতাবশত ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ পরিত্যাগকারী ফাসিক। তাই তাকে হত্যা করা হবে না; বরং তাজির হিসাবে শাস্তি দেওয়া হবে এবং

১৪. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১/১৪৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

তাওবা বা মৃত্যু পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হবে। আর হাম্বলি মাজহাব মতে, অলসতাবশত নামাজ পরিত্যাগকারীকে নামাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হবে, যদি তুমি নামাজ পড়ো, তাহলে তো ঠিক আছে; নচেৎ আমরা তোমাকে হত্যা করব। সুতরাং সে নামাজ পড়লে বেঁচে গেল, অন্যথায় তাকে হত্যা করা আবশ্যক। তবে তিনদিন বন্দী রাখার পূর্বে তাকে হত্যা করা যাবে না। প্রতি ওয়াক্তে তাকে নামাজের জন্য ডাকা হবে। নামাজ পড়লে বেঁচে যাবে; নচেৎ তাকে হত্যা করা হবে—(হাম্বলিদের) কারও মতে (এই হত্যাটা) হদ হিসাবে আর কারও মতে কুফরির কারণে। অর্থাৎ (কুফরির কারণে হলে) তাকে গোসল দেওয়া হবে না, তার জানাজার নামাজ পড়া হবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না। অবশ্য মুরতাদদের মতো তার স্ত্রী-সন্তানকে বন্দী ও দাস-দাসী বানানো যাবে না।[১৫]

মোটকথা, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি একসাথে বলা হলেও মর্যাদাগতভাবে এতে কিছু পার্থক্য আছে। সুতরাং শাহাদাহ বা তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া হলো ইসলামের প্রধান ও মূল ভিত্তি। আর নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ হলো তার প্রধান চারটি শাখা। এ চারটির কোনোটি পরিত্যাগ করলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে কিনা- এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইসলামে কালিমায়ে শাহাদাতের পর এ চারটি বিধানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষত নামাজ। তাই শুধু তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার দ্বারা ইসলাম পূর্ণ হবে না; বরং তার সাথে এ চারটি আমলও আবশ্যিকভাবে করতে হবে। অবশ্য জাকাত ও হজ, এ দুটি বিধান সবার জন্য নয়; বরং শুধু তাদের জন্য, যাদের কাছে জাকাতযোগ্য সম্পদ আছে এবং হজ করার সামর্থ্য আছে।

১৫. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ২৭/৫৩-৫৪ (অজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যা, কুয়েত)

প্রথম অধ্যায়
ইসলামি আকাইদ

প্রাক্কথন

প্রত্যেক মুসলমানের ইমানের প্রধান ভিত্তি ও মিলনকেন্দ্র হলো ইসলামি বিশুদ্ধ আকিদা। যার আকিদা যেমন, তার চিন্তা-গবেষণা ও কথাবার্তাও তেমন। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব আকিদানুযায়ী মত পেশ করে থাকে। তাই সবার আকিদা পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যেন সকলের চিন্তা-চেতনা স্পষ্ট ও ফলপ্রসূ হয়। মুসলমানের মন-মস্তিষ্ক তো হবে পরিশুদ্ধ ইসলামি আকিদার ওপর গঠিত। কেননা, এ আকিদাই তার জীবন চলার পথে আগত অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে আলোকবর্তিকা ও সব ধরনের পদস্খলন থেকে রক্ষার উপায়।

ইসলামি চিন্তা-চেতনার ফলে একজন মানুষ তার নিজের মাঝে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করতে পারবে। ফলে সর্বদা তার নিকট এমন প্রতীয়মান হবে যে, তার প্রতিটি নড়াচড়া, কথাবার্তা ও শ্বাস-প্রশ্বাস আল্লাহ তাআলা দেখছেন এবং শুনছেন। সকল ক্ষেত্রে তার অর্জিত হয় সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এমন জাগ্রত, উজ্জ্বল ও চমৎকার অনুভূতি সৃষ্টি হয় কেবল আল্লাহভীতির ফলে। তাকওয়ার এমন স্বাদ থেকে নির্বোধ ও মৃত অন্তরের অধিকারীরাই কেবল বঞ্চিত হয়, যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপাচারিতায় লিপ্ত হতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই যারা প্রকৃতপক্ষে মুত্তাকি, তারা হয়ে থাকে সুস্থ চিন্তার অধিকারী। তাদের সামনে সত্য উদ্ভাসিত হয়।

আকাইদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো আকিদা। আকিদা শব্দের অর্থ অন্তরে বিরাজমান ধর্মীয় বিশ্বাস।[১৬] মানুষের অন্তর, অনুভূতি, অস্তিত্বসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে হৃদয়ে বদ্ধমূল এমন বাস্তবিক বিশ্বাসকে আকিদা বলে। আকিদা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন : ইসলামি আকিদা, বৈজ্ঞানিক আকিদা, রাষ্ট্রীয় আকিদা, সামাজিক আকিদা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি আকিদার সংজ্ঞা, ধরন ও প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। আমরা এখানে শুধু ইসলামি আকিদা নিয়ে আলোচনা করব।

---

১৬. আল-মিসবাহুল মুনির : ২/৪২১ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

ইসলামের আবশ্যকীয় মৌলিক বিষয়াদির প্রতি ইমান আনয়ন করার নামই হলো ইসলামি আকিদা। অন্তর, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা সর্বোপরি মানুষের স্বভাবজাত ফিতরাত ও সুস্থ চিন্তাশক্তির সাথে এ সকল বিশ্বাস সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আকিদাই একটি জাতির চালিকাশক্তি। সুস্থ ও সঠিক আকিদা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর ভুল ও ভ্রান্ত আকিদা মানুষেকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়।

সন্দেহ নেই যে, সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে ইসলামি আকিদাই হলো শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে নির্ভুল। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য ও উন্নত সমাজব্যবস্থা। এর ভিত্তিতেই মানুষ মুক্তি পেয়েছে সকল প্রকার জুলুম ও কষ্ট থেকে। কেননা, এ বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলো ওহি, যা আল্লাহ তাআলা জিবরাইল ﷺ-এর মাধ্যমে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানিয়েছেন। তাই এর আকিদা-বিশ্বাস সব নির্ভুল ও পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ।

আকিদার অধ্যায়ে বিভিন্ন রকমের ভাগ রয়েছে। যেমন মৌলিক ও শাখাগত আলোচনা, তাওহিদের পরিচিতি ও প্রকারভেদ, তাওহিদ বা ইমান ভঙ্গের কারণসমূহ, আলা-ওয়ালা ওয়াল-বারাসহ বিভিন্ন আলোচনা। আমরা এ অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় এ বিষয়গুলো নিয়ে সামান্য আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহ

ইসলামি আকিদার মৌলিক ও প্রাথমিক বিশ্বাসের মধ্যে ছয়টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এগুলোতে সন্দেহ-সংশয়ের মোটেও অবকাশ নেই। ইসলামি আকিদার সে ছয়টি ভিত্তি হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ইমান, ফেরেশতাদের প্রতি ইমান, আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান, নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান, কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান ও তাকদিরের প্রতি ইমান। আমরা এখানে ধারাবাহিকভাবে ইসলামের ছয়টি মৌলিক আকিদা সম্পর্কে সামান্য বিবরণ তুলে ধরছি।

এক. আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান

আল্লাহ তাআলাকে সকল বিষয়ের একমাত্র অধিপতি হিসাবে মেনে নেওয়া। তিনি ইলাহ, ইবাদতের উপযুক্ত একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। সবকিছুর পরিচালক। জগতের অধিপতি। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো জিনিস বা বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তিনিই অহংকার ও বড়ত্বের একমাত্র উপযুক্ত সত্তা। আসমান ও জমিনসহ সমগ্র জাহান তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে। তাঁর আদেশমতেই সব পরিচালিত হয়।

তিনি নিজেই তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করছেন :

﴿ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ - هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ - هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব জানেন। তিনি সীমাহীন দয়ালু, পরম করুণাময়। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই

একমাত্র বাদশাহ, মহাপবিত্র, শান্তি বিধায়ক, নিরাপত্তাদাতা, সর্বনিয়ন্তা, মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রতাপশালী। তারা যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[১৭]

দুই. ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহর তাআলার বিশেষ এক সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেন না। তিনি যা বলেন, তাঁরা যথাযথভাবে তা পালন করেন। তাঁদের কাজই হচ্ছে সর্বদা এক আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তাঁদের যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই তাঁরা সর্বদা তাঁর ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। কেউ সিজদায়, কেউ রুকুতে, কেউ দাঁড়িয়ে, আবার কেউ বসে তাঁর ইবাদত ও তাসবিহ পাঠে সদা মশগুল। তাঁরা কেউ আল্লাহর নির্দেশ পালনে কষ্ট-ক্লেশ, ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করেন না। এটাই তাঁদের স্বভাব, এটাই তাঁদের কাজ এবং এটাই তাদের ধর্ম। আল্লাহ তাঁদের এ কারণেই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾

'আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যত প্রাণী আছে সবাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে এবং ফেরেশতাগণও—তাঁরা অহংকার করে না।'[১৮]

১৭. সুরা আল-হাশর : ২১-২৪
১৮. সুরা আন-নাহল : ৪৯

তিন. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান

নবি-রাসুলদের ওপর অবতীর্ণ আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনা ইসলামি আকিদার অন্যতম ভিত্তি। আসমানি কিতাবসমূহ অনেক। তন্মধ্যে চারটি হলো বড় ও প্রধান কিতাব। তথা তাওরাত, জাবুর, ইনজিল ও কুরআন। এই আসমানি গ্রন্থগুলোতে রয়েছে মানবতার হিদায়াত ও কল্যাণ, যা মানুষকে উভয় জাহানের শান্তি ও মুক্তির পথ দেখায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ - مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾

'তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন সত্যতার সাথে; যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের। আর তিনি এ কিতাবের পূর্বে মানুষের হিদায়াতের জন্য নাজিল করেছেন তাওরাত ও ইনজিল এবং অবতীর্ণ করেছেন কুরআন।'[১৯]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

﴿ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴾

'আর আমি দাউদকে দান করেছি জাবুর।'[২০]

চার. নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান

অতঃপর নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান আনা। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির কান্ডারি। মানবতার শান্তি ও সৌভাগ্যের পথপ্রদর্শক। তাদের দান করা হয়েছে অদম্য মনোবল এবং অনন্য গুণাবলি। তাই তাঁরা আল্লাহ তাআলার রিসালাতের মহান দায়িত্ব আদায় করতে পেরেছেন। নিঃসন্দেহে নবি-রাসুলগণ ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট মানব। কারণ, তাঁরা ছিলেন এমন পরিপূর্ণ

১৯. সুরা আলি ইমরান : ৩-৪
২০. সুরা আন-নিসা : ১৬৩

বৈশিষ্ট্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী, যার সামনে অন্য মানুষদের স্বভাব-চরিত্র একেবারেই নগণ্য।

এঁরাই হলেন রবের প্রেরিত দূত, মানবতার পথপ্রদর্শক, জগতের আলোকবর্তিকা। তাঁরা তাঁদের উচ্চ মনোবল, দৃঢ় ধৈর্যশক্তি ও পরিপূর্ণ ইমানের মাধ্যমে হতভাগ্য, দারিদ্র্য-দুর্দশাগ্রস্ত ও সংকীর্ণ একটি সমাজকে সুখী, সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় সমাজে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরাই পেরেছেন দেশ ও মানবতার সকল ক্লান্তি, অবসাদ ও নির্যাতন বিদূরিত করে একটি শান্তিময় ও সুখের রাজ্য উপহার দিতে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾

'আর আমি অনেক রাসুল পাঠিয়েছি, ইতিপূর্বে যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি এবং অনেক রাসুল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি। আর আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন।'[২১]

উল্লেখ্য যে, নবি-রাসুলদের কাউকে অস্বীকার করার অধিকার কারও নেই। সকলের প্রতিই ইমান আনতে হবে সমানভাবে। কারও প্রতি ইমান আনবে আর কারও প্রতি আনবে না; এমনটি করার সুযোগ নেই। অবশ্য শরিয়তগুলোর মধ্য হতে বর্তমানে শুধু শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়তই বহাল আছে এবং পূর্বের নবিদের শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে। তাই শরিয়তের ক্ষেত্রে এখন শুধু শরিয়তে মুহাম্মাদিই মানতে হবে; অন্যথায় নাজাত মিলবে না।

---

২১. সুরা আন-নিসা : ১৬৪

পাঁচ. কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান

ইমানের মৌলিক বিষয়গুলোর অন্যতম হলো কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান রাখা। কিয়ামত হলো আল্লাহর সকল সৃষ্টির ধ্বংস শেষে বিচার দিবস। যেদিন আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলের যাবতীয় বিষয়ের হিসাব-নিকাশ করে ভালো-মন্দের ফয়সালা করবেন। যে দিবসে কারও সামান্য পাপ বা অপরাধ থাকলেও তা দৃষ্টিগোচর হবে এবং কারও সুঁই পরিমাণ পুণ্য থাকলে তাও দৃশ্যমান হবে। কোনো কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ- فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ- وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾

'সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতএব কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলেও তা দেখতে পাবে।'[২২]

কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন স্থানে মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে বিশেষভাবে শুধু কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে...।' এর কারণ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে স্বাভাবিকত অন্যান্য বিষয়েও বিশ্বাস রাখে। এ ভিত্তিতে বলা যায়, মুমিনকে কাফির থেকে পৃথক করার জন্য এ দুটি আলামতই যথেষ্ট। অনেক কাফির আছে, যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী হলেও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী নয়। তাই মুমিন হতে হলে তাকে অবশ্যই কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে।

---

২২. সুরা আজ-জিলজাল : ৬-৮

ছয়. তাকদিরের প্রতি ইমান

তাকদিরের প্রতি ইমান আনার অর্থ হলো, এই বিশ্বাস লালন করা যে, আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে পৃথিবী এবং তাতে অবস্থিত সকল জড় ও জীবকে সৃষ্টি করেছেন। হঠাৎ করে নিজে নিজে এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়নি; বরং ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং পূর্ব নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসারেই আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি বস্তুর ভালো-মন্দ ও চূড়ান্ত ফলাফল তিনি লিখে রেখেছেন। কোনো জিনিসই তাঁর তাকদিরের বাইরে যেতে পারে না।

তিনি ইরশাদ করেন :

﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾

'তিনিই প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে শোধিত করেছেন।'[২৩]

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾

'আর তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ ও সীমা রয়েছে।'[২৪]

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴾

'আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত।'[২৫]

এখান থেকে যে স্বচ্ছ ধারণাটি পাওয়া যায় তা হলো, আল্লাহর নির্ধারিত নির্দেশ ব্যতীত কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও নড়তে পারে না। কোনো ঘটনা ঘটা বা কোনো কিছু হওয়ার আগেই তা আল্লাহ তাআলার ইলমে বিদ্যমান রয়েছে।

অতএব তাকদির হলো, আল্লাহ তাআলার চিরন্তন জ্ঞানের প্রতি এ বিশ্বাস রাখা যে, কোনো কিছু ঘটা বা হওয়ার আগেই তিনি তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন।

২৩. সুরা আল-ফুরকান : ২
২৪. সুরা আর-রাদ : ৮
২৫. সুরা আল-আহজাব : ৩৮

আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ : يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي بِالحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَبِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالقَدَرِ

'চারটি বিষয়ের প্রতি ইমান আনা ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারে না। এক. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। তিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। দুই. মৃত্যুর প্রতি ইমান আনা। তিন. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ইমান আনা। চার. তাকদিরের প্রতি ইমান আনা।'[২৬]

সারকথা

এগুলোই হলো ইসলামি আকিদার মূলভিত্তি, যার কোনো একটি বা তার আংশিক না থাকলে ইসলামি আকিদা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি কিংবা কমবেশ করার সামান্য পরিমাণও অবকাশ নেই। এগুলো ইমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ক। যে কারণে আল্লাহ তাআলা এই বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ সকল মৌলিক বিশ্বাসের অস্বীকারকারীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন :

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমূহ, রাসুলগণ ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে সুদূর ভ্রান্তিতে নিপতিত হবে।'[২৭]

২৬. সুনানুত তিরমিজি : ৪/২০, হা. নং ২১৪৫ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।
২৭. সুরা আন-নিসা : ১৩৬

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾

'আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন।'[২৮]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾

'তারা কি জেনে নেয়নি, আল্লাহ তাদের রহস্য ও সলাপরামর্শ সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং সমস্ত গোপন বিষয় আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন?'[২৯]

ইসলামি আকিদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিপূর্ণ মানসিক স্বাধীনতা। এখানে মানুষ অন্য মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে নেয়। তাঁর অনুসরণ, ইবাদত, আনুগত্য ও নির্দেশ মেনে জীবন পরিচালনা করে। আর মুমিনের অভিভাবক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।

যেমন তিনি ইরশাদ করেন :

﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾

২৮. সুরা আল-মুজাদালা : ৭
২৯. সুরা আত-তাওবা : ৭৮

'আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করে তাদের বন্ধু হচ্ছে তাগুত। তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।'[৩০]

সুতরাং কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারবে না। আল্লাহর আইনের বিপরীতে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করতে পারবে না বা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ-মূর্খরাই ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাই তারা সর্বদা শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। এই স্তরে এসে মানুষ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

প্রথম শ্রেণি : যারা আল্লাহকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছেন। এরাই হলো আল্লাহর খাঁটি বান্দা।

দ্বিতীয় শ্রেণি : এ শ্রেণি অভিভাবক গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক মত ও পথের অনুসরণ করে থাকে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে। হতে পারে তা নির্জীব মূর্তি কিংবা তাগুত শাসক ও বিচারক। আবার হতে পারে জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র বা সাম্যবাদের মতো বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾

'এক দলকে তিনি পথপ্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্য পথ ভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা ধারণা করে যে, তারা সৎ পথে রয়েছে।'[৩১]

৩০. সুরা আল-বাকারা : ২৫৭
৩১. সুরা আল-আরাফ : ৩০

তিনি আরও বলেন :

﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾

'তোমরা অনুসরণ করো, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য (বাতিল) অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। আর তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।'[৩২]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা বা অনুসরণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

'আপনি বলে দিন, আমি কি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব?'[৩৩]

এই আয়াতের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মুসলমান পরিপূর্ণ স্বাধীন বিবেকের অধিকারী। আর এটাই হলো প্রকৃত স্বাধীনতা, যা মন-মানসিকতায় আনে প্রশান্তি এবং অন্তরে জাগ্রত করে আল্লাহর মহত্ত্বের অনুভূতি। এই স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা জাগতিক সৃষ্ট পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুসলমানদের মুক্ত করে রাখে। তাই তো একজন প্রকৃত মুসলিম কোনো স্বৈরাচারের রক্তচক্ষুর পরোয়া না করে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে।

উল্লিখিত আলোচনায় ইমানের মূল ভিত্তি ও ইসলামি আকিদার মৌলিক ছয়টি বিষয় ও তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত ইসলামি আকিদা শরিয়ার ব্যাপক ও বিস্তৃত একটি অধ্যায়, যার বিস্তারিত ও বিশদ বিবরণ দেওয়া এ সংক্ষিপ্ত কলেবরে সম্ভব নয়।

৩২. সুরা আল-আরাফ : ৩
৩৩. সুরা আল-আনআম : ১৪

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ' এর সংক্ষিপ্ত আকিদাসমূহ

এক. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত আকিদা

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অবিনশ্বর। তিনি অনাদি ও অন্তহীন, যাঁর কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন। তিনি সবকিছু জানেন, কোনো জিনিস তাঁর থেকে গোপন নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, যা ইচ্ছা তা-ই করেন। তাঁর ইরাদা ও ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। তিনি সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান, তাঁর কোনো কাজ প্রজ্ঞা থেকে খালি নয়। তিনি সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবাইকে রিজিক দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। তিনি কথা বলেন, হাঁসেন, খুশি হন, রাগান্বিত হন, তবে মাখলুকের মতো করে নয়; বরং তাঁর মর্যাদা ও শান মোতাবেক। তিনিই মাখলুকের জীবন দান করেন এবং তাকে পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত করেন। তিনিই বিধানদাতা, অন্য কারও বিধান তৈরি করার অধিকার নেই। তিনি অমুখাপেক্ষী, কিন্তু সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি যাকে ইচ্ছা দয়া করেন। তিনি ন্যায়পরায়ন, কারও প্রতি ন্যূনতমও জুলুম করেন না। তিনিই সবকিছুর ফয়সালাকারী, কেউ-ই তাঁর ফয়সালা প্রতিহত করতে পারে না। গাইবের চাবিকাঠি সব তাঁর কাছে। তিনি ছাড়া কেউ গাইব জানে না। তিনি আরশে আছেন এবং পুরো সৃষ্টিজগত তাঁর ইলম ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাঁর কোনো পরিবার, যথা স্ত্রী, বাবা-মা ও ছেলেমেয়ে কেউ নেই। তিনি এগুলো থেকে পুতঃপবিত্র। তিনি খাবার খান না, তন্দ্রা যান না, নিদ্রা যান না। তিনি স্থান, কাল, দিক, সীমা, দেহ, অঙ্গ ইত্যাদি থেকে পবিত্র। তিনি মাখলুকের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি থেকে পবিত্র। কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তাঁর সবকিছুই তাঁর শান মোতাবেক। আল্লাহর ব্যাপারে ওতটুকুই বলা যাবে, যতটুকু কুরআন ও সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে এসেছে। এর অতিরিক্ত কোনো কিছু বলা এবং এ নিয়ে বিতর্ক ও গভীর চিন্তায় মগ্ন হওয়া জায়িজ নেই।

দুই. ফেরেশতা সম্পর্কিত আকিদা

ফেরেশতারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা। আল্লাহ ছাড়া তাদের সংখ্যা কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা তাদের এমন শক্তি দিয়েছেন, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তাঁরা নুরের তৈরি। তাঁরা আমাদের মতো খান না, ঘুমান না। আল্লাহ তাঁদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর হুকুম মেনে চলেন, কখনো তাঁর অবাধ্য হন না। তাঁরা পুরুষও নন, নারীও নন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন চারজন। যথা : জিবরাইল ﷺ, মিকাইল ﷺ, ইসরাফিল ﷺ ও আজরাইল ﷺ। জিবরাইল ﷺ হলেন ফেরেশতাদের সরদার। তিনি আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি ওহি নিয়ে আসতেন। দুনিয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর আজাবের ক্ষেত্রেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। মিকাইল ﷺ মেঘ-বৃষ্টি ও আসমানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং মাখলুকের রিজিক পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। ইসরাফিল ﷺ আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করেন। তাঁর দৃষ্টির সামনেই রয়েছে লাওহে মাহফুজ। কিয়ামতের সময় তিনিই শিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন। আজরাইল ﷺ, যাকে কুরআন-সুন্নাহর ভাষায় 'মালাকুল মওত' বলা হয়, তিনি সব প্রাণীর রুহ কবজ করার দায়িত্বে আছেন।

তিন. আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কিত আকিদা

আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর নির্বাচিত বিশেষ বান্দা। তাঁরা সমগ্র মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ। তাঁরা সত্তাগতভাবে মানুষ ও মাটির তৈরি, কিন্তু তাঁদের অন্তর আল্লাহপ্রদত্ত নুরের দ্বারা আলোকিত। তাঁরা আল্লাহ ও বান্দাদের মাঝে সংযোগকারী। তাঁরা আল্লাহর বাণী মানুষকে পৌঁছে দিতেন। প্রথম নবি হলেন আদম ﷺ এবং সর্বশেষ নবি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবে না। নবিদের মধ্যে সবার সরদার ও শ্রেষ্ঠ হলেন শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ। আম্বিয়ায়ে কিরাম সবাই নিষ্পাপ। তাঁদের কোনো গুনাহ নেই। কখনো তাঁদের অনিচ্ছাকৃতভাবে ইজতিহাদি ভুল হলে আল্লাহ তাআলা সাথেসাথে তা সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁদের ওপর অর্পিত আমানত তাঁরা যথাযথভাবে উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের থেকে প্রকাশিত মুজিজাসমূহ সত্য।

চার. কিতাবসমূহ সম্পর্কিত আকিদা

আল্লাহর কিতাবসমূহ সত্য। এগুলো বিভিন্ন সময়ে নবিদের ওপর নাজিল হয়েছিল। মোট কিতাবের সংখ্যা একশ চারটি। এর মধ্যে চারটি হলো প্রধান। যথা : তাওরাত, জাবুর, ইনজিল ও কুরআন। প্রথম তিনটি পূর্বের যুগের নবিদের ওপর নাজিল হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে উম্মতেরা পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলেছে। আর কুরআন নাজিল হয়েছে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর, যা এখনও অবিকৃত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কেননা, এর হিফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। কুরআন আল্লাহর কালাম ও অবিনশ্বর সিফাত। এটাকে মাখলুক বা সৃষ্ট বলা যাবে না।

পাঁচ. মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত আকিদা

মৃত্যুর পর নেককার মুমিনদের রুহ ইল্লিয়্যিনে শান্তির সহিত থাকে এবং ফাসিক ও কাফিরদের রুহ সিজ্জিনে কষ্টের মধ্যে থাকে। কবরের আজাব বাস্তব ও সত্য। কবরে মুনকার নাকিরের সুওয়াল-জবাব সত্য। কবর হয় জান্নাতের একটি টুকরো হবে, না হয় জাহান্নামের একটি গর্ত। নির্ধারিত সময় পর কবর থেকে পুনরুত্থান সত্য। হিসাব-নিকাশ সত্য। পুলসিরাত সত্য। মিজান সত্য। ডান হাতে বা বাম হাতে আমলনামা পাওয়া সত্য। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা নেককারদের জান্নাতে দেবেন, কাফিরদের জাহান্নামে দেবেন এবং গুনাহগার মুমিনদের অনেককে ক্ষমা করে দেবেন এবং অনেককে জাহান্নামে শাস্তি দিয়ে তারপর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

ছয়. জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত আকিদা

জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহর দুটি সৃষ্টি, যা কখনো ধ্বংস হবে না। জান্নাত চিরসুখের আবাসস্থল আর জাহান্নাম চিরকষ্টের আবাসস্থল। নেককার ও আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত বান্দাগণ জান্নাতে যাবে। তারা তা থেকে কোনোদিনও বের হবে না। আর জাহান্নামে কিছু গুনাহগার মুমিন ও সকল কাফির যাবে। তবে মুমিনরা নির্দিষ্ট এক সময় পর বের হয়ে আসবে, কিন্তু কাফিররা স্থায়ীভাবে থেকে যাবে। জান্নাতে সব ধরনের নিয়ামত থাকবে। কল্পনাতীত নাজ-নিয়ামতে ভরপুর থাকবে। সেখানে যা ইচ্ছা, তা-ই পাওয়া যাবে।

জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহর দিদার। আর জাহান্নামে সব ধরনের কষ্ট থাকবে। এমন শাস্তি থাকবে, যা মানুষের কল্পনা থেকে অনেক অনেক দূরে।

সাত. সাহাবা সম্পর্কিত আকিদা

সাহাবায়ে কিরাম হলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। তাঁদের মর্যাদা পরবর্তী যে কারও থেকে অনেক বেশি। তাঁরা হলেন সত্যের মাপকাঠি। তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা সর্বজনবিদিত। তাঁদের মহব্বত করা ইমানের আলামত। তাঁদের গালি দেওয়া বা সমালোচনা করা নিফাকির আলামত। তাঁদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁদের কারও কারও থেকে কখনও গুনাহ প্রকাশ পেলেও তাঁদের তাওবাও ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তাঁদের ব্যাপারে আমরা আশা রাখি, আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। সাহাবিদের মধ্যে চারজন হলেন শ্রেষ্ঠ। যথা : আবু বকর رضي الله عنه, উমর رضي الله عنه, উসমান رضي الله عنه ও আলি رضي الله عنه। তাঁদের খিলাফত হক ও নবুওয়াতের মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাহাবিদের মধ্যে দশজন ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি। যথা আবু বকর رضي الله عنه, উমর رضي الله عنه, উসমান رضي الله عنه, আলি رضي الله عنه, তালহা رضي الله عنه, জুবাইর رضي الله عنه, সাদ رضي الله عنه, সাইদ رضي الله عنه, আবু উবাইদা رضي الله عنه, ও আব্দুর রহমান বিন আউফ رضي الله عنه।

আট. মুমিনদের সম্পর্কিত আকিদা

মুমিনদের ভালোবাসা ও তাদের সাথে হৃদ্যতা রাখা ইমানের বৈশিষ্ট্য। তাদের কল্যাণকামনা, সাহায্য-সহযোগিতা করা মুমিনের কর্তব্য। তাদের মধ্যে মর্যাদার মাপকাঠি হলো তাকওয়া। মুমিনদের থেকে কারামত প্রকাশ পাওয়া সত্য। তাদের থেকে সুস্পষ্ট কুফরি প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত শুধু গুনাহের কারণে কাউকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। কুফর ও শিরক না করলে যত বড় গুনাহগারই হোক না কেন, চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে না। মৃত নেককার মুমিনদের ব্যাপারে ক্ষমা পাওয়ার সুধারণা রাখতে হবে এবং গুনাহগারদের ব্যাপারে আজাবের আশঙ্কা রেখে ইসতিগফার করতে হবে, নিরাশ হওয়া যাবে না।

নয়. শাসকদের সম্পর্কিত আকিদা

শরিয়তের সীমার মধ্যে হলে মুসলিম খলিফা ও শাসকের আনুগত্য করা আবশ্যক। খলিফা জালিম ও ফাসিক হলেও স্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়িজ নেই। জালিম হলেও তাদের পেছনে নামাজ পড়তে হবে। তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। ন্যায়পরায়ণ শাসকদের অন্তর থেকে ভালোবাসতে হবে এবং জালিমদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ রাখতে হবে। ইসলামি শাসকের হাতে বাইআতবিহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু সমতুল্য। কোনো যুগে আল্লাহর জমিনে খিলাফত না থাকলে সকলের জন্য তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করা আবশ্যক।

দশ. বিবিধ বিয়ষ সম্পর্কিত আকিদা

কিয়ামতের দিন রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাওজে কাওসার সত্য থেকে পানি পান করানো সত্য। তাঁর শাফাআত সত্য। মুসলমানদের মধ্যে হক জামাআতের বিরোধিতা করে বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়িজ নেই। ইমান আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও দৈহিক আমলের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। আন্তরিক বিশ্বাস না থাকলে তার ইমানের কোনো মূল্য নেই। আর আন্তরিক বিশ্বাস থাকার পর মৌখিক স্বীকৃতি না থাকলে পার্থিব জগতে সে কাফির বলেই গণ্য হবে। আর আখিরাতের বিষয়টি আল্লাহই ভালো জানেন। আর আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি থাকার পর আমল না থাকলে তাকে মুমিন বলা হলেও তার ইমান অসম্পূর্ণ বলা হবে। শরিয়তের উৎসমূল চারটি। যথা : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। তন্মধ্যে প্রথম দুটি হলো প্রধান। আর পরের দুটি তার শাখা ও অনুগামী। কিয়ামতের আলামতসমূহ, যথা দাজ্জালের আবির্ভাব, ইসা عليه السلام-এর অবতরণ, দাব্বাতুল আরজের বহির্গমন, ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়া, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ইত্যাকার বিষয়গুলো সত্য। গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করা যাবে না।[৩৪]রাসুলুল্লাহ ﷺ এর স্বশরীরে মিরাজ সত্য।

৩৪. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর এসব আকিদার অধিকাংশই এসেছে 'আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা' গ্রন্থটিতে। দেখুন : আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা : ১-৩৩ (আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله-এর 'আল-আকিদা' গ্রন্থটিতেও অনেক আকিদা বর্ণিত হয়েছে। দেখুন : আল-আকিদা, আহমাদ বিন হাম্বল : ১০১-১২৮ (দারু কুতাইবা, দিমাশক) এছাড়াও ইমাম আবু হানিফা رحمه الله-এর 'আল-ফিকহুল আকবার ও 'আল-ফিকহুল আবসাত' গ্রন্থ দুটিতেও রয়েছে বেশ কিছু আকিদা। দেখুন : আল-ফিকহুল আকবার : ৫-১৬৭ (মাকতাবাতুল ফুরকান, আল-ইমারাতুল আরাবিয়্যা) আল-ফিকহুল আবসাত : ১২১-১৬৭ (মাকতাবাতুল ফুরকান, আল-ইমারাতুল আরাবিয়্যা)

তাওহিদ পরিচিতি

একজন মুমিন বান্দার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাওহিদ। আর তাওহিদ শুধু মুখে কিছু বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা ছাড়া তাওহিদ পূর্ণ হয় না। যেগুলো জানা না থাকলে তাওহিদ নিখুঁত হয় না। অজান্তেই অনেক সময় এতে শিরক প্রবেশ করে; অথচ সে উপলব্ধিও করতে পারে না। তাই প্রতিটি মুমিনের জন্য বিশুদ্ধ তাওহিদ জানার কোনো বিকল্প নেই। আমরা সংক্ষিপ্ত এ পরিসরে তাওহিদের পরিচিতি ও তার প্রকারভেদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব।

তাওহিদের আভিধানিক অর্থ

তাওহিদ (التوحيد) শব্দটি বাবে تفعيل থেকে وحد يوحد توحيدا এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ, এক বলে স্বীকৃতি প্রদান বা একত্রিতকরণ বা একত্ববাদ।[৩৫]

তাওহিদের পারিভাষিক অর্থ

إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

'রুবুবিয়্যা, উলুহিয়্যা এবং আসমা ও সিফাতকে এককভাবে আল্লাহ তাআলার সাথেই নির্দিষ্টকরণ।'[৩৬]

অর্থাৎ রব হওয়া, মাবুদ হওয়া এবং উত্তম নাম ও গুণাবলি একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করাকে তাওহিদ বলে। এতে অন্য কারও অংশীদারত্ব নেই।

৩৫. আল-মুজামুল অসিত : ২/১০১৬ (দারুদ দাওয়াহ, ইসকানদারিয়া)
৩৬. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি উসাইমিন : ৯/১ (দারুল ওয়াতন)

তাওহিদের প্রকারভেদ

তাওহিদের তিনটি প্রকার রয়েছে। যথা :

১. توحيد الربوبية- তাওহিদুর রুবুবিয়্যা।

২. توحيد الألوهية- তাওহিদুল উলুহিয়্যা।

৩. توحيد الأسماء والصفات- তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

এক. তাওহিদুর রুবুবিয়্যা

তাওহিদুর রুবুবিয়্যা অর্থ, আল্লাহর সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনা ইত্যাদি গুণাবলি একমাত্র তাঁর জন্যই সাব্যস্ত করা। এতে অন্য কাউকে শরিক না করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾

'আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর কর্মবিধায়ক।'[৩৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

'বলুন, হে রাজাধিরাজ আল্লাহ, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। সকল কল্যাণ তো আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং

৩৭. সুরা আজ-জুমার : ৬২

দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর যাকে চান বিনা হিসাবে রিজিক দান করেন।'[৩৮]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

'নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। যাবতীয় বিষয় তিনিই পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করবে এমন সাধ্য কার? তিনিই আল্লাহ—তোমাদের রব। সুতরাং তাঁর ইবাদত করো। তবুও কি তোমরা চিন্তা (অনুধাবন) করবে না?'[৩৯]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

﴿ اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾

'আল্লাহ তাআলা-ই আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা তো তা দেখতেই পাচ্ছ। এরপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন যে, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারো।'[৪০]

৩৮. সুরা আলি ইমরান : ২৬-২৭
৩৯. সুরা ইউনুস : ৩
৪০. সুরা আর-রাদ : ২

দুই. তাওহিদুল উলুহিয়্যা

তাওহিদুল উলুহিয়্যা অর্থ, কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়া। সুতরাং ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই হতে হবে। আর ইবাদত হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ যা কিছুর আদেশ-নিষেধ করেছেন, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুগত্য করা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ ইবাদতের সংজ্ঞায় বলেন :

﴿ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ: مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ ﴾

'আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় সকল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কথা ও কাজের সমষ্টির নাম হলো ইবাদত।'[৪১]

তাওহিদুল উলুহিয়্যাকে 'তাওহিদুল ইবাদাহ'-ও বলা হয়। কেননা, ألوهية (উলুহিয়্যা) শব্দ থেকে নির্গত مألوه (মালুহ) এর অর্থ হলো معبود (মাবুদ) বা ইবাদতের উপযুক্ত। তাওহিদুল উলুহিয়্যা-ই হলো সেই তাওহিদ, যার দিকে সকল নবি-রাসুল আহ্বান করেছেন এবং যার জন্য আসমানি কিতাবসমূহ নাজিল হয়েছে। এটা 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যা'-কেও অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, 'তাওহিদুল উলুহিয়্যা' হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, যার কোনো শরিক নেই। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে যার একত্ববাদ মেনে নেওয়া হয়, প্রকারান্তরে সৃষ্টি, রাজত্ব, পরিচালনা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তার একত্ববাদকে মেনে নেওয়া হয়। তাই এ দুটি প্রকারের মাঝে তাওহিদুল উলুহিয়্যা-ই হলো আসল ও মূল।

এই তাওহিদের মূল কথা হলো, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে কথায় বা কাজে তাঁর কোনো সৃষ্টিকে শরিক না করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

৪১. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ১০/১৪৯ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করো না এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ করো।'[৪২]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

'তোমার রব এটা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।'[৪৩]

তিন. তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত

তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত অর্থ কোনো ধরনের تحريف (তাহরিফ) বা বিকৃতিসাধন, تعطيل (তাতিল) বা নিষ্ক্রিয়করণ تكييف বা ধরন নির্ধারণ এবং تمثيل (তামসিল) বা সাদৃশ্য প্রদান ব্যতীত আল্লাহ তাআলার নামসমূহ ও গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾

'আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। উত্তম সব নাম তো তাঁরই।'[৪৪]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন :

﴿ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

৪২. সুরা আন-নিসা : ৩৬
৪৩. সুরা বনি ইসরাইল : ২৩
৪৪. সুরা ত্বহা : ৮

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তিদাতা, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। ওরা (কাফিররা) যাদের শরিক স্থির করে আল্লাহ তাআলা তা হতে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ। সৃজনকর্তা, অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা, উত্তম সব নাম তো তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৪৫]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}. فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفُوَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مَصْدُوقُونَ؛ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ

৪৫. সুরা আল-হাশর : ২২-২৪

السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ؛ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ: مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

'আল্লাহর প্রতি ইমানের অংশ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে নিজের জন্য যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, সেগুলোর প্রতি কোনো ধরনের তাহরিফ (বিকৃতিসাধন), তাতিল (নিষ্ক্রিয়করণ), তাকয়িফ (ধরন নির্ধারণ) ও তামসিল (সাদৃশ্য প্রদান) ব্যতীত ইমান আনা। বরং বান্দাগণ এ বিশ্বাস করবে, আল্লাহ তাআলা এমন মহান যে, "তার মতো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" [সুরা আশ-শুরা : ১১] সুতরাং আল্লাহ নিজের জন্য যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলো অস্বীকার করা যাবে না, আল্লাহর কালাম বিকৃত করা যাবে না, আল্লাহর নাম ও আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করা যাবে না, তাঁর কোনো আকৃতি বর্ণনা করা যাবে না এবং তাঁর গুণাবলির সাথে মাখলুকের গুণাবলির কোনো তুলনা করা যাবে না। কেননা, আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, তাঁর নেই কোনো অংশীদার। সৃষ্টির দ্বারা তাঁকে অনুমান করা যাবে না। কেননা, তিনিই নিজের ব্যাপারে এবং অন্যের ব্যাপারে সৃষ্টির চেয়ে অধিক জ্ঞাতা, অধিক সত্যবাদী এবং সর্বোত্তম বর্ণনাকারী। অতপর তাঁর রাসুলগণ হলেন মহাসত্যবাদী যারা আল্লাহর ওপর এমন বিষয় আরোপ করে, যা তারা জানে না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "ওরা যা আরোপ করে, তোমার রব তা হতে পবিত্র, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলদের প্রতি। সকল প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।" [সুরা আস-সাফফাত : ১৮০-১৮২] সুতরাং নবি-রাসুলের বিরোধীরা আল্লাহর জন্য যেসব গুণ আরোপ করে, আল্লাহ সেগুলো থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং রাসুলদের প্রতি শান্তি

বর্ষণ করেছেন। কেননা, তাঁরা যা বলেন, তা দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাম ও গুণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচকের সমন্বয় সাধন করেছেন। সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর জন্য রাসুলদের আনীত হিদায়াত থেকে ফেরার কোনো অবকাশ নেই। কেননা, এটাই হলো সিরাতে মুসতাকিম বা সরল পথ; তাদের পথ, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—আম্বিয়ায়ে কিরাম, সিদ্দিকিনে কিরাম, শুহাদায়ে কিরাম ও সালিহিনের পথ।'[৪৬]

বি. দ্র. : এ তিনটি প্রকারের পাশাপাশি অনেকের মুখে তাওহিদুল হাকিমিয়্যা নামে আরেকটি প্রকারের কথা শোনা যায়। এর মর্মার্থ হলো, আইন বা বিধান একমাত্র আল্লাহরই। এটা প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার কেবল তাঁরই। এতে বান্দার কোনো শিরকত থাকতে পারবে না। আল্লাহ আইন করে দেবেন, আর বান্দা তা বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহর আইন বা বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন প্রণয়ন করা স্পষ্ট শিরক বা কুফর। তাই এটাও বিশুদ্ধ তাওহিদের জন্য অতিআবশ্যক একটি শর্ত। তবে আমাদের উলামায়ে সালাফ এটাকে তাওহিদের তিন প্রকার থেকে অতিরিক্ত একটি প্রকার হিসাবে উল্লেখ করেননি; বরং এটাকে তাওহিদুর রুবুবিয়্যা বা তাওহিদুল উলুহিয়্যার অন্তর্গত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ছাড়া যেহেতু অন্য কারও আইন প্রণয়ন করা, আদেশ করা, নিষেধ করা ও পরিচালনা করার অধিকার নেই, সে অর্থে এটা তাওহিদুর রুবুবিয়্যার অন্তর্ভুক্ত। আর এসব আইন মানা ও বাস্তবায়ন করা যেহেতু বান্দার দায়িত্ব; তাই এ অর্থে এটা তাওহিদুল উলুহিয়্যা বা তথা তাওহিদুল ইবাদার অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং তাওহিদের প্রকার তিনটিই থাকছে। এর জন্য আলাদা একটি প্রকার বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তবে কেউ বোঝার সুবিধার্থে বা গুরুত্বের বিচারে তাওহিদকে চার ভাগে বিভক্ত করলেও মৌলিক কোনো সমস্যা নেই। কেননা, মাসআলাই মূল, সংখ্যা নয়।

---

৪৬. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ৩/১২৯-১৩০ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

তাওহিদ বা ইমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

অজু ভঙ্গের যেমন কিছু কারণ আছে, নামাজ ভঙ্গের যেমন কিছু কারণ আছে, ঠিক তেমনই ইমান বা তাওহিদ ভঙ্গেরও কিছু কারণ আছে। আফসোসের বিষয় হলো, অজু-নামাজ-রোজাসহ বিভিন্ন আমল ভঙ্গের কারণ আমরা জানলেও ইমান ভঙ্গের কারণগুলো আমরা জানি না। অথচ ইমানের পর এর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। কেননা, যে জিনিস যতটা দামি, তার রক্ষণাবেক্ষণ ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুমিনের জন্য যেহেতু ইমানই সবচেয়ে দামি, তাই এটা বিনষ্ট হওয়ার কারণসমূহ জেনে তা থেকে ইমানকে রক্ষা করাটাও তার কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

ইমান ভঙ্গের কারণ কয়টি—এ নিয়ে সংখ্যাগত কিছু মতভিন্নতা দেখা যায়। মূলত এটা তেমন মৌলিক ভিন্নতা বুঝায় না; বরং গুরুত্বের বিচারে কেউ কমসংখ্যক কারণ উল্লেখ করেন আর কেউ একটু বিস্তারিত বলতে গিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। কারও আলোচনায় একটার মধ্যেই একাধিক কারণ চলে আসে, আবার কারও আলোচনায় প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করে বিচার করা হয়। এ জন্যই মূলত সংখ্যাগতভাবে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। অবশ্য দুয়েকটি বিষয়ে মৌলিক মতভিন্নতাও রয়েছে। আমরা সব কারণ যাচাই-বাছাই করে, এতে পরিমার্জন ও পরিশোধন করে মোট দশটি কারণ নির্ণয় করেছি। এ দশটির মাঝেই ইমান ভঙ্গের মৌলিক সব কারণ চলে এসেছে। তাই এ কারণগুলো মুখস্ত করে সর্বদা মনে রাখলে ইমানের পরিচর্যা করা এবং তা বিনষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ।

এক. গাইরুল্লাহর ইবাদত করা

উলুহিয়্যার ক্ষেত্রে শিরক হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পূজা করা বা কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা। এটা কুফর হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। গাইরুল্লাহর ইবাদত বা এতে বিশ্বাস করা মাত্রই ব্যক্তি কাফিরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾

'বলুন, আমার নামাজ, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ জগতসমূহের রব একমাত্র আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। আর আমাকে এই আদেশই করা হয়েছে এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।'[৪৭]

শাইখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন :

وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة، وغيرهم في باب حكم المرتد، على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي: عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات.

'চার মাজহাবের উলামায়ে কিরাম এবং অন্য সকলেই 'মুরতাদের হুকুম' অধ্যায়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদত করবে, চাই তা যে প্রকারের ইবাদতই হোক না কেন, সে কাফির।"'[৪৮]

দুই. রুবুবিয়্যার ক্ষেত্রে শিরক

রুবুবিয়্যার ক্ষেত্রে শিরক হলো, এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, সৃষ্টির কর্তৃত্বকারী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ। যেমনটি জাহিল সুফিগণ অনেক অলিদের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস রাখে যে, তাদের হাতে বিভিন্ন বিষয়ের কর্তৃত্ব এবং বিপদ দূর করার ক্ষমতা রয়েছে। অনুরূপ ইমামিয়া, ইসমাইলিয়া ও বাতিনি সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিজগতে তাদের ইমামদের অদৃশ্য ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। এসব বিশ্বাস শিরকপূর্ণ। কোনো মুমিন এমন বিশ্বাস রাখতে পারে না। কেউ এমন বিশ্বাস রাখলে তার ইমান বিনষ্ট হয়ে যাবে।

---

৪৭. সুরা আল-আনআম : ১৬২-১৬৩

৪৮. তাইসিরু আজিজিল হামিদ : ১৮৮ (আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

'আর আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যে তা দূর করবে। আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে এমন কেউ নেই, যে তাঁর অনুগ্রহ করবে। তাঁর বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৪৯]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

'আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তিনি ব্যতীত কেউ তা প্রেরণ করতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৫০]

আল্লাহ তাআলা অপর এক আয়াতে বলেন :

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾

'বলুন, তোমরা তাদের ডাকো, যাদের তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ইলাহ মনে করো। ওরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে ওদের কোনো অংশ নেই আর ওদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়।'[৫১]

৪৯. সুরা ইউনুস : ১০৭
৫০. সুরা ফাতির : ২
৫১. সুরা সাবা : ২২

তিন. অকাট্য কোনো বিধান অস্বীকার করা

একজন মুমিনের জন্য দ্বীনের অকাট্য সব বিধানের ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক। যদি কেউ দ্বীনের এমন কোনো বিষয়ে মিথ্যারোপ বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾

'তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিশ্চয়ই অপরাধীরা সফলকাম হবে না।"[৫২]

আল্লামা ইবনে আবুল ইজ হানাফি ؒ বলেন :

فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ أَظْهَرَ إِنْكَارَ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَالْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ كَافِرًا مُرْتَدًّا

'মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ নেই যে, কোনো ব্যক্তি যদি দ্বীনের অকাট্য ও সুস্পষ্ট ওয়াজিব বা হারাম বা এ জাতীয় কোনো বিধানকে অস্বীকার করে তাহলে তাকে তাওবা করতে বলা হবে। সুতরাং তাওবা করলে তো ভালো; নতুবা তাকে কাফির ও মুরতাদ হিসাবে হত্যা করা হবে।'[৫৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

৫২. সুরা আল-আনআম : ২১
৫৩. শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা : ২/৪৩৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

'তারা (ইহুদিরা) অন্যায়ভাবে ও সীমালঙ্ঘন করে নির্দেশগুলো প্রত্যাখ্যান করল; যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতঃপর দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।'[৫৪]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾

'অবশ্যই আমি জানি, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চয়ই কষ্ট দেয় কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং জালিমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে।'[৫৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

'যার ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে, সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হবে এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেবে, তাদের ওপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।'[৫৬]

৫৪. সুরা আন-নামল : ১৪
৫৫. সুরা আল-আনআম : ৩৩
৫৬. সুরা আন-নাহল : ১০৬

চার. হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম মনে করা

শরিয়তের হারামকে হারাম জানা আর হালালকে হালাল জানা ইমানের জন্য অন্যতম শর্ত। অতএব, কেউ যদি দ্বীনের প্রমাণিত কোনো হারামকে হালাল দাবি করে বা অন্তরে হালাল মনে করে কিংবা প্রমাণিত কোনো হালালকে হারাম দাবি করে বা অন্তরে হারাম বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

'যে সমস্ত আহলে কিতাব আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ইমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন—তা হারাম মানে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় করজোড়ে জিজিয়া প্রদান করে।'[৫৭]

ইমাম ইবনে আব্দুল বার ﷺ বর্ণনা করেন :

وَقَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ فَقَالَ لِي: يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ: أَلْقِ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ. وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةٍ حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} [التوبة: ٣١] قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَمْ نَتَّخِذْهُمْ أَرْبَابًا، قَالَ: بَلَى، أَلَيْسَ يُحِلُّونَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَتُحِلُّونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: تِلْكَ عِبَادَتُهُمْ.

৫৭. সুরা আত-তাওবা : ২৯

'আদি বিন হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গলায় ক্রুশ ঝুলানো অবস্থায় আমি একবার রাসুল ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, হে হাতিমপুত্র আদি, তোমার গলা থেকে এ মূর্তি ফেলে দাও। আমি যখন তাঁর নিকট পৌছলাম তখন তিনি সুরা তাওবা তিলাওয়াত করছিলেন।অতঃপর তিলাওয়াত করতে করতে যখন এ আয়াত اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ (তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে। -সুরা তাওবা : ৩১) পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তো তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করিনি! তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই করেছ। তোমাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছিল, তারা কি তা হালাল করেনি, যদ্দরুন তোমরাও তা হালাল বলে গ্রহণ করেছ? আর তোমাদের জন্য যা হালাল করা হয়েছিল, তারা কি তা হারাম করেনি, যদ্দরুন তোমরাও তা হারাম বলে গ্রহণ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এটাই ছিল তাদের ইবাদত ও উপাসনা।'[৫৮]

শাইখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ বলেন :

وأما استحلال المحرمات المجمع على حرمتها أو بالعكس فهو كفر اعتقادي لأنه لا يجحد تحليل ما أحل الله ورسوله أو تحريم ما حرم الله ورسوله إلا معاند للإسلام ممتنع من التزام الأحكام غير قابل للكتاب والسنة وإجماع الأمة

'আর ঐকমত্যপূর্ণ হারামকে হালাল মনে করা বা এর উল্টো ঐকমত্যপূর্ণ হালালকে হারাম মনে করা কুফরে ইতিকাদি বা বিশ্বাসগত কুফর। কেননা, একমাত্র ইসলাম বিদ্বেষী, বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতা অস্বীকারকারী ও কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা অগ্রাহ্যকারীরাই

৫৮. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহ : ২/৯৭৫, হা. নং ১৮৬২ (দারু ইবনিল জাওজি, সৌদিআরব)

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ কর্তৃক হালালকে হালাল আর হারামকে হারাম মানতে অস্বীকৃতি জানায়।'[৫৯]

পাঁচ. ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া

ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া অর্থ দ্বীনের ব্যাপারে বিমুখতা প্রদর্শন করা। এভাবে বলা যে, আমার সাথে আল্লাহ ও রাসুলের বা ইসলামের কোনো শত্রুতাও নেই আবার কোনো বন্ধুত্বও নেই। আমি সবার ক্ষেত্রে সমতায় বিশ্বাসী ও সব ধর্মকেই সমান মর্যাদার চোখে দেখি। এমন কথা বলা বা বিশ্বাস করা নিঃসন্দেহে কুফরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾

'তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তাআলা যা অবতরণ করেছেন তার দিকে এবং রাসুলের দিকে এসো, তখন মুনাফিকদের তুমি দেখবে, তারা তোমার নিকট হতে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।'[৬০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ- وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ- وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ- أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

'তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করলাম। কিন্তু এরপর ওদের একদল

৫৯. আত-তাওজিহ আন তাওহিদিল খাল্লাক : ৯৮ (দারু তাইয়িবা, রিয়াদ)
৬০. সুরা আন-নিসা : ৬১

বিমুখতা প্রদর্শন করে। ওরা নিশ্চিত মুমিন নয়। যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি তাদের প্রাপ্য থাকে, তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসুলের নিকট ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে? না তারা সংশয় পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ওদের প্রতিও জুলুম করবেন? বরং ওরাই তো জালিম।'[৬১]

ইমাম ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া ﵀ বলেন :

﴿ وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَاضِ فَأَنْ يُعْرِضَ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ، لَا يُصَدِّقُهُ وَلَا يُكَذِّبُهُ، وَلَا يُوَالِيهِ وَلَا يُعَادِيهِ، وَلَا يُصْغِي إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْبَتَّةَ ﴾

'কুফরে ইরাজ বা বিমুখতামূলক কুফর হলো, কর্ণ ও অন্তর দিয়ে রাসুল ﷺ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করা। রাসুল ﷺ-কে সত্যায়নও না করা, আবার শত্রুতাও না করা এবং তাঁর আনীত দ্বীনের প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ না করা।'[৬২]

ছয়. দ্বীনের কোনো বিধান অপছন্দ করা

ইমান ঠিক থাকার জন্য দ্বীনের সকল বিধানের প্রতি নিঃশর্ত সন্তুষ্টি ও আনুগত্য প্রকাশ আবশ্যক। অতএব, কেউ যদি দ্বীনের সুসাব্যস্ত কোনো বিধানের ব্যাপারে নাক ছিটকায় বা কোনো আইনের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহলে তা যত ছোট বিধান-ই হোক না কেন, এতে তার ইমান বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ- ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾

৬১. সুরা আন-নুর : ৪৭-৫০
৬২. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৩৪৭ (দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

'যারা কুফরি করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা যা অবতরণ করেছেন, ওরা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।'[৬৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ শরিয়তের যে কোনো বিধান অপছন্দ করাকে 'নাওয়াকিজুত তাওহিদ' বা তাওহিদ ভঙ্গকারী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ উল্লেখ করে বলেন :

لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع

'কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর প্রদানকৃত সকল সংবাদ স্বীকার করে, মুমিনরা যা সত্যায়ন করে, সেও তার সবই সত্যায়ন করে; এতদসত্ত্বেও তার প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার চাহিদা মোতাবেক না হওয়ার কারণে সে তা অপছন্দ করে, এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। সে বলে, আমি এটার স্বীকৃতি দেবো না এবং তা আঁকড়ে ধরব না। আমি এই বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি এবং এটাকে ঘৃণা করি। এটা প্রথম প্রকার-ভিন্ন আরেকটি প্রকার। এই ব্যক্তির কুফরি ইসলামের সুনিশ্চিত দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং পুরো কুরআনে এ প্রকারের কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার বিষয়টি ভরপুর।'[৬৪]

৬৩. সুরা মুহাম্মাদ : ৮-৯
৬৪. আস-সারিমুল মাসলুল : ৫২২ (আল-হারাসুল অতনি, সৌদিআরব)

সাত. দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা

আল্লাহ, রাসুল বা দ্বীনের বড় থেকে ছোট কোনো বিধানের ব্যাপারে যদি কেউ ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা তুচ্ছ জ্ঞান করে কিংবা আল্লাহ বা তাঁর রাসুলকে গালি দেয়, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে ইমান থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ- لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾

'মুনাফিকরা আশঙ্কা করে এমন সুরা না আবার অবতীর্ণ হয়ে যায়, যা তাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দেবে। আপনি বলে দিন, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাকো। তোমরা যা আশঙ্কা করছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন। আপনি তাদের প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই তারা বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসুলকে বিদ্রুপ করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা ইমান আনার পর কুফরি করেছ। তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবো; এ জন্য যে, তারা ছিল অপরাধী।'[৬৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الأولى

৬৫. সুরা আত-তাওবা : ৬৪-৬৬

'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কুফরি হওয়ার ব্যাপারে এই আয়াতটি সুস্পষ্ট। তাহলে গালি দেওয়ার ব্যাপারটি তো আর বলারই অপেক্ষা রাখে না।'[৬৬]

তিনি আরও বলেন :

إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله.

'যদি কেউ আল্লাহ বা রাসুল ﷺ-কে গালি দেয়, তাহলে সে ভেতর-বাহির উভয় দিক থেকে কাফির হয়ে যাবে। চাই গালিদাতা এটা হারাম মনে করুক বা হালাল মনে করুক অথবা কোনো ধরনের বিশ্বাসই না রাখুক। এটাই ফুকাহায়ে কিরাম ও আহলুস সুন্নাহর মাজহাব, যারা এ কথার প্রবক্তা যে, ইমান হলো কথা ও কাজের নাম। ইমাম শাফিয়ি ﷺ ও ইমাম আহমাদ ﷺ-এর সমপর্যায়ভুক্ত প্রখ্যাত ফকিহ ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুইয়া ﷺ বলেন, মুসলমানদের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ বা তাঁর রাসুল ﷺ-কে গালি দেবে, সে কাফির হয়ে যাবে; যদিও সে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা স্বীকার করে।'[৬৭]

৬৬. আস-সারিমুল মাসলুল : ৩১ (আল-হারাসুল অতনি, সৌদিআরব)
৬৭. প্রাগুক্ত : ৫১২

আট. গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নিকট সরাসরি কোনো কিছু প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট শিরক, যা মানুষের ইমান বিনষ্ট করে দেয়। যেমন : পির-আওলিয়ার কাছে সন্তান চাওয়া, কোনো কবরবাসীর কাছে বিপদ থেকে মুক্তি চাওয়া ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ- وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও আহ্বান করো না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না। কারণ, এটা করলে তো তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যে তা দূর করবে। আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে এমন কেউ নেই, যে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করবে। তাঁর বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৬৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾

'আল্লাহর সাথে অপর কাউকে ডেকো না।'[৬৯]

---

৬৮. সুরা ইউনুস : ১০৬-১০৭
৬৯. সুরা আল-জিন : ১৮

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন :

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾

'সত্যের আহ্বান একমাত্র তাঁরই। আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা তাদের আহ্বানে কোনোই সাড়া প্রদান করে না।'[৭০]

আল্লামা শাওকানি ﷺ বলেন :

وَإِخْلَاصُ التَّوْحِيدِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يَكُوْنَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لِلّٰهِ، وَالنِّدَاءُ، وَالْاِسْتِغَاثَةُ، وَالرَّجَاءُ، وَاسْتِجْلَابُ الْخَيْرِ، وَاسْتِدْفَاعُ الشَّرِّ لَهُ وَمِنْهُ لَا لِغَيْرِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ.

'সমস্ত দুআ আল্লাহর জন্য হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওহিদ খাঁটি হতে পারে না। আহ্বান, সাহায্য-প্রার্থনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্যাণ চাওয়া এবং অকল্যাণ দূর করতে চাওয়া ইত্যাদি আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অন্যের জন্য নয়, অন্যের পক্ষ থেকেও নয়।'[৭১]

তবে যেসব বিষয়ে আল্লাহ মাখলুককে সক্ষমতা দান করেছেন সেসব ক্ষেত্রে মাখলুককে মাধ্যম মনে করে তার সাহায্য চাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন কেউ গর্তে পড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, ভাই, আমাকে বাঁচাও, আমাকে সাহায্য করো। এ ঘটনায় তাকে সাহায্য করার মতো শক্তি ও সামর্থ্য আল্লাহ মাখলুককে দান করেছেন, তাই এখানে অসিলা বা মাধ্যম হিসাবে মাখলুকের কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক হবে না। এভাবে দুনিয়ার অন্যান্য কাজে একে অপরের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া সম্পূর্ণরূপে জায়িজ। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ইজমা রয়েছে।

---

৭০. সুরা আর-রাদ : ১৪
৭১. আল-ফাতহুর রাব্বানি : ১/৩৩৮ (মাকতাবাতুল জাইলিল জাদিদ, সানআ)

'আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা'-তে বলা হয়েছে :

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاِسْتِغَاثَةَ لِدَفْعِ شَرٍّ، أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ مِمَّا يَمْلِكُهُ الْمَخْلُوقُ تَجُوزُ بِالْمَخْلُوقِينَ مُطْلَقًا، فَيُسْتَغَاثُ بِالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، وَالْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

'উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মাখলুকের সাধ্যের মধ্যে হলে তার কাছে কোনো অনিষ্ট দূরীকরণ বা কোনো সুবিধা অর্জনের জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ; চাই সে যে মাখলুকই হোক না কেন। অতএব, মুসলিম বা কাফির, ভালো বা মন্দ সব ধরনের লোকের কাছেই সাহায্য চাওয়া যাবে।'[৭২]

'ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা'-তে এসেছে :

اَلْإِسْتِعَانَةُ بِالْحَيِّ الْحَاضِرِ الْقَادِرِ فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ جَائِزَةٌ، كَمَنِ اسْتَعَانَ بِشَخْصٍ فَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُقْرِضَهُ نُقُوْدًا أَوِ اسْتَعَانَ بِهِ فِيْ يَدِهِ أَوْ جَاهِهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ لِجَلْبِ حَقٍّ أَوْ دَفْعِ ظُلْمٍ.

'জীবিত, উপস্থিত ও সক্ষম ব্যক্তির কাছে তার সাধ্যের মধ্যে সাহায্য চাওয়া বৈধ। যেমন, কেউ কোনো লোকের কাছে সহযোগিতার জন্য কিছু টাকা ঋণ চাইল অথবা বাদশার নিকট কোনো অধিকার আদায় বা জুলুম দূর করতে তার শক্তি বা প্রভাবের সাহায্য কামনা করল।'[৭৩]

বুঝা গেল, মাখলুকের কাছে কোনো কিছু চাইলেই তা ইমান বিনষ্টের কারণ হবে না; বরং দেখতে হবে, যা চাওয়া হচ্ছে তা মাখলুকের সাধ্যে আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে তা শিরক হবে না এবং এতে কোনো সমস্যাও হবে না। যেমন লেনদেন, চলাফেরা, উঠাবসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরে

৭২. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ৪/৩০ (অজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যা, কুয়েত)

৭৩. ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা : ১/১৭৪ (রিয়াসাতু ইদারাতিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা, রিয়াদ)

এক অপরের সাহায্য চাওয়া। আর যদি তা বান্দার সাধ্যের বাইরে হয় তাহলে তা হবে শিরক এবং এর কারণে তার ইমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমন সরাসরি পিরের কাছে সন্তান চাওয়া, মৃত ব্যক্তির কাছে বিপদআপদ থেকে মুক্তি চাওয়া ইত্যাদি।

নয়. আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন করা

যেসব ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিধান ও আইন রয়েছে, সেসব আইনের বিপরীত ভিন্ন কোনো আইন প্রণয়ন করা সুস্পষ্ট কুফরি। কেননা, এটা শরিয়তের সাথে সরাসরি যুদ্ধ ও বিদ্রোহের নামান্তর। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শরিয়তের বিরুদ্ধে এমন সরাসরি অবস্থান পরিষ্কার কুফরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

'তাদের কি এমন কিছু শরিক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন সব বিধান তৈরি করে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তাহলে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[৭৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ؒ বলেন :

وَالْإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أَوْ بَدَّلَ الشَّرْعَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ

'মানুষ যখন ঐকমত্যপূর্ণ হারামকে হালাল বানায় অথবা ঐকমত্যপূর্ণ হালালকে হারাম বানায় কিংবা ঐকমত্যপূর্ণ আইন পরিবর্তন করে, তখন সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যায়।'[৭৫]

৭৪. সুরা আশ-শুরা : ২১

৭৫. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ৩/২৬৭ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

'তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; অথচ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।'[৭৬]

শাইখ মুহাম্মাদ আমিন শানকিতি ﵀ তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী ব্যক্তির কুফরি বর্ণনা করে বলেন :

وَمِنْ أَصْرَحِ الْأَدِلَّةِ فِي هَذَا: أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ بَيَّنَ أَنَّ مَنْ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى غَيْرِ مَا شَرَعَهُ اللهُ يَتَعَجَّبُ مِنْ زَعْمِهِمْ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ دَعْوَاهُمُ الْإِيمَانَ مَعَ إِرَادَةِ التَّحَاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ بَالِغَةٌ مِنَ الْكَذِبِ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْعَجَبُ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا [النساء: ٦٠]

'এ ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল হলো, আল্লাহ তাআলা সুরা নিসায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যারা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনে বিচার প্রার্থনা করে, তারা নিজেদের মুমিন দাবি করায় আল্লাহ তাআলা আশ্চর্যবোধ করেছেন। এটা কেবল এ জন্যই যে, তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করা সত্ত্বেও মৌখিকভাবে তাদের

৭৬. সুরা আন-নিসা : ৬০

ইমানের দাবি এমন চূড়ান্ত পর্যায়ের মিথ্যা, যাতে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। আর তা রয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে- "তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়। অথচ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" [সুরা নিসা : ৬০]'[৭৭]

আল্লামা সাদি ﵀ বলেন :

يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين. {الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ} مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. والحال أنهم {قد أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فَمَنْ زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك.

'মুনাফিকদের অবস্থা অবলোকনে আল্লাহ তাআলা আশ্চর্যবোধ করেছেন যে, যারা রাসুলের আনীত এবং পূর্ববর্তী নবীদের আনীত কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করে, তবুও তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়! তাগুত হলো, প্রত্যেক ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করে; অথচ তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল তাগুতকে অস্বীকার করার। সুতরাং এটা আর ইমান কীভাবে একত্র হতে পারে? কেননা, ইমানের দাবি হলো, আল্লাহর আইনের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং সকল বিষয়ে আল্লাহকেই বিচারক ও বিধানদাতারূপে মেনে নেওয়া। সুতরাং যে নিজেকে মুমিন বলে দাবি করবে, আবার

৭৭. আজওয়াউল বায়ান : ৩/২৫৯ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

আল্লাহর হুকুমের ওপর তাগুতের হুকুমকে প্রাধান্য দেবে, সে ইমানের দাবিতে মিথ্যাবাদী।'[৭৮]

দশ. মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাগুতকে সাহায্য করা

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির ও তাগুতকে সাহায্য-সহযোগিতা করা বা তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করার নামান্তর। আর যে কেউ মুমিনদের বিপরীতে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে ইমান থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।'[৭৯]

ইমাম ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া ﷺ বলেন :

أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ حَكَمَ - وَلَا أَحْسَنَ مِنْ حُكْمِهِ - أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَهُوَ مِنْهُمْ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١]، فَإِذَا كَانَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنْهُمْ بِنَصِّ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُمْ حُكْمُهُمْ،

'আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিয়েছেন—আর তাঁর ফয়সালার চেয়ে উত্তম কোনো ফয়সালা নেই—যে ব্যক্তি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল্লাহ তাআলা বলেন,) "তোমাদের মধ্য হতে যে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সুরা মায়িদা : ৫১] সুতরাং যখন কুরআনের ভাষ্যানুসারে কাফিরদের বন্ধুরা কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত হলো, তখন তাদের হুকুমও কাফিরদের মতোই হবে।'[৮০]

শাইখ বিন বাজ ﷺ বলেন :

وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة، فهو كافر مثلهم، كما قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

'উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের যেকোনো প্রকারে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, সেও তাদের মতো কাফির। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে ইমানদারগণ, তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।" [সুরা আল-মায়িদা : ৫১] তিনি আরও বলেন, "হে ইমানদারগণ, তোমরা স্বীয়পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ইমান অপেক্ষা কুফরকে ভালোবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী।" [সুরা আত-তাওবা : ২৩]'[৮১]

---

৭৮. তাফসিরুস সাদি : ১/১৮৪ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

৭৯. সুরা আল-মায়িদা : ৫১

৮০. আহকামু আহলিজ জিম্মাহ : ১/১৯৫ (রামাদি, দাম্মাম)

৮১. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি বাজ : ১/২৬৯ (মুহাম্মাদ বিন সাদ আশ-শুওয়াইয়ির কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত)

আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা

কোনো সন্দেহ নেই যে, 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' ইমানের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ ব্যাপারে কারও আকিদা বিশুদ্ধ না থাকলে তার ইমানই বিশুদ্ধ হবে না; তার ইমানের ভেতর কুফরের অনুপ্রবেশ ঘটে তা বিনষ্ট করে দেবে। এটি এমনই একটি আকিদা, যা ইসলামের মৌলিক ভিত্তি তৈরি করে, সঠিক পথ চিহ্নিত করে এবং ইমান ও কুফরের মাঝে চিরস্থায়ী দেয়াল গড়ে তোলে। তাই বলা হয়, যার 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আকিদা ঠিক আছে, তার ইমানও ঠিক আছে; আর যার এ আকিদা নেই বা থাকলেও বিশুদ্ধ নয়, তার ইমানও সঠিক নয়। অতএব, কোনো মুমিনের জন্যই এ থেকে উদাসীন থাকার সুযোগ নেই। এটাকে পরিপূর্ণভাবে জেনেবুঝে অন্তরে স্থাপন করতে হবে। কেননা, এর ভিত্তিতেই ইমান থেকে কুফর এবং কুফর থেকে ইমান আলাদা করা হয়। কুরআন-সুন্নাহয় এ ব্যাপারে অসংখ্য নস রয়েছে। কিন্তু অলসতাবশত আমরা এসব থেকে দূরে সরে আছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ. ﴾

'তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।'[৮২]

৮২. সুরা আল-মুমতাহিনা : ৪

ইমাম তাবারি ﷺ বলেন :

وَقَوْلُهُ: {كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة: ٤] يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مُخْبِرًا عَنْ قِيلِ أَنْبِيَائِهِ لِقَوْمِهِمُ الْكَفَرَةِ: كَفَرْنَا بِكُمْ، أَنْكَرْنَا مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاللهِ وَجَحَدْنَا عِبَادَتَكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْ تَكُونَ حَقًّا، وَظَهَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا عَلَى كُفْرِكُمْ بِاللهِ، وَعِبَادَتِكُمْ مَا سِوَاهُ، وَلَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَلَا هَوَادَةَ، {حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة: ٤] يَقُولُ: حَتَّى تُصَدِّقُوا بِاللهِ وَحْدَهُ، فَتُوَحِّدُوهُ، وَتُفْرِدُوهُ بِالْعِبَادَةِ.

'আর আল্লাহর বাণী "আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে" আম্বিয়ায়ে কিরাম ﷺ কর্তৃক কাফির সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলা কথাটি উল্লেখ করে আল্লাহ বলছেন, আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম, আল্লাহর সাথে তোমাদের কুফরি আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যার উপাসনা করছ, আমরা তা সত্য হওয়াকে অস্বীকৃতি জানালাম। আর তোমাদের আল্লাহকে অস্বীকার করা ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যের ইবাদত করার কারণে আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে চিরশত্রুতা ও বৈরিতা সৃষ্টি হলো। আমাদের পরস্পরের মাঝে কোনো আপস ও নমনীয়তা নেই। "তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা পর্যন্ত।" অর্থাৎ বলছেন, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহকে অন্তর থেকে সত্যায়ন করে তাঁর একত্ববাদ মেনে নেবে এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, ততক্ষণ আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে এ বৈরিতা ও শত্রুতা থাকবে।'[৮৩]

৮৩. তাফসিরুত তাবারি : ২৩/৩১৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন :

فَصْلٌ: فِي الْوِلَايَةِ وَالْعَدَاوَةِ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءُ اللهِ وَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ؛ وَالْكُفَّارُ أَعْدَاءُ اللهِ وَأَعْدَاءُ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَدْ أَوْجَبَ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ وَنَهَى عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيَّنَ حَالَ الْمُنَافِقِينَ فِي مُوَالَاةِ الْكَافِرِينَ.

'বন্ধুত্ব ও শত্রুতা অধ্যায় : নিশ্চয় মুমিনগণ আল্লাহর বন্ধু এবং তারা নিজেদের মধ্যেও পরস্পর বন্ধু। আর কাফিররা আল্লাহরও শত্রু, মুমিনদেরও শত্রু। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব আবশ্যক করেছেন এবং স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, এটি ইমানের আবশ্যকীয় শর্ত। আর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুমিনদের মাঝে এটা থাকবে না। অন্যদিকে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব হলো মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ তাআলা সেটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন।'[৮৪]

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ আকিদাটি আজ মুসলিম সমাজে বিলুপ্তপ্রায়। সাধারণরা তো দূরে থাক, বর্তমানের অনেক আলিমও এ সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখে না। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে জড়িয়ে আছে ইমানের মতো মহামূল্যবান সম্পদ থাকা ও না থাকার প্রশ্ন। তাই এ অধ্যায়ে আমরা 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর সামগ্রিক দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আভিধানিক অর্থ

'الولاء (আল-ওয়ালা) শব্দটি وَلِيَ এর মাসদার। এর অর্থ মৈত্রী, বন্ধুত্ব, নৈকট্য, সাহায্য ইত্যাদি। যেমন 'আল-মুনজিদ'-এ বলা হয়েছে :

৮৪. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ২৮/১৯০ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

الوَلَاءُ : اَلْمَحَبَّةُ وَالصَّدَاقَةُ، اَلْقُرْبُ وَالْقَرَابَةُ، اَلنَّصْرَةُ، اَلْمِلْكُ، مِيْرَاثٌ يَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأُ بِسَبَبِ عِتْقِ شَخْصٍ فِيْ مِلْكِهِ أَوْ بِسَبَبِ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ.

'الولاء (আল-ওয়ালা) অর্থ : হৃদ্যতা, সততা, নৈকট্য, সাহায্য, মালিকানা, নিজ মালিকানাধীন দাসমুক্তি বা মুওয়ালাত চুক্তির ভিত্তিতে প্রাপ্ত মিরাস।'[৮৫]

এটি তিন হরফবিশিষ্ট এমন একটি শব্দ, যা থেকে গঠিত সকল শব্দেই নিকটবর্তিতার অর্থ পাওয়া যায়। যেমন 'মাকায়িসুল লুগাত'-এ বলা হয়েছে :

(وَلِيَ) الْوَاوُ وَاللَّامُ وَالْيَاءُ: أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قُرْبٍ. مِنْ ذَلِكَ الْوَلْيُ: الْقُرْبُ. يُقَالُ: تَبَاعَدَ بَعْدَ وَلْيٍ، أَيْ قُرْبٍ. وَجَلَسَ مِمَّا يَلِينِي، أَيْ يُقَارِبُنِي. وَالْوَلِيُّ: الْمَطَرُ يَجِيءُ بَعْدَ الْوَسْمِيِّ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلِي الْوَسْمِيَّ. وَمِنَ الْبَابِ الْمَوْلَى: الْمُعْتِقُ وَالْمُعْتَقُ، وَالصَّاحِبُ، وَالْحَلِيفُ، وَابْنُ الْعَمِّ، وَالنَّاصِرُ، وَالْجَارُ؛ كُلُّ هَؤُلَاءِ مِنَ الْوَلْيِ وَهُوَ الْقُرْبُ.

'وَلِيَ শব্দটি و (ওয়া), ل (লাম) ও ي (ইয়া) যোগে গঠিত। এটি একটি বিশুদ্ধ উৎস, যা নিকটবর্তিতার অর্থ বুঝায়। এ থেকে একটি শব্দ হলো, الْوَلْيُ যার অর্থ নিকটবর্তী হওয়া। বলা হয়, تَبَاعَدَ بَعْدَ وَلْيٍ অর্থাৎ নিকটবর্তী হওয়ার পর সে দূরে চলে গেছে। جَلَسَ مِمَّا يَلِينِي অর্থাৎ আমার নিকটবর্তী স্থানে সে বসল। الْوَلِيُّ অর্থ বসন্তকালের প্রথম বৃষ্টির পরের বৃষ্টি। এটাকে এ জন্যই الْوَلِيُّ বলা হয় যে, তা বসন্তকালের প্রথম বৃষ্টির পরপরই আসে। এ জাতীয় আরেকটি শব্দ হলো, الْمَوْلَى যার অর্থ মুক্তকারী মনিব, মুক্ত দাস, সঙ্গী, মৈত্রীবদ্ধ, চাচাতো ভাই, সাহায্যকারী, প্রতিবেশী। এর সবগুলোতেই রয়েছে নিকটবর্তিতার অর্থ।'[৮৬]

৮৫. আল-মুনজিদ : ৯১৯ (আল-মাতবাআতুল কাসুলিকিয়্যা, বৈরুত)
৮৬. মাকায়িসুল লুগাত : ৬/১৪১ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

আর الْبَرَاءُ (আল-বারা) শব্দটির অর্থ হলো, নিষ্কৃতি, দায়মুক্তি, অব্যাহতি, দূরত্ব ইত্যাদি। যেমন 'আল-মুজামুল অসিত'-এ এসেছে :

(بَرِئَ) الْمَرِيض برء وبروء شفي وتخلص مِمَّا بِهِ وَمن فلَان بَرَاءَة تبَاعد وتخلى عَنهُ وَمن الدّين وَالْعَيْب والتهمة خلص وخلا.

'بَرِئَ الْمَرِيض অর্থ : সে সুস্থ হলো, তার আপদ থেকে সে মুক্তি পেল। بَرِئَ من فلَان অর্থ : অমুকের থেকে সে দূরে সরে গেল, তার থেকে সে অব্যাহতি পেল। بَرِئَ من الدّين وَالْعَيْب والتهمة অর্থ : দ্বীন, দোষ ও অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি ও অব্যাহতি পেল।'[৮৭]

ইবনে মানজুর ﵀ 'লিসানুল আরব'-এ বলেন :

ابنُ الأَعرابي: بَرِئَ إِذا تخَلَّصَ، وبَرِئَ إِذا تَنَزَّهَ وتباعَدَ، وبَرِئَ، إِذا أَعْذَرَ وأَنذَرَ... ابْنُ الأَعرابي: البَرِيءُ: المُتَفصِّي مِنَ القَبائح، المُتنَجِّي عَنِ الْبَاطِلِ والكَذِبِ، البعِيدُ مِن التُّهم، النَّقِيُّ القَلْبِ مِنَ الشِّرك.

'ইবনুল আ'রাবি ﵀ বলেন, بَرِئَ অর্থ সে মুক্তি বা নিষ্কৃতি পেল। بَرِئَ অর্থ : সে মুক্ত থাকল ও দূরে গেল। بَرِئَ অর্থ : অব্যাহতি দিল ও সতর্ক করল। ...ইবনুল আ'রাবি ﵀ বলেন, البَرِيءُ অর্থ : মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজসমূহ থেকে মুক্ত, ভ্রান্তি ও মিথ্যা থেকে নিষ্কৃতি লাভকারী, অপবাদসমূহ থেকে দূরবর্তী, শিরক থেকে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী।'[৮৮]

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর পারিভাষিক অর্থ

কুরআন ও সুন্নাহর সকল নস সামনে রাখলে প্রতিভাত হয় যে, সামগ্রিকভাবে চারটি জিনিস হলো 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর মূল। যথা : 'আল-ওয়ালা' এর জন্য মূল হলো, হৃদ্যতা ও সাহায্য। আর 'আল-বারা' এর মূল হলো, বিদ্বেষ ও শত্রুতা।

৮৭. আল-মুজামুল অসিত : ১/৪৬ (দারুদ দাওয়াহ, ইসকানদারিয়া)
৮৮. লিসানুল আরব : ১/৩৩ (দারু সাদির, বৈরুত)

অতএব, 'আল-ওয়ালা' এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে—আল্লাহ, তাঁর রাসুল, তাঁর দ্বীন ও অনুগত মুমিনদের ভালোবাসা এবং আল্লাহ, তাঁর রাসুল, তাঁর দ্বীন ও অনুগত মুমিনদের সাহায্য করা।

আর 'আল-বারা' এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে—সকল প্রকার তাগুতি আদর্শ ও কুফর-শিরকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা এবং বস্তুগত, আদর্শগত ও সত্তাগত সকল তাগুত ও কাফিরের সাথে শত্রুতা রাখা।

এ সংজ্ঞা থেকে আমরা পরোক্ষভাবে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর রুকনসমূহও জানতে পারলাম। সুতরাং 'আল-ওয়ালা' এর রুকন হলো, হৃদ্যতা ও সাহায্য এবং 'আল-বারা' এর রুকন হলো, বিদ্বেষ ও শত্রুতা। এখানে 'হৃদ্যতা ও সাহায্য' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমরা অন্তরে মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা ও হৃদ্যতা রাখব, তাদের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক রাখব, কাফিরদের মোকাবেলায় আমরা সবাই মুসলমানদের সাহায্য করাকে আবশ্যক মনে করব এবং দ্বীনের যেকোনো প্রয়োজনে সাধ্যানুসারে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে কর্তব্য মনে করব। আর 'বিদ্বেষ ও শত্রুতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানবরচিত সকল কুফরি আইনের প্রতি চরম বিদ্বেষ রাখব, তাগুতের আদর্শের প্রতি ঘৃণা রাখব, শিরক-কুফরকে সর্বাত্মকভাবে পরিত্যাজ্য মনে করব, সকল কাফির ও তাগুতের সাথে অন্তরে চিরশত্রুতা পোষণ করব এবং তাদের সাথে শরিয়া অনুমোদিত প্রয়োজন ছাড়া সকল সম্পর্ক ছিন্ন করব।

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর প্রায়োগিক প্রকারভেদ

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' সবার সাথে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়; বরং মানুষভেদে এতে তারতম্য হবে। কারও সাথে পূর্ণ 'ওয়ালা', কারও সাথে পূর্ণ 'বারা' আর কারও সাথে উভয়টিই কমবেশ করে থাকবে। এ হিসাবে মানুষকে তিনভাবে ভাগ করা যায়। প্রতিটি মুমিনের জন্য এ তিন শ্রেণির মানুষ চিনে তার সাথে সে অনুপাতে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' বা মিত্রতা ও শত্রুতা রাখা আবশ্যক। এর অন্যথা হলে তার ইমানে সমস্যা সৃষ্টি হবে। তিনটি শ্রেণি হলো :

এক : নেককার ও সালিহ মুমিনশ্রেণি। সুতরাং এদের সাথে পূর্ণ 'ওয়ালা' রাখতে হবে। অন্তর থেকে তাদের ভালোবাসতে হবে। তাদের প্রতি নমনীয় হতে হবে, তাদের সাথে কোমল আচরণ করতে হবে এবং তাদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করার চেষ্টা করতে হবে।

দুই : তাগুত ও কাফিরসম্প্রদায়। অমুসলিম সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, সে যতই শান্তিপ্রিয় হওয়ার দাবি করুক না কেন, তাদের সাথে মুমিনের চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ রাখতে হবে। দ্বীনি বিষয়ে তাদের প্রতি নমনীয়ভাব দেখানো যাবে না। অন্তরে তাদের জন্য কোনো ভালোবাসা রাখা যাবে না। মুসলমানদের বিপরীতে তাদের ন্যূনতম সাহায্য-সহযোগিতাও করা যাবে না। এক কথায় তাদের সাথে পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তবে ইসলামি রাষ্ট্রে জিজিয়া-কর দিয়ে বসবাসরত অমুসলিমদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা জরুরি, অনুরূপ দারুল কুফরে বসবাসরত কাফিরদের সাথে বৈধ পার্থিব লেনদেন করারও অনুমতি আছে।

তিন : গুনাহগার ও ফাসিক মুমিনশ্রেণি। এদের পাপ ও গুনাহের হিসাবে 'ওয়ালা' ও 'বারা' এর মধ্যে কমবেশ হতে থাকবে। সুতরাং যার গুনাহ অধিক ও জঘন্য হবে তার সাথে 'ওয়ালা' এর তুলনায় 'বারা' অধিক থাকবে। আর যার গুনাহ স্বল্প ও হালকা হবে, তার প্রতি 'বারা' এর পরিমাণও কমে যাবে। যেমন : বিদআত, প্রকাশ্য কবিরা গুনাহ, ইসলামি শিআর সংশ্লিষ্ট গুনাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে 'বারা' এর পরিমাণ বেশি থাকবে, আর সগিরা গুনাহ, অপ্রকাশ্য কবিরা গুনাহ বা গুনাহের পর তাওবা করলে 'বারা' এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হবে। আর খালিস দিলে তাওবা করলে তো আর কোনো 'বারা'-ই রাখা যাবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা যেমন কুফর, শিরক থেকে মুমিনদের 'বারা' ঘোষণা দেওয়ার কথা বলেছেন, তেমনই গুনাহ ও ফিসকের প্রতিও মুমিনদের ঘৃণা সৃষ্টির কথা বলেছেন। তাই যারা বলে, 'বারা' শুধু কাফিরদের জন্যই খাস, তাদের কথা ঠিক নয়। বস্তুত গুনাহগারদের জন্যও 'বারা' আছে; যদিও তা কাফির-তাগুতদের 'বারা' এর মতো কঠিন নয়। উভয়ের মাঝে অবস্থাভেদে ও অপরাধের মাত্রা অনুসারে অনেক তারতম্য ও ফারাক রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ. ﴾

'তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।'[৮৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

'আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে, নিশ্চয় মুশরিকদের থেকে আল্লাহ দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসুলও। অতএব, তোমরা যদি তাওবা করো, তাহলে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি মুখ ফিরাও, তবে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর কাফিরদের মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।'[৯০]

এ দুই আয়াতে কাফির ও তাগুতদের সাথে স্পষ্ট ভাষায় 'বারা' বা সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। তাই প্রতিটি মুমিনের জন্য অবশ্যকর্তব্য হলো, তারাও যেন সব কাফির ও তাগুত থেকে 'বারা' এর ঘোষণা দেয়।

৮৯. সুরা আল-মুমতাহিনা : ৪
৯০. সুরা আত-তাওবা : ০৩

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾

'আর তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসুল রয়েছেন। তিনি অনেক বিষয়ে তোমাদের কথা মানলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাছে ইমানকে প্রিয় করেছেন এবং সেটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। আর কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত।'[৯১]

শরিয়তে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' থাকার দলিলসমূহ

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আকিদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমানের সাথে এর রয়েছে গভীর সম্পর্ক। কুরআন-সুন্নাহয় এর পক্ষে অসংখ্য দলিল রয়েছে। যদিও অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে গাফিল। আমরা এখানে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে সামান্য কয়েকটি দলিল উল্লেখ করছি।

এক. কুরআন থেকে দলিল :

'আল-ওয়ালা' এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ - وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾

'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনগণ; যাঁরা নামাজ কায়িম করে, জাকাত দেয় এবং বিনম্র হয়। আর যাঁরা

৯১. সুরা আল-হুজুরাত : ০৭

আল্লাহ,তাঁর রাসুল ও মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাঁরাই আল্লাহর দল এবং তাঁরাই বিজয়ী।'[৯২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

'আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, নামাজ কায়িম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। এদের ওপর আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৯৩]

ইমাম তাবারি ﷺ বলেন :

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، وَهُمُ الْمُصَدِّقُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآيَاتِ كِتَابِهِ، فَإِنَّ صِفَتَهُمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَنْصَارُ بَعْضٍ وَأَعْوَانُهُمْ.

'আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ, যারা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পরস্পর সাহায্যকারী ও সহযোগী।'[৯৪]

আল্লামা ইবনে কাসির ﷺ বলেন :

لما ذكر تَعَالَى صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ الذَّمِيمَةَ عَطَفَ بِذِكْرِ صِفَاتِ المؤمنين المحمودة، فقال :وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ أَيْ يَتَنَاصَرُونَ وَيَتَعَاضَدُونَ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ : الْمُؤْمِنُ

৯২. সুরা আল-মায়িদা : ৫৫-৫৬
৯৩. সুরা আত-তাওবা : ৭১
৯৪. তাফসিরুত তাবারি : ১৪/৩৪৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَفِي الصَّحِيحِ أيضا : مثل الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ

'মুনাফিকদের গর্হিত গুণাবলি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রশংসা ও গুণাবলি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "ইমানদার পুরুষেরা ও ইমানদার নারীরা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু।" অর্থাৎ তারা একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। যেমন সহিহ বুখারির হাদিসে এসেছে, "মুমিনগণ পরস্পর একটি প্রাসাদের ন্যায়, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ এক হাতের আঙুলগুলো অপর হাতের আঙুলে প্রবেশ করালেন।" [সহিহুল বুখারি : ৪৮১] বুখারির অন্য একটি বর্ণনায় আরও এসেছে, "পরস্পর মহব্বত, দয়া ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মুমিনদের উদাহরণ একটি দেহের ন্যায়। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার পুরো দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। [সহিহুল বুখারি : ৬০১১]"'[৯৫]

আর 'আল-বারা' এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾

'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টতার আশঙ্কা করো, তাহলে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর (শাস্তি) সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'[৯৬]

৯৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/১৫৩-১৫৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৯৬. সুরা আলি ইমরান : ২৮

ইমাম তাবারি ﷺ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَمَعْنَى ذَلِكَ: لَا تَتَّخِذُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارَ ظَهْرًا وَأَنْصَارًا، تُوَالُونَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، وَتُظَاهِرُونَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَدُلُّونَهُمْ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ؛ يَعْنِي بِذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ، وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ بِارْتِدَادِهِ عَنْ دِينِهِ، وَدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ

'এর অর্থ হচ্ছে, হে মুমিনগণ, তোমরা কাফিরদেরকে সাহায্য ও সহায়তাকারীরূপে গ্রহণ করো না; এভাবে যে, তোমরা মুমিনদের বাদ দিয়ে তাদেরকে তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ভালোবাসবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে, মুমিনদের দুর্বলতা তাদের নিকট প্রকাশ করবে। কেননা, যে এ ধরনের কাজ করবে, সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ এসব কর্মের কারণে মুরতাদ হয়ে কুফরে প্রবেশ করায় তার সাথে আল্লাহ তাআলার এবং আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।'[৯৭]

দুই. হাদিস থেকে দলিল :

নুমান বিন বাশির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'পরস্পর মহব্বত, দয়া ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে এক দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার পুরো দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে।'[৯৮]

৯৭. তাফসিরুত তাবারি : ৬/৩১৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)
৯৮. সহিহুল বুখারি : ৮/১০, হা. নং ৬০১১ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

আবু মুসা আশআরি ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

'মুমিনগণ পরস্পর একটি প্রাসাদের ন্যায়, যার একাংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে রাসুলুলুল্লাহ ﷺ এক হাতের আঙুলসমূহ অপর হাতের আঙুলসমূহে প্রবেশ করালেন।'[৯৯]

আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না মুমিন হবে। আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন বিষয় বলে দেবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তা হলো, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাবে।'[১০০]

আব্দুল্লাহ বিন জারির বাজালি ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْتَرِطْ عَلَيَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ، قَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَنْصَحَ الْمُسْلِمَ، وَتَبْرَأَ مِنَ الْمُشْرِكِ.

'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য কিছু শর্ত বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করুন। কেননা, আপনিই শর্ত সম্পর্কে অধিক অবগত।" তিনি বললেন, "আমি তোমাকে এ শর্তের ওপর বাইআত করছি যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক না করে তাঁর ইবাদত করবে, ফরজ নামাজ কায়িম করবে, ফরজ জাকাত আদায়

৯৯. সহিহুল বুখারি : ১/১০৩, হা. নং ৪৮১ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
১০০. সহিহ মুসলিম : ১/৭৪, হা. নং ৫৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

করবে, মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করবে এবং মুশরিকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে।"'[১০১]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 'এবং কাফিরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে।'[১০২]

তিন. ইজমা থেকে দলিল :

বস্তুত, কুরআন-সুন্নাহয় 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আকিদার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে এত বেশি দলিল-প্রমাণ এসেছে যে, এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো ফকিহ বা আলিম মতানৈক্য করেননি। উম্মাহর সবাই এক বাক্যে এ আকিদার আবশ্যকীয়তা ও তা ইমানের অংশ হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। কারও থেকে এ ব্যাপারে ভিন্ন কোনো মত পাওয়া যায়নি। তাই বলা যায়, এ বিষয়ে উম্মতের মাঝে প্রকৃত অর্থেই মৌন ইজমা হয়ে গেছে। একাধিক ফকিহের ভাষ্য থেকেও ইজমার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়।

যেমন ইমাম ইবনে হাজাম ﷫ বলেন :

وَصَحَّ أَنَّ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١] إِنَّمَا هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ بِأَنَّهُ كَافِرٌ مِنْ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ - وَهَذَا حَقٌّ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

'আর এটা বিশুদ্ধ কথা যে, আল্লাহ তাআলার বাণী "আর তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই একজন।" [সুরা আল-মায়িদা : ৫১] আয়াতটি তার বাহ্যিক অর্থে এসেছে যে, সে (কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী নামধারী মুসলমান) কাফিরদের মধ্য হতে একজন বলে গণ্য হবে। এটা এমন ধ্রুব সত্য, যাতে দুজন মুসলমান পরস্পর মতভেদ করতে পারে না।'[১০৩]

১০১. মুসনাদু আহমাদ : ৩১/৫৫৯, হা. নং ১৯২৩৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।
১০২. মুসনাদু আহমাদ : ৩১/৪৯১, হা. নং ১৯১৫৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।
১০৩. আল-মুহাল্লা, ইবনু হাজাম : ১২/৩৩ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

আর ইজমা হবে না-ই বা কেন, যেখানে আমরা প্রতি নামাজে সুরা ফাতিহার মধ্যে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পথ ভিন্ন সরল পথের কামনা করি। কেননা, এ সুরায় উল্লিখিত الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ দ্বারা যে ইহুদি-খ্রিষ্টান উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে সকল মুফাসসিরের ইজমা রয়েছে। সুতরাং তাদের সাথে যে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তা সুরা ফাতিহার মধ্যেই পরোক্ষভাবে বলা আছে।

চার. কিয়াস[১০৪] বা যুক্তি থেকে দলিল

সুস্থ বিবেক ও বিশুদ্ধ যুক্তিও এ কথা বলে যে, 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আকিদা রাখা প্রতিটি মুমিনের জন্য ফরজ। কারণ, মানুষ যখন অনেক জিনিসের মাঝে কোনোটি শ্রেষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা বা বিশ্বাস রাখে, তখন সে নিজের জন্য নির্দিষ্ট সে জিনিসটিকেই বেছে নেবে। শুধু তাই নয়; বরং বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদেরও সে সেটিই নেওয়ার জন্য বলবে। কারণ, এখানে তার পূর্ণ বিশ্বাস কাজ করছে। সে জানে যে, এখানে জিনিসগুলোর মধ্যে ভালো-মন্দ আছে। সে নির্ভরযোগ্য কোনো মাধ্যমে যখন এর মধ্য হতে একটির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছে, তখন সে কেবল সেটিই নেওয়ার চিন্তা করবে এবং বাকিগুলো বর্জন করবে। একটিকেই কেবল সে ভালো বলবে, অন্যগুলোকে মন্দ বলবে। তার পরিচিত লোকদেরকেও সে একই আহ্বান জানাবে। 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপই। মুসলমানরা যখন নিশ্চিত সূত্রে জানতে পেরেছে যে, ইসলামই হলো একমাত্র সঠিক ধর্ম, তখন সে চূড়ান্তভাবে এ কথা বিশ্বাস করে নিয়েছে, ইসলাম ভিন্ন দুনিয়াতে যত ধর্ম বা দর্শন আছে সবই বাতিল। এ বিশ্বাসের আবশ্যকীয় দাবি হলো, এটিকে ভালো বলে প্রচার করবে। এ মতাদর্শীদের সাথে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক রাখবে। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলবে। পাশাপাশি এর বিপরীত সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের লোকদের এ সত্য পথে আসার আহ্বান করবে। আহ্বানে সাড়া না দিলে তাদের বাতিল

১০৪. উল্লেখ্য যে, এখানে শরয়ি কিয়াস উদ্দেশ্য নয়, যা মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন নস সামনে রেখে করে থাকেন; বরং আভিধানিক অর্থে এখানে কিয়াস বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক বিবেক ও সাধারণ যুক্তির আলোকে যা বুঝানো হয়ে থাকে।

ও ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করবে। তাদের বিশ্বাসের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে। আর যারা এ সত্য ও সঠিক বিশ্বাস না মেনে, এর সামনে মাথা নত না করে উল্টো পৃথিবী থেকে তা মূলোৎপাটন করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তাদেরকে সত্য ও কল্যাণের পথে বাধা মনে করে তাদের প্রধান শত্রু জ্ঞান করবে। অতঃপর সর্বাত্মকভাবে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যয় করে নত হতে তাদের বাধ্য করবে, না হয় নিশ্চিহ্ন করে দেবে। যুক্তির নিরিখে এটাই সঠিক ও বিবেকগ্রাহ্য বলে প্রতিভাত হয়। এতে কোনো বিবেকবান দ্বিমত পোষণ করতে পারে না।

এর বিপরীতে কাফিরদের মধ্যে কিছু উদারচিন্তার লোক আছে, যারা ভাবে যে, প্রত্যেকের চিন্তা-দর্শনই স্ব স্ব স্থানে ভালো ও সঠিক। অতএব, শুধু নিজের দর্শনকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়ে অন্যদের চিন্তা-দর্শন ভুল বলা ঠিক নয়। এতে বরং অন্যের মতাদর্শের প্রতি অসম্মান জানানো হয়, যা ভদ্রতা ও শিষ্টাচার পরিপন্থী। অতএব, পৃথিবীতে সবাইকে সহাবস্থান করে একে অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিতে বসবাস করা উচিত। মূলত যারা এমন কথা বলে, তারা উদারচিন্তার নয়; বরং তারা হলো সংশয়বাদী। তাদের কোনো চূড়ান্ত ধর্ম বা বিশ্বাসই নেই। তারা নিজেরাও জানে না যে, সে যে মতটি গ্রহণ করছে বা যে বিশ্বাস লালন করছে, তা আদৌ সঠিক বা চূড়ান্ত কিনা। কারণ, তার কাছে তো নিশ্চিত কোনো দলিল নেই। আর তাই সে পৃথিবীর সবাইকে তার মতো করে ভাবতে থাকে। সে চিন্তা করে, আমারটার মতো সবারটাই বুঝি এমন সংশয়পূর্ণ। অন্যান্য সংশয়বাদীরাও তার কথায় সাড়া দেয়। তাদের বাতিল মতাদর্শের মাধ্যমে পৃথিবীতে কল্পিত এক শান্তি আনয়নের দাবি করে, যা কোনোদিনও বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। কীভাবেই বা হবে, তাদের তো নীতিমালা ও সংবিধানই ঠিক নেই! তাদের দর্শন ও চিন্তায় রয়েছে হাজারও ভুল। এ ভুল পথে কোনোদিনও পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না। এর বিপরীতে মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, ইসলামের বিধানই হলো চূড়ান্ত ও সঠিক। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যখন নির্ভরযোগ্য সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, এটাই চূড়ান্ত পথ, তখন এ পথের পথিকদের অবশ্যই এ অধিকার আছে যে, এর বিপরীত সকল মত ও দর্শনকে বাতিল বলে ঘোষণা দেবে। তাদের এসব ভুল

চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এসব মানবরচিত বিধিবিধানের প্রতি পূর্ণ বিদ্বেষ ও ঘৃণা রাখবে। কেননা, তারা এটা নিশ্চিত জানে যে, এগুলো ভুল ও মন্দ এবং মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে ক্ষতিকর। এগুলো সঠিক পথ ও মত প্রতিষ্ঠার পথে বাধা। তাই এসব বাধার বিপরীতে নিজেদের অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতা রাখতে হবে। এগুলো উৎখাত করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করতে হবে। এভাবেই চূড়ান্ত বিশ্বাস ও সংশয়পূর্ণ বিশ্বাসের মাঝে মৌলিক পার্থক্য থাকায় প্রকৃত শান্তিবাদী ও তথাকথিত শান্তিবাদীদের মাঝে অসামান্য পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আমাদের অনেক সাধারণ মুসলিম এ বিষয়গুলো সম্বন্ধে না জানায় কাফিরদের প্রচারিত প্রোপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে সবার সাথে এক নিয়মে চলতে চায়। পৃথিবীর সবাইকে শান্তিবাদী বলে ভাবতে ভালোবাসে। কাফির ও মুসলিম উভয়ের জন্য একই আচরণে বিশ্বাস করে। 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আকিদায় বিশ্বাসী মুসলিমদের গোড়া ও কট্টরপন্থী বলে গালিগালাজ করে। অথচ প্রকৃত সত্য থেকে তারা কত আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে! আল্লাহ তাদের হিদায়াত দিন এবং সঠিক বুঝ দান করুন।

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ও তার বিধান

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মুমিনদের 'ওয়ালা' (হৃদ্যতা) শুধু মুমিনদের জন্যই, কাফিরদের জন্য এতে কোনো অংশ নেই। আর 'বারা' পূর্ণরূপে শুধু কাফিরদের জন্যই, মুমিনদের জন্য কখনো পূর্ণ 'বারা' (সম্পর্কচ্ছেদ) প্রয়োগ করা যাবে না। আর গুনাহগার হলে তার গুনাহের পরিমাণ ও মাত্রানুসারে আংশিক 'ওয়ালা' ও আংশিক 'বারা' রাখা হবে। 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর সাথে যেহেতু ইমানের মতো স্পর্শকাতর বিষয় জড়িত, তাই এর অপব্যবহার হলে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। কখনো তো এতে ইমানই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর কখনো ইমান তো ঠিক থাকবে, কিন্তু তা কবিরা গুনাহ ও জঘন্য হারাম বলে বিবেচিত হবে। এখানে আমরা এমন তেরোটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

এক. কাফিরদের ভালোবাসা ও মিত্র হিসাবে গ্রহণ করা

এটা মূলত কুফরকেই ভালোবাসার নামান্তর। যেমন কেউ শয়তানকে তার শয়তানির কারণে ভালোবাসল বা কোনো তাগুতকে তাদের মানবরচিত কুফরি সংবিধানের কারণে পছন্দ করল অথবা তাদের ইসলামবিরোধী তথাকথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য ভালোবাসল, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করল, জোটবদ্ধ হলো, তাহলে এটা স্পষ্ট কুফর। এর কারণে সে দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾

'যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি গোষ্ঠী হয়।'[১০৫]

আল্লামা ইবনে কাসির ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَى آخِرِهَا فِي أَبِي عُبَيْدَةَ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَرَّاحِ حِينَ قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ جُعِلَ الْأَمْرُ شُورَى بَعْدَهُ فِي أُولَئِكَ السِّتَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: وَلَوْ كَانَ أَبُو عبيدة حيا لاستخلفته. وقيل في قوله تعالى: وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ نَزَلَتْ فِي أَبِي عُبَيْدَةَ قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدْرٍ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ فِي الصِّدِّيقِ هَمَّ يَوْمَئِذٍ بِقَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ إِخْوَانَهُمْ فِي مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَتَلَ أَخَاهُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَوْمَئِذٍ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ فِي عُمَرَ قَتَلَ

---

১০৫. সুরা আল-মুজাদালা : ২২

قَرِيبًا لَهُ يَوْمَئِذٍ أَيْضًا، وَفِي حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَتَلُوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، فالله أَعْلَمُ.

'সাইদ বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-সহ প্রমুখের মতে আয়াতটি নাজিল হয়েছে আবু উবাইদা বিন আব্দুল্লাহ বিন জাররাহ ﷺ-এর ব্যাপারে, বদরের যুদ্ধে যখন তিনি তাঁর পিতাকে হত্যা করলেন। এ জন্যই উমর ﷺ তাঁর পরবর্তী খলিফা নিয়োগের জন্য ছয়জনের শুরা গঠনকালে বলেছিলেন, যদি আবু উবাইদা ﷺ আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমি তাঁকেই খলিফা ঘোষণা করতাম। আর কারও মতে আল্লাহর বাণী- وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ "যদিও তারা তাদের পিতা হয়" নাজিল হয়েছে আবু উবায়দা ﷺ-এর ব্যাপারে, যিনি বদর যুদ্ধে তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। أَوْ أَبْنَاءَهُمْ "অথবা তাদের পুত্র হয়" নাজিল হয়েছে আবু বকর সিদ্দিক ﷺ-এর ব্যাপারে, যিনি সেদিন তাঁর পুত্র আব্দুর রহমানকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিলেন। أَوْ إِخْوَانَهُمْ "অথবা তাদের ভ্রাতা হয়" নাজিল হয়েছে মুসআব বিন উমাইর ﷺ-এর ব্যাপারে, যিনি সেদিন তাঁর ভাই উবাইদ বিন উমাইরকে হত্যা করেছিলেন। أَوْ عَشِيرَتَهُمْ "অথবা তাদের গোষ্ঠী হয়" নাজিল হয়েছে উমর ﷺ-এর ব্যাপারে, যিনি সেদিন তাঁর এক আত্মীয়কে হত্যা করেছিলেন এবং হামজা ﷺ, আলি ﷺ ও উবাইদা বিন হারিস ﷺ-এর ব্যাপারে, যারা সেদিন উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদ বিন উতবাকে হত্যা করেছিলেন। আর আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।'[১০৬]

আল্লামা ইবনে কাসির ﷺ আরও বলেন :

قُلْتُ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ حِينَ اسْتَشَارَ رسول الله الْمُسْلِمِينَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ، فَأَشَارَ الصِّدِّيقُ بِأَنْ يُفَادُوا فَيَكُونُ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ قُوَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، وهم بنو العم والعشيرة، ولعل الله تعالى أن يهديهم، وقال عمر: أرى ما أرى، يا رسول الله هل تمكني مِنْ فُلَانٍ

১০৬. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/৮৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

قَرِيبٍ لِعُمَرَ فَأَقْتُلَهُ، وَتُمَكِّنُ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ وَتُمَكِّنُ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ لِيَعْلَمَ الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين.

'আমার মতে, বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের সাথে যে পরামর্শ করেছিলেন, সেই পরামর্শও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তখন আবু বকর ﷺ মুক্তিপণ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন; যেন সম্পদের মাধ্যমে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। বন্দীরা ছিল তাঁদের ভাই-বেরাদার ও আত্মীয়স্বজন। হতে পারে আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াত দিয়ে দেবেন। উমর ﷺ বললেন, আবু বকর ﷺ যে মত ব্যক্ত করেছেন, এর সাথে আমি একমত নই। আপনি অমুককে (উমর ﷺ-এর আত্মীয়) আমার হাতে উঠিয়ে দিন, আমি তাকে হত্যা করি। আর আলি ﷺ-এর হাতে আকিলকে দিন। অমুকের হাতে অমুককে দিন। যাতে আল্লাহ তাআলা জানতে পারেন যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের জন্য কোনো সহানুভূতি নেই।'[১০৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও; অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসুল ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখো। যদি

১০৭. প্রাগুক্ত

তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাকো, তবে কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।'[১০৮]

আল্লামা ইবনে কাসির ﵀ বলেন :

كَانَ سَبَبُ نُزُولِ صَدْرِ هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ قِصَّةَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ

'পবিত্র এ সুরার প্রথমাংশ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল হাতিব বিন আবু বালতাআ ﵁-এর ঘটনা।'[১০৯]

ঘটনাটি ইমাম আহমাদ ﵀ সহিহ সনদে আলি ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন। আলি ﵁ বলেন :

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا. فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ قُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ. قَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. قُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَقْلِبَنَّ الثِّيَابَ. قَالَ: فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَخَذْنَا الْكِتَابَ، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ

---

১০৮. সুরা আল-মুমতাহিনা : ০১

১০৯. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/১১১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে, জুবাইরকে ও মিকদাদকে পাঠিয়ে বললেন, এখনই রওয়ানা হয়ে রওজায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছে যাও। সেখানে একজন উষ্ট্রারোহী নারীকে পাবে, যার কাছে একটি চিঠি আছে। তার কাছ থেকে তা নিয়ে এসো। আমরা ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বেগে রওয়ানা হলাম এবং রওজায়ে খাখে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে সেই উষ্ট্রারোহী নারীকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, চিঠি বের করো। সে বলল, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। আমরা বললাম, হয় চিঠি বের করো, নয়তো আমরা কাপড় খুলে তল্লাশি করব। আলি ﵁ বলেন, তখন সে তার মাথার ঝুঁটি থেকে চিঠিটি বের করে দিল। আমরা চিঠি নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলাম। সেই চিঠিতে লেখা ছিল, "হাতিব বিন আবু বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকের প্রতি।" তাতে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সিদ্ধান্তের ব্যাপার তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হাতিব, এটা কী? তিনি বললেন, আমার ব্যাপারে জলদি কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশের ঘনিষ্ঠ ছিলাম, তবে আসল কুরাইশ ছিলাম না। আপনার সাথে যে সকল মুহাজির আছেন, মক্কায় তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা তাঁদের পরিবার-পরিজনকে সুরক্ষা দেয়। যেহেতু তাদের সাথে আমার কোনো বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাই আমি চাইছিলাম যে, পরিবার-

পরিজনকে বাঁচানোর জন্য তাদের সাথে এমন সম্পর্ক করি। আমি কুফরি কিংবা আমার দ্বীন পরিত্যাগ করে এ কাজ করিনি আর ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও করিনি। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই সে তোমাদের সত্য বলেছে। উমর ؓ বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বদরি সাহাবিদের ব্যাপারে অবগত রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, "তোমরা যা-ই ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"'[১১০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ইমান অপেক্ষা কুফরকে ভালোবাসে, তবে তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করবে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী। বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো—এসব তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর

১১০. মুসনাদু আহমাদ : ২/৩৭-৩৮, হা. নং ৬০০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

রাসুল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।'[১১১]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জালিমদের পথ প্রদর্শন করেন না।'[১১২]

ইমাম তাবারি ؒ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَمَنْ يَتَوَلَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى دُونَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، يَقُولُ: فَإِنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ وَنَصَرَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ دِينِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يَتَوَلَّى مُتَوَلٍّ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ بِهِ وَبِدِينِهِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ رَاضٍ، وَإِذَا رَضِيَهُ وَرَضِيَ دِينَهُ فَقَدْ عَادَى مَا خَالَفَهُ وَسَخِطَهُ، وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ

'যে মুসলমানদের বাদ দিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে, সে তাদের দ্বীন ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, কেউ কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না, যতক্ষণ না সে উক্ত ব্যক্তির দ্বীন ও অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট হয়। আর যখন সে তার ওপর ও তার দ্বীনের ওপর সন্তুষ্ট হবে, তখন তার বিপরীত সে সবকিছুর ব্যাপারে

১১১. সুরা আত-তাওবা : ২৩-২৪
১১২. সুরা আল-মায়িদা : ৫১

বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং তার ওপর তার কাফির বন্ধুর বিধানই প্রযোজ্য হবে।'[১১৩]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

'সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সমস্ত মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হব।'[১১৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾

'মুনাফিকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি, যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয়। তারা কি তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে? অথচ যাবতীয় সম্মানই তো আল্লাহর।'[১১৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

'ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ-প্রদর্শিত পথই প্রকৃত পথ। যদি আপনি তাদের

১১৩. তাফসিরুত তাবারি : ১০/৪০০, (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)
১১৪. সহিহুল বুখারি : ১/২১, হা. নং ১৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
১১৫. সুরা আন-নিসা : ১৩৮-১৩৯

আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন ওই জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে আল্লাহর কবল থেকে কেউ আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী থাকবে না।'[১১৬]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾

'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টতার আশঙ্কা করো, তাহলে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর (শাস্তি) সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন। আর সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'[১১৭]

ইমাম তাবারি ﷺ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَمَعْنَى ذَلِكَ: لَا تَتَّخِذُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارَ ظَهْرًا وَأَنْصَارًا، تُوَالُونَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، وَتُظَاهِرُونَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَدُلُّونَهُمْ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ؛ يَعْنِي بِذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ، وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ بِارْتِدَادِهِ عَنْ دِينِهِ، وَدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ

'এর অর্থ হচ্ছে, হে মুমিনগণ, তোমরা কাফিরদের সাহায্য ও সহায়তাকারীরূপে গ্রহণ করো না—এভাবে যে, তোমরা মুমিনদের ব্যতিরেকে তাদেরকে তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ভালোবাসবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে, মুমিনদের দুর্বলতা

১১৬. সুরা আল-বাকারা : ১২০
১১৭. সুরা আলি ইমরান : ২৮

তাদের নিকট প্রকাশ করবে। কেননা, যে এ ধরনের কাজ করবে সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ এসব কর্মের কারণে মুরতাদ হয়ে কুফরে প্রবেশ করায় তার সাথে আল্লাহ তাআলার এবং আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।'[১১৮]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাআলার বাণী "তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টতার আশঙ্কা করো, তাহলে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।" এখান থেকে অনেকেই মনে করে, কাফিরদের পক্ষ থেকে নিজের ওপর কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করলে তাদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করা যাবে এবং তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে করা যাবে। অথচ এটা ভুল চিন্তা। তুকিয়ার অর্থ এ নয় যে, কাফিরদের সাথে তাদের সবকিছু হালাল হয়ে গেছে; বরং তুকিয়ার অর্থ হলো, মৌখিকভাবে তাদের সমর্থনের কথা প্রকাশ করা। কিন্তু কর্মগতভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিপরীতে তাদের কোনোরূপ সাহায্য করা কিছুতেই বৈধ হবে না, যদ্দরুন মুসলমানদের জান-মালের ক্ষতি হয়।

ইমাম ইবনে আবি হাতিম ﵀ ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করে বলেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً فَالتَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ مَنْ حُمِلَ عَلَى أَمْرٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ، فَيَتَكَلَّمَ بِهِ مَخَافَةَ النَّاسِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرَّهُ إِنَّمَا التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ.

'আল্লাহর বাণী "তবে তোমরা যদি তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করো।" এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, মুখের মাধ্যমে তুকিয়া হলো, কাউকে আল্লাহর অবাধ্যতা জাতীয় কোনো কথা বলতে বলা হয়েছে, যদ্দরুন সে মানুষের ভয়ে সে কথা বলে ফেলে, কিন্তু তার অন্তর ইমানের ওপর অটল থাকে; তাহলে এতে তার কোনো গুনাহ হবে না। নিশ্চয়ই তুকিয়া শুধু মৌখিকভাবেই হয়ে থাকে।'[১১৯]

---

১১৮. তাফসিরুত তাবারি : ৬/৩১৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

১১৯. তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম : ২/৬২৯, হা. নং ৩৩৮১ (মাকতাবাতু নাজ্জার মুস্তাফা আল-বাজ, সৌদি আরব)

ইমাম ইবনে আবি হাতিম ﵀ ইকরামা ﵀ থেকে বর্ণনা করে বলেন :

عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً مَا لَمْ يَهْرِقْ دَمَ مُسْلِمٍ وَمَا لَمْ يَسْتَحِلَّ مَالَهُ.

'আল্লাহর বাণী "তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করো।" এর ব্যাখ্যায় ইকরামা ﵀ বলেন, এ তুকিয়া (ভয় ও আশঙ্কাজনিত কাজের বৈধতা) ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক আছে, যতক্ষণ না সে কোনো মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করবে এবং তার ধন-সম্পদ হালাল করে নেবে।'[১২০]

আল্লামা ইবনে কাসির ﵀ বলেন :

وقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً أَيْ إِلَّا مَنْ خَافَ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ أَوِ الْأَوْقَاتِ مِنْ شَرِّهِمْ، فَلَهُ أَنْ يَتَّقِيَهُمْ بِظَاهِرِهِ لَا بباطنه ونيته، كما قال الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ. وَقَالَ الثوري: قال ابن عباس: لَيْسَ التَّقِيَّةُ بِالْعَمَلِ إِنَّمَا التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ، وَكَذَا رَوَاهُ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ، وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَالضَّحَّاكُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ. وَيُؤَيِّدُ مَا قَالُوهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ [النَّحْلِ: ١٠٦]. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ الْحَسَنُ: التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

'আল্লাহর বাণী "তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করো।" এর ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তি কোনো শহরে বা কোনো সময়ে কাফিরদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা করে, তাহলে তার জন্য অন্তর দিয়ে নয়; বরং বাহ্যিকভাবে কিছু

---

১২০. তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম : ২/৬২৯, হা. নং ৩৩৮০ (মাকতাবাতু নাজ্জার মুস্তাফা আল-বাজ, সৌদি আরব)

প্রকাশ করে তাদের থেকে আত্মরক্ষা করার অবকাশ আছে। যেমনটি ইমাম বুখারি ﵀ আবু দারদা ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমরা কিছু লোকের সাথে দাঁত বের করে হাসি; অথচ আমাদের অন্তর তাদেরকে অভিশাপ দেয়। ইমাম সাওরি ﵀ বলেন, ইবনে আব্বাস ﵁ বলেছেন, তুকিয়া কাজের মাধ্যমে নয়; বরং তা শুধু মুখ দিয়েই করা হয়। এমনিভাবে আওফা ﵀ ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণনা করেন যে, তুকিয়া শুধু মুখ দিয়েই সংঘটিত হয়। এভাবে আবুল আলিয়া ﵀, আবুশ শাসা ﵀, জাহহাক ﵀, রবি বিন আনাস ﵀ এমন মতই ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা আল্লাহর এ বাণী সমর্থন করে, "যাকে (কুফরি করতে) বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার অন্তর ইমানের ওপর অটল থাকে, সে ব্যতীত যে কেউ ইমান আনার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য হৃদয়-মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের ওপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে এবং তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।" [সুরা আন-নাহল : ১০৬] ইমাম বুখারি ﵀ বলেন, হাসান বসরি ﵀ বলেছেন, তুকিয়ার বৈধতা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।'[১২১]

মূলত তুকিয়ার করার জন্য উপযুক্ত হলো দুর্বল শ্রেণির মুসলমান, যারা কাফিরদের দেশ থেকে বের হওয়ার সামর্থ্য রাখে না বা এর কোনো উপায়-পদ্ধতি খুঁজে পায় না। এমতাবস্থায় তারা একান্ত বাধ্য হলে তুকিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করবে। অর্থাৎ তারা এ দুর্বল অবস্থায় জিহাদের মাধ্যমে কাফিরদের মূলোৎপাটন করতে সক্ষম না হওয়ায় নিজেদের জান-মাল ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়ে তুকিয়া করবে। এরাই হলো এ আয়াতের দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا. ﴾

১২১. তাফসিরু ইবনি কাসির : ২/২৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

'কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্য হতে যারা অসহায়, যারা কোনো উপায় বের করতে পারে না এবং পথও জানে না, তাদের কথা ভিন্ন। এদের ব্যাপারে আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।'[১২২]

তুকিয়া এই ধরনের দুর্বল মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু যারা কোনো কৌশল অবলম্বন কিংবা হিজরতের কোনো পথ বের করতে সক্ষম, তাদের জন্য যেহেতু কাফিরদের দেশে থাকার বৈধতা নেই, তাই মৌখিকভাবে হলেও তাদের জন্য কোনো কুফরি ও ইসলামবিরোধী কাজে সমর্থন দেওয়া জায়িজ হবে না।

দুই. কাফিরদের ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা

সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ হলো, কাফিররা যে ধর্ম বা মতাদর্শের ওপর আছে, তা পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ঠিক মনে করা। যেমন : কেউ ভাবল যে, তাদের ধর্ম ঠিক আছে বা তারা সঠিক মতাদর্শের ওপর আছে বা ইসলামও সঠিক, অন্যগুলোও সঠিক বা সব ধর্মকে সমান মনে করল বা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করল বা মুসলমানকে কাফিরের মতো মনে করল। কাফিরদের ধর্ম বা মতাদর্শের প্রতি এমন মনোভাব ও সন্তোষ থাকা পরিষ্কার কুফরি, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

'নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসা সত্ত্বেও শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। আর যে

১২২. সুরা আন-নিসা : ৯৮-৯৯

ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তবে (সে জেনে রাখুক,) আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'[১২৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

'আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনোই তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[১২৪]

আল্লাহ তাআলা ইমানের জন্য তাগুতকে অস্বীকারের শর্তারোপ করে বলেন :

﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

'অতএব যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর ওপর ইমান আনবে, সে এমন সুদৃঢ় হাতল ধারণ করল, যা কখনো ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।'[১২৫]

উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফর। হাতিব বিন আবু বালতাআ ﷺ-এর ঘটনায়ও এ কথার সমর্থন মেলে, যখন তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর গোপন অভিযানের কথা মক্কার লোকদের জানানোর জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পরে ওহির মাধ্যমে ঘটনা প্রকাশ পেলে হাতিব বিন আবু বালতাআ ﷺ এ বলে নিজের অপারগতা পেশ করেন :

১২৩. সুরা আলি ইমরান : ১৯
১২৪. সুরা আলি ইমরান : ৮৫
১২৫. সুরা আল-বাকারা : ২৫৬

لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ.

'আমার ব্যাপারে জলদি কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশের ঘনিষ্ঠ ছিলাম, তবে আসল কুরাইশ ছিলাম না। আপনার সাথে যে সকল মুহাজির আছেন, মক্কায় তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা তাঁদের পরিবার-পরিজনকে সুরক্ষা দেয়। যেহেতু তাদের সাথে আমার কোনো বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাই আমি চাইছিলাম যে, পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর জন্য তাদের সাথে এমন সম্পর্ক করি। আমি কুফরি কিংবা আমার দ্বীন পরিত্যাগ করে এ কাজ করিনি আর ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও করিনি। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই সে তোমাদের সত্য বলেছে।'[১২৬]

এ হাদিসে হাতিব ﷺ-এর উক্তি "আমি কুফরি কিংবা দ্বীন পরিত্যাগ করে এ কাজ করিনি আর ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও করিনি।"—থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফর। সাহাবি হাতিব ﷺ আল্লাহর রাসুল ﷺ-কে এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, যদিও এমন করাটা আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে, কিন্তু এতে আমার অন্তরে দ্বীনত্যাগ বা কুফরের প্রতি সন্তুষ্টি ছিল না; বরং বিষয়টি পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এরপর আল্লাহর রাসুল ﷺ তার ওজর মেনে নেন এবং শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকেন এ জন্য যে, তিনি ছিলেন বদরি সাহাবি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

১২৬. মুসনাদু আহমাদ : ২/৩৭-৩৮, হা. নং ৬০০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

'যে ব্যক্তি ইমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করে, তবে সে নয়, যাকে কুফরি করতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার অন্তর ইমানের ওপর অটল থাকে; বরং যে ব্যক্তি কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তার ওপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।'[১২৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴾

'আর যারা জুলুম করেছে, তাদের প্রতি তোমরা ঝুঁকে পড়ো না। অন্যথায় তোমাদের আগুন স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু নেই, অতঃপর তোমাদের কোনো সাহায্য করা হবে না।'[১২৮]

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন :

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تَرْكَنُوا) الرُّكُونُ حَقِيقَةُ الِاسْتِنَادُ وَالِاعْتِمَادُ وَالسُّكُونُ إِلَى الشَّيْءِ وَالرِّضَا بِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: مَعْنَاهُ لَا تَوَدُّوهُمْ وَلَا تُطِيعُوهُمْ. ابْنُ جُرَيْجٍ: لَا تَمِيلُوا إِلَيْهِمْ. أَبُو الْعَالِيَةِ: لَا تَرْضَوْا أَعْمَالَهُمْ، وَكُلُّهُ مُتَقَارِبٌ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: الرُّكُونُ هُنَا الْإِدْهَانُ وَذَلِكَ أَلَّا يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ كُفْرَهُمْ.

১২৭. সুরা আন-নাহল : ১০৬
১২৮. সুরা হুদ : ১১৩

'আল্লাহর বাণী وَلَا تَرْكَنُوا "আর তোমরা ঝুঁকে পড়ো না।" الرُّكُونُ প্রকৃত অর্থে ভরসা করা, আস্থা রাখা, বস্তুর প্রতি নির্ভর করা ও তাতে সন্তুষ্ট থাকা। কাতাদা ﷺ বলেন, এর অর্থ হলো, তোমরা তাদের সাথে হৃদ্যতা রেখো না এবং তাদের অনুসরণ করো না। ইবনে জুরাইজ ﷺ বলেন, তোমরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। আবুল আলিয়া ﷺ বলেন, তাদের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হয়ো না। বস্তুত, এর সবগুলোই কাছাকাছি কথা। ইবনে জাইদ ﷺ বলেন, এখানে الرُّكُونُ অর্থ নমনীয় হওয়া। আর তা হলো তাদের কুফরি অস্বীকার না করা।'[১২৯]

তিন. মুসলমানদের বিপরীতে কাফিরদের সাহায্য করা

যদি কোনো মুসলিম কাফিরদের সাথে মিলে বা জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ জন্য যুদ্ধ করে যে, তারা মুসলিম কিংবা এ জন্য যে, তারা ইসলামের বিশেষ কোনো বিধান পালন করছে এবং তাদের জেতানোর জন্য সামরিক বা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا. ﴾

'যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়াতে অসহায় ছিলাম। তারা প্রত্যুত্তরে বলেন, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! তবে

১২৯. তাফসিরুল কুরতুবি : ৯/১০৮ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, বৈরুত)

যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না, আল্লাহ অচিরেই তাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।'[১৩০]

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন :

الْمُرَادُ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا وَأَظْهَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانَ بِهِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامُوا مَعَ قَوْمِهِمْ وَفُتِنَ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ فَافْتُتِنُوا، فَلَمَّا كَانَ أَمْرُ بَدْرٍ خَرَجَ مِنْهُمْ قَوْمٌ مَعَ الْكُفَّارِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ.

'এখানে উদ্দেশ্য মক্কার ওই সব লোক, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ইমানও এনেছিল। অতঃপর যখন নবি ﷺ হিজরত করলেন, তখন তারা নিজেদের গোত্রের লোকদের সাথে রয়ে গেল। এদের মধ্যে অনেককে পরীক্ষায় ফেলা হলে তারা ফিতনায় পড়ে গিয়েছিল। এরপর যখন বদর যুদ্ধের সময় হলো, তাদের মধ্য হতে একদল লোক কাফিরদের সাথে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করার জন্য) বের হলো। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।'[১৩১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা মুসলমানদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি এমনটি করে আল্লাহর কাছে নিজেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য দলিল স্থাপন করতে চাও?'[১৩২]

১৩০. সুরা আন-নিসা : ৯৭-৯৯

১৩১. তাফসিরুল কুরতুবি : ৫/৩৪৫ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)

১৩২. সুরা আন-নিসা : ১৪৪

ইমাম তাবারি ﷺ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

يَقُولُ لَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، لَا تُوَالُوا الْكُفَّارَ فَتُوَازِرُوهُمْ مِنْ دُونِ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ وَدِينِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَكُونُوا كَمَنْ أَوْجَبَ لَهُ النَّارَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

'আল্লাহ তাআলা তাদের বলছেন, ওহে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনয়নকারী লোকসকল, তোমরা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তোমাদের স্বজাতি ও দ্বীনি ভাই মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করো না। যদি করো, তবে মুনাফিকদের মতো তোমাদের জন্যও জাহান্নাম অবধারিত হবে।"'[১৩৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদের পথপ্রদর্শন করেন না। বস্তুত, যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, আপনি তাদের দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই (ইহুদি-খ্রিষ্টানদের) মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা

১৩৩. তাফসিরুত তাবারি : ৯/৩৩৬ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন; ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে। মুমিনগণ বলবে, এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।'[১৩৪]

ইমাম তাবারি ﷬ বলেন :

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا أَنْ يَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَنْصَارًا وَحُلَفَاءَ عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَنِ اتَّخَذَهُمْ نَصِيرًا وَحَلِيفًا وَوَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فِي التَّحَزُّبِ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ.

'আমাদের মতে, এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুমিনকে নিষেধ করেছেন, তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনয়নকারীদের বিরুদ্ধে গিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাহায্যকারী ও মিত্র না বানায়। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসুল ও মুমিনদের বাদ দিয়ে তাদেরকে মিত্র ও সাহায্যকারী বানাবে—সে আল্লাহ, রাসুল ও মুমিনদের বিরোধী শিবিরের লোক। আর আল্লাহ ও রাসুল তার থেকে মুক্ত।'[১৩৫]

আল্লামা ইবনে কাসির ﷬ বলেন :

وقوله تعالى: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَيْ شَكٌّ وريب ونفاق، يسارعون فيهم، أي يُبَادِرُونَ إِلَى مُوَالَاتِهِمْ وَمَوَدَّتِهِمْ فِي الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دائِرَةٌ أَيْ يَتَأَوَّلُونَ فِي مَوَدَّتِهِمْ

১৩৪. সুরা আল-মায়িদা : ৫১-৫৩

১৩৫. তাফসিরুত তাবারি : ১০/৩৯৮ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

وَمُوَالَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَخْشَوْنَ أَنْ يَقَعَ أمر من ظفر الكافرين بِالْمُسْلِمِينَ، فَتَكُونُ لَهُمْ أَيَادٍ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَيَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ.

'আল্লাহর বাণী فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ "যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদের আপনি দেখবেন।" অর্থাৎ (যাদের অন্তরে) সন্দেহ, সংশয় ও কপটতা রয়েছে। يُسَارِعُونَ فِيهِمْ "দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে।" অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে তাদের বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতার জন্য দৌড়ঝাঁপ করে। يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ "তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই।" অর্থাৎ তাদের বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতার কারণ ব্যাখ্যা করে বলে, তারা ভয় করছে যে, কাফিররা যদি মুসলমানদের ওপর বিজয় লাভ করে, তখন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছে তাদের একটা অবস্থান হওয়ায় উপকৃত হবে।'[১৩৬]

আল্লাহ তাআলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. ﴾

'আপনি তাদের অনেককে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন। কতই না নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম। যে কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল শাস্তি পেতে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও নবির প্রতি এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত; তবে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।'[১৩৭]

১৩৬. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৩/১২০-১২১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

১৩৭. সুরা আল-মায়িদা : ৮০-৮১

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ- وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

'যাঁরা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যাঁরা তাঁদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তাঁরা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ইমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তোমাদের জন্য তাদের অভিভাবকত্বের কোনো দায়িত্ব নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। অবশ্য যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নয়। বস্তুত, তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সেসবই দেখেন। আর যারা কাফির তারা একে অপরের বন্ধু। তোমরা যদি উক্ত ব্যবস্থা কার্যকর না করো, তবে ফিতনা বিস্তার লাভ করবে এবং বড়ই বিপর্যয় দেখা দেবে। আর যাঁরা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যাঁরা তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাঁদের জন্য রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

আর যাঁরা ইমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে মিলে জিহাদ করেছে, তাঁরাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত।'[১৩৮]

আল্লামা ইবনে কাসির ﷺ বলেন :

يقول تعالى وإن استنصركم هَؤُلَاءِ الْأَعْرَابُ، الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا فِي قِتَالٍ دِينِيٍّ عَلَى عَدُوٍّ لَهُمْ فَانْصُرُوهُمْ، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عليكم نَصْرُهُمْ، لِأَنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَنْصِرُوكُمْ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْكُفَّارِ، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَيْ مُهَادَنَةٌ إِلَى مُدَّةٍ، فَلَا تَخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَلَا تَنْقُضُوا أَيْمَانَكُمْ مَعَ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه.

'আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ "তারা যদি তোমাদের সহায়তা কামনা করে।" যেসব লোক হিজরত করে কাফিরদের সঙ্গ নিয়ে যুদ্ধ করতে যায়নি, তারা যদি সাহায্য কামনা করে, তাদের সাহায্য করো। তাদের সাহায্য করা ওয়াজিব। কারণ, তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। তবে তারা যদি এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য চায়, যাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তখন তোমরা তোমাদের দায় ও চুক্তি ভঙ্গ করবে না। এটি ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত।'[১৩৯]

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন :

(وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ) يُرِيدُ إِنْ دَعَوْا هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ عَوْنَكُمْ بِنَفِيرٍ أَوْ مَالٍ لِاسْتِنْقَاذِهِمْ فَأَعِينُوهُمْ، فَذَلِكَ فَرْضٌ عَلَيْكُمْ فَلَا تخذلوهم. إلا أن يستنصر

১৩৮. সুরা আল-আনফাল : ৭২-৭৫
১৩৯. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/৮৫-৮৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

وكم عَلَى قَوْمٍ كُفَّارٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَلَا تنصر وهم عَلَيْهِمْ، وَلَا تَنْقُضُوا الْعَهْدَ حَتَّى تَتِمَّ مُدَّتُهُ. ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أُسَرَاءَ مُسْتَضْعَفِينَ فَإِنَّ الْوَلَايَةَ مَعَهُمْ قَائِمَةٌ وَالنُّصْرَةَ لَهُمْ وَاجِبَةٌ، حَتَّى لَا تَبْقَى مِنَّا عَيْنٌ تَطْرِفُ حَتَّى تخرج إلى استنقاذ هم إِنْ كَانَ عَدَدُنَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ، أَوْ نَبْذُلُ جَمِيعَ أَمْوَالِنَا فِي اسْتِخْرَاجِهِمْ حَتَّى لَا يَبْقَى لِأَحَدٍ دِرْهَمٌ. كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَجَمِيعُ الْعُلَمَاءِ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عَلَى مَا حَلَّ بِالْخَلْقِ فِي تَرْكِهِمْ إِخْوَانَهُمْ فِي أَسْرِ الْعَدُوِّ وَبِأَيْدِيهِمْ خَزَائِنُ الْأَمْوَالِ، وَفُضُولُ الْأَحْوَالِ وَالْقُدْرَةُ وَالْعَدَدُ وَالْقُوَّةُ وَالْجَلَدُ.

'আল্লাহর বাণী وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ "যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দারুল হারব থেকে হিজরত করতে অক্ষম মুমিনরা যদি তোমাদের কাছে সৈন্যপ্রেরণ বা সম্পদ সাহায্য চায়, তাহলে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। এটি তোমাদের ওপর ফরজ। অতএব, তোমরা তাদের নিরাশ করবে না। তবে তারা যদি এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করে, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি আছে, তখন সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি ভঙ্গ করবে না। ইবনুল আরাবি ﵀ বলেন, কিন্তু তারা (সাহায্য প্রার্থনাকারী মুমিনরা) যদি দুর্বল বন্দী হয় (তাহলে কাফিরদের সাথে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও বন্দীদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা যাবে না)। কেননা, মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব অটুট রাখা এবং তাদের সাহায্য করা ওয়াজিব। এমনকি অভিযান চালিয়ে তাদের মুক্ত করার সম্ভাবনা থাকলে, তাদের মুক্ত করার জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে বা তাদের মুক্ত করতে টাকার প্রয়োজন হলে সব টাকা খরচ করে হলেও তাদের মুক্ত করতে হবে। এমনকি এর জন্য মুমিনদের কাছে অতিরিক্ত এক দিরহামও যেন অবশিষ্ট না থাকে। ইমাম

মালিক ﵀ ও সমস্ত আলিম এমনই বলেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! কত নীচু তাদের চরিত্র, যাদের ভাইয়েরা আজ দুশমনের কারাগারে বন্দী; অথচ তাদের হাতে রয়েছে সম্পদের খাজানা, তাদের রয়েছে শক্তি-সামর্থ্য, তারা সংখ্যায় যথেষ্ট, তাদের রয়েছে সেনাবাহিনী, রয়েছে অস্ত্র-শস্ত্র।'[১৪০]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

'আর মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, নামাজ কায়িম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। এদের ওপর আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[১৪১]

আল্লামা ইবনে কাসির ﵀ বলেন :

لما ذكر تَعَالَى صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ الذَّمِيمَةَ عَطَفَ بِذِكْرِ صِفَاتِ المؤمنين المحمودة، فقال :وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ أَيْ يَتَنَاصَرُونَ وَيَتَعَاضَدُونَ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَفِي الصَّحِيحِ أيضا : مثل الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

'মুনাফিকদের গর্হিত গুণাবলি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রশংসা ও গুণাবলি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

১৪০. তাফসিরুল কুরতুবি : ৮/৫৭ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)
১৪১. সুরা আত-তাওবা : ৭১

"ইমানদার পুরুষরা ও ইমানদার নারীরা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু" অর্থাৎ একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। যেমন সহিহ বুখারির হাদিসে এসেছে, "মুমিনগণ পরস্পর একটি প্রাসাদের ন্যায়, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে রাসুল ﷺ এক হাতের আঙুলগুলো অপর হাতের আঙুলে প্রবেশ করালেন।" [সহিহুল বুখারি : ৪৮১] বুখারির অন্য একটি বর্ণনায় আরও এসেছে, "পরস্পর মহব্বত, দয়া ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মুমিনদের উদাহরণ একটি দেহের ন্যায়। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার পুরো দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে।"' [সহিহুল বুখারি : ৬০১১][১৪২]

ইমাম ইবনে হাজাম رحمه الله বলেন :

مَنْ لَحِقَ بِدَارِ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ مُخْتَارًا مُحَارِبًا لِمَنْ يَلِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ بِهَذَا الْفِعْلِ مُرْتَدٌّ لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ كُلُّهَا: مِنْ وُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، مَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ، وَمِنْ إِبَاحَةِ مَالِهِ، وَانْفِسَاخِ نِكَاحِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

'যে ব্যক্তি নিকটবর্তী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে স্বেচ্ছায় দারুল কুফরে যোদ্ধা হিসেবে চলে যায়, সে তার এই অপরাধের কারণে মুরতাদ হয়ে যায়। তার ওপর মুরতাদের সব হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন, গ্রেফতার করতে সক্ষম হলে তাকে হত্যা করা, তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, বিয়ে ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি।'[১৪৩]

চার. কাফিরদের নিঃশর্ত আনুগত্য করা

এর ব্যাখ্যা হলো, তারা তাকে যা করতে বলে, সে তা-ই করে। প্রতিটি আদেশই সে মান্য করে চলে; এমনকি কুফরি হলেও সে কোনো পরোয়া করে না। যার অবস্থা এমন হবে, সে নিশ্চিতই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কেননা, কাফির মাত্রই তাকে কুফরির আদেশ করবে। আর বাস্তবে

১৪২. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/১৫৩-১৫৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
১৪৩. আল-মুহাল্লা, ইবনু হাজাম : ১২/১২৫-১২৬ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

এমন কোনো আদেশ না করলেও সে তা মানার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকাই তার কুফরির জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

'হে নবি, আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[১৪৪]

আল্লামা সাদি رحمه الله বলেন :

فَلَا تُطِعْ كُلَّ كَافِرٍ، قَدْ أَظْهَرَ الْعَدَاوَةَ لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ، وَلَا مُنَافِقٍ، قَدِ اسْتَبْطَنَ التَّكْذِيبَ وَالْكُفْرَ، وَأَظْهَرَ ضِدَّهُ. فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْأَعْدَاءُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَلَا تُطِعْهُمْ فِيْ بَعْضِ الْأُمُوْرِ، الَّتِيْ تَنْقُضُ التَّقْوَى، وَتُنَاقِضُهَا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، فَيُضِلُّوْكَ عَنِ الصَّوَابِ.

'অতএব, আপনি কোনো কাফিরেরই অনুসরণ করবেন না, যে কিনা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে। আর অনুসরণ করবেন না কোনো মুনাফিকের, যে কিনা তার অস্বীকৃতি ও কুফর গোপন রেখে তার বিপরীতটা প্রকাশ করে। এরাই প্রকৃত দুশমন। সুতরাং কিছু বিষয়ে তাদের অনুসরণ করবেন না, যা তাকওয়া বিনষ্ট করে দেয় এবং তার পরিপন্থী হয়; যদ্দরুন তারা আপনাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে।'[১৪৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾

১৪৪. সুরা আল-আহজাব : ০১
১৪৫. তাফসিরুস সাদি : পৃ. নং ৬৫৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

'হে মুমিনগণ, যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য করো, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে; ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।'[১৪৬]

ইমাম তাবারি ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

يَعْنِي بِذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ، فِي وَعْدِ اللهِ وَوَعِيدِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ {إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا} [آل عمران: ١٤٩]، يَعْنِي: الَّذِينَ جَحَدُوا نُبُوَّةَ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فِيمَا يَأْمُرُونَكُمْ بِهِ، وَفِيمَا يَنْهَوْنَكُمْ عَنْهُ، فَتَقْبَلُوا رَأْيَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَتَنْتَصِحُوهُمْ فِيمَا تَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ لَكُمْ فِيهِ نَاصِحُونَ، {يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} [آل عمران: ١٤٩] يَقُولُ: يَحْمِلُوكُمْ عَلَى الرِّدَّةِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ بِاللهِ وَآيَاتِهِ وَبِرَسُولِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، {فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} [آل عمران: ١٤٩] يَقُولُ: فَتَرْجِعُوا عَنْ إِيمَانِكُمْ وَدِينِكُمُ الَّذِي هَدَاكُمُ اللهُ لَهُ خَاسِرِينَ، يَعْنِي: هَالِكِينَ، قَدْ خَسِرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ، وَضَلَلْتُمْ عَنْ دِينِكُمْ، وَذَهَبَتْ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتُكُمْ، يَنْهَى بِذَلِكَ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِاللهِ أَنْ يُطِيعُوا أَهْلَ الْكُفْرِ فِي آرَائِهِمْ، وَيَنْتَصِحُوهُمْ فِي أَدْيَانِهِمْ.

'আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, হে ওই সকল লোক, যারা আল্লাহর ওয়াদা ও ভীতিপ্রদর্শন, তাঁর আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সত্যায়ন করে, তোমরা যদি কাফিরদের অনুসরণ করো অর্থাৎ ওই সব লোকের, যারা তোমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত অস্বীকার করেছে, যেমন ইহুদি-খ্রিষ্টানরা, তাদের কৃত আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চলো এবং তাদেরকে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ভেবে তাদের উপদেশ গ্রহণ করো, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে

১৪৬. সুরা আলি ইমরান : ১৪৯

দেবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা তোমাদের ইমান আনার পর মুরতাদ হয়ে যেতে এবং ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতে প্ররোচিত করবে। যদ্দরুন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এতে করে আল্লাহ তোমাদের যে দ্বীন ও ইমানের পথ প্রদর্শন করেছিলেন, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। "ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে" অর্থ ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা নিজেদের ক্ষতির মধ্যে ফেলেছ, তোমাদের দ্বীন থেকে সরে পড়েছ এবং তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি ধ্বংস হয়েছে। এদ্বারা আল্লাহ মুমিনদেরকে কাফিরদের মতামত মানা এবং ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের উপদেশ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।'[১৪৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ- فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের নিকট সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পর তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্য তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এ জন্য যে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে, তারা তাদের বলে, "আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের কথা মান্য করব।" আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্বন্ধে অবগত আছেন। ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের কেমন দশা হবে? এটা এ জন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে; ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন।'[১৪৮]

১৪৭. তাফসিরুত তাবারি : ৭/২৭৬ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)
১৪৮. সুরা মুহাম্মাদ : ২২-৩১

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে, তাতে তারা ইমান এনেছে, তারপরও তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়? অথচ সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।'[১৪৯]

আল্লামা ইবনে কাসির ﵀ বলেন :

هَذَا إِنْكَارٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَدَّعِي الْإِيمَانَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ، وَهُوَ مع ذلك يريد أن يتحاكم فِي فَصْلِ الْخُصُومَاتِ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، كَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهَا فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ورجل من اليهود تخصاما، فَجَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُحَمَّدٌ، وَذَاكَ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ، وَقِيلَ: فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِمَّنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ، أَرَادُوا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى حُكَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْآيَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنَّهَا ذَامَّةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَتَحَاكَمُوا إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِلِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هَاهُنَا، وَلِهَذَا قَالَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

'এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওই ব্যক্তির কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে, যে দাবি করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ও পূর্বের সকল

১৪৯. সুরা আন-নিসা : ৬০

নবির ওপর যা নাজিল করেছেন, সে তাতে বিশ্বাস রাখে, এতদসত্ত্বেও সে বিবাদের ফয়সালার জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহ ব্যতিরেকে অন্য কোথাও যেতে চায়। যেমন আয়াতটির শানে নুজুলের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন আনসারি ও ইহুদির মাঝে বিবাদ চলছিল। ইহুদি বলতে লাগল, আমার ও তোমার মাঝে মুহাম্মাদ ﷺ বিচারক। আর সে বলছিল, আমার ও তোমার মাঝে কাব বিন আশরাফ বিচারক। কারও মতে আয়াতটি এক দল মুনাফিকের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, যারা ব্যাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করত। তারা জাহিলিয়াতের যুগের বিচারকদের নিকট বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা করেছিল। এ ছাড়াও (শানে নুজুলের ব্যাপারে) আরও মত রয়েছে। আয়াতটি এসব ঘটনার চেয়ে ব্যাপকতা বোঝায়। কেননা, আয়াতটি প্রত্যেক ওই ব্যক্তির নিন্দা করেছে, যে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যান্য বাতিলের নিকট বিচার প্রার্থনা করেছে। এখানে তাগুত বলতে এটাই উদ্দেশ্য। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়।"[১৫০]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন :

فَمَنْ اسْتَكْبَرَ عَنْ بَعْضِ عِبَادَتِهِ سَامِعًا مُطِيعًا فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِ؛ لَمْ يُحَقِّقْ قَوْلَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا - حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللهُ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) : أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ بَدَّلُوا دِينَ اللهِ فَيَتْبَعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَتَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللهُ اتِّبَاعًا لِرُؤَسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا دِينَ الرُّسُلِ فَهَذَا كُفْرٌ وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكًا - وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُمْ - فَكَانَ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَهُ فِي خِلَافِ الدِّينِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ خِلَافُ الدِّينِ وَاعْتَقَدَ مَا قَالَهُ ذَلِكَ دُونَ مَا قَالَهُ اللهُ

১৫০. তাফসিরু ইবনি কাসির : ২/৩০৫ (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, বৈরুত)

وَرَسُولَهُ؛ مُشْرِكًا مِثْلَ هَؤُلَاءِ. وَ (الثَّانِي) : أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيمَانُهُمْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ ثَابِتًا لَكِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أَنَّهَا مَعَاصٍ؛ فَهَؤُلَاءِ لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ

'অতএব, যে ব্যক্তি অহংকারবশত অন্যের কথা মেনে আল্লাহর কিছু ইবাদত থেকে বিরত থাকল সে এ ক্ষেত্রে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর বক্তব্য বাস্তবায়ন করল না। এরাই ওই সকল লোক, যারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে; এ কারণে যে, আল্লাহর হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করার ক্ষেত্রে তারা তাদের আনুগত্য করেছে। এরা দুধরনের লোক। এক. যারা এ কথা জানবে যে, কাফিররা আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে আর তারা এ পরিবর্তন মেনে নিয়েই তাদের অনুসরণ করছে; যদ্দরুন তাদের নেতাদের অনুসরণে তারা আল্লাহর হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম বলে বিশ্বাস করছে; অথচ তাদের জানা আছে, তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত দ্বীনের বিরোধিতা করেছে, তাহলে এটা হবে কুফর, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ শিরক বলে অভিহিত করেছেন। যদিও তারা তাদের উদ্দেশ্যে সালাত বা সিজদা করে না। অতএব, যে ব্যক্তি জেনেশুনে দ্বীনের বিপরীতে অন্য কারও অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পরিবর্তে তার কথা শুনবে, সে তাদের মতোই মুশরিক হয়ে যাবে। দুই. আল্লাহর হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম[১৫১] বলে যাদের বিশ্বাস ঠিক থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তারা তাদের অনুসরণ করে, যেমন কোনো মুসলিম গুনাহকে গুনাহ বিশ্বাস করেই গুনাহ করে থাকে, তাহলে তাদের বিধান অন্যান্য গুনাহগারদের মতোই হবে।'[১৫২]

১৫১. এখানে আরবি ভাষ্যে লিপিকারদের থেকে শব্দগত কিছু ভুল হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'হালাল' এর জায়গায় 'হারাম' আর 'হারাম' এর জায়গায় 'হালাল' চলে এসেছে। অনেক প্রাজ্ঞ আলেম এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তাই অনুবাদের মধ্যে আমরা সঠিক অনুবাদটিই করে দিয়েছি।

১৫২. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ৭/৭০ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

পাঁচ. কাফিরদের কাছে মুসলমানদের গোপন তথ্য ফাঁস করা

কাফিরদের কাছে মুসলমানদের গোপন তথ্য ও দুর্বল কোনো দিক ফাঁস করা স্পষ্ট কুফর। কেননা, এতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া সাব্যস্ত হয়, যার কারণে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। তবে যদি কেউ মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং পার্থিব কোনো স্বার্থ বা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এমনটা করে, তবে তা কুফর হবে না ঠিক, তবে এতে মারাত্মক কবিরা গুনাহ হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না। তারা তা-ই কামনা করে, যা তোমাদের বিপন্ন করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে, তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন করো।'[১৫৩]

ইমাম কুরতুবি ؒ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَالْبِطَانَةُ مَصْدَرٌ، يُسَمَّى بِهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ. وَبِطَانَةُ الرَّجُلِ خَاصَّتُهُ الَّذِينَ يَسْتَبْطِنُونَ أَمْرَهُ،... نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَهُودِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ دُخَلَاءَ وَوُلَجَاءَ، يُفَاوِضُونَهُمْ فِي الْآرَاءِ، وَيُسْنِدُونَ إِلَيْهِمْ أُمُورَهُمْ. وَيُقَالُ: كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِكَ وَدِينِكَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُحَادِثَهُ. قَالَ الشَّاعِرُ: عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ * فكل قرين بالمقارن يقتدي.

১৫৩. সুরা আলি ইমরান : ১১৮

'البطانة' শব্দটি মাসদার। একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্যই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। بِطَانَةُ الرَّجُلِ-এর অর্থ হলো, মানুষের এমন সব ঘনিষ্ঠজন, যারা তার কথা গোপন রাখে। ...আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে মুমিনদের নিষেধ করেছেন কাফির, ইহুদি ও প্রবৃত্তিপূজারিদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুপ্রবেশকারী বানানো থেকে, যাদের ওপর তারা (মুসলমানরা) নিজেদের সিদ্ধান্তের ভার সোপর্দ করে এবং নিজেদের সকল বিষয়ে তাদের প্রতিই নির্ভর করে। বলা হয়, যে ব্যক্তি তোমার দ্বীন ও নীতিবিরোধী তার সাথে কোনো কথা শেয়ার করতে নেই। কবি বলেন, "ব্যক্তি সম্পর্কে নয়; বরং তার বন্ধু সম্পর্কে শোধাও। কেননা, প্রত্যেক বন্ধু তার সঙ্গীরই অনুগামী হয়।"'[১৫৪]

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

'মানুষ তার বন্ধুর নীতির ওপর থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ করে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।'[১৫৫]

এরপর ইমাম কুরতুবি ﵀ তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ نَهَى عَنِ الْمُوَاصَلَةِ فَقَالَ: (لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا) يَقُولُ فَسَادًا. يَعْنِي لَا يَتْرُكُونَ الْجُهْدَ فِي فَسَادِكُمْ، يَعْنِي أَنَّهُمْ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الظَّاهِرِ فَإِنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَ الْجُهْدَ فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ،

'এরপর তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলার কারণ আল্লাহ তাআলা এভাবে বর্ণনা করছেন, لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا "তারা তোমাদের অকল্যাণ সাধনে কোনো ত্রুটি করবে না।" অর্থাৎ

১৫৪. তাফসিরুল কুরতুবি : ৪/১৭৮ (আল-মাকতাবাতুল মিসরিয়্যা, কায়রো)
১৫৫. সুনানু আবি দাউদ : ৪/২৫৯, হা. নং ৪৮৩৩ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি হাসান।

তোমাদেরকে তারা ফাসাদে না ফেলে ছাড়বে না। তারা বাহ্যত যদিও তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, কিন্তু তোমাদেরকে ধোঁকা-প্রতারণায় ফেলতে চেষ্টার কমতি করবে না।'[১৫৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসুল এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখো। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাকো, তবে কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো, তা সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।'[১৫৭]

আল্লামা ইবনে কাসির ﵀ বলেন :

كَانَ سَبَبُ نُزُولِ صَدْرِ هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ قِصَّةَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ

'পবিত্র এ সুরার প্রথমাংশ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল হাতিব বিন আবু বালতাআ ﵁-এর ঘটনা।'[১৫৮]

১৫৬. তাফসিরুল কুরতুবি : ৪/১৭৯ (আল-মাকতাবাতুল মিসরিয়্যা, কায়রো)
১৫৭. সুরা আল-মুমতাহিনা : ০১
১৫৮. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/১১১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

ঘটনাটি ইমাম আহমাদ ؒ তাঁর মুসনাদে সহিহ সনদে আলি ؓ থেকে বর্ণনা করেছেন। আলি ؓ বলেন :

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا. فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ قُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ. قَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. قُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَقْلِبَنَّ الثِّيَابَ. قَالَ: فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَخَذْنَا الْكِتَابَ، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে, জুবাইরকে ও মিকদাদকে কোথাও পাঠানোর উদ্দেশে বললেন, এখনই বের হয়ে রওজায়ে খাখ নামক স্থানে চলে যাও। সেখানে একজন উষ্ট্রারোহী নারীকে পাবে, যার কাছে একটি চিঠি আছে। তার কাছ থেকে তা নিয়ে এসো। আমরা ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বেগে রওয়ানা হলাম এবং রওজায়ে খাখে গিয়ে পৌঁছলাম।

সেখানে সেই উষ্ট্রারোহী নারীকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, চিঠি বের করো। সে বলল, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। আমরা বললাম, হয় চিঠি বের করো, নয়তো আমরা কাপড় খুলে তল্লাশি করব। আলি ؓ বলেন, তখন সে তার মাথার ঝুঁটি থেকে চিঠিটি বের করে দিল। আমরা চিঠি নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ফিরে এলাম। সেই চিঠিতে লেখা ছিল, "হাতিব বিন আবু বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকের প্রতি।" তাতে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কিছু গোপন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হাতিব, এটা কী? তিনি বললেন, আমার ব্যাপারে জলদি কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশের ঘনিষ্ঠ ছিলাম, তবে আসল কুরাইশ ছিলাম না। আপনার সাথে যে সকল মুহাজির আছেন, মক্কায় তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা তাঁদের পরিবার-পরিজনকে সুরক্ষা দেয়। যেহেতু তাদের সাথে আমার কোনো বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাই আমি চাইছিলাম যে, পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর জন্য তাদের সাথে এমন সম্পর্ক করি। আমি কুফরি কিংবা দ্বীন পরিত্যাগ করে এ কাজ করিনি আর ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও করিনি। রাসুলুল্লাহ ﷺ সব শুনে বললেন, নিশ্চয়ই সে তোমাদের সত্য বলেছে। উমর ؓ বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরি সাহাবিদের ব্যাপারে অবগত রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, তোমরা যা-ই ইচ্ছা করো। কারণ, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।'[১৫৯]

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কাফিরদের কাছে মুসলমানদের গোপন সংবাদ সরবরাহ করা কুফরি। তবে পার্থিব উদ্দেশ্যে হলে তা কুফরি হবে না; বরং তা হবে কবিরা গুনাহ। এ জন্যই হাতিব বিন আবু বালতাআ ؓ-এর ওপর আল্লাহর রাসুল ﷺ কুফরির হুকুম আরোপ করেননি। যেহেতু

---

১৫৯. মুসনাদু আহমাদ : ২/৩৭-৩৮, হা. নং ৬০০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

তিনি পার্থিব একটি উদ্দেশ্যে কাজটি করেছিলেন। উমর ﵁ ভেবেছিলেন, তিনি মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এমনটা করেছেন; এ জন্য তিনি তাঁকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু আল্লাহর রাসুল ﷺ তাঁকে এ জন্য শান্ত করলেন যে, পার্থিব উদ্দেশ্যে এমন করায় কাজটি কুফরি হয়ে সে মুরতাদ হয়ে যায়নি যে, তাকে হত্যা করতে হবে; বরং এটা কবিরা গুনাহ হয়েছে। এটা কবিরা গুনাহ হলেও হাতিব ﵁ যেহেতু বদরি সাহাবি, তাই আল্লাহর ঘোষণা অনুসারে তার এ গুনাহও মাফ হয়ে গেছে। অর্থাৎ এ ঘটনায় হাতিব ﵁ বদরি সাহাবি হওয়ায় ক্ষমা পেয়ে গেছেন। নইলে এমন অপরাধের জন্য ইসলামি শরিয়তে আলাদা শাস্তির বিধান আছে, যা রাষ্ট্রপ্রধান অপরাধের মাত্রা বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন করবেন। মোটকথা, প্রমাণ হলো যে, মুসলমানদের ক্ষতির উদ্দেশ্যে বা কাফিরদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বা ইসলামের পরাজয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে কাফিরদের নিকট মুসলমানদের গোপন তথ্য সরবরাহ করা কুফর। আর শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যে হলে তা কবিরা গুনাহ বলে বিবেচিত হবে।

ছয়. কাফির ও তাগুতদের কাছে বিচার চাওয়া

মানবরচিত আইন প্রণয়নকারী ও প্রয়োগকারী তাগুতদের কাছে বিচার চাওয়া এবং এ বিচারব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার নজরে দেখা শরিয়তে মুহাম্মাদির প্রতি স্পষ্ট অবমাননা ও অস্বীকৃতির নামান্তর। সাধারণ অবস্থায় এ পদ্ধতিতে বিচারকারী ও বিচারপ্রার্থী উভয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে। বিচারকারীর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি তো পরিষ্কার। কেননা, সে এটাকে শ্রদ্ধাযোগ্য মনে করে এবং সকল আইনের বিপরীতে একমাত্র সঠিক ও আমলযোগ্য বলে বিশ্বাস করে। বিচারপ্রার্থীও যদি এমন বিশ্বাস রাখে, তাহলে সেও মুরতাদ। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ এ ব্যবস্থাকে ভুল বলে স্বীকার করে, অন্তরে এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শরিয়তের আইনকেই সঠিক ও একমাত্র আমলযোগ্য মনে করে, তাহলে এসব মানবরচিত আইনের আশ্রয় নেওয়া কুফরি হবে না; বরং হারাম ও কবিরা গুনাহ হবে। কোথাও ইসলামি শরিয়ত না থাকলে সেক্ষেত্রে যথাসম্ভব আলিমদের নিকট থেকে শরয়ি ফয়সালা নিয়ে আমল করতে হবে, অন্যথায় সবর করতে হবে। তবে কতিপয় উলামায়ে কিরাম তিনটি শর্তে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করার

অনুমোদন দিয়েছেন। যথা : একান্ত জরুরত ও বাধ্য হওয়া, অন্তরে এ আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ বিদ্বেষ ও ঘৃণা রাখা এবং শরিয়া অনুসারে ন্যায্য অধিকারের অতিরিক্ত কোনো কিছু গ্রহণ না করা। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাদের কাছে বিচারপ্রার্থী না হয়ে সবর করার মধ্যেই রয়েছে আজিমত; যদিও এতে তার পার্থিব ক্ষতি হোক।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে, তাতে তারা ইমান এনেছে? তারপরও তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; অথচ সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।'[১৬০]

ইমাম বাগাবি ﵀ এ আয়াতটির শানে নুজুল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُقَالُ لَهُ بِشْرٌ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ خُصُومَةٌ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: نَنْطَلِقُ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَقَالَ الْمُنَافِقُ: بَلْ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ اللهُ الطَّاغُوتَ، فَأَبَى الْيَهُودِيُّ أَنْ يُخَاصِمَهُ إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى الْمُنَافِقُ ذَلِكَ أَتَى مَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُودِيِّ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ لَزِمَهُ الْمُنَافِقُ، وَقَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَتَيَا عُمَرَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: اخْتَصَمْتُ أَنَا وَهَذَا إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَضَى لِي عَلَيْهِ

১৬০. সুরা আন-নিসা : ৬০

فَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ يُخَاصِمُ إِلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلْمُنَافِقِ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُمَا رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكُمَا فَدَخَلَ عُمَرُ الْبَيْتَ وَأَخَذَ السَّيْفَ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ فَضَرَبَ بِهِ الْمُنَافِقَ حَتَّى بَرُدَ، وَقَالَ: هَكَذَا أَقْضِي بَيْنَ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَضَاءِ رَسُولِهِ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. وَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فَسُمِّيَ الْفَارُوقُ

'ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, এ আয়াতটি নাজিল হয়েছে বিশর নামক এক মুনাফিকের ব্যাপারে। তার মাঝে ও এক ইহুদির মাঝে কোনো বিষয়ে বিবাদ ছিল। ইহুদি লোকটি বলল, আমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাব। আর মুনাফিক বলল, বরং আমরা কাব বিন আশরাফের কাছে যাব। সে-ই ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাগুত বলে নাম দিয়েছেন। কিন্তু ইহুদি লোকটি আল্লাহর রাসুল ﷺ ছাড়া অন্য কারও কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাল। মুনাফিক লোকটি যখন তার অস্বীকৃতি দেখতে পেল, বাধ্য হয়ে আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর কাছে আসল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ ইহুদির পক্ষে ফয়সালা করলেন। তাঁর নিকট থেকে দুজনে যখন বের হলো, মুনাফিক তাকে (ইহুদি লোকটিকে) ধরে বলল, আমাকে উমর ﷺ-এর কাছে নিয়ে চলো। অতঃপর তারা উমর ﷺ-এর কাছে এল। ইহুদি বলল, আমি এবং এ লোকটি একটি বিবাদ নিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে গিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি তার বিপরীতে আমার পক্ষে ফয়সালা করলেন। কিন্তু সে এতে সন্তুষ্ট নয়। সে ভাবছে, আপনার কাছে এর বিচার দায়ের করবে। তখন উমর ﷺ মুনাফিক লোকটিকে বললেন, ঘটনা কি এমনই? মুনাফিক বলল, হ্যাঁ। উমর ﷺ তাদের বললেন, তোমরা দাঁড়াও, আমি আসছি। অতঃপর উমর ﷺ ঘরে প্রবেশ করে হাতে তলোয়ার পেঁচিয়ে নিলেন। এরপর ঘর থেকে বের হয়ে এসে মুনাফিক লোকটিকে আঘাত করলে লোকটি নিথর হয়ে গেল। উমর ﷺ বললেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের

বিচারে সন্তুষ্ট হয় না, তার বিচার আমি এভাবেই করি। এরপর এ আয়াতটি নাজিল হলো এবং জিবরাইল ﷺ বললেন, উমর ﷺ সত্য ও মিথ্যার মাঝে প্রভেদ সৃষ্টি করেছেন। এ থেকেই তার নাম হয় ফারুক (হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী)।'[১৬১]

আল্লামা ইবনে কাসির ﷺ বলেন :

هَذَا إِنْكَارٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَدَّعِي الْإِيمَانَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ، وَهُوَ مع ذلك يريد أن يتحاكم فِي فَصْلِ الْخُصُومَاتِ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، كَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهَا فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ورجل من اليهود تخصاما، فَجَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُحَمَّدٌ، وَذَاكَ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ، وَقِيلَ: فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِمَّنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ، أَرَادُوا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى حُكَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْآيَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنَّهَا ذَامَّةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَتَحَاكَمُوا إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِلِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هَاهُنَا، وَلِهَذَا قَالَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

'এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওই ব্যক্তির কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে, যে দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ও পূর্বের সকল নবির ওপর যা নাজিল করেছেন, সে তাতে বিশ্বাস রাখে, এতদসত্ত্বেও সে বিবাদের ফয়সালার জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহ ব্যতিরেকে অন্য কোথাও যেতে চায়। যেমন আয়াতটির শানে নুজুলের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, এক আনসারি ও এক ইহুদির মাঝে বিবাদ চলছিল। ইহুদি বলতে লাগল, আমার ও তোমার মাঝে মুহাম্মাদ ﷺ বিচারক। আর সে বলছিল, আমার ও তোমার মাঝে কাব বিন আশরাফ বিচারক। কারও মতে আয়াতটি

১৬১. তাফসিরুল বাগাবি : ১/৬৫৫-৬৫৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

এক দল মুনাফিকের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করত। তারা জাহিলিয়াতের যুগের বিচারকদের নিকট বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা করেছিল। এ ছাড়াও (শানে নুজুলের ব্যাপারে) আরও মত রয়েছে। আয়াতটি এসব ঘটনার চেয়ে আরো ব্যাপকতা বুঝায়। কেননা, আয়াতটি প্রত্যেক ওই ব্যক্তির নিন্দা করেছে, যে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে বাতিলের নিকট বিচার প্রার্থনা করেছে। এখানে তাগুত বলতে এটাই উদ্দেশ্য। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়।"'[১৬২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

'তারা কি জাহিলিয়াতের বিধিবিধান কামনা করে? আর দৃঢ়বিশ্বাসী লোকদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে?'[১৬৩]

আল্লামা ইবনে কাসির ﷺ বলেন :

يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللهِ الْمُحْكَمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، النَّاهِي عَنْ كُلِّ شَرٍّ وَعَدَلَ إِلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالِاصْطِلَاحَاتِ الَّتِي وَضَعَهَا الرِّجَالُ بِلَا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ، كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْكُمُونَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ مِمَّا يَضَعُونَهَا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ، وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جِنْكِزْخَانَ الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ الياسق، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ مَجْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قد اقتبسها من شَرَائِعَ شَتَّى: مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وغيرها، وَفِيهَا كَثِيرٌ

১৬২. তাফসিরু ইবনি কাসির : ২/৩০৫ (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত)

১৬৩. সুরা আল-মায়িদা : ৫০

مِنَ الْأَحْكَامِ أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نظره وهواه، فصارت في بينه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فَلَا يَحْكُمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ.

'আল্লাহ তাআলা ওই সব লোকদের প্রত্যাখ্যান করেছেন, যারা সব কল্যাণের আধার ও সব অকল্যাণ থেকে বাধাদানকারী আল্লাহর সুদৃঢ় আইন অমান্য করে মানবরচিত চিন্তাধারা, খেয়ালখুশি ও রীতিনীতির দিকে ফিরে যায়, যা শরিয়ার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়নি; যেমনটি জাহিলি যুগের লোকেরা তাদের খেয়াল ও প্রবৃত্তির ভিত্তিতে রচিত আইনের দ্বারা বিভিন্ন ভ্রান্ত ও জাহালাতপূর্ণ বিচার-আচার করত এবং যেরকমভাবে বর্তমানে মোঙ্গলীয় শাসকরা চেঙ্গিস খানের প্রণীত রাষ্ট্রনীতি দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে, যা তাদের নেতা চেঙ্গিস খানের 'ইয়াসিক' নামক সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। 'ইয়াসিক' এটা এমন একটি আইনগ্রন্থ, যা বিভিন্ন ধর্ম তথা ইহুদি, খ্রিষ্টান, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত। সেখানে তার নিজস্ব খেয়ালখুশি ও চিন্তাধারারও অনেক আইন সন্নিবেশিত ছিল। এভাবেই এটা তাদের মাঝে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে স্বীকৃতি পায়। তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহর ওপর এটাকে প্রাধান্য দেয়। অতএব যে কেউ এমনটা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করতে হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের দিকে ফিরে আসে, অতঃপর কমবেশি কোনো ক্ষেত্রেই শরিয়ার বিধান ছাড়া ফয়সালা করবে না।'[১৬৪]

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ

১৬৪. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৩/১১৯ (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত)

'আল্লাহর তাআলার নিকটে তিন শ্রেণির মানুষ সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এক. হারাম শরিফে অন্যায় ও অপকর্মকারী। দুই. ইসলামি যুগে জাহিলি যুগের আইন-কানুন অন্বেষণকারী। তিন. ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া কারও রক্তপাত দাবিকারী।'[১৬৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

'তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র ইসাকেও। অথচ এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই তারা আদিষ্ট ছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যা কিছু শরিক করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।'[১৬৬]

ইমাম তাবারি ﷺ বলেন :

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: قِيلَ لِحُذَيْفَةَ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ} [التوبة: ٣١] قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَصُومُونَ لَهُمْ، وَلَا يُصَلُّونَ لَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحِلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحَلَّهُ اللهُ لَهُمْ حَرَّمُوهُ، فَتِلْكَ كَانَتْ رُبُوبِيَّتَهُمْ

'আবুল বুখতারি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজাইফা ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর বাণী اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ এর ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, মনে রেখো, তারা (ইহুদিরা) তাদের (পণ্ডিতদের) উদ্দেশ্যে রোজাও রাখত না এবং তাদের উদ্দেশ্যে নামাজও পড়ত না। কিন্তু তারা (পণ্ডিতরা) যখন তাদের জন্য কোনো জিনিস হালাল করে দিত, তারা তা হালাল বলে মেনে

১৬৫. সহিহুল বুখারি : ৯/৬, হা. নং ৬৮৮২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
১৬৬. সুরা আত-তাওবা : ৩১

নিত এবং যখন তারা আল্লাহর কোনো হালালকে হারাম করত, তখন তারাও তা হারাম বলে মেনে নিত। আর এটাই ছিল তাদের রব বানানোর স্বরূপ।'[১৬৭]

আল্লামা ইবনে কাসির ﷺ বলেন :

فَمَنْ تَرَكَ الشَّرْعَ الْمُحْكَمَ الْمُنَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَتَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ الْمَنْسُوخَةِ كَفَرَ، فَكَيْفَ بِمَنْ تحاكم إلى الياساق وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ؟ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَفَرَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

'যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ সুদৃঢ় শরিয়ত বাদ দিয়ে পূর্বের রহিত শরিয়তমতে বিচার কামনা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। তাহলে যে ব্যক্তি 'ইয়াসাক' (চেঙ্গিস খানের বানানো সংবিধান) অনুসারে বিচার কামনা করে এবং এটাকে শরিয়তের ওপর প্রাধান্য দেয়, তার অবস্থা কী হবে? যে এমনটি করবে, সে মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে কাফির হয়ে যাবে।'[১৬৮]

সাত. দ্বীনের ব্যাপারে কাফিরদের সাথে নমনীয়তা দেখানো

এখানে নমনীয়তার অর্থ, সৌজন্যবশত কাফিরদের ভ্রান্ত ও ভুল কোনো কাজের ব্যাপারে নীরব থাকা বা সাপোর্ট করা এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্যভাব প্রকাশ করে নমনীয়তা দেখানো। সুতরাং সে কাজটি যদি কুফরি হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানোও কুফরি হবে। যেহেতু কুফরির প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরির অন্তর্ভুক্ত। আর যদি কাজটি কুফরি না হয়ে নাজায়িজ কিছু হয়, তাহলে নমনীয়তা দেখানো নাজায়িজ হবে। মোটকথা, কাফিরের কাজের ধরন অনুসারে মুসলমানের নমনীয়তার ওপর হুকুম আরোপিত হবে।

১৬৭. তাফসিরুত তাবারি : ১৪/২০৯ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)
১৬৮. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৩/১১৯ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾

'তারা চায়, যদি আপনি নমনীয় হোন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।'[১৬৯]

ইমাম তাবারি ﵀ বলেন :

وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَدَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَا مُحَمَّدُ لَوْ تَلِينُ لَهُمْ فِي دِينِكَ بِإِجَابَتِكَ إِيَّاهُمْ إِلَى الرُّكُونِ إِلَى آلِهَتِهِمْ، فَيَلِينُونَ لَكَ فِي عِبَادَتِكَ إِلَهَكَ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} [الإسراء: ٧٥] وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الدُّهْنِ شَبَّهَ التَّلْيِينَ فِي الْقَوْلِ بِتَلْيِينِ الدُّهْنِ.

'দুটি মত হতে অধিক বিশুদ্ধ মত হলো, যারা বলেন, "আয়াতটির অর্থ হলো, ওই সকল মুশরিক কামনা করে, হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি তাদের মাবুদদের প্রতি নরম হয়ে তাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে আপনার দ্বীনের বিষয়ে একটু নমনীয়তা দেখান, তাহলে তারাও আপনার মাবুদের ইবাদতের ব্যাপারে নমনীয়তা দেখাবে।" যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর যদি আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখতাম, আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। তখন অবশ্যই আমি আপনাকে ইহজীবনে দ্বিগুন ও পরজীবনে দ্বিগুন শাস্তি আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার বিপরীতে কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।" [সুরা বনি ইসরাইল : ৭৪-৭৫] تُدْهِنُ শব্দটি الدُّهْن (তেল) থেকে নির্গত হয়েছে। কথার নমনীয়তাকে তেলের তরলতার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।'[১৭০]

১৬৯. সুরা আল-কলাম : ০৯

১৭০. তাফসিরুত তাবারি : ২৩/৫৩৪ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। আর তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।'[১৭১]

ইমাম তাবারি ﵀ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَأَتْبَاعُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ مَعَهُ عَلَى دِينِهِ، أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، غَلِيظَةٌ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ، قَلِيلَةٌ بِهِمْ رَحْمَتُهُمْ {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} يَقُولُ: رَقِيقَةٌ قُلُوبُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، لَيِّنَةٌ أَنْفُسُهُمْ لَهُمْ، هَيِّنَةٌ عَلَيْهِمْ لَهُمْ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল্লাহর রাসুল। আর অনুসারী সঙ্গীগণ, যারা তাঁর সাথে তাঁর দ্বীনের ওপর আছেন—তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর, তাদের ব্যাপারে তাঁদের অন্তর শক্ত ও দয়ার পরিমাণ সীমিত। "নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের অন্তর একে অপরের জন্য নরম, কোমল ও সহজ।'[১৭২]

এখানে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে যে, মুমিনগণ নিজেদের মধ্যে তো খুবই সহনশীল ও নরমদিল হবে, একে অপরের প্রতি সহায়তাপরায়ণ হবে এবং নিজেদের মধ্যে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা রাখবে। কিন্তু কাফিরদের ব্যাপারে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো হবে। তাদের সাথে কোনো বিষয়ে নরমি ও ছাড় দেওয়ার মানসিকতা রাখা যাবে না। বিশেষত দ্বীনের বিষয়ে ছাড় দেওয়া বা নমনীয়ভাব দেখানোর ন্যূনতম কোনো সুযোগ নেই।

১৭১. সুরা আল-ফাতহ : ২৯

১৭২. তাফসিরুত তাবারি : ২২/২৬১ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

আট. দ্বীন নিয়ে হাসিঠাট্টা ও বিরোধিতার মজলিসে বাস

দ্বীন নিয়ে ঠাট্টার মজলিস বলতে সাধারণ মজলিসও হতে পারে, অনুরূপ তাগুতদের আইনসভা বা সংসদও হতে পারে, যেখানে আল্লাহর দ্বীন নিয়ে মশকরা করা হয়, ইসলামের বিধানের ব্যাপারে কটূক্তি করা হয় এবং শরিয়তের হুকুমের বিরোধিতা করা হয়। এসব মজলিসে অংশগ্রহণ করে দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা বিরোধিতা করতে দেখলে অবশ্যই তার প্রতিবাদ করতে হবে এবং স্থান ত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় তাদের কথায় মৌন সমর্থন থাকায়, তাদের মতো সে-ও কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾

'কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি নাজিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে কথা শুরু করে, তোমরা তাদের সাথে বসবে না। নয়তো তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয় মুনাফিক ও কাফির সবাইকে আল্লাহ জাহান্নামে একত্র করবেন।'[১৭৩]

ইমাম বাগাবি ﵀ বলেন :

إِنْ قَعَدْتُمْ عِنْدَهُمْ وَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَسْتَهْزِئُونَ وَرَضِيتُمْ بِهِ فَأَنْتُمْ كُفَّارٌ مِثْلُهُمْ، وَإِنْ خَاضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِالْقُعُودِ مَعَهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ،

'যদি তোমরা কাফিরদের সাথে বসো, যে সময়ে তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে অশালীন কথাবার্তা ও বিদ্রূপ করছে এবং তোমরা

১৭৩. সুরা আন-নিসা : ১৪০

তাতে সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে তোমরাও তাদের মতো কাফির বলে গণ্য হবে। আর যদি তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের সাথে বসা অনুত্তম হলেও এতে কোনো সমস্যা নেই।'[১৭৪]

নয়. প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাফিরদের নিয়োগ দেওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾

'আর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।'[১৭৫]

আবু মুসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ لِعُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ لِي كَاتِبًا نَصْرَانِيًّا. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَاتَلَكَ اللهُ! أَمَا سَمِعْتَ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}؟ أَلَا اتَّخَذْتَ حَنِيفًا؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لِي كِتَابَتُهُ وَلَهُ دِينُهُ. قَالَ: لَا أُكْرِمُهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ اللهُ، وَلَا أُعِزُّهُمْ إِذْ أَذَلَّهُمْ، وَلَا أُدْنِيهِمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ اللهُ.

'আমি উমর ﵁-কে বললাম, আমার একজন খ্রিষ্টান কেরানি আছে। উমর ﵁ বললেন, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! এ তুমি কী করেছ? তুমি কি এ আয়াত শোনোনি? আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু।" [সুরা আল-মায়িদা : ৫১] তুমি কি তাকে একনিষ্ঠ কর্মী বানাওনি? আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনিন, তার লেখাটাই আমার দরকার হয় আর তার

১৭৪. তাফসিরুল বাগাবি : ১/৭১৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
১৭৫. সুরা আন-নিসা : ১৪১

ধর্ম তার থাকবে! তিনি বললেন, আল্লাহ যখন তাদের অপমানিত করেছেন, আমি তাদের সম্মান দেবো না। আল্লাহ যখন তাদের লাঞ্ছিত করেছেন, আমি তাদের মর্যাদা দেবো না। আল্লাহ যখন তাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন, আমি তাদের কাছে টানব না।'[১৭৬]

ইমাম কুরতুবি ﵀ বলেন :

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا تَسْتَعْمِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الرِّشَا، وَاسْتَعِينُوا عَلَى أُمُورِكُمْ وَعَلَى رَعِيَّتِكُمْ بِالَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ تَعَالَى. وَقِيلَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا مِنْ نَصَارَى الْحِيرَةِ لَا أَحَدَ أَكْتَبُ مِنْهُ وَلَا أَخَطُّ بِقَلَمٍ أَفَلَا يَكْتُبُ عَنْكَ؟ فَقَالَ: لَا آخُذُ بِطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَا يَجُوزُ اسْتِكْتَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالِاسْتِنَابَةِ إِلَيْهِمْ. قُلْتُ: وَقَدِ انْقَلَبَتِ الْأَحْوَالُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ بِاتِّخَاذِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَتَبَةً وَأُمَنَاءَ وَتَسَوَّدُوا بِذَلِكَ عِنْدَ الْجَهَلَةِ الْأَغْبِيَاءِ مِنَ الْوُلَاةِ وَالْأُمَرَاءِ.

'উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো আহলে কিতাবকে (ইহুদি-খ্রিষ্টানকে) সরকারি পদে নিয়োগ দেবে না। কারণ, তারা ঘুষ বৈধ মনে করে। তোমরা নিজেদের ও জনগণের কাজের জন্য এমন লোকদের থেকে সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করো, যারা আল্লাহকে ভয় করে। উমর রা-কে বলা হলো, এখানে হীরার জনৈক খ্রিষ্টান আছে, যে লেখালেখি ও কলম চালনায় বেশ পারঙ্গম। সে কি আপনার লেখার কাজ করতে পারে না? তিনি বললেন, "আমি অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করব না।" সুতরাং জিম্মিকে কেরানি পদে নিয়োগ দেওয়া কিংবা ব্যবসার পরিচালক ও অফিসার পদে নিয়োগ দেওয়া জায়িজ নেই। আমি

১৭৬. আহকামু আহলিল মিলাল ওয়ার-রিদ্দাহ : পৃ. নং ১১৭, হা. নং ৩২৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি হাসান।

বলি, এ যুগে অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। এখন আহলে কিতাবকে (ইহুদি-খ্রিষ্টানকে) রেজিস্টার ও আমানতদার বানানো হচ্ছে। এ কারণে অনেক বোকা ও অজ্ঞদের দৃষ্টিতে তারা প্রশাসক ও গভর্নর হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।'[১৭৭]

আল্লামা ইবনে কাইয়িম ﵀ বলেন :

حُكْمُ تَوْلِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضَ شُئُونِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ : وَلَمَّا كَانَتِ التَّوْلِيَةُ شَقِيقَةَ الْوِلَايَةِ كَانَتْ تَوْلِيَتُهُمْ نَوْعًا مِنْ تَوَلِّيهِمْ، وَقَدْ حَكَمَ تَعَالَى بِأَنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وَلَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ، وَالْوَلَايَةُ تُنَافِي الْبَرَاءَةَ، فَلَا تَجْتَمِعُ الْبَرَاءَةُ وَالْوَلَايَةُ أَبَدًا، وَالْوَلَايَةُ إِعْزَازٌ، فَلَا تَجْتَمِعُ هِيَ وَإِذْلَالُ الْكُفْرِ أَبَدًا، وَالْوَلَايَةُ صِلَةٌ، فَلَا تُجَامِعُ مُعَادَاةَ الْكَافِرِ أَبَدًا.

'ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে জিম্মি কাফিরদের নিয়োগ দেওয়ার বিধান : কাউকে কোনো পদে নিয়োগদান যেহেতু ক্ষমতা প্রদানেরই নামান্তর, বিধায় জিম্মিদের নিয়োগদান মানে তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা রাখা। অথচ আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিয়েছেন যে, যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়াও কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে কারও ইমান পূর্ণ হবে না। আর কাউকে ক্ষমতা প্রদান তো সম্পর্কচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব, সম্পর্কচ্ছেদ ও ক্ষমতা প্রদান কখনো একসাথে হতে পারে না। এ ছাড়াও ক্ষমতা প্রদান বস্তুত মর্যাদাদান বুঝায়। অতএব, কুফরির লাঞ্ছনার সাথে এটা কোনোদিন একত্রিত হতে পারে না। অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান তো সম্পর্ক স্থাপন বুঝায়। অতএব, কাফিরদের শত্রুতার সাথে তা কখনো একত্রিত হতে পারে না।'[১৭৮]

১৭৭. তাফসিরুল কুরতুবি : ৪/১৭৯ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়া, কায়রো)
১৭৮. আহকামু আহলিজ জিম্মাহ : ১/৪৯৯ (রামাদি, দাম্মাম)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

وَلَا يُسْتَعَانُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي عِمَالَةٍ وَلَا كِتَابَةٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ مَفَاسِدُ أَوْ يُفْضِي إِلَيْهَا وَسُئِلَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي مِثْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ لَا يُسْتَعَانُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ... فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَهِدَ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ أَحَدًا وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ لِمَا يَخَافُ مِنْ فَسَادِ دِيَانَتِهِمْ.

'আর জিম্মিদের থেকে প্রশাসনিক বা দাপ্তরিক কোনো কাজে সাহায্য নেওয়া যাবে না। কেননা, এতে অনেক গোলযোগ ও অনিষ্ট দেখা দেবে বা এর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আবু তালিব ﷺ-এর বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমাদ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, খারাজ উসুল করার মতো কোনো দায়িত্বে কি জিম্মিকে বসানো যাবে? তিনি বললেন, না। কোনো ব্যাপারেই তাদের মদদ নেওয়া যাবে না। ...আবু বকর ﷺ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি কোনো মুরতাদকে সরকারি পদে নিয়োগ দেবেন না; যদিও তারা ইসলামে ফিরে আসুক। কারণ, তাদের দ্বীনদারি বিনষ্ট হওয়া নিয়ে আশঙ্কা আছে।'[১৭৯]

দশ. কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখা

কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করার ক্ষেত্রে বিধান তিন ধরনের। এক. তাদের ধর্মীয় বিষয়ে সাদৃশ্য অবলম্বন করা এবং তা সম্মানের চোখে দেখা। সন্দেহ নেই যে, এটা পরিষ্কার কুফর। দুই. বৈধ পার্থিব বিষয়ে তাদের অনুসরণের উদ্দেশ্যে বা তাদের সাথে মিল রাখার নিয়তে সাদৃশ্য অবলম্বন করা। এটা মাকরুহ বা নাজায়িজ। তিন. বৈধ পার্থিব বিষয়ে তাদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া, কিন্তু অন্তরে তাদের সাথে মিল রাখার কোনোরূপ চিন্তা থাকবে না; বরং পার্থিব প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা উদ্দেশ্য হবে। এটা জায়িজ ও মুবাহ।

১৭৯. আল-ফাতাওয়াল কুবরা : ৫/৫৩৯-৫৪০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ - ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾

'নিশ্চয় যারা তাদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এ জন্য যে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে, তারা তাদের বলে, "আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদের কথা মান্য করব।" আর আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্বন্ধে অবগত আছেন।'[১৮০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জালিমদের পথ প্রদর্শন করেন না।'[১৮১]

'আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করল, সে তাদেরই একজন।'[১৮২]

১৮০. সুরা মুহাম্মাদ : ২৫-২৬
১৮১. সুরা আল-মায়িদা : ৫১
১৮২. সুনানু আবি দাউদ : ৪/৪৪, হা. নং ৪০৩১ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

মুল্লা আলি কারি ﵀ বলেন :

(مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ) : أَيْ مَنْ شَبَّهَ نَفْسَهُ بِالْكُفَّارِ مَثَلًا فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، أَوْ بِالْفُسَّاقِ أَوِ الْفُجَّارِ أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّفِ وَالصُّلَحَاءِ الْأَبْرَارِ. (فَهُوَ مِنْهُمْ) : أَيْ فِي الْإِثْمِ وَالْخَيْرِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا عَامٌّ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَالشِّعَارِ، وَلِمَا كَانَ الشِّعَارُ أَظْهَرُ فِي التَّشَبُّهِ ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ. قُلْتُ: بَلِ الشِّعَارُ هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّشَبُّهِ لَا غَيْرُ، فَإِنَّ الْخُلُقَ الصُّورِيَّ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ التَّشَبُّهُ، وَالْخُلُقَ الْمَعْنَوِيَّ لَا يُقَالُ فِيهِ التَّشَبُّهُ، بَلْ هُوَ التَّخَلُّقُ.

'"যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে" অর্থাৎ যে ব্যক্তি পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কাফিরদের সাথে নিজেকে সাদৃশ্যপূর্ণ করবে, অথবা ফাসিক-ফুজ্জার কিংবা বুজুর্গ ও নেক বান্দাদের সাথে, "তাহলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।" অর্থাৎ গুনাহ ও সাওয়াবের ক্ষেত্রে। আল্লামা তিবি ﵀ বলেন, এটা আকৃতি, স্বভাব ও ধর্মীয় প্রতীক সবগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর ধর্মীয় প্রতীক সাদৃশ্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে অধিক স্পষ্ট হওয়ায় হাদিসটি এ অধ্যায়ে আনা হয়েছে। (মুল্লা আলি কারি ﵀ বলেন) "আমি বলব, বরং এখানে শুধু প্রতীকই উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নয়। কেননা, আকৃতিগত রূপে সাদৃশ্য অবলম্বন অসম্ভব। আর অভ্যন্তরীণ স্বভাব-চরিত্রের ক্ষেত্রে তো সাদৃশ্য অবলম্বন বলা হয় না; বরং বলা হয় স্বভাব গ্রহণ।"'[১৮৩]

আল্লামা মুনাবি ﵀ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন :

أَيْ تَزَيَّا فِيْ ظَاهِرِهِ بِزِيِّهِمْ وَفِيْ تَعَرُّفِهِ بِفِعْلِهِمْ وَفِيْ تَخَلُّقِهِ بِخُلُقِهِمْ وَسَارَ بِسِيْرَتِهِمْ وَهَدْيِهِمْ فِيْ مَلْبَسِهِمْ وَبَعْضِ أَفْعَالِهِمْ.

১৮৩. মিরকাতুল মাফাতিহ : ৭/২৭৮২, হা. নং ৪৩৪৭ সংশ্লিষ্ট আলোচনা (দারুল ফিকর, বৈরুত)

'অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে তাদের ফ্যাশনের মতো, চলাফেরায় তাদের কর্মের মতো ও স্বভাব-চরিত্রে তাদের আচার-আচরণের মতো সাজ গ্রহণ করে। আর বেশ-ভূষা ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের আদর্শ-কালচার অনুসরণ করে।'[১৮৪]

শাইখিজাদা দামাদে আফিন্দি ﵀ বলেন :

وَيَكْفُرُ بِوَضْعِ قَلَنْسُوَةِ الْمَجُوسِ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَّا لِتَخْلِيصِ الْأَسِيرِ أَوْ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَقِيلَ إِنْ قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ يَكْفُرُ وَكَذَا شَدُّ الزُّنَّارِ فِي وَسَطِهِ.

'বিশুদ্ধ মতানুসারে মাথায় অগ্নিপূজারিদের টুপি পরিধান করার দ্বারা কাফির হয়ে যাবে। তবে বন্দীকে মুক্তি করার জন্য, বা কারও মতে গরম-ঠান্ডা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে হলে সমস্যা নেই। আর কারও মতে এতে যদি কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপ কোমরে জুন্নার (বিজাতিদের ধর্মীয় বিশেষ ফিতা) বাঁধলেও কাফির হয়ে যাবে।'[১৮৫]

ইমাম নববি ﵀ বলেন :

وَلَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ، كَفَرَ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ وَضَعَ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ عَلَى رَأْسِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكْفُرُ، وَلَوْ شَدَّ عَلَى وَسَطِهِ حَبْلًا، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَا زُنَّارٌ، فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ، وَلَوْ شَدَّ عَلَى وَسَطِهِ زُنَّارًا، وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ لِلتِّجَارَةِ، كَفَرَ، وَإِنْ دَخَلَ لِتَخْلِيصِ الْأُسَارَى، لَمْ يَكْفُرْ.

'কোমরে জুন্নার (বিজাতিদের ধর্মীয় ফিতা) বাঁধলে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মাথায় অগ্নিপূজারিদের টুপি পরিধান করবে, তার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম মতভেদ করেছেন। তবে বিশুদ্ধ

১৮৪. ফাইজুল কাদির : ৬/১০৪ (আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতিল কুবরা, মিশর)
১৮৫. মাজমাউল আনহুর : ১/৬৯৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

মত হলো, সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোমরে কোনো ফিতা বাঁধে, অতঃপর তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তরে বলল, এটা জুন্নার; তাহলে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোমরে জুন্নার বেঁধে সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে দারুল হারবে প্রবেশ করে, তবুও সে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি বন্দীদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যায়, তাহলে কাফির হবে না।'[১৮৬]

এগারো. কাফিরদের দেশে বসবাস বা সফর করা

কাফিরদের দেশে যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলাম পালনের সুযোগ না থাকে, ইসলামের সব শিআর প্রকাশের অনুমোদন না থাকে, তাহলে স্বেচ্ছায় সে দেশে মুসলমানদের জন্য বসবাস করা হারাম। আর যদি পুরোপুরিভাবে ইসলাম পালন ও শিআর প্রকাশের সুযোগ থাকে, তাহলে কাফিরদের প্রতি অন্তরে পূর্ণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ রেখে বসবাস করা জায়িজ হলেও তা নিরাপদ ও উত্তম নয়। তবে শরয়ি কোনো কল্যাণের উদ্দেশ্য থাকলে সে ক্ষেত্রে থাকাটাই বরং উত্তম। যেমন : অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া, দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া বা ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি। আর ওই সব দেশে সফর করার ক্ষেত্রে নীতি হলো, প্রয়োজন ছাড়া বিনোদন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের দেশে যাওয়াও নাজায়িজ। কেননা, এতে কোনো প্রয়োজন ছাড়াই নিজের দ্বীন ও চরিত্রকে আশঙ্কার মুখে ফেলা হয়। তবে দ্বীনি বা পার্থিব বৈধ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবে। যেমন : চিকিৎসা, ব্যবসা, বৈধ শিক্ষা, দ্বীনের দাওয়াত ইত্যাদি। তবে এর বৈধতার জন্য তিনটি শর্ত আছে। এক. তার দ্বীনের ব্যাপারে এতটুকু জ্ঞান থাকতে হবে, যদ্দরুন সে দ্বীনের ব্যাপারে সংশয়ে পড়া থেকে বাঁচতে পারে। দুই. তার এতটুকু চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে সে সকল অশ্লীলতা ও নোংরামি থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে। তিন. সে দেশে পূর্ণভাবে দ্বীন পালন করার স্বাধীনতা থাকতে হবে।

১৮৬. রাওজাতুত তালিবিন : ১০/৬৯ (আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا. ﴾

'যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়াতে অসহায় ছিলাম। তারা প্রত্যুত্তরে বলেন, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও খুঁজে পায় না, আল্লাহ অচিরেই তাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।'[১৮৭]

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ

'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতির ওপর আজাব অবতীর্ণ করেন, তাদের মধ্যে যারাই আছে, সবাইকে সেই আজাব গ্রাস করে। অতঃপর তাদের (ভালো-মন্দ)আমলের ভিত্তিতে তাদের পুনরুত্থান করা হবে।'[১৮৮]

১৮৭. সুরা আন-নিসা : ৯৭-৯৯
১৮৮. সহিহুল বুখারি : ৯/৫৬, হা. নং ৭১০৮ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

ইবনে হাজার আসকালানি ﵀ বলেন :

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا مَشْرُوعِيَّةُ الْهَرَبِ مِنَ الْكُفَّارِ وَمِنَ الظَّلَمَةِ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ مَعَهُمْ مِنْ إِلْقَاءِ النَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ هَذَا إِذَا لَمْ يُعِنْهُمْ وَلَمْ يَرْضَ بِأَفْعَالِهِمْ فَإِنْ أَعَانَ أَوْ رَضِيَ فَهُوَ مِنْهُمْ وَيُؤَيِّدُهُ أَمْرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْرَاعِ فِي الْخُرُوجِ مِنْ دِيَارِ ثَمُودَ

'এ হাদিস থেকে কাফির ও জালিমদের কাছ থেকে পালানোর শরয়ি অনুমোদন বুঝা যায়। কারণ, তাদের সাথে বসবাস করা নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করার নামান্তর। এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন সে তাদের (তাদের) সাহায্য করবে না এবং তাদের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হবে না। কিন্তু যদি সে তাদের সাহায্য করে অথবা তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তবে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। সামুদের জনপদ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান এ কথারই সমর্থন করে।'[১৮৯]

জারির বিন আব্দুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

'আমি প্রত্যেক ওই মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে।'[১৯০]

ইমাম আবু মুহাম্মাদ বিন হাজাম ﵀ এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّ مَنْ لَحِقَ بِدَارِ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ مُخْتَارًا مُحَارِبًا لِمَنْ يَلِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ بِهَذَا الْفِعْلِ مُرْتَدٌّ لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ كُلُّهَا:

১৮৯. ফাতহুল বারি : ১৩/৬১, (দারুল মারিফা, বৈরুত)
১৯০. সুনানু আবি দাউদ : ৩/৪৫, হা. নং ২৬৪৫ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

مِنْ وُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، مَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ، وَمِنْ إِبَاحَةِ مَالِهِ، وَانْفِسَاخِ نِكَاحِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَبْرَأْ مِنْ مُسْلِمٍ. وَأَمَّا مَنْ فَرَّ إِلَى أَرْضِ الْحَرْبِ لِظُلْمٍ خَافَهُ، وَلَمْ يُحَارِبْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا أَعَانَهُمْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَجِدْ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُجِيرُهُ، فَهَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ مُكْرَهٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شَهَابٍ: كَانَ عَازِمًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ مَاتَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ، لِأَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ نَذَرَ دَمَهُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَهُوَ كَانَ الْوَالِي بَعْدَ هِشَامٍ فَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ مَعْذُورٌ. وَكَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ بِأَرْضِ الْهِنْدِ، وَالسِّنْدِ، وَالصِّينِ، وَالتُّرْكِ، وَالسُّودَانِ وَالرُّومِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ هُنَالِكَ لِثِقَلِ ظَهْرٍ، أَوْ لِقِلَّةِ مَالٍ، أَوْ لِضَعْفِ جِسْمٍ، أَوْ لِامْتِنَاعِ طَرِيقٍ، فَهُوَ مَعْذُورٌ. فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ مُعِينًا لِلْكُفَّارِ بِخِدْمَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ: فَهُوَ كَافِرٌ - وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقِيمُ هُنَالِكَ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، وَهُوَ كَالذِّمِّيِّ لَهُمْ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اللِّحَاقِ بِجَمْهَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْضِهِمْ، فَمَا يَبْعُدُ عَنْ الْكُفْرِ، وَمَا نَرَى لَهُ عُذْرًا - وَنَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ فِي طَاعَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ مِنْ الْغَالِيَةِ؛ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، لِأَنَّ أَرْضَ مِصْرَ وَالْقَيْرَوَانِ، وَغَيْرَهُمَا، فَالْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ، وَوُلَاتُهُمْ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ لَا يُجَاهِرُونَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْإِسْلَامِ، بَلْ إِلَى الْإِسْلَامِ يَنْتَمُونَ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهِمْ كُفَّارًا. وَأَمَّا مَنْ سَكَنَ فِي أَرْضِ الْقَرَامِطَةِ مُخْتَارًا فَكَافِرٌ بِلَا شَكٍّ، لِأَنَّهُمْ مُعْلِنُونَ بِالْكُفْرِ وَتَرْكِ الْإِسْلَامِ - وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا مَنْ سَكَنَ فِي بَلَدٍ تَظْهَرُ فِيهِ بَعْضُ الْأَهْوَاءِ الْمُخْرِجَةِ إِلَى الْكُفْرِ، فَهُوَ لَيْسَ بِكَافِرٍ، لِأَنَّ اسْمَ الْإِسْلَامِ هُوَ الظَّاهِرُ هُنَالِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مِنْ التَّوْحِيدِ، وَالْإِقْرَارِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - وَالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَسَائِرِ الشَّرَائِعِ الَّتِي هِيَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ - وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» يُبَيِّنُ مَا قُلْنَاهُ، وَأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ، وَإِلَّا فَقَدْ اسْتَعْمَلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عُمَّالَهُ عَلَى خَيْبَرَ، وَهُمْ كُلُّهُمْ يَهُودُ. وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي مَدَائِنِهِمْ لَا يُمَازِجُهُمْ غَيْرُهُمْ فَلَا يُسَمَّى السَّاكِنُ فِيهِمْ - لِإِمَارَةٍ عَلَيْهِمْ، أَوْ لِتِجَارَةٍ - بَيْنَهُمْ: كَافِرًا، وَلَا مُسِيئًا، بَلْ هُوَ مُسْلِمٌ حَسَنٌ، وَدَارُهُمْ دَارُ إِسْلَامٍ، لَا دَارُ شِرْكٍ، لِأَنَّ الدَّارَ إِنَّمَا تُنْسَبُ لِلْغَالِبِ عَلَيْهَا، وَالْحَاكِمُ فِيهَا، وَالْمَالِكُ لَهَا. وَلَوْ أَنَّ كَافِرًا مُجَاهِرًا غَلَبَ عَلَى دَارٍ مِنْ دُورِ الْإِسْلَامِ، وَأَقَرَّ الْمُسْلِمِينَ بِهَا عَلَى حَالِهِمْ، إِلَّا أَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ لَهَا، الْمُنْفَرِدُ بِنَفْسِهِ فِي ضَبْطِهَا، وَهُوَ مُعْلِنٌ بِدِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ لَكَفَرَ بِالْبَقَاءِ مَعَهُ كُلُّ مَنْ عَاوَنَهُ، وَأَقَامَ مَعَهُ - وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ - لِمَا ذَكَرْنَا.

'সুতরাং এ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ হয় যে, যে ব্যক্তি নিকটবর্তী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে স্বেচ্ছায় দারুল কুফরে যোদ্ধা হিসাবে চলে যায়, সে তার এই অপরাধের কারণে মুরতাদ হয়ে যায়। তার ওপর মুরতাদের সব হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন : গ্রেফতার করতে সক্ষম হলে তাকে হত্যা করা, তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, বিয়ে ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো মুসলমান থেকে দায়িত্বমুক্তির ঘোষণা করেননি। আর যে ব্যক্তি নিজের ওপর জুলুমের আশঙ্কায় দারুল হারবে পলায়ন করে, আর সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে না, তাদের বিপরীতে কাফিরদের সাহায্যও করে না এবং মুসলমানদের মধ্যে এমন কাউকে পায় না, যে তাকে আশ্রয় দেবে, তাহলে এতে তার কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, সে অপারগ ও বাধ্য। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম জুহরি রহ. এ সংকল্প

করেছিলেন যে, খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক মারা গেলে তিনি রোমে চলে যাবেন। কেননা, ওলিদ বিন ইয়াজিদ ক্ষমতা পেলে তাঁকে হত্যা করার মান্নত করেছিল। আর হিশামের পর সেই ছিল (পূর্ব-নির্ধারিত) খলিফা। অতএব, যার অবস্থা এমন হবে, তাকে মাজুর বা ক্ষমাযোগ্য ধরা হবে। তেমনই যেসব মুসলমান ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, তুরস্ক, সুদান, ইতালি ইত্যাদি রাষ্ট্রে বসবাস করে, সে যদি বার্ধক্য, দারিদ্র্য, অসুস্থতা বা দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির কারণে চলে আসতে সক্ষম না হয়, তাকে মাজুর হিসাবে গণ্য করা হবে। সে যদি সেখানে কাফিরদের খিদমত, লেখালেখি ইত্যাদির মাধ্যমে মদদ দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে সেও কাফির বলে গণ্য হবে। আর যদি সে দারুল হারবে দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে আসে এবং তাদের কাছে জিম্মির মতো হয়ে থাকে; অথচ সে মুসলিম সমাজ বা দেশে চলে আসতে সক্ষম, তাহলে সে কুফর থেকে দূরে নয় এবং আমরা তার কোনো ওজর আছে বলে মনে করি না। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে মুক্তি কামনা করছি। তবে কুফরকারী শাসক তথা সীমালঙ্ঘনকারী ও এ জাতীয় শাসকদের আনুগত্যে যারা বসবাস করবে, তারা তাদের (কাফিরদের কুফরি রাষ্ট্রে বসবাসকারীদের) মতো নয়। কেননা, মিশর, কাইরাওয়ান প্রমুখ অঞ্চলে ইসলামই বিজয়ী এবং সবকিছুর পরও এসব দেশের শাসকরা প্রকাশ্যে ইসলাম থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়নি; বরং তারা ইসলামের সাথেই সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি করে। যদিও তাদের কর্মের বাস্তবতায় তারা কাফির। তবে যারা স্বেচ্ছায় কারামতিদের[১৯১] দেশে বসবাস করবে, তারা নিঃসন্দেহে কাফির। কেননা, তারা প্রকাশ্যে কুফর ও ইসলাম পরিত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর যে ব্যক্তি এমন দেশে বসবাস করবে, যেখানে কুফরি পর্যায়ের কিছু প্রবৃত্তিপূজা প্রকাশ পায়, তাহলে সে (বসবাসকারী) কাফির হবে না। কেননা, সর্বাবস্থায় সেখানে তাওহিদের অস্তিত্ব, মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের

---

১৯১. শিয়াদের মধ্যে অত্যন্ত উগ্র ও নিকৃষ্ট একটি দলের নাম। এদের নেতা আবু তাহির কারামতি সে-ই নরাধম, যে ৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা আক্রমণ করে এবং অসংখ্য হাজিদের হত্যা করে হাজরে আসওয়াদ পাথর চুরি করে নিয়ে যায়। প্রায় বাইশ বছর পর তা পুনরায় যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়।

স্বীকৃতি, ইসলাম ভিন্ন অন্য সব ধর্ম থেকে মুক্ত ঘোষণা, নামাজ প্রতিষ্ঠা, রমজানের রোজা রাখা এবং ইসলাম ও শরিয়তের সকল বিষয় থাকার ভিত্তিতে ইসলামই বিজয়ী। আর সকল প্রশংসা সারা জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী "আমি প্রত্যেক ওই মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে" আমাদের কথাকে স্পষ্ট করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ এদ্বারা এখানে দারুল হারব উদ্দেশ্য নিয়েছেন। নইলে তো রাসুলুল্লাহ ﷺ খাইবারে তাঁর দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন; অথচ ওখানকার সব অধিবাসীই ইহুদি ছিল। যখন জিম্মিগণ তাদের শহরে থাকবে এবং তাদের সাথে অন্যরা মেলামেশা করবে না, তাহলে মুসলামানদের কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণে তথায় বসবাসকারী (মুসলিম) ব্যক্তিকে কাফিরও বলা যাবে না, গুনাহগারও বলা যাবে না; বরং সে একজন উত্তম মুসলমান। তাদের বসবাসের স্থানকে দারুল ইসলাম বলা হবে, দারুশ শিরক (দারুল হারব) নয়। কেননা, কোনো দেশের বিজয়ী, শাসক ও মালিকের ভিত্তিতেই (দারুল ইসলাম বা দারুল হারব বলে) দেশের নাম নির্ধারিত হয়। কোনো প্রকাশ্য কাফির যদি দারুল ইসলামের কোনো এলাকা দখল করে নেয় এবং মুসলমানদেরকে তাদের আপন অবস্থায় বহাল রাখে, সে উক্ত এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে এবং নিজেকে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করে, তাহলে তাতে অবস্থানকারী যে-ই তাকে সাহায্য করবে এবং তার সাথে থাকবে, সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে; যদিও সে (নাগরিক) নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করুক।'[১৯২]

বারো. কাফিরদের উৎসবে শরিক হওয়া

কাফিরদের ধর্মীয় বা আনন্দ উৎসবে মুসলমানদের শরিক হওয়া, অনুরূপ এতে কোনো ধরনের সাহায্য করা বা একে অপরকে অভিনন্দন জানানো কিছুতেই জায়িজ নয়। সুতরাং কাফিরদের শিআর ও শিরকি কর্মকাণ্ডের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে শরিক হওয়া স্পষ্ট কুফর। আর মনে ঘৃণা রেখে এমনিই কৌতূহলবশত শরিক হওয়া হারাম।

১৯২. আল-মুহাল্লা, ইবনু হাজাম ১২/১২৫-১২৬ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾

'আর যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং অসার কার্যকলাপের সম্মুখীন হলে আপন মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে।'[১৯৩]

তাবিয়িনে কিরামের অনেকেই এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুশরিকদের ধর্মীয় দিবস ও আনন্দ উৎসবে না যাওয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ এটি মুমিনদের একটি বৈশিষ্ট্য যে, তারা মুশরিকদের উৎসবে যোগদান করবে না।

আল্লামা ইবনে কাসির ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ صِفَاتِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، قِيلَ: هُوَ الشِّرْكُ وَعِبَادَةُ الْأَصْنَامِ، وَقِيلَ الْكَذِبُ والفسق والكفر واللغو والباطل، وقال محمد ابن الحنفية: هو اللغو والغناء. وقال أبو العالية وطاوس وابن سِيرِينَ وَالضَّحَّاكُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُمْ: هِيَ أَعْيَادُ الْمُشْرِكِينَ.. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، هِيَ مَجَالِسُ السُّوءِ وَالْخَنَا. وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: شُرْبُ الْخَمْرِ لَا يَحْضُرُونَهُ وَلَا يَرْغَبُونَ فِيهِ.

'এটাও রহমানের বান্দাদের একটি গুণ যে, তারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না। কারও মতে এখানে الزُّورَ এর অর্থ শিরক ও মূর্তিপূজা। কারও মতে এর অর্থ মিথ্যা, পাপাচার, কুফর, বেহুদা ও বাতিল কর্মকাণ্ড। মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া ﷺ বলেন, এর অর্থ অসার কাজ ও গানবাজনা। আবুল আলিয়া ﷺ, তাউস ﷺ, ইবনে সিরিন ﷺ, জাহহাক ﷺ, রবি বিন আনাস ﷺ-সহ অনেকেই বলেছেন, এর অর্থ মুশরিকদের ধর্মীয় দিবস ও আনন্দ উৎসব। আমর বিন কাইস ﷺ-এর মতে, এর অর্থ অশ্লীল ও মন্দ মজলিস। মালিক ﷺ জুহরি ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, এর অর্থ মদপান। তারা এতে উপস্থিত হতো না এবং এতে আকর্ষণবোধও করত না।'[১৯৪]

১৯৩. সুরা আল-ফুরকান : ৭২
১৯৪. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৬/১১৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

مَنْ بَنَى بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি অনারব তথা অমুসলিম দেশে বাসস্থান নির্মাণ করে এবং তাদের নওরোজ ও মেহেরজান[১৯৫] উৎসব পালন করে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, অতঃপর এ অবস্থার ওপরই তার মৃত্যু হয়, তাহলে ওই সব কাফিরদের সাথেই তার হাশর হবে।'[১৯৬]

তাদের সাথে ধর্মীয় ও আনন্দ উৎসবে যোগদান মানে তাদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা, তাদের কর্মকে সমর্থন করা; অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে বারণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ. ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও; অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসুল ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখো।'[১৯৭]

১৯৫. নওরোজ ও মেহেরজান ইরানের অগ্নিপূজারীদের বিশেষ দুটি উৎসব দিবস ছিল। এতে বিভিন্ন শিরকি ও কুফরি কর্মকাণ্ড থাকার পাশাপাশি তা বিজাতীয় ঐতিহ্য হওয়ায় মুসলমানদের জন্য তা পালন করা ও তাতে অংশগ্রহণ করার নিষিদ্ধ।

১৯৬. আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৯/৩৯২, হা. নং ১৮৮৬৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

১৯৭. সুরা আল-মুমতাহিনা : ০১

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾

'যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে তাদের আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি গোষ্ঠী হয়।'[১৯৮]

এ ছাড়াও এতে শরিক হওয়ার দ্বারা তাদের কুফরি ও মন্দ কাজে সহযোগিতা পাওয়া যায়। অথচ কুরআনে আল্লাহর অবাধ্যতা ও মন্দ কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ

'আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো এবং পাপ সীমালঙ্ঘনে এক অপরকে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শাস্তিদানে কঠোর।'[১৯৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির ﷺ বলেন :

يَأْمُرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَهُوَ الْبِرُّ، وَتَرْكِ الْمُنْكِرَاتِ وَهُوَ التَّقْوَى وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَّنَاصُرِ عَلَى الْبَاطِلِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْمَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ

'আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে উত্তম তথা সৎকর্ম করার এবং অসৎকর্ম পরিত্যাগ তথা তাকওয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে একে

১৯৮. সুরা আল-মুজাদালা : ২২

১৯৯. সুরা আল-মায়িদা : ০২

অপরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর ভ্রান্ত কাজে পরস্পরকে সাহায্য এবং পাপ ও হারাম কাজে একে অপরকে সহায়তা করতে নিষেধ করছেন।'[২০০]

তেরো. কাফিরদের জন্য রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করা

কাফিরদের জন্য রহমত ও ক্ষমার প্রার্থনা করা হারাম। মৃত কাফির হলে তো বিষয়টি পরিষ্কার। আর জীবিত হলে তার জন্য শুধু হিদায়াতের দুআ করা যাবে। তবে মাগফিরাত বা রহমতের দুআ করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হলো, হিদায়াতের অর্থে মাগফিরাত বা রহমতের দুআও করা যেতে পারে, সরাসরি মাগফিরাত বা রহমতের অর্থে নয়। অর্থাৎ জীবিত কোনো কাফিরের ব্যাপারে যখন এ দুআ করা হবে যে, "হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করো, তাকে রহম করো।" তখন এর অর্থ হবে, হিদায়াত দিয়ে তাকে ক্ষমা করো এবং রহম করো। এমন অর্থ উদ্দেশ্য না নিয়ে সরাসরি ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা জায়িজ হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾

'আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবি ও মুমিনদের জন্য সংগত নয়, যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামের অধিবাসী।'[২০১]

আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নাসির সাদি ﷺ বলেন :

يعني: ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به {أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} أي: لمن كفر به، وعبد معه غيره {وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} فإن الاستغفار لهم في

২০০. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৩/১০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
২০১. সুরা আত-তাওবা : ১১৩

هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بالنبي والمؤمنين، لأنهم إذا ماتوا على الشرك، أو علم أنهم يموتون عليه، فقد حقت عليهم كلمة العذاب، ووجب عليهم الخلود في النار، ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين، ولا استغفار المستغفرين. وأيضا فإن النبي والذين آمنوا معه، عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، ويوالوا من والاه الله، ويعادوا من عاداه الله، والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك، مناقض له.

'অর্থাৎ নবি ও মুমিনদের জন্য সমীচীন নয় যে, "মুশরিকদের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।" যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সাথে অন্যেরও উপাসনা করেছে। "আত্মীয়-স্বজন হলেও নয়, যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামের অধিবাসী।" কেননা, এ অবস্থায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার দ্বারা কোনো লাভ নেই। অতএব, নবি ও মুমিনদের জন্য এমনটা করা উচিত হবে না। কেননা, তারা যখন শিরকের ওপর মারা গেছে কিংবা কোনোভাবে জানা গেছে যে, তারা শিরকের ওপরই মরবে, তখন তাদের জন্য আল্লাহর আজাব অবধারিত হয়ে যাবে। তাদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে গেছে। সুপারিশকারীদের সুপারিশ ও ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা প্রার্থনা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। এ ছাড়াও নবি ﷺ ও মুমিনগণের ওপর আবশ্যকীয় করণীয় হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারে স্বীয় রবের সিদ্ধান্তে সম্মতি জানানো, আল্লাহ যাকে বন্ধু বানিয়েছেন তাকে বন্ধু বানানো এবং আল্লাহ যাকে শত্রু ঘোষণা করেছেন তাকে শত্রু জ্ঞান করা। আর কারও জাহান্নামি হয়ে যাওয়া স্পষ্ট হওয়ার পরও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এর (আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার) সাথে সাংঘর্ষিক ও বিপরীত।"[২০২]

২০২. তাফসিরুস সাদি : ৩৫৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

আল্লাহর রাসুল ﷺ তো জীবিত কাফিরদের জন্যও অনুগ্রহ ও ক্ষমার দুআ করেননি; বরং তাদের হিদায়াতের দুআ করেছেন। অতএব, মৃত কাফিরদের জন্য দুআ করার কোনোই অবকাশ নেই। আবু মুসা আশআরি رضي الله عنه বলেন :

﴿ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ﴾

'ইহুদিরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এসে হাঁচি দিত এবং এ আশা করত যে, তিনি তাদের হাঁচির জবাবে বলবেন, "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন)। কিন্তু তিনি বলতেন, "ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম" (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন)।'[২০৩]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন :

(وَأَمَّا) الصَّلَاةُ عَلَى الْكَافِرِ وَالدُّعَاءُ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ فَحَرَامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعِ

'আর কাফিরের জানাজার নামাজ পড়া এবং তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করা কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য ও ইজমার ভিত্তিতে হারাম।'[২০৪]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন :

فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ لِلْكُفَّارِ لَا يَجُوزُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ

'কেননা, কাফিরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে নাজায়িজ।'[২০৫]

---

২০৩. সুনানুত তিরমিজি : ৪/৩৭৯, হা. নং ২৭৩৯ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত)-হাদিসটি সহিহ।

২০৪. আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব : ৫/১৪৪ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

২০৫. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ১২/৪৮৯ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

হাফিজ বদরুদ্দির আইনি رحمه الله বলেন :

فَإِن قلت: جَاءَ فِي حَدِيث آخر: اغْفِر لقومي فَإِنَّهُم لَا يعلمُونَ. قلت: مَعْنَاهُ: إهدهم إِلَى الْإِسْلَام الَّذِي تصح مَعَه الْمَغْفِرَة، لِأَن ذَنْب الْكفْر لَا يغْفر، أَو يكون الْمَعْنى: اغْفِر لَهُم إِن أَسْلمُوا.

'যদি প্রশ্ন করা হয়, এক হাদিসে তো এভাবে এসেছে, "হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা করুন। কেননা, তারা জানে না।" তাহলে উত্তরে বলব, এর অর্থ হলো, তাদেরকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করুন, যদ্দরুন তাদের মাগফিরাত করা যায়। যেহেতু কুফরের গুনাহ তো মাফ করা হয় না। অথবা এর অর্থ এমন হবে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের ক্ষমা করুন।'[২০৬]

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর সারকথা

এক. কাফিরদের সাথে অন্তরঙ্গ বা বন্ধুত্বমূলক কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না। চাই দ্বীনি বিষয়ে হোক বা পার্থিব বিষয়ে। তবে হ্যাঁ, পার্থিব জরুরত ও লেনদেন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের সাথে প্রয়োজন-মাফিক উঠাবসা করা যাবে।

দুই. কাফিরদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ লালন করতে হবে। তাদেরকে আল্লাহ, রাসুল, দ্বীন ও মুসলমানদের শত্রু জ্ঞান করতে হবে। দ্বীনি বিষয়ে তাদের প্রতি সামান্য নমনীয়তাও দেখানো যাবে না।

তিন. মুসলমানদের বিপরীতে কাফিরদের কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করা যাবে না। আর্থিক, সামরিক, আদর্শিক কোনোভাবেই না।

চার. দ্বীন নিয়ে কাফিরদের হাসি-ঠাট্টা ও বিরোধিতার বৈঠকে অংশগ্রহণ করা যাবে না। এমন মজলিস, হলরুম বা সংসদ অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

---

২০৬. উমদাতুল কারি : ২৩/১৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

পাঁচ. কাফিরদের নিঃশর্ত অনুসরণ করা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হবে।

ছয়. কাফিরদেরকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ, উল্লেখযোগ্য বা সম্মানযোগ্য কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

সাত. একান্ত দ্বীনি বা পার্থিব প্রয়োজন ছাড়া কাফিরদের দেশে বসবাস বা সফর করা যাবে না।

আট. কাফিরদের ধর্মীয় পোশাক-আশাক, কালচার ও চলাফেরার সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

নয়. কাফিরদের ধর্মীয় বা কোনো আনন্দ উৎসবে যোগ দেওয়া যাবে না এবং এ উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানানো যাবে না।

দশ. কাফির থাকাবস্থায় তাদের জন্য রহমত ও ক্ষমার দুআও করা যাবে না। মারা গেলে একেবারেই না। আর জীবিত থাকলে শুধু হিদায়াতের দুআ করা যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি শরিয়াব্যবস্থা

প্রাককথন

ইসলামি শরিয়ত মানবজীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করেছে। চারিত্রিক ও মানসিক, ব্যক্তিক ও পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়, রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক—সকল বিষয়েই রয়েছে এর পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। এতে রয়েছে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনের সকল সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান।

কিছু অজ্ঞদের মুখে শোনা যায়, ইসলামে ইবাদত-বিষয়ক কিছু নিয়ম-কানুন ছাড়া সামগ্রিক জীবনের ক্ষেত্রে বিধিবিধান বলতে কিছু নেই! এটা তাদের বুদ্ধিহীনতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। একমাত্র পথভ্রষ্ট, ধোঁকাগ্রস্ত, মিথ্যুক ও প্রতারক লোকেরাই এমন জঘন্য মন্তব্য করতে পারে। বাস্তবতা হচ্ছে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ইসলামের পরিব্যাপ্তি, বিস্তৃতি, বিশালতা ও প্রসারতার কথা অমুসলিম দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও গবেষকরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

‘এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরিয়তের ওপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।’[২০৭]

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছে। এমন কোনো বিষয় নেই, যা নিয়ে ইসলাম সুন্দরতম সমাধান দান করেনি; হোক তা মৌলিক, শাখাগত বা ছোট-খাটো কোনো বিষয়। যেমন : এক মুমিন অপর মুমিনের ব্যাপারে কী ধারণা লালন করে-না করে—এমন সূক্ষ্ম বিষয়কেও ইসলাম গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছে। কারও সাথে রাগান্বিত হলে অহংকার ও আত্মগরিমা পরিত্যাগ করে কীভাবে পরস্পর

২০৭. সুরা আল-জাসিয়া : ১৮

মিল-মহব্বত সৃষ্টি করা যায়, তার প্রতিও ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। কারও অনুপস্থিতিতে তার গিবত না করার বিষয়টিকেও ইসলাম নজরে রেখেছে। মসজিদে যাওয়ার সময় দ্রুত, ধীরে নাকি মাঝামাঝি গতিতে হাঁটবে, তাও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে খাবে না বসে খাবে, সে বিষয়টির বর্ণনাদানেও ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার পর দারিদ্র্য বা বিপদের ভয়ে বন্ধুর সাথে গোপন আলাপ করা যাবে কি যাবে না, এ বিষয়টিকেও ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে।

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিজীবনেরও কোনো কিছুকে বাদ দেয়নি। যেমন : পারিবারিক প্রথা, বিবাহ-শাদি, তালাকব্যবস্থা, অন্যের সাথে আচার-আচরণের আদব। এভাবে ফৌজদারি নিয়েও ইসলামের রয়েছে পূর্ণ বিধান। যেমন : হুদুদ, কিসাস ও তাজির। বেসামরিক লেনদেন নিয়েও ইসলাম আলোচনা করেছে। যেমন : বেচাকেনা, ভাড়া প্রদান, ঋণ আদান-প্রদান ইত্যাদি। এ আলোচনাগুলো আমরা সবিস্তরে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে করব ইনশাআল্লাহ।

মূলত ইসলামি জীবনব্যবস্থা একটি মহাসমুদ্রের মতো, যার মধ্যে সমগ্র বিশ্ববাসী সাঁতার কাটতে পারে। মানবজীবনের এমন কোন সমস্যা পাওয়া যাবে না, যার সুষ্ঠ ও সঠিক সমাধান ইসলামে নেই। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মনোনীত একমাত্র সত্য ধর্ম হলো ইসলাম। আর ইসলামের মাঝেই রয়েছে মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তি।

দেহ ও রূহের মাঝে সম্পর্ক

মানুষের সত্তা দুটি রূপের সমন্বয়ে গঠিত। ১. দৈহিক রূপ। ২. আত্মিক রূপ।

দৈহিক রূপ

মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত রূপকে দৈহিক রূপ বলে। এটি মানুষের একটি মূল উপাদান, যা ব্যতীত তার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। দৈহিক এ রূপটির জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এই শরীরকে রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করা, তাকে উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করানো, প্রয়োজনমাফিক খাবার সরবরাহ করা কর্তব্য। এ ছাড়াও দেহের নানাবিধ চাহিদা পূরণ করাও অপরিহার্য। যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে দেহ ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়ে যায়।

আত্মিক রূপ

মানুষ স্বভাবগতভাবে একটি ধর্মকে আপন করে নিতে চায়। এটি প্রত্যেক মানুষের স্বভাবের সাথে মিশে আছে। অতীত ও বর্তমানে এ বাস্তবতার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। প্রাচীনকালে প্রত্যেক সমাজে যেমনই হোক না কেন, তাদের উপাসনা করার জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট করা থাকত। স্বভাবগতভাবেই যুগে যুগে সকল সভ্যতার মানুষ এই কাজটি করেছে। তাই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ধর্মপ্রাণ।

স্বভাব ও গঠনের দিক থেকে মানুষ দুধরনের।

প্রথম প্রকার হলো, বস্তুগত। ভারত্ব বা ওজন আছে এমন। যা রক্ত, শিরা, হাড়, গোশত ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, আত্মিক। মানব হৃদয়ের গভীরে যার স্থান। মানুষ তা উপলব্ধি করে। এই আত্মা মানুষকে চালিকাশক্তির মতো পরিচালিত করে। এটিই মানুষের মধ্যে মায়া-মমতা, ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও প্রশান্তি ছড়িয়ে দেয় এবং বিভিন্ন সক্ষমতা দান করে, যা মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। দয়া, ভালোবাসা, সততা, নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, আত্মত্যাগ, উদারতা, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি এ আত্মিকতার এক একটি রূপ।

মানব গঠনের এই দুটি উপাদান একটি অপরটির পরিপূরক। তারা পরস্পর একসাথে মিলে পূর্ণতা লাভ করে। একটি ছাড়া অপরটি অচল। যেমন রাত-দিন ও নর-নারী, একটি অপরটির মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়।

মানবজীবনে এই বস্তুগত শরীরের কিছু চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদার বিবেচনায় মানুষের কিছু বিষয় সামনে আসে। যেমন : আমিত্ব, হিংসা, প্রতিহিংসা, অহংকার, সীমালঙ্ঘন, অন্যের ক্ষতিসাধন, ভীরুতা, হীনতা, নিকৃষ্টতা ও খিয়ানত। অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা এমন অসংখ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়ে থাকে। অপরদিকে আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান অন্তর মানবতাকে কল্যাণ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার ছায়া দান করে থাকে। এই দুপ্রকারের মধ্যে আত্মিক দিকই সবচেয়ে দামি ও শ্রেষ্ঠ। আত্মিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে মানুষ অসংখ্য উন্নত গুণাবলি অর্জন করে থাকে। যেমন : একনিষ্ঠতা, লজ্জাশীলতা, মনুষ্যত্ব, জাগ্রত হৃদয়, বদান্যতা, বিনয়, পাড়া-প্রতিবেশী ও মেহমানের সম্মান, মিসকিনদের ভালোবাসা, দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা, অঙ্গীকার পূরণ করা, কথা ও কাজের মিল থাকাসহ এমন আরও অনেক মহৎ গুণের অধিকারী হওয়া যায়।

উত্তম গুণাবলি অর্জনের উপায়সমূহ

উল্লিখিত উত্তম গুণাবলি অর্জনের কিছু মাধ্যম রয়েছে। যেমন : সর্বদা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক রাখা। যদি কোনো মুমিন বান্দা এমনটি করে, তাহলে সে আল্লাহকে ইলাহ বলে ইমান আনার পর সর্বদা তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি সহকারে প্রার্থনা করতে থাকে। কথা, কাজ, ইবাদত যেমন : নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিকির, তাসবিহ, দুআ ইত্যাদি সকল বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে।

এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা ইসলামের অবস্থান নির্ণয় করতে পেরেছি। তা এরকম যে, ইসলাম একটি পরিমিত, মধ্যবর্তী ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। ইসলাম দেহ ও মন—দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের সাথে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করেছে। দুটিকে পরস্পরের সম্পূরক বানিয়েছে। মানুষের মাঝে যেমন

রয়েছে নিজ খেয়াল-খুশি, আমিত্ব ও বিভিন্ন ধরনের খারাপ চাহিদা। ঠিক তেমনই তার বিপরীতে রয়েছে জাগ্রত হৃদয়, সুষ্ঠু স্বভাব, সুন্দর চরিত্র, সৌন্দর্যমণ্ডিত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপ, সকল ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা এবং সকল অন্যায় ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা। ইসলাম তো মানুষকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পার্থিব কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে বলেছে এবং মন-মস্তিষ্ককে সর্বদা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার আদেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾

'আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান করো এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। তুমি অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করার প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।'[২০৮]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

'হে মানবজাতি, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[২০৯]

ইসলাম মানুষকে এই নির্দেশ দেয় যে, তাদের দুনিয়া যেন আখিরাতে শান্তি লাভের একটি মাধ্যম হয়। সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে,

২০৮. সূরা আল-কাসাস : ৭৭
২০৯. সূরা আল-বাকারা : ১৬৮

ইসলাম দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারণ, উভয় জগতেই মানুষের জন্য সুখ ও কষ্ট রয়েছে। দুনিয়ার জীবনে এমন কোনো বাড়াবাড়ি করা যাবে না, যার কারণে তাকে বঞ্চিত হতে হয়। আবার পরকালীন জীবন থেকে এমন অমনোযোগীও হওয়া যাবে না যে, এর দরুন আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়।

ইসলাম কখনো দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে ইবাদতে নিমগ্ন হওয়াকে সমর্থন করে না। এমনিভাবে আত্মিক চাহিদা এবং স্রষ্টা থেকে বিমুখ হয়ে শুধু দৈহিক চাহিদা পূরণে ব্যস্ত হওয়াকেও সমর্থন করে না। অতএব, দুনিয়াবিমুখতা যদি শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ এবং সীমালঙ্ঘন হয়, তাহলে আত্মিক চাহিদা থেকে বিমুখিতাও বড় ধরনের সীমালঙ্ঘন হবে; বরং তা হবে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতার নামান্তর। এটাই ইসলামের ন্যায়সংগত ও ভারসাম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যাতে কোনো বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি নেই। প্রান্তিকতাহীন ইসলামের এমন সুষম নীতি যুগ যুগ ধরে মানবতার কল্যাণ বয়ে এনেছে।

ইসলামে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিচারব্যবস্থার বিধান

বাহ্যিক বিচার দ্বারা উদ্দেশ্য, বাস্তবতার বিপরীত হলেও বাহ্যিক দলিল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে মীমাংসা করা। আর অভ্যন্তরীণ বিচার দ্বারা উদ্দেশ্য, বাহ্যিক দলিল-প্রমাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রকৃত ঘটনার নিরিখে বিচার করা।

সুতরাং বিচার বিভাগের নিয়মানুসারে বিচারকের জন্য এই সুযোগ আছে যে, তিনি তার নিকট বিদ্যমান দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন। চাই তার ফয়সালা বাস্তবতার অনুকূল হোক বা প্রতিকূল হোক। কেননা, তিনি যা দেখেন, শুনেন বা তার সামনে যেসব প্রমাণ তুলে ধরা হয়, তাকে তার ওপর ভিত্তি করেই সমাধান দিতে হবে। দলিল-প্রমাণের বাইরে তার অন্য কোনো ক্ষমতা নেই। অনেক সময় দেখা যায়, উপস্থাপিত দলিলগুলো মিথ্যাও হয়। এ ক্ষেত্রে বিচারকের এই ক্ষমতা নেই যে, তিনি মানুষের মনের উদ্দেশ্য বা গোপন তথ্য সম্পর্কে অবগত হবেন। কার কথায় কী গোপনীয়তা রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

উদাহরণ :

১. যদি কোনো লোকের ব্যভিচারের পক্ষে সাক্ষী একজনই থাকে, তাহলে তার জন্য বিষয়টি গোপন রাখা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ, যদি বিচারকের নিকট এই ব্যভিচারের অভিযোগ চারজন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তাহলে অভিযোগকারী নিজেই শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে সে বিচারকের নিকট পর্যাপ্ত প্রমাণাদি তথা চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য পেশ করতে সক্ষম না হওয়ায় উল্টো সে নিজেই মানুষকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। যদিও অভ্যন্তরীণ ঘটনা ও বাস্তবতার নিরিখে ওই একজন প্রত্যক্ষদর্শী শাস্তিযোগ্য নয়; বরং যে ব্যভিচার করেছে, সেই প্রকৃত শাস্তিযোগ্য।

২. যদি কোনো সম্পদ প্রকৃত মালিক ব্যতীত অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত হয় এবং তার কাছে অসংখ্য প্রমাণাদি থাকে। আর আসল মালিকের নিকট কোনো প্রমাণ না থাকে। এ অবস্থায় মূল ঘটনা জানা থাকলেও বিচারকের জন্য এই সুযোগ নেই যে, তিনি প্রমাণ ছাড়া প্রকৃত মালিকের পক্ষে ফয়সালা করবেন। কারণ, সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বাহ্যিক অবস্থার ওপর হুকুম দেওয়া ছাড়া বিচারকের আর কোনো ক্ষমতা নেই।

৩. যদি কোনো ঋণগ্রস্ত লোক দাবি করে, সে খুব অভাবের মধ্যে আছে; অথচ বাস্তবে সে সচ্ছল, আর এই বিষয়টি বিচারকের জানা না থাকে, তাহলে বিচারক তাকে ঋণ দেরিতে শোধ করার সুযোগ করে দেবে। কেননা, বিচারক তার দাবি অনুযায়ী বাহ্যিক দিক বিবেচনা করে হুকুম দিতে বাধ্য। যদিও ঋণগ্রস্ত প্রকৃতপক্ষে মিথ্যুক। এ মিথ্যার দরুন সে গুনাহগার হবে, বিচারকের কোনো গুনাহ ও ক্ষতি হবে না।

উম্মে সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

'আমি তো একজন মানুষ। আমার কাছে (অনেক সময়) বিবাদকারী বিচার নিয়ে আসবে। তখন হয়তো তোমাদের কেউ অন্যের চেয়ে অধিক বাকপটু হওয়ায় আমি মনে করব, সে সত্য বলেছে। তাই আমি সে অনুযায়ী তার পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দেবো। অতএব, বিচারে আমি যদি (অজ্ঞাতসারে) অন্য কোনো মুসলমানের হক তাকে দিয়ে দিই, তবে তা মূলত জাহান্নামের একটি অংশ। এখন সে তা চাইলে গ্রহণ করুক বা চাইলে ত্যাগ করুক।'[২১০]

এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট উত্থাপিত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতেই ফয়সালা করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, এতে কেউ মিথ্যার আশ্রয় নিলে এর জন্য তাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অর্থাৎ বিচার বিভাগের বিবেচনায় তার জন্য দুনিয়াতে প্রমাণের ভিত্তিতে ফয়সালা করা হবে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিবেচনায় তার সাথে এবং আল্লাহর সাথে পরকালে বোঝাপড়া হবে। সত্যবাদী হলে তো ঠিক আছে, কিন্তু মিথ্যাবাদী হলে তাকে পাকড়াও করা হবে। ইসলামে এটি একটি মৌলিক বিষয়। এর ওপর ভিত্তি করেই আখিরাতে বান্দাকে শাস্তি বা পুরস্কার দেওয়া হবে।

উমর ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا، أَمِنَّاهُ، وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ.

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কিছু মানুষকে ওহির ভিত্তিতে পাকড়াও করা হতো। কিন্তু এখন আর ওহি নাজিল হয় না। তাই আমরা তোমাদের বাহ্যিক আমল বিবেচনা করব। অতএব, যে ব্যক্তি আমাদের কাছে

২১০. সহিহুল বুখারি : ৩/১৩১, হা. নং ২৪৫৮ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

কল্যাণ প্রকাশ করবে, তাকে আমরা নিরাপত্তা দেবো, তাকে কাছে টেনে নেব। তার অন্তরের গোপন তথ্য আমাদের জানার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহই তার গোপন বিষয়ের হিসাব নেবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের কাছে মন্দ প্রকাশ করবে, তাকে আমরা নিরাপত্তা দেবো না এবং তাকে সত্যবাদী বলে জানব না; যদিও সে দাবি করে যে, তার অন্তর ভালো।'[২১১]

ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিচারব্যবস্থার মধ্য থেকে বাহ্যিক দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। তন্মধ্য থেকে আমরা এখানে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি।

এক. বিচার-মীমাংসা সাধারণত করা হয় মানুষের বাহ্যিক অবস্থার আলোকে, মনের গোপন উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে নয়। ইসলামের এই পদ্ধতিটি মানুষকে অনেক কষ্ট-কাঠিন্য থেকে রক্ষা করে। এটি মানুষের জন্য অনেক সহজবোধ্যও বটে। কেননা, মনের গোপন বিষয় জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

দুই. যদি মানুষকে তার গোপনভেদ প্রকাশ করতে চাপ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তার কোনো অকল্যাণও হতে পারে। তা ছাড়া মানুষের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর বিষয়। তাই এ ক্ষেত্রে আরও অনেক সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তিন. যদি স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপেক্ষা করে বিচারকের অনুসন্ধান বা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়, তাহলে সমাজে গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। যদি এভাবে দলিল-প্রমাণ বাদ দিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী ফয়সালা দেওয়া হয়, তাহলে বিশৃঙ্খলা বাধার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সার্বিক বিবেচনায় এ ক্ষেত্রে দলিল-প্রমাণের ওপর নির্ভর করাই অধিক নিরাপদ।

২১১. সহিহুল বুখারি : ৩/১৬৯, হা. নং ২৬৪১, (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

মানসিক রোগ থেকে আরোগ্য

কিছু মানসিক রোগ রয়েছে, যা খুবই কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক। মানুষের মধ্যে উন্নত গুণাবলি না থাকলে সে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আল্লাহ তাআলা সকল যুগে প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে কিছু উত্তম চরিত্র দান করেছেন। কিন্তু মানুষের অযত্ন ও অবহেলার দরুন এটি ধ্বংস হয়ে যায়, যার পরিণতিতে মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় অসংখ্য আত্মিক ব্যাধি।

অন্তরের রোগব্যাধি বিভিন্ন প্রকারের। তন্মধ্যে একটি হলো দ্বিমুখিতা, এতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং অবস্থান ও সময়ভেদে সে তার দ্বিমুখী রূপ প্রকাশ করে।

আরেকটি হলো অবসাদগ্রস্থতা। এটি নৈরাশ্যজনিত কারণে সৃষ্ট এমন তিক্ত এক অনুভূতি, যা অসুস্থ অন্তরকে গ্রাস করে ফেলে। এতে সে যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় এবং চরম পেরেশানি ও কষ্ট অনুভব করে।

আরেকটি হলো গুনাহ ও পাপাচারের সাথে অনুভূতির বন্ধন। এটি এমন এক অনুভূতি, যা বিপথগামী অন্তরের ওপর চেপে বসে। অতঃপর সে নিরবচ্ছিন্নভাবে এর তিক্ততার অনুভূতি আস্বাদন করতে থাকে। এটা এমন এক দুর্ভাগ্য, যা পাপিষ্ঠ মানুষের আজীবনের সঙ্গী হয়ে যায় এবং সে স্থিরতা ও শান্তি থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

আরেকটি হলো যন্ত্রণাদায়ক উৎকণ্ঠা ও শঙ্কার অনুভূতি, যা মানুষকে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্থায়ী ভীতির অনুভূতি আস্বাদন করায়। তাকে কখনো নিশ্চিন্তে থাকতে দেয় না। সে দুনিয়ার সবকিছু পেয়েও চরম অশান্তিতে দিনাতিপাত করতে থাকে। এ কষ্টের যন্ত্রণা খুবই কঠিন এবং সুস্থ জীবনের জন্য মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টিকারী।

আরেকটি হলো আমিত্বের দাগ, যা বক্র অন্তরের ওপর কর্তৃত্ব চালায়, যদ্দরুন সে অন্যদের কল্যাণ ও সুবিধার কোনো পরোয়াই করে না। যেভাবেই হোক না কেন, সে শুধু নিজ স্বার্থের প্রতিই যত্নবান হয়। এ জাতীয় অনুভূতি তাকে হীনতা ও কৃপণতার স্বভাবে অভ্যস্ত করে। লোলুপতা ও অতৃপ্ততা উপার্জনের

ক্ষেত্রে তাকে সীমালঙ্ঘনকারী মানুষে পরিণত করে। আর এটা এমন এক অনুভূতি, যা মানুষকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয়, যাতে না আছে কোনো ইতিবাচক দিক, আর না আছে কোনো লাভ বা কল্যাণ। আর তা এমন মানুষের স্বভাব, যে তাকওয়ার স্বাদ আস্বাদন করেনি। অতএব, সে সর্বদা বস্তুগত ব্যবস্থা বা ধর্মবিরোধী ভ্রান্ত দর্শনের বেড়াজালে আটকে থাকে।

এখানে মারাত্মক আরেকটি দুরারোগ্য রোগ আছে, যা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে অবিরতভাবে পশ্চাদমুখিতা, পরাজিত মানসিকতা ও অধোগামিতার দিকে নিয়ে যায়। আর তা হলো দুর্বলতা ও অপূর্ণতার উপলব্ধি। এটা এমন এক অনুভূতি, যা অন্তরে অবসন্নতা ও অসম্পূর্ণতার অনুভূতি জাগ্রত করে। তার এ বিশ্বাস জন্মায় যে, সে মান-মর্যাদায় অন্যদের থেকে পিছিয়ে। একপর্যায়ে সে অধঃপতন ও পরাজিত মানসিকতার চূড়ান্ত স্তরে নিপতিত হয়। তার মনে এ ভুল চিন্তার উদয় হয় যে, অন্যের সাহায্য ছাড়া কিংবা অন্যদের পেছনে দৌড়ানো ছাড়া তার কোনো গতি নেই।[২১২]

সম্ভবত এ যুগে মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে ভয়ানক পরীক্ষার বিষয় হলো, নিজ দুর্বলতার ব্যাপারে তার সর্বগ্রাসী ঝুঁকিপূর্ণ অনুভূতি। সে ভাবে, নিজেদের ব্যক্তিজীবন এবং চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ভিনদেশিদের অনুকরণ ছাড়া কোনো উপায় নেই। আর এ অন্ধ অনুকরণপ্রবণতা উম্মাহকে আত্মনির্ভর করে তুলবে না; বরং এতে তারা দুর্বল, বোকা ও নিকৃষ্ট এক জাতিতে রূপান্তরিত হবে।

এখানে আরও কিছু ব্যক্তিগত অন্তরের রোগ আছে। যেমন : বেপরোয়াভাব। এর স্বরূপ হলো, যে পরিস্থিতিই হোক না কেন, কোনো বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ না করার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এটা অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট অনুভূতি, যদ্বারা সে স্বীয় অক্ষমতা, উদাসীনতা ও শিথিলতার স্থায়িত্ব উপভোগ করে। যদ্দরুন সে বেপরোয়া জিন্দেগির সমীকরণে এসে শুধু উপেক্ষা আর ব্যর্থতারই সম্মুখীন হয়। ব্যক্তিগতভাবে ও দলবদ্ধভাবে এটা অনেক মানুষেরই স্বভাব, যাদের ওপর উদাসীনতাপ্রীতি এবং আত্মমর্যাদার অনুপস্থিতি চেপে বসেছে। আর এটা মূলত ধ্বংস, বিনাশ ও বিক্ষিপ্ততার

২১২. উসুসুস সিহহাতিন নাফসিয়্যা : পৃ. ৩৬৪, ড. আব্দুল আজিজ কাওসি

পথ, যা ব্যক্তি ও দল উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এমন মানসিকতার লোকেরা অধিকাংশ সময় বিপদ ও ব্যর্থতার শিকার হয়।

এরপর হলো অহংকার ও অহমিকা। এটা এমন বিনাশী রোগ, যা মানুষকে আক্রান্ত করে তার অন্তরে নিজের বড়ত্বের অনুভূতি ছড়িয়ে দেয়; অথচ তার কল্পিত অনুভূতি ও ভুয়া ধারণা ছাড়া এর বাস্তবতার কোনো ভিত্তি নেই। এ রোগ কাউকে আক্রমণ করলে তার সত্তা ও অনুভূতি থেকে বিনয়, ভারসাম্য, সচেতনতা ও সুস্থ চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণরূপে বিদায় নেয়। এমন ব্যক্তি শুধু আত্মপ্রবঞ্চনাতেই নিমজ্জিত থাকে; যদ্দরুন সে অবিরতভাবে স্বীয় অবাস্তব কল্পনা ও ভ্রান্ত চিন্তার ব্যাপারে উদাসীন থাকে। সে ধারণা করে, সে কিছু একটা করছে, কিন্তু বাস্তবে সে অলীক কল্পনা ও চরম ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই করছে না।

আমরা এসব রোগের উল্লেখ এ জন্যই করেছি যে, মানুষ যেন জানতে পারে, মানবরচিত বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আইন-কানুনই এসব তিক্ততা, ব্যর্থতা ও সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং তা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর মনোনীত নিয়মকানুনের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক। এ ছাড়াও এসব রোগের বৈশিষ্ট্য ও সর্বশেষ পরিণতি অত্যন্ত জঘন্য হয়ে থাকে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, বাস্তব উপলব্ধি থেকে পালানোর জন্য কিংবা মদ্যপ অবস্থায় বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে দুনিয়ার মিথ্যা ভোগবিলাসে নিমগ্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে সীমাতিরিক্ত মদপান ও নেশায় আসক্ত হওয়া। এভাবে এসব রোগের আরেকটি কুফল হলো, পতিতা নারীদের সাথে উত্তেজিত পশুর ন্যায় মাত্রাতিরিক্ত যৌনসম্ভোগে লিপ্ত হওয়া। এতে চারিত্রিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি সমাজে অবৈধ সন্তানের সংখ্যাও বৃদ্ধি করে। অনুরূপ এসব রোগের আরেকটি মর্মান্তিক পরিণতি হলো তালাক। এটি দৃশ্যমান ও চলমান মারাত্মক এক প্রবণতা, যা অবিরতভাবে সহজেই ঘটছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা এমন সমাজে ঘটে থাকে, যে সমাজ চরিত্র গঠন ও জীবন পরিচালনার জন্য পশ্চিমা দর্শনকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছে।

আমাদের পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান অনুসারে অধিকাংশ তালাকের ঘটনা ওই সব সমাজে ঘটছে, যেসব সমাজ আল্লাহর নীতি পশ্চাদে রেখে

সীমালঙ্ঘনকারী ও পাপাচারীদের মতো অবাধ্য হয়েছে এবং পঙ্কিল ও অবিশ্বাসের জগতে জীবন উপভোগ করেছে। এ জন্যই নাস্তিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার দেশসমূহে তালাকের ঘটনা অনেক বেশি ঘটছে। আর এটা হলো অধঃপতন ও অবক্ষয়ের পথ। চাই তা পুঁজিবাদী দেশে হোক, যার নেতৃত্বে রয়েছে আমেরিকা কিংবা সমাজতান্ত্রিক দেশে হোক, যার নেতৃত্বে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সুইডেনের তালাকের পরিসংখ্যানের একটি রিপোর্ট বলছে, সেখানে প্রতি সাতটি বৈবাহিক সম্পর্কের একটি তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ হয়। আর নরওয়েতে প্রতি ছয়টি বৈবাহিক সম্পর্কের একটি তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ হয়।[২১৩]

এ ব্যাপারে আরেকটি পরিসংখ্যান আছে, যা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'পারাভদা' পত্রিকা প্রকাশ করেছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বিগত বছরে তালাকের সংখ্যা এক মিলিয়নে পৌঁছেছে। আর অধিকাংশ তালাকই মস্কো, লেনিনগ্রাড ও কিয়েভের মতো বড় বড় শহরে ঘটেছে। পত্রিকাটির ভাষ্যমতে চাঞ্চল্যকর এ রিপোর্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের পারিবারিক অবস্থার চরম অবনতির দিকে ইঙ্গিত করছে এবং জোরালো প্রশ্ন তুলছে যে, এমনটি কি অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ঘটছে না মাদকতায় আসক্তির কারণে, না এ জন্য যে, নতুন প্রজন্ম পারিবারিক সম্পর্কের অনুভূতি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে?[২১৪]

ওই সকল রোগের এসব অশুভ পরিণতিতেই আল্লাহর সরল পথ থেকে বিচ্যুত লোকেরা এসব ভুল পদক্ষেপ ও বিকৃত চালচলন চর্চা করছে। এর দরুন সমাজে অরাজকতা ও অশান্তি ব্যাপকহারে বেড়ে চলছে। আর বিবেকশূন্যতা তো আরও জঘন্য ব্যাপার। তারাই এ দুর্ভাগ্যের শিকার হয়, যাদের স্বভাব ও প্রকৃতি বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং মন্দ হয়ে গেছে নিজেদের লক্ষ্য ও অভিপ্রায়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অন্তর তখনই প্রাণবন্ত ও স্থির থাকে, যখন সে মহান আল্লাহর ভয় ও তাকওয়াকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে। কেননা,

২১৩. মাজাল্লাতু হাজারাতিল ইসলাম : ২/৩৬৫, প্রকাশ : ১৯৬১ ইং
২১৪. আল-কুদস পত্রিকা, তারিখ : ২৭/০৮/১৯৮৩ ইং

অন্তরে যখন আল্লাহর ভয়ের ছাপ বসবে, তখন অন্তর জীবন্ত, পরিশুদ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আর এটি এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা ইসলাম ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, যা তার অনুসারীদের গভীর ও সুপ্ত এক শক্তিবলে দৃঢ় করে তোলে। এটি এমন এক ভিত্তিমূল, ইসলামি আকিদা সম্পূর্ণরূপে যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে অন্তরের ব্যাধির একাংশই মাত্র উল্লেখ করলাম। এ ছাড়া আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যা অনৈসলামি সমাজব্যবস্থাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, যা মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত ব্যবস্থা বর্জন করে পশ্চিমা সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচার গ্রহণ করতে উৎসাহী করে তুলছে। কিন্তু এসব ব্যাধি ও সমস্যা থেকে সত্যিকারের একজন মুসলিম যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে। সত্যিকারের মুসলিম তাকেই বলা হয়, যার হৃদয়, অনুভূতি ও ভাবনা ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসকে সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছে কিংবা যে ব্যক্তি আকিদা, সংবিধান ও জীবনব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে পূর্ণভাবে তাকে আঁকড়ে ধরেছে।

এই হলো সে মুসলিম, যে নিজের সাথে, তার রবের সাথে এবং সকল মুসলিমের সাথে সৎ ও নিষ্ঠাবান। যে নিজের জন্য আল্লাহর সাথে এ প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সে ইসলামের বাণী আঁকড়ে ধরবে এবং সুখে-দুঃখে সর্বদা আল্লাহর শরিয়তের নির্দেশনা অনুসারে জীবন পরিচালনা করবে। পাশাপাশি এ শরিয়ত অনুযায়ী চলার জন্য সে অন্যদেরকেও আহ্বান করবে এবং ধর্মত্যাগী, মুনাফিক ও জাহিলদের মধ্য হতে যারা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে, যথাসম্ভব দলিল-প্রমাণ ও শক্তি প্রয়োগ করে তাদের মোকাবেলা করবে।

একজন মুসলিম মাত্রই অন্তরের এসব রোগব্যাধি ও ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থান করবে। 'মুসলিম' শব্দটিই তার এ অবস্থা প্রমাণ করে। কেননা, শব্দটি আরবি الاستسلام (আল-ইসতিসলাম) থেকে নির্গত হয়েছে,[২১৫] যার অর্থ হলো, নমনীয় হওয়া, আত্মসমর্পণ করা। সে

২১৫. ইশতিকাক (নির্গত হওয়া) দুধরনের। এক. ইশতিকাকে লফজি, দুই. ইশতিকাকে মা'নবি। এখানে ইশতিকাকে মা'নবি উদ্দেশ্য। ইশতিকাকে লফজির জন্য মূল হরফ ও বাব এক হওয়া শর্ত হলেও ইশতিকাকে মা'নবির জন্য এরূপ কোনো শর্ত নেই।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে নমনীয় হয় না এবং অন্য কারও কাছে আত্মসমর্পণ করে না। অথবা এটি السلام (আস-সালাম) থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ নিরাপত্তা, শান্তি, অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। আর এটিই একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য যে, সে হবে প্রশান্ত চিত্তের অধিকারী, সকল অনুভূতি ও আবেগকে সমর্পণকারী। যত কষ্ট ও বিপদাপদই আসুক না কেন, কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারে না।

একজন মুসলিম সদা-সর্বদা এক আল্লাহর সামনেই শুধু মাথানত করে। সে অন্য কোনো পূজনীয় বস্তুর সামনে নত হয় না; চাই সেটা মানুষ হোক বা মাটি-পাথরের মূর্তি, সম্পদ হোক বা কামনা-বাসনা, লোভ হোক বা অন্য কিছু। অনুরূপভাবে নিজ বংশ, জাতি, দেশ, স্বামী-স্ত্রী বা সন্তানসন্তুতি কারও জন্যই সে মাথানত করে না, কারোরই আনুগত্য করে না; বরং সে শুধু ওই মহান সত্তার বশ্যতা স্বীকার করে, যিনি সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। এই হলো প্রকৃত মুসলিমের পরিচয়। আর কোনো ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ও মুসলমানের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ না সে নিজ উপলব্ধি ও ইচ্ছায় নিজকে আল্লাহর সামনে সমর্পণ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

'হে নবি, আপনি বলুন, নিশ্চয় আল্লাহর পথনির্দেশই হলো একমাত্র পথনির্দেশ। আর আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আমরা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করি।'[২১৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾

'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে আর সে সৎকর্মশীল, তাহলে তার প্রতিদান তার রবের নিকট রয়েছে।'[২১৭]

২১৬. সুরা আল-আনআম : ৭১

২১৭. সুরা আল-বাকারা : ১১২

তিনি আরও বলেন :

﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾

'যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে আর সে সৎকর্মশীল, তাহলে সে সুদৃঢ় হাতল আঁকড়ে ধরল।'[২১৮]

মূলত একজন মুসলিমের অবস্থা এমনই, যেমনটি পূর্বে বলে এসেছি যে, সে নিজেকে গাইরুল্লাহর দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে নেবে। এটাও তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, সে চিন্তা-চেতনা, উপলব্ধি সার্বিক দিক থেকে মানুষের সকল কর্তৃত্ব, বন্দিত্ব ও আইন-কানুন থেকে নিজেকে মুক্ত ভাববে; যাতে বন্দী হওয়ার পর তার শুধু এ উপলব্ধি থাকে যে, সে সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর দাস। এতে তাগুত কর্তৃক বন্দিত্বের দরুন তার অন্তরে তাগুতের প্রতি কোনো প্রকার নমনীয়তা, দাসত্বভাব ও আনুগত্যের অনুভূতি জাগ্রত হবে না।

কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি সর্বোচ্চ স্তরের একটি বৈশিষ্ট্য, যা শুধু মুসলিমরাই অর্জন করতে পারে, অন্য কারও জন্য এসব গুণ অর্জন করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। আর এটিই হলো আল্লাহর পূর্ণ দাসত্বের উপলব্ধি যে, আল্লাহ তাআলা-ই হলেন একমাত্র ইবাদতযোগ্য উপাস্য, যার হাতে গোটা জগতের চাবিকাঠি ও সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

'আর তাদের শুধু এক ইলাহের ইবাদতেরই আদেশ করা হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তারা যা কিছু শরিক করে, তিনি তা থেকে পবিত্র ও মহান।'[২১৯]

---

২১৮. সূরা লুকমান : ২২
২১৯. সূরা আত-তাওবা : ৩১

অতএব, এ ভিত্তিতে যে ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সামনে সমর্পণ করেছে, মানুষ-নির্মিত পৃথিবীর সকল বন্দিত্ব এবং অন্তর ও অনুভূতির ওপর কর্তৃত্বকারী সকল প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে, সেই একমাত্র অন্তরের সকল রোগব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভ করেছে, যা বিভিন্ন দল-উপদলকে আক্রমণ করে দুর্বল, বিশৃঙ্খল ও অস্থির করে ছেড়েছে।

যে মুসলিমের অবস্থা এমন হবে, সে নিশ্চয়ই নিরাপদ ও প্রশান্ত থাকবে এবং প্রবৃত্তিগত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকবে, যেসব ব্যাধিতে আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী ও তাঁর নিদর্শনসমূহ অস্বীকারকারীরা আক্রান্ত।

যে মুসলিমের অবস্থা এমন হবে, সে কখনো বিষণ্ণ, অহংকারী ও ব্যক্তিত্বহীন হতে পারে না; বরং সে হয় প্রশান্ত, বিনয়ী ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সে স্বার্থপর, কৃপণ ও হিংসুক হতে পারে না, যে কিনা নিজের তৃষ্ণা মিটানোর জন্য অপরকে কষ্টে ফেলে দূরে চলে যায়। সে নির্জীব, দুর্বল, তুচ্ছ ও অন্ধ জাহিলিয়াতের ক্ষেত্রে অন্যদের অনুগামী হতে পারে না। বরং মুসলিম তো তার রবের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হবে, যার পরে তার অপূর্ণতার কোনো অনুভূতিই আসবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে একজন মুসলিম স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যার সত্তায় দুর্বলতা ও ভ্রান্তির বিপরীত শক্তি ও দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

আর ত্রুটিযুক্ত চালচলন, যেমন : অলস সময় নষ্ট, অরাজকতা, নিজের ক্ষতিসাধন বা বাস্তব উপলব্ধি থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে নেশায় আসক্ত হওয়া—এ ধরনের ভয়ংকর ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে একজন মুসলিম যোজন যোজন দূরে থাকে। মুসলিম তো আল্লাহভীরু, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র ও আপন লক্ষ্যে অবিচল। সে উচ্চাঙ্গের শালীনতা ও আদব বজায় রেখে জীবন পরিচালনা করে, যা ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে।

এ ছাড়া মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে খুবই সজাগ ও দৃঢ় এবং লাগামহীন জীবনযাপনের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। বরং মুসলিম সমাজ ইসলামি আকিদা ও আলোকিত শরিয়তের কল্যাণে বিশৃঙ্খলা, বিচ্ছিন্নতা ও

অধঃপতন থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছে। আর মুসলিমদের মাঝে তালাকের ঘটনা অনেক অনেক কম। শত্রু-মিত্র সবাই তা জানে এবং সবাই এটি স্বীকার করে যে, তুলনামূলকভাবে তালাকের ঘটনা মুসলিমদের মাঝে কম ঘটে, যা বস্তুবাদী আধুনিক সভ্যতার দাবিদার অনৈসলামিক সমাজে অনেকগুণ বেশি।

আল্লাহর ওপর ভরসা

আল্লাহর ওপর ভরসা করার অর্থ হলো, পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে সকল বিষয়কে তাঁর ওপর ন্যস্ত করা। التوكل (আত-তাওয়াক্কুল) শব্দটি وكالة (ওকালাত) থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ সমর্পণ করা।

যেমন বলা হয়, تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ 'সে আল্লাহর ওপর ভরসা করেছে, তাঁর ওপর আস্থা রেখেছে, তাঁর ওপর নির্ভর করেছে।'[২২০]

তাওয়াক্কুলের জন্য শর্ত হলো, শরয়ি বিবেচনায় বিষয়টি সঠিক হতে হবে। শরিয়া অনুমোদিত সম্ভাব্য সকল উপকরণ গ্রহণ করে তবেই তাওয়াক্কুল করতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিকভাবে তাওয়াক্কুল করে, সে অবশ্যই এই বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করবে যে, আল্লাহ তাআলা তার ভরসাকৃত বিষয়ে সাড়া দেবেন। এর জন্য সে নিজের যথাযথ চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। অতএব, যদি কারও তাওয়াক্কুল সকল উপকরণ গ্রহণ করে পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে না হয়, তাহলে তার তাওয়াক্কুল শরিয়াসম্মত হবে না; বরং তা توكل (তাওয়াক্কুল) এর পরিবর্তে تواكل (তাওয়াকুল) অর্থাৎ একে অপরের ওপর নির্ভর করাতে পরিণত হবে।

ইমাম গাজ্জালি ﷺ তাওয়াক্কুল সম্পর্কে বলেন, 'ইমানের দরজাসমূহ থেকে একটি দরজা হলো তাওয়াক্কুল। আর ইমানের প্রতিটি দরজা ইলম, আমল ও স্থিরতা ছাড়া সুবিন্যস্ত হয় না। এমনিভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া তাওয়াক্কুলও সুবিন্যস্ত হয় না। এর মধ্যে ইলম হলো মূল, আমল তার ফল আর স্থিরতা তার উদ্দেশ্য।'[২২১]

২২০. আল-মিসবাহুল মুনির : ২/৬৭০ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
২২১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/২৪৫ (দারুল মারিফা, বৈরুত)

তাওয়াক্কুলের বিষয়টি আকিদার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহর ওপর যার ভরসা যত বেশি, তার ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল তত সুদৃঢ়। তার ধৈর্য, বিশ্বাস ও বিনয় তত বেশি বৃদ্ধি পায়। মুমিনের অবস্থা এমনই হওয়া উচিত।

আর এর বিপরীত تواكل (তাওয়াকুল) অর্থ, মানুষ মানুষের ওপর নির্ভর করা। যাদের ওপর নির্ভর করা হবে, তারা চাই শাসক হোক কিংবা নেতৃস্থানীয় বা অন্য কেউ হোক। যদি মানুষের ওপর নির্ভর করা হয়, তবে তা تواكل (তাওয়াকুল) হবে, توكل (তাওয়াক্কুল) নয়। এমনিভাবে যদি কেউ শুধু মুখেই বলে যে, আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম, কিন্তু সে কাজে-কর্মে তার বিপরীত করে, তাহলে সেটাও প্রকৃত তাওয়াক্কুল হবে না। এমন ত্রুটিপূর্ণ তাওয়াক্কুল অনর্থক আশা-আকাঙ্ক্ষা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তাআলা যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল করে মাধ্যম গ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী আন্তরিক চেষ্টা সহকারে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেন :

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

'আর আপনি বলে দিন, তোমরা আমল করে যাও। অতঃপর আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনগণ তোমাদের আমল লক্ষ করবেন।'[২২২]

আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর ভরসা করে তদনুযায়ী কাজ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। অন্যদিকে যারা নিজেদের কথা ও কাজে মিল রাখে না, তাদের নিন্দা করেছেন।

তিনি বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

২২২. সুরা আত-তাওবা : ১০৫

'হে মুমিনগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলে বেড়াও? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।'[২২৩]

ইমাম তিরমিজি ﵀ আনাস ﵁ থেকে বর্ণনা করেন :

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ

'এক ব্যক্তি জানতে চাইল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আমার এই উটনীকে বেঁধে রেখে আল্লাহর ওপর ভরসা করব, নাকি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করব? উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগে বাঁধো, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।'[২২৪]

এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রকৃত তাওয়াক্কুলের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সময় কিছু মানুষ ছিল, যারা তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থ জানত না। তাই তারা যখন হজের সফরে বের হতো, তখন সাথে দীর্ঘ সফরের জন্য রসদ বা খাদ্যদ্রব্য না নিয়েই বেরিয়ে পড়ত। তারা বলত, আমরা আল্লাহর ঘরের হজ করব, আর তিনি আমাদের খাওয়াবেন না?! নিজেদেরকে তারা আল্লাহর ওপর ভরসাকারী বলে দাবি করত। আল্লাহ তাআলা তাদের আসবাব গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন :

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ﴾

'আর তোমরা সাথে পাথেয় নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।'[২২৫]

তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এক শ্রেণির মিথ্যাবাদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় এবং আল্লাহর ওপর ভরসাকারীদের নিয়ে কটাক্ষ করে। এ সকল মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীরা সর্বদা ইসলামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত

---

২২৩. সুরা আস-সফ : ২-৩

২২৪. সুনানুত তিরমিজি : ৪/২৪৯, হা. নং ২৫১৭ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

২২৫. সুরা আল-বাকারা : ১৯৭

জঘন্য ও মন্দ ধারণা পোষণ করে। অথচ ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এমন মিথ্যারোপের কোনো দলিল-প্রমাণই তারা পেশ করতে পারে না; বরং এ সকল মানুষের বিপক্ষে আল্লাহর অনেক প্রমাণ আছে। কেননা, তিনি মানুষকে বারবার তাওয়াক্কুলের পাশাপাশি যথাযথ পদক্ষেপ ও আসবাব গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন।

সালাফে সালেহিন ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাওয়াক্কুলের অধিকারী। তাঁরা পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। অর্ধ পৃথিবী বিজিত হয়েছিল তাদের হাতে। তাঁরা সত্য ও ন্যায়ের ঝান্ডা উঁচু করেছেন। পৃথিবীব্যাপী দাওয়াতের প্রসার, বিভিন্ন ভূখণ্ড বিজিত হওয়া ও হকের ঝান্ডা বুলন্দ হওয়ার কারণ এটাই যে, তাঁরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আর তাদের অগ্রনায়ক ছিলেন মানবতার মুক্তির দিশারি, আদর্শ নেতা মুহাম্মাদ ﷺ। যুদ্ধের সময় তিনি থাকতেন সকলের সামনে। এমনকি যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করত, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ শত্রুর সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি থাকতেন। যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে শ্রেষ্ঠ বীরযোদ্ধারা পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। তিনি হতেন তাদের ইমাম। সবার আগে থাকতেন তিনি। তাঁর পেছনে থেকে অন্যরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন।

ইমাম ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া ﵀ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গাজওয়ার সংখ্যা সাতাশটি। আর বিভিন্ন সারিয়া ও খণ্ড যুদ্ধের সংখ্যা প্রায় ষাটটি।'[২২৬]

দাওয়াতের সে প্রসারণ আজ আর নেই। মুসলমানদের হাতে নতুন ভূমি বিজিত হওয়া দূরে থাক; বরং মুসলিমদের ভূমিতে আজ নাপাক কাফির-মুশরিকদের নগ্ন থাবা পড়েছে। ইসলামের পতাকার স্থলে জায়গা করে নিয়েছে জাতীয়তাবাদের পতাকা। কালিমার পতাকার স্থানে আজ বিভিন্ন শিরকি পতাকা বাধাহীনভাবে উড়ছে। এ অধঃপতনের একমাত্র কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রকৃত আদর্শ ভুলে যাওয়া। বর্তমানে মুসলমানদের যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে, তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা। মুসলমানরা আজ বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত।

---

২২৬. জাদুল মাআদ : ১/১২৫ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

তারা আজ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। অথচ তারা ইসলামি শরিয়তের সকল বিধানকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে, এটাই ছিল যৌক্তিকতা ও বাস্তবতার দাবি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও পরিপূর্ণ মনোবলের সাথে সে বরকতময় শরিয়ত অনুযায়ী আমল করবে। জীবনের পরতে পরতে কল্যাণকর কাজ করার প্রতি উৎসাহী হবে। অথচ আজ শরিয়ত পালনে মুসলিমগণ পরনির্ভরশীল! অন্যের অধীনতা স্বীকার করে মনোতুষ্টিতে ভোগা আজ মুসলিমদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

উমর ﷺ-এর এ বক্তব্যটি কতই না চমৎকার! তিনি বলেন :

> 'আল্লাহর নিকট রিজিকের জন্য দুআ করে কেউ যেন রিজিক অন্বেষণ করা থেকে বিরত না থাকে। কারণ, দুআ করলেই আকাশ হতে সোনা-রুপা বর্ষিত হয় না; বরং দুআ করার পর রিজিক অন্বেষণ করতে হয়।'[২২৭]

উল্লেখ্য, যদি কোনো মুমিন বান্দা আল্লাহর ওপর ভরসা করে থাকে, তাহলে সে যতদিন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে থাকবে, ততদিন শান্তি ও নিরাপত্তার মাঝে থাকবে। তার জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার লেশমাত্র থাকবে না। কোনো মুসলিম যখন নেক আমল ও প্রয়োজনীয় মাধ্যম গ্রহণের দ্বারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তখন তাকে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যারা আল্লাহর ওপর ভরসাও করে আবার শরিয়ত অনুযায়ী আমলও করে; যদিও সে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম না হয়।

তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বিষয় হচ্ছে, কাঙ্ক্ষিত মনজিলে পৌছুক আর নাই পৌছুক, যথাযথভাবে আমল করে যেতে হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি ত্রুটিমুক্তভাবে তাওয়াক্কুলের চাহিদামতো আমল করে যায়, তাহলে সে অবশ্যই আত্মিকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করবে, তার মনে প্রফুল্লতা বিরাজ করবে এবং তার মস্তিষ্ক থাকবে ঠান্ডা ও স্থির।

---

২২৭. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/৬২ (দারুল মারিফা, বৈরুত)

মুসলমানের উদ্যমতা

সকল মানুষের মধ্যে একমাত্র মুসলিম জাতিই উদ্যমতা, প্রাণবন্ততা ও তৎপরতা ইত্যাদি গুণে স্বতন্ত্র। ইসলামের নির্দেশও এমনই যে, মুসলমানরা যেন কর্মঠ ও উদ্যমী হয় এবং অলসতা ও সংকীর্ণতা থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকে। তাই আমাদের উচিত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা।

ইসলামের নির্দেশমতো চললে পার্থিব জীবনের অনুকূল-প্রতিকূল যেকোনো পরিস্থিতিতে দৃঢ় মনোবল, সাহায্য, শক্তি ও উদ্যমতা পাওয়া যাবে। তাই যে ব্যক্তি ইসলামের এই চাহিদা মোতাবেক কাজ করবে না, নিঃসন্দেহে সে সহায়হীন ও পরিত্যক্ত হবে এবং দুর্বল, পশ্চাদপদ ও নিম্নগামী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

ইসলামের চাহিদাই হলো মুসলমানগণ যেন তৎপর ও উদ্যমী হয়। তারা যেন হিম্মত ও সাহসিকতার সাথে সত্যের দাওয়াত নিয়ে দুর্বার গতিতে ছুটে চলে। এরই মধ্য দিয়ে একজন মুসলমান সমাজ, রাষ্ট্র ও সকল মানুষের জন্য কল্যাণের বার্তাবাহকরূপে আবির্ভূত হতে পারে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্মঠ ও উদ্যমী হওয়া আবশ্যক।

বিশেষ করে, বর্তমানকালে এ গুণগুলোর বড়ই অভাব অনুভূত হচ্ছে। সর্বত্র আজ কুফর ও শিরকে ছেয়ে গেছে। পাপাচারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাপকভাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধবাদী কাফির-মুশরিক, নাস্তিক-মুরতাদরা দ্বীনের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। মানুষরূপী শয়তানগুলো দিন-রাত ইসলাম নির্মূল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাই কাফির-মুশরিকদের ওপর বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে এবং ইসলামের সম্মান রক্ষা করার জন্যে সকল নিদ্রা, দুর্বলতা ও অধঃপতনের বেড়াজাল ছিন্ন করে মুসলমানদের জাগ্রত হতে হবে, তাদের হতে হবে সদা তৎপর ও উদ্যমী।

বস্তুত, মুসলমান তো হবে সর্বদা প্রাণবন্ত, কর্মঠ ও উচ্চ মনোবলসম্পন্ন। সে তো ক্লান্তিহীনভাবে কুরবানির চেষ্টায় থাকবে, সদা সৎকর্মের প্রতি উৎসাহ দেবে, সত্যকে আঁকড়ে থাকবে ও পরস্পরকে সদুপদেশ দেবে।

আল্লাহ তাআলা সুরা আসরে সময়ের শপথ করে দুশ্রেণির মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। এক শ্রেণি ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আর অপর শ্রেণির জন্য রয়েছে সফলতা। ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾

'কসম সময়ের। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাগিদ দেয় সত্যের, তাগিদ দেয় সবরের।'[২২৮]

শিরক ও লৌকিকতামুক্ত নেক আমলের প্রতি উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾

'যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।'[২২৯]

যে সকল মুমিনের মাঝে নেক আমল, সত্যতা ও সততার মতো তাকওয়ার সকল গুণ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে, তাদের গুণকীর্তন করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

২২৮. সুরা আল-আসর : ১-৩
২২৯. সুরা আল-কাহফ : ১১০

'নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী—তাদের সবার জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'[২৩০]

মুসলমানগণ যেন একে অপরের কষ্ট ও বিপদ দূর করতে পারে, সে জন্য পারস্পরিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

'সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা।'[২৩১]

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ঐক্যের ডোরে আবদ্ধ হয়ে পরস্পর ভাইয়ের ন্যায় একই সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে কিতালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে ইরশাদ করেন :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾

'আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে।'[২৩২]

২৩০. সুরা আল-আহজাব : ৩৫
২৩১. সুরা আল-মায়িদা : ২
২৩২. সুরা আস-সফ : ৪

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সর্বদা যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরির মতো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও ইসলাম মুসলমানদেরকে শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করতে আদেশ দিয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানগণ যেন একটি বিধান আদায় করতে গিয়ে আরেকটি বিধান বাদ না দেয় এবং সর্বদাই যেন ইসলামের সকল বিধান তারা পালন করে, সে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

'আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে তারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে স্বজাতির নিকট ফিরে তাদের ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তারা বেঁচে থাকতে পারে।'[২৩৩]

ইসলামের দাওয়াত উত্তম ও সুন্দর ভঙ্গিতে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

'আপন পালনকর্তার পথে আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে। আর তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন।'[২৩৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যা মুমিন ব্যক্তির জীবনে ফুটে ওঠে। এর মাধ্যমে একজন মুমিন কর্মঠ ও উদ্যমী হয়ে ওঠে। ফলে তার দ্বারা কোনো ধরনের অন্যায় কর্ম সাধিত হয় না। তার প্রতিটি কথা ও কাজ ইসলামি ভূখণ্ড ও উম্মাহর কল্যাণে আসে। রাসুলুল্লাহ

২৩৩. সুরা আত-তাওবা : ১২২

২৩৪. সুরা আন-নাহল : ১২৫

ﷺ এমন ইমানের বাস্তব প্রমাণ বুঝিয়ে দিয়েছেন, যা একজন মুমিনকে জীবনের নানা পরিস্থিতিতে নেক আমল করার জন্য সহায়ক হয়। আবু জর গিফারি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

'তোমার মুসলিম ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি তোমার জন্য সদকা। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা তোমার জন্য সদকা। পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখানো তোমার জন্য সদকা। অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়া তোমার জন্য সদকা। রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা, হাড় ইত্যাদি সরিয়ে দেওয়া তোমার জন্য সদকা। তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেওয়া সদকা।'[২৩৫]

সুতরাং প্রকৃত মুসলমানকে অবশ্যই সৎ আমল করতে হবে। অন্যের উপকার করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। আমাদের সালাফে সালেহিন এমনই ছিলেন। যারাই ইসলামকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারাই এমন মহৎ গুণের অধিকারী হতে পেরেছে। তারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না। তাদের মতো এমন গুণে গুণান্বিত হওয়ার মাধ্যমেই দুনিয়ার বুক থেকে সকল অন্যায়-অত্যাচার দূর করে আল্লাহর মনোনীত ধর্মের আলো জ্বালানো সম্ভব। যারা এর আলোকে জীবন পরিচালনা করে, আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য করে থাকেন এবং জমিনে তাদেরকে খিলাফত দান করেন।

২৩৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩/৪০৪, হা. নং ১৯৫৬ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

ইসলামে শান্তির ভিত্তিমূল

পৃথিবীতে সবাই শান্তি চায়। সবাই দুদণ্ড আরামে দিনাতিপাত করতে চায়। কিন্তু সবাই শান্তির দেখা পায় না। এ বিষয়ে আলোচনার কোনো অন্ত নেই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল অঙ্গনে সবার একটিই কথা—শান্তি আর শান্তি। কিন্তু কোন পথে শান্তি তা কেউ বুঝতে চায় না। জানতে চেষ্টা করে না, কোন নীতি ফলো করলে শান্তি ফিরে আসবে। অথচ একটু দৃষ্টিপাত করলেই তারা বুঝতে পারত যে, পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই পারে মানুষের কাঙ্ক্ষিত শান্তি ফিরিয়ে দিতে। ইসলামের বার্তা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি সকলেই সমানভাবে শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারবে এবং সকল প্রকার অশান্তি, অস্থিতিশীলতা, অকল্যাণ, অন্যায় ও দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।

শান্তির বাস্তবতা ও মানবজীবনে তার প্রভাবের বিবেচনায় বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার দাবিদার। কারণ, এটি মানবতার মূল স্তম্ভ। এ ব্যাপারে অনেক বই লিপিবদ্ধ হয়েছে। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং বিভিন্ন বিজ্ঞাপনসহ প্রচারমাধ্যমে শান্তি বিষয়ক লেখালেখি প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এত কিছু করার পরও মানুষ আজ শান্তির খোঁজে দিশেহারা।

ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত ধর্ম। শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এবং সঠিক পথে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামি আদর্শের বিকল্প নেই। মানবতাকে অশান্তি, অন্ধকার, ভ্রষ্টতা, ভয়, উদ্বেগ ও দুর্ভোগ থেকে বের করে শান্তি, আলো, হিদায়াত, সাহসিকতা ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিধান অবতীর্ণ করেছেন। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিকভাবে যার বিস্তারিত বিবরণ ইসলামি ইতিহাসে ভরপুর এবং সোনালি অতীত যার বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল।

প্রায়োগিক দিক নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কারণ, ইসলামি ইতিহাস এর উজ্জ্বল সাক্ষী। যখন ইসলাম পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ

করেছে, তখন সারা দুনিয়ায় শান্তি আর নিরাপত্তার ছায়া দান করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় জগৎ আলোকিত করেছে। সততা, সত্যবাদিতা, স্থিতিশীলতা, শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করেছে। মর্যাদা-সম্মান, স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যতার শাসন ছড়িয়েছে। যেন মানুষ শান্তি, ঐক্য, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশে বাস করতে পারে। এমনই ছিলেন পূর্ববর্তী মুসলিমগণ ও তাঁদের সময়কাল। তাঁরা আল্লাহর দেওয়া সংবিধান অনুযায়ী জীবন রাঙিয়েছেন; বিধায় আল্লাহ তাআলা তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার নিয়ামত দান করেছেন।

আর তাত্ত্বিক দিক পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিভিন্ন হাদিসের স্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়। কুরআন-হাদিসে ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তার বিধানবিষয়ক বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বলা বাহুল্য, ইসলাম যে শান্তি ও নিরাপত্তার কথা বলে, তার মূলভিত্তি হচ্ছে—বিশুদ্ধ আকিদা, তাকওয়া ও আখলাক।

আকিদা

আকিদা ইসলামের সকল ভিত্তি ও স্তম্ভের মূল। প্রত্যেকের জন্য ইসলামের আকিদা হৃদয়ের গভীরে বদ্ধমূল করে নেওয়া আবশ্যক। যেন এর মাধ্যমে মানুষ একজন আদর্শ, পরিপূর্ণ ও উদ্যমী মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই আকিদা ছাড়া মানুষের কোনো ভিত্তি নেই। কারণ, মানবজীবনের চালিকাশক্তিই হলো আকিদা-বিশ্বাস। তাই যার আকিদা ঠিক নেই, তার জীবনের কোনো ভিত্তিই নেই।

যদি মানুষ বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী না হয়, তাহলে তার হিম্মত ও মনোবল দুর্বল হয়ে পড়বে। সে আশা ও অনুভূতি হারিয়ে ফেলবে। নিশ্চল হয়ে যাবে ইচ্ছা ও সহানুভূতির শক্তি। এর চেয়েও অধিক ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, বিশুদ্ধ আকিদা না থাকলে মানুষ ভ্রান্ত আকিদা গ্রহণ করে। যেমন : নাস্তিকতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি। যদি কোনো মানুষ এমন ভ্রান্ত আকিদার ওপর তার জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে, তাহলে নিশ্চিতভাবে সে এক ভ্রষ্ট, নিকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রণহীন মানুষে পরিণত

হবে। তার অন্তরে সর্বদা কুধারণা ও কুমন্ত্রণা উঁকি দিতে থাকবে। সে পৃথিবীতে কেবল অশান্তি, অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্যই সৃষ্টি করবে এবং নিরাপত্তার বিঘ্নতা ঘটাবে।

তাকওয়া

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এমন একটি সূক্ষ্ম অনুভূতি, যা সহিহ আকিদা থেকে উৎসারিত হয়। যা অন্তরে সূক্ষ্ম ও প্রফুল্ল ভাব সৃষ্টি করে। মানুষকে সর্বদা নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। সকল অকল্যাণ, মন্দ কাজ, খারাপ চিন্তার মাঝে এবং ওই ব্যক্তির মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে। এটা হলো মুসলিম হৃদয়ে প্রোথিত ও লালিত তাকওয়ার বিনিময়। এই তাকওয়াই একজন মুমিনের চালিকাশক্তি ও প্রেরণাশক্তি। তাকে মন্দ থেকে সতর্ককারী ও নিষেধকারী। আর যাদের অন্তরে তাকওয়া ঠিক নেই, তারা নানা অন্যায়-অপরাধ ও পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত থাকে।

তাকওয়া হচ্ছে হৃদয় গভীরে প্রোথিত একটি উপলব্ধির নাম। তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মাধ্যমে সুস্থ চিন্তা-চেতনা ও উত্তম আচরণের প্রকাশ ঘটে। যেমন : মুত্তাকি ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলবে না; বরং সদা সত্য বলবে এবং আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকবে। তার হাত সর্বদা কল্যাণকর কাজ করবে। তার পা সর্বদা অগ্রসর হবে সৎ কাজের প্রতি। এমনিভাবে শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাকওয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

সর্বোপরি তাকওয়া হচ্ছে, সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। আর তাকওয়াহীনতা হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি। অতএব, যে ব্যক্তি সব সময় আল্লাহকে ভয় করে, মনে করে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন, তার সকল কার্যক্রম তিনি প্রত্যক্ষ করছেন এবং মনের সকল গুপ্ত মনোভাব তাঁর সামনে প্রকাশ্য, তাহলে সে অবশ্যই একজন নিরাপদ ও নেককার বলে বিবেচিত হবে। কারণ, সে সর্বদা তার অন্তরে তাকওয়ার কারণে শান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করে। তার দ্বারা কখনো কারও ক্ষতি হওয়ার চিন্তা করা যায় না।

আখলাক

আখলাক হলো হৃদয়ে বদ্ধমূল আকিদার প্রকাশমাধ্যম বা ফলাফল। এর মাধ্যমেই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি সব সময় সততা, ন্যায়পরায়ণতা, লজ্জাশীলতা, মানবিকতা, বিনয়, সদাচরণ ও এমন অসংখ্য উত্তম গুণে গুণান্বিত হয়। এমন ব্যক্তির মাধ্যমে কখনো কোনো অন্যায় কাজ সাধিত হতে পারে না; বরং তার মাধ্যমে সর্বদা তার নিজের ও অন্যদের শান্তি-নিরাপত্তা অর্জিত হয়। এটাই হলো সহিহ আকিদায় আধারিত উত্তম আখলাকের ফলাফল। এমন সুচরিত্রই মানুষকে নিরাপদে, নিশ্চিন্তে ও স্বাধীনভাবে চলতে সহযোগিতা করে। পরস্পর ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও ঐক্য অর্জনে সাহায্য করে। ফলে সকলের অবস্থা এমন হয় যে, সবাই একটি দেহে পরিণত হয়ে যায়। এক অঙ্গ ব্যথা পেলে সব অঙ্গ ব্যথিত হয়। এটাই হলো শান্তি ও নিরাপত্তা। এভাবেই সারা দুনিয়া কল্যাণ ও ভালোবাসায় ছেয়ে যায়। এর মাধ্যমেই মানুষের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন না থাকলেও পরস্পরে তারা আত্মার আত্মীয় হয়ে যায়। আর এ বন্ধনের মূলভিত্তিই হচ্ছে বিশুদ্ধ আকিদা। একমাত্র ইসলামই পৃথিবীবাসীকে এরকম আকিদা-বিশ্বাস উপহার দিয়েছে।

যার আকিদা, আখলাক ও তাকওয়া সহিহ হয় না—অন্যভাবে বলা যায়, যার অন্তর কুফর, শিরক, নাস্তিকতা ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদ দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রের ছিটেফোঁটাও যার মাঝে থাকে না—তবে সে সামান্যতম শান্তি পাওয়ার যোগ্য হবে না। ইহজগতে এই ব্যক্তির সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। সে কল্যাণ ও রহমত থেকে বঞ্চিত।

তার অবস্থা দুটির যেকোনো একটি হবে। হয়তো সে হবে কোনো ধরনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কার্যক্ষমতাহীন একজন নেতিবাচক নির্জীব মানুষ। ইসলাম এমন মানুষকে পছন্দ করে না। অথবা সে হবে অত্যন্ত খারাপ ও পাপিষ্ঠ—যাকে ভ্রষ্টতা, নষ্টামি ও কষ্ট-ক্লেশে চুবিয়ে রাখা হয়েছে। যার থেকে নিকৃষ্টতা, হীনতা ও অহংকারের বোটকা গন্ধ বের হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আকিদা বঞ্চিত লোকেরা এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ আকিদা, তাকওয়া, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি গুণাবলি না থাকায় তাদের এমন দুরবস্থা হয়ে থাকে।

আবার ভ্রান্ত মতাদর্শী হলেও এমন হয়ে থাকে, যার ভিত্তি গড়ে ওঠে ধ্বংসযজ্ঞতার ওপর। যেসব মতবাদের আবিষ্কারক হলো পাপিষ্ঠ, ধোঁকাবাজ ও দাজ্জাল প্রকৃতির মানব শয়তানগুলো। যেমন : লেনিন, কার্ল মার্ক্স, ভুট্টো, কামাল আতাতুর্ক, সার্টার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এগুলো ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য এক একটি অভিশাপ। এই মতবাদগুলো দেশ ও জাতিকে শান্তি দিতে একেবারেই অক্ষম। অথচ শান্তিই হলো মানুষের মৌলিক ও প্রাথমিক চাহিদা। আর যদি মানুষ পূত-পবিত্র ও তাকওয়াবান হতো, তাহলে তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় গেঁথে যেত এবং স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তায় ছেয়ে যেত।

শান্তির ধ্বজাধারীদের মিথ্যাচার

বড় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে কিছু নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোককে মুখে শান্তির বুলি আওড়াতে দেখা যায়। তারা কিনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তির ধ্বজাধারী। অথচ তারা পৃথিবীটাকে হত্যা-লুণ্ঠন ও নির্যাতনে জর্জরিত করে দিয়েছে। মাজলুম মানবতার কান্নার রোলে আজ পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। দুনিয়ার মানুষ যেন নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে, ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞতা থেকে রক্ষা পায়; সে জন্য তারা বিশ্বকে তাদের কথিত শান্তির ডাকে সাড়া দিতে এবং তাদের মাথা থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহের ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে আহ্বান করে। বিভিন্ন গণমাধ্যম, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, বই-পুস্তকসহ সকল প্রচার মাধ্যমে দিন-রাত তারা তাদের মিথ্যা আশার বুলি প্রচার করে বেড়ায়।

নিঃসন্দেহে তাদের এসব আস্ফালন মিথ্যা চেঁচামেচি বৈ কিছু নয়। মূলত ওরা মানবতা ও শান্তির দুশমন। বাহ্যিকভাবে তারা পৃথিবীর মানুষদের প্রতি নিজেদের দয়ার্দ্র বলে প্রকাশ করতে চায় এবং বিশ্বের আনাচে-কানাচে শান্তি ও নিরাপত্তা পৌঁছে দেওয়ার দাবি করে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। এই মিথ্যুক, ধোঁকাবাজরা প্রকৃত বাস্তবতা মানুষের নিকট গোপন রেখে নিজেদেরকে শান্তি ও কল্যাণের বন্ধু বলে প্রকাশ করে। তাদের স্বভাব-চরিত্র, মন-মস্তিষ্ক ভ্রান্ত মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা

যুগ যুগ ধরে মানবতাকে চুষে খাচ্ছে। জুলুম, মিথ্যা, ষড়যন্ত্র ও ধোঁকায় জাতিকে পিষে মারছে। যাদের মাঝে কেবল আমিত্ব, অহংকার ও দাম্ভিকতা পূর্ণ হয়ে আছে। তাদের এসব ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারকে জানার জন্য তেমন কোনো গবেষণা করার প্রয়োজন পড়ে না; বরং বর্তমান সময়ে আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা তা স্পষ্টরূপে বুঝতে পারছি। তাদের ধোঁকাবাজির যেই চিত্র আমাদের মেধায় অঙ্কিত হয়, তা থেকেও আমরা কিছুটা ধারণা নিতে পারব। তাদের ইতিহাস সাধারণ জনগণের সাথে শান্তির নামে ধোঁকাবাজিতে ভরপুর।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এসব ধোঁকাবাজ, প্রতারক, পাপিষ্ঠ ও মিথ্যুকরা শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম ইসলামকে সাহায্য করার আশ্বাস দেয়। এরা শান্তির বাণী শুনিয়ে ইসলামের প্রতি দরদ দেখাতে ছুটে আসে; অথচ এদের অন্তর ইসলামের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও হিংসায় পরিপূর্ণ। এদের প্রথম শ্রেণিতে রয়েছে উপনিবেশবাদী, খ্রিষ্টবাদী ক্রুসেডার ও কমিউনিস্ট।

উপনিবেশবাদী

এদের কার্যকলাপ অত্যন্ত ভয়ংকর। হত্যা, লুণ্ঠন, অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন ও অবৈধ শক্তি-দাপটে ভরপুর তাদের ইতিহাস। আর এই পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের মধ্যে মার্কিন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য। এরা মুসলিম জাতির সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে শত্রুতা, গাদ্দারি ও ধোঁকাবাজি করেছে। এ বর্ণনা ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

খ্রিষ্টবাদী ক্রুসেডার

তারা নিজেদের শান্তির অগ্রদূত বলে দাবি করে এবং সেই পবিত্র ভালোবাসার আহ্বায়ক বলে প্রচার করে, যা মাসিহ ইসা عليه السلام এসে ঘোষণা করবেন। অথচ ইসা عليه السلام এসব পাপিষ্ঠ, মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা তো বহু আগেই ইসা عليه السلام-এর পবিত্র ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। যুগের পর যুগ ধরে এই পশ্চিমা ক্রুসেডগোষ্ঠী কর্তৃক সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিমদের সাথে নানা অজুহাতে যুদ্ধ বাধিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর-নারী হত্যা যার উজ্জ্বল প্রমাণ।

এরা সর্বদা অন্যদের তুলনায় নিজেদের শান্তিকামী বলে প্রচার করে। তাদের মতো ধোঁকাবাজ ও কৃত্রিমতা প্রদর্শনকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ আরও আছে সত্য, কিন্তু অন্যদের চেয়ে এরাই শান্তি ও নিরাপত্তার কথা বলে সবচেয়ে বেশি। অথচ এরা বারবার সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করে চলছে। তাদের এসব মিথ্যা দাবির পক্ষে বিন্দু পরিমাণ প্রমাণ কিংবা বাস্তবতার ছিটেফোঁটাও নেই। বরং তাদের বাস্তবতা সমগ্র বিশ্ববাসী ভালোভাবেই জানে যে, মার্ক্সবাদ যেখানে প্রবেশ করেছে, সেখানকার অধিবাসীদের ওপর তারা জুলুমের স্টিম-রোলার চালিয়েছে। যার সূচনা হয়েছিল ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের অগ্রনায়ক লেনিন এবং তার পরবর্তী লম্পট রুশ শাসকদের সময়। কমিউনিস্টদের জন্মলগ্নেই অসংখ্য মানুষ তাদের হত্যার শিকার হয়েছে, যাদের অধিকাংশই ছিল নিরীহ মুসলমান। তাদের অপরাধ ছিল, তারা স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছিল।

এমনিভাবে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মুক্তিকামীদের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসযজ্ঞতা কমিউনিস্টদের প্রকৃত চেহারা স্পষ্ট করে তোলে। কমিউনিজমের নির্যাতনের স্বীকার রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম হলো : হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, আফগানসহ আরও বহু রাষ্ট্র।

সাম্প্রতিককালে ফিলিস্তিনের ওপর ইহুদিদের প্রতিনিয়ত বোমাবর্ষণ, শিশু-নারীদের হত্যাও এ সকল জালিমের অত্যাচারের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তারা একটি দেশ, জাতি ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তবুও তারা বিশ্ব শান্তির ধারক ও বাহক!

লক্ষ, কোটি মানুষ হত্যা করার পরও কথিত শান্তির এ ধ্বজাধারীরা নিজেদের শান্তিকামী বলে প্রচার করে। নিজেদেরকে তারা পৃথিবী ও পৃথিবীর নিরীহ মানুষদের নিরাপত্তা দানকারী বলে দাবি করে। এদের হাত মানবতার রক্তে রঞ্জিত, অন্তরগুলো ঘৃণা আর অহংকারে পরিপূর্ণ। হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞতা, গাদ্দারি, ধোঁকাবাজি তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। অতএব, কোনো বিবেকবান মানুষ কীভাবে এসব মিথ্যুক, ভণ্ড ও প্রতারকদেরকে বিশ্ববাসীর জন্য শান্তিদাতা বলে মনে করতে পারে!

সুতরাং পৃথিবীর অন্য কোনো তন্ত্র-মন্ত্রের মধ্যে শান্তি তো নেই-ই; বরং রয়েছে ধোঁকা ও প্রতারণা। একমাত্র ইসলামই হচ্ছে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে শান্তির উৎস। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, শান্তির উৎসমূল হচ্ছে মানুষের পূত-পবিত্র আত্মা। তাই স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী মুমিন ব্যতীত কেউই শান্তির অধিকারী হতে পারে না। পক্ষান্তরে যে লোক নষ্ট ও ভ্রান্ত হৃদয়ের অধিকারী, সে কেবল নোংরামি ও হীনতার অধিকারী হয়ে থাকে। অন্যের মাঝে শান্তি বিলানো তো দূরের কথা, তার নিজের মাঝেই শান্তির অনুভূতি থাকে না।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। কারণ, ইসলাম মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে সুদৃঢ়ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। একমাত্র ইসলামই পেরেছে পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে। এই সুবিশাল আলোচনা সামান্য পরিধিতে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, বিধায় কয়েকটি বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করেই ক্ষান্ত করছি।

ইসলামের প্রাথমিক ঘোষণা হলো, এ ধর্মের অনুসারী সকলে ইমান ও আকিদার ক্ষেত্রে সমান এবং তারা সবাই পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾

'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।'[২৩৬]

ইসলাম আরও ঘোষণা করে যে, পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে পরস্পর পরিচিতি অর্জন ও ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করার জন্য। এর মাধ্যমেই সকলের মাঝে শান্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

---

২৩৬. সুরা আল-হুজুরাত : ১০

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

'হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান, যে তাঁকে অধিক ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।'[২৩৭]

পারস্পরিক ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও দয়ার অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ তাআলা মুমিনের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ করেন :

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।'[২৩৮]

ইসলাম নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, অপর ভাইকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসা এবং অহংকার পরিহার করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে।

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে অপর ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'[২৩৯]

মুমিন ব্যক্তি তো নিজ জীবনকে অপর মুসলিমের প্রতি ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে। অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে আচার-আচরণ, লেনদেন ও চলাফেরার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা এমন হতে হবে,

২৩৭. সুরা আল-হুজুরাত : ১৩

২৩৮. সুরা আল-ফাতহ : ২৯

২৩৯. সহিহুল বুখারি : ১/১২, হা. নং ১৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

যেন সকলে পরস্পর ভাই ভাই। তাদের একে অপরের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, থাকবে শুধু পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও পরোপকারিতা। কেউ কারও ওপর অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন করবে না। কারও সাথে কেউ দুরাচার দেখাবে না; বরং সকলে একটি দেহের মতো বসবাস করবে।

নুমান বিন বাশির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدُ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'পারস্পরিক দয়া-ভালোবাসার ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মতো। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন অনিদ্রা ও জ্বরের মাধ্যমে পুরো দেহ সাড়া দেয়।'[২৪০]

যেহেতু মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, সেহেতু একজন মুসলমান কখনো তার অন্য ভাইয়ের ওপর জুলুম করতে পারে না। বিপদে তাকে একা ছেড়ে দিতে পারে না; বরং সে অপর মুমিন ভাইয়ের প্রতি সাহায্য-সহায়তার হাত বাড়াবে, যেন তার কষ্ট ও মুসিবত সহজ হয়ে যায় এবং দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে যায়।

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করবে না। শত্রুর জুলমের মুখে তাকে সমর্পণ করবে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে কোনো মুসলিমের একটি বিপদ দূর

২৪০. সহিহু মুসলিম : ৪/১৯৯৯, হা. নং ২৫৮৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।'[২৪১]

মোটকথা, প্রতিটি মুসলিম এই পৃথিবীকে শান্তিময় করার একনিষ্ঠ কর্মী। যার সর্বনিম্ন একটি প্রমাণ হলো, কোনো মুসলমান তার অপর মুসলিম ভাইকে হাত বা কথার মাধ্যমে কষ্ট দেবে না। সকল মানুষ একজন মুসলমানের পক্ষ থেকে নিজেদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা অনুভব করবে। অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান কখনো অন্যের জানমালের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

'প্রকৃত মুসলমান হলো, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুমিন হলো, যাকে মানুষ নিজেদের জানমালের ব্যাপারে নিরাপদ মনে করে।'[২৪২]

ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তার পরিধি ব্যাপক। ইসলামের সুশীতল ছায়া সুবিস্তৃত। শুধু মানুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র সৃষ্টিজীবের জন্যই ইসলামে শান্তির বিধান রয়েছে। ইসলামের বিধান হলো, একটি প্রাণী যেন আরেকটি প্রাণীর ওপর, অনুরূপ একজন মানুষ যেন অন্য কোনো মানুষ বা প্রাণীর ওপর কোনোরূপ অবিচার না করে; বরং একে অপরের প্রতি যেন দয়াপরবশ হয়ে জীবনযাপন করে। একজন মানুষ যদি একটি বোবা প্রাণীর কষ্ট দূর করে বা তার খাদ্যের ব্যবস্থা করে কিংবা তাকে পানি পান করায়, তাহলে এর বিনিময়ে তার জন্য অনেক কল্যাণ ও উত্তম প্রতিদান লিপিবদ্ধ করা হবে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয়, ইসলাম শুধু মানুষের মাঝেই শান্তি

২৪১. সহিহ মুসলিম : ৪/১৯৯৬, হা. নং ২৫৮০ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
২৪২. সহিহ ইবনি হিব্বান : ১/৪০৬, হা. নং ১৮০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

প্রতিষ্ঠা করেনি; বরং ইসলাম মানবসমাজ পেরিয়ে প্রাণীদের মাঝেও শান্তির বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে।

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا. فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، وَخَرَجَ. فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ. يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ. فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ. ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ. فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْراً؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

'একদা এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। সে একটি কূপ দেখে সেখানে নেমে পানি পান করে আবার ওপরে উঠে আসল। তখন লোকটি দেখতে পেল, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার জ্বালায় মাটি খাচ্ছে। সে (মনে মনে) বলল, পিপাসার তাড়নায় আমার যেই অবস্থা হয়েছিল, এই কুকুরটিরও পিপাসায় একই অবস্থা হয়েছে। অতঃপর সে পুনরায় কূপে নেমে তার মোজার মধ্যে পানি ভরে কুকুরের মুখে ধরল। অবশেষে কুকুরটি তৃষ্ণা নিবারণ করল। ফলে আল্লাহ তাআলা দয়া পরবশ হয়ে লোকটিকে মাফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের কোনো প্রতিদান আছে? উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রত্যেক তাজা কলিজার অধিকারী তথা জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রতিদান রয়েছে।'[২৪৩]

রাসুলুল্লাহ ﷺ চতুষ্পদ জন্তুকে কষ্ট দেওয়ার কারণে নিন্দা প্রকাশ করেছেন। এটাকে তিনি জুলুম ও জাহান্নামে যাওয়ারও একটি কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

২৪৩. মুআত্তা মালিক : ৫/১৩৬১, হা. নং ৩৪৩৫ (মুআসসাসাতু জাইদ বিন সুলতান, আবুধাবি) - হাদিসটি সহিহ।

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ. قَالَ : فَقَالَ : وَاللهُ أَعْلَمُ : لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِيهَا وَلَا سَقَيْتِيهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا، فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

'জনৈকা মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে শাস্তি পেয়েছে। সে মহিলাটি বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, যার কারণে বিড়ালটি মারা যায়। ফলে মহিলাটি জাহান্নামে প্রবেশ করে।' বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহই ভালো জানেন, বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে আর না তাকে তুমি ছেড়ে দিয়েছিলে, যাতে সে জমিনের পোকামাকড় খেয়ে বাঁচত।'[২৪৪]

পশুর গায়ে ছাপ দেওয়া হারাম। কেননা, এতে ওদের কষ্ট হয়। ইমাম মুসলিম রহ. জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ : لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ

'একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে একটি গাধা যাচ্ছিল। তার চেহারা ছিল ছাপ দেওয়া। রাসুলুল্লাহ ﷺ তা দেখে বললেন, যে এর চেহারায় ছাপ দিয়েছে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।'[২৪৫]

ইমাম আবু দাউদ রহ. জাবির রা. সূত্রে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ : أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا؟ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

২৪৪. সহিহুল বুখারি : ২/১১২, হা. নং ২৩৬৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
২৪৫. সহিহ মুসলিম : ৩/১৬৭৩, হা. নং ২১১৭ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

'একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে চেহারায় দাগ দেওয়া একটি গাধা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি (তা দেখে) বললেন, তোমাদের নিকট কি এ সংবাদ পৌছেনি, যে ব্যক্তি পশুর চেহারায় দাগ দেয় বা প্রহার করে আমি তাকে অভিসম্পাত করেছি? অতঃপর তিনি (সামনে থেকে) এরূপ করতে নিষেধ করলেন।'[২৪৬]

এমনিভাবে এক প্রাণীকে আরেক প্রাণীর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলাও হারাম। কেননা, এর ফলে একটি আরেকটিকে গুঁতো মারতে পারে বা কোনো ক্ষতি করতে পারে। ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ পশুদের পরস্পর লড়াই করার জন্য উত্তেজিত করতে নিষেধ করেছেন।'[২৪৭]

ইসলামে শাস্তির বিধান এতটাই বিস্তৃত যে, খোঁড়া, কানা বা রোগা প্রাণীকে পর্যন্ত কষ্ট দিতে ইসলাম নিষেধ করেছে। শুধু তাই নয়; বরং সেগুলোর প্রতি ইহসান ও দয়া করার আদেশ দিয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন :

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا. وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ : مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا : نَحْنُ. قَالَ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ

২৪৬. সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৬-২৭, হা. নং ২৫৬৪ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।
২৪৭. সুনানুত তিরমিজি : ৩/২৬২, হা. নং ১৭০৮ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

'একদা আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। এক সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ প্রয়োজন সারতে গেলেন। তখন আমরা একটি হুমারা পাখি[২৪৮] দেখলাম, যার সাথে তার দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা তার বাচ্চা দুটিকে রেখে দিলাম। অতঃপর হুমারা পাখিটি পাখা ঝাপটাতে লাগল। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ এসে বললেন, কে এই বাচ্চা দুটি নিয়ে তাকে কষ্ট দিচ্ছে? তার বাচ্চা তার নিকট ফিরিয়ে দাও। এছাড়াও আমরা একটি পিঁপড়ার বাসাতে আগুন দিয়েছিলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ দেখে বললেন, কে এখানে আগুন ধরিয়েছে? আমরা বললাম, আমরা হে আল্লাহর রাসুল। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আগুনের মালিক ছাড়া কারও জন্য আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকার নেই।'[২৪৯]

এই সকল আয়াত ও হাদিসের ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম অসহায় প্রাণীর প্রতিও দয়া প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছে। এটি হচ্ছে ইসলামের বিশালত্ব, যা মানব-জিনসহ সকল প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, যখন পৃথিবীতে এ ধরনের মহান আদর্শমূলক কাজ ছড়িয়ে পড়বে, তখন অবশ্যই অন্যায়-অত্যাচার দূর হয়ে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এটাই হলো প্রকৃত শান্তি, যা কেবল ইসলামি শরিয়ার আকিদা-দর্শনের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। আর ইসলাম ছাড়া বিভিন্ন জাগতিক তন্ত্র-মন্ত্রের ধ্বজাধারী, যেমন ইহুদি-খ্রিষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক যে কেউ-ই শান্তির বুলি প্রচার করুক, তা মিথ্যা মন্ত্র বৈ কিছু নয়। তাদের এসব মিথ্যা দাবি মানবতার সাথে স্পষ্ট প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি।

২৪৮. দামিরি ﷺ বলেন, হুমারা চড়ুইয়ের মতো এক প্রকার পাখি। এটি খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। কেননা, তা চড়ুই পাখিরই একটি প্রকার।
২৪৯. সুনানু আবি দাউদ : ৩/৫৫, হা. নং ২৬৭৫ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

ইসলামের সর্বজনীনতা ও মানবতা

ইসলামের পূর্বে সকল আসমানি ধর্ম কোনো না কোনো জাতির জন্য নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য বিধিবদ্ধ ছিল। এ সকল ধর্মের পরিসীমাও ছিল সীমাবদ্ধ। উদাহরণত তখন সে ধর্মটি একটি প্রজন্মের জন্য উপযোগী হতো অথবা তা মানুষের মধ্যকার নির্দিষ্ট এক জাতির জন্য উপযোগী ছিল।

কিন্তু ইসলাম এমন এক বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান, যা মানব অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল। ইসলাম সকল মানুষের জন্য; চাই সে মানুষ যে জাতি বা যে বংশ কিংবা যে সময়ের-ই হোক না কেন। কারণ, ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সব সময়ের জন্য উপযোগী। সবার জন্য এক অনুপম আদর্শ। আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির জন্য ইসলামের প্রযোজ্যতা সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

'আপনি বলে দিন, হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসুল।'[২৫০]

তিনি আরও বলেন :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾

'আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।'[২৫১]

ইসলাম তার মহান জীবনব্যবস্থার কারণে সকল প্রথাপ্রীতি, জাতীয়তা ও দেশচেতনাকে ডিঙিয়ে মানবতার জন্য এক অনুপম আদর্শ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছে, যা সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম সমগ্র মানবতার জন্য একটি উৎকর্ষ জীবনব্যবস্থা হিসাবে সর্বদা বিরাজমান থাকবে। তার সামনে যত

২৫০. সুরা আল-আরাফ : ১৫৮
২৫১. সুরা সাবা : ২৮

প্রতিবন্ধকতাই আসুক না কেন, ইসলামের অনুসারী ও দায়িগণ যত বাধা-প্রতিবাদেরই সম্মুখীন হন না কেন, কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম স্বমহিমায় চিরউজ্জ্বল থাকবে।

এ সকল বাধা সত্ত্বেও ইসলাম সদা মানবতার ধর্মরূপেই বিদ্যমান থাকবে। তাই ইসলাম ও মানবতার মাঝে কোনো কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন : রীতি-নীতি, আইন-কানুন, দেশ ও সময়ের ভিন্নতাসহ বিভিন্ন বাধা। ইসলাম এ সকল বস্তুর কোনোরূপ স্বীকৃতিই দেয় না; বরং ইসলামের ডাক হলো প্রকৃত মানবতার প্রতি, যাতে পৃথিবীকে একটি পরিশুদ্ধরূপে নিয়ে যাওয়া যায়। ইসলামের আহ্বান হলো, মানুষের মন-মানসিকতাকে পরিশুদ্ধ করার প্রতি, যেন তার মাঝে চিন্তার ঔজ্জ্বল্যের মতো অমূল্য সম্পদকে নিকৃষ্ট চিন্তাধারার স্থানে প্রতিস্থাপিত করা যায়। এ ছাড়াও ইসলামের দাওয়াত হলো, সমাজের বিভিন্ন অংশে বিরাজমান কুপ্রথা, কুসংস্কার ও খারাপ অবস্থার সংশোধনের প্রতি। যাতে প্রত্যেক ময়লা-আবর্জনা, নাপাকি ও ফাসাদ থেকে পৃথিবীকে সংশোধন করা যায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾

'হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে। এরপরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক আল্লাহভীরু।'[২৫২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

২৫২. সুরা আল-হুজুরাত : ১৩

'হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ হতে সমাগত হয়েছে উপদেশ, অন্তরস্থ রোগের শিফা এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।'[২৫৩]

ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তা সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী থাকবে। জীবন অবসানের চরম মুহূর্তটি পর্যন্ত এর প্রতি আনুগত্য করে চলতে হবে। এ ধর্মটিই সমগ্র মানবতার পালনীয় একমাত্র ধর্ম। অন্য কোনো ধর্ম বা মতাদর্শ অনুসরণ বা পালন করার অবকাশ নেই। কেননা, অন্যান্য আসমানি ধর্মের ওপর এর মর্যাদা চিরন্তন। ইসলাম অন্যান্য আসমানি ধর্মের সত্যায়নকারী। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ইসলামের মৌলিক ভিত্তিসমূহের অংশ-বিশেষ উল্লেখ করে বলেন :

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾

'আর আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর সংরক্ষক।'[২৫৪]

অন্যান্য জীবনব্যবস্থা, জাতীয়তা, আইন-কানুন ও ধর্মের ওপর ইসলামকে কর্তৃত্ব প্রদান ও বিজয়ী করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾

'তিনিই তাঁর রাসুলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে সকল দ্বীনের ওপর একে বিজয়ী করেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'[২৫৫]

২৫৩. সুরা ইউনুস : ৫৭
২৫৪. সুরা আল-মায়িদা : ৪৮
২৫৫. সুরা আস-সফ : ০৯

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম মানুষের স্বভাবধর্ম। এখানে গোত্রপ্রীতি, বর্ণবাদ, বংশীয় আভিজাত্য, ভাষা বিভেদ, জাতীয়তা ও দেশচেতনার কোনো স্থান নেই। ইসলাম কোনো জাতির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন ইহুদি ও খ্রিষ্টান; তারা ছিল বিশেষ দুটি জাতি। তাদের জন্য আনীত ধর্ম তাদের জাতির মাঝেই নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ইসলাম সমগ্র বিশ্বের জন্য, সকল মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ। ইসলাম সমগ্র মানবতার জন্য এক সর্বজনীন ধর্ম।

ইসলামি শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলাম সর্বযুগ ও সর্বস্থানের জন্য উপযুক্ত একমাত্র ধর্ম। ইসলাম যে সব বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত, সে সব বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোঁটাও আমরা অন্য কোনো ধর্ম বা মতাদর্শে দেখি না। এ ক্ষেত্রে ইসলামের সমমর্যাদার বা নিকটতম কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ইসলামি শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণিত হলো।

প্রথমত, শরিয়তের বিধিবিধানের ব্যাপকতা

এ বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য ইসলামের শাখাগত বিধিবিধান, মৌলিক বিধিবিধান নয়। বিস্তারিত বলতে গেলে, ইসলামি ফিকহ শরিয়তের বিস্তারিত মাসআলা লিপিবদ্ধ করে থাকে। ফুকাহায়ে কিরাম বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী গবেষণা ও পর্যালোচনার আলোকে বিভিন্ন পরিস্থিতির সমাধান ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা দেন। এ সম্পর্কে উদাহরণ হিসাবে আল্লাহ তাআলার এ বাণীটি উল্লেখ করা যায় :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলো পূর্ণ করো।'[২৫৬]

এ আয়াতটি সংক্ষিপ্ত ও ছোট হলেও এটি ইসলামের একটি মূলনীতি হিসাবে পরিগণিত। এর ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত, নাগরিক ও জাতীয় বিভিন্ন

২৫৬. সুরা আল-মায়িদা : ১

নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ নীতিটি প্রণয়নের অন্যতম কারণ হলো, সকলে যেন সর্বদা লেনদেন ও চলাফেরায় সততা, সরলতা ও ইনসাফ বজায় রাখে। এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে চুক্তি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকারসমূহের আলোচনায়।

মহান আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾

'আর তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে।'[২৫৭]

উক্ত আয়াতটি ইসলামি শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। দ্বীন ইসলাম অনুযায়ী ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শুদ্ধতা নির্ণায়ক হিসাবে উক্ত আয়াতটি হলো মাপকাঠি। ইসলামে শাসনব্যবস্থার অন্যতম বিষয় হলো পরামর্শভিত্তিক কাজ সম্পাদন করা। কুরআনে পরামর্শের কথা বলা হলেও শুরার ধরন বা কাঠামোর বর্ণনা এতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়নি। বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সাধারণের কল্যাণের জন্য পরামর্শের ধরন, পথ, পদ্ধতিসহ কাঠামোগত বিবরণ রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের জিন্দেগিতে পাওয়া যায়। তাঁরা তাঁদের শাসনব্যবস্থায় এ আয়াতের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানত তার প্রাপকের নিকট অর্পণ করতে আদেশ করেন।'[২৫৮]

আমানত রক্ষা ও তত্ত্বাবধান ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে এটি প্রভুর পক্ষ থেকে ঘোষণা। আমানত এমন একটি শব্দ, যা প্রত্যেকের ওপর অর্পিত দায়িত্বকে

২৫৭. সুরা আশ-শুরা : ৩৮
২৫৮. সুরা আন-নিসা : ৫৮

অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে আদেশ করা হয়েছে, যেন পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে এ ওয়াজিব আদায় করা হয় এবং আমানত আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো কমতি না ঘটে। অতএব বলা যায় যে, আমানতের আবর্তনে নামাজ, রোজা, মেহমানদারি, প্রতিবেশীর অধিকার আদায়, মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণসহ প্রতিটি দায়িত্বই অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহও এর অন্তর্ভুক্ত। যেন জিহাদের মাধ্যমে ইসলামি ভূখণ্ড থেকে শত্রু ও শত্রুদের সকল অনিষ্টতা প্রতিরোধ করা যায়।

এমনিভাবে উত্তম শিক্ষা দেওয়া ও ফিতনাপূর্ণ পরিবেশ, মিডিয়া, সংস্কৃতিসহ প্রভৃতি থেকে সন্তানকে রক্ষা করা উক্ত আমানতেরই একটি অংশ। ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা থেকে মন-মানসিকতা রক্ষা করা, কাফিরদের আক্রমণ থেকে ইসলামি ভূখণ্ড রক্ষা করা, প্রত্যেক বস্তুর স্ব স্ব অধিকার রক্ষা ও তত্ত্বাবধান করাও কুরআনে বর্ণিত আমানতের অন্তর্ভুক্ত এবং হাদিসে বর্ণিত আমানতের একটি প্রকার। এগুলো এমন নুসুস, যা বিভিন্ন মর্মার্থ, হুকুম-আহকাম ও উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ক্ষেত্রে এগুলোর চাহিদা হলো, ফুকাহায়ে কিরাম শাখাগত মাসআলাকে গবেষণা করার জন্য আরও অধিক প্রচেষ্টা চালাবেন।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি শরিয়ত সংস্কার থেকে মুক্ত

ইসলামি জীবনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আকিদা, ইবাদত, আখলাক-সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো কালের বিবর্তন সত্ত্বেও কোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, কম বা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে একবারেই মুক্ত। পূর্বে তা যেভাবে অটল ছিল, বর্তমানেও সেভাবেই অটল রয়েছে। ইসলামি জীবনব্যবস্থা শুদ্ধ হওয়ার সত্যতা প্রমাণে এ বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য। এ মূলভিত্তির ওপর নির্ভর করে মিল্লাতে ইসলামিয়া গঠিত হয়েছে দৃঢ়তা ও অবিচলতার গুণে। এ বৈশিষ্ট্য উম্মাহর মাঝে ধারাবাহিকতা রোপিত করে। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামি শরিয়তের মাঝে কোনো অস্থিরতা বা এলোমেলো ভাব প্রবেশ করতে পারে না। অথচ অন্যান্য সংস্কারপন্থী মানবরচিত ব্যবস্থায় দেখা যায় টালমাটাল অবস্থা।

ইসলামি আকিদা, ইবাদত ও আখলাকসংশ্লিষ্ট শিক্ষার দৃঢ়তার কারণে ইসলামি জীবনব্যবস্থা একটি পৃথক ও অনন্য নির্দেশিকা। এখানে রয়েছে স্পষ্টতা ও বিন্যস্ততা। এতে বিশৃঙ্খলার সামান্যতম কোনো সম্ভাবনা নেই। এর বিপরীত মানবরচিত ব্যবস্থা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজনে ভরপুর। কেননা, তা কোনো আকিদাগত দৃঢ়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই যেকোনো মানবরচিত আকিদা, যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হওয়ার উপযুক্ত; তার অনুসারীরা তাতে কম-বেশি করার ক্ষেত্রে কোনো দোষ মনে করে না। এরকম যদি হয় কোনো আদর্শের অবস্থা, তবে তাতে আকিদা-বিশ্বাসে কোনো রকম অবিচলতা, নির্দিষ্ট কাঠামো, অথবা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলতে কিছুই থাকে না; বরং এমন আদর্শ বা মতবাদ বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

নিঃসন্দেহে এমন পরিবর্তন বা কমবেশ করার কারণে অচিরেই সে মতাদর্শের আকিদা-বিশ্বাস আমূল পাল্টে যায়। ফলে তা ভিন্ন ও নতুন এক মতাদর্শে পরিণত হয়। এটাই সে বিশৃঙ্খলা, যার কারণে বিষয়টা সম্পূর্ণই এলোমেলো হয়ে পড়ে। ফলে একপর্যায়ে খোলা হস্তক্ষেপ ও আমূল পরিবর্তনের কারণে সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যা একটি মতাদর্শের মৃত্যু সমতুল্য।

কিন্তু ইসলামি আকিদা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে অটল রয়েছে। কালের পর কাল, প্রজন্মের পর প্রজন্ম এবং যুগের শত আবর্তন সত্ত্বেও তা স্বীয় দৃঢ়তায় অবিচল। তার এ দৃঢ়তা থেকেই বেরিয়ে আসে সমৃদ্ধ মুসলিম প্রজন্ম, যারা সুদৃঢ় ঐক্য, পরিকল্পনা ও পরিতৃপ্তির ক্ষেত্রে অভিন্ন সত্তাকে ধারণকারী। বিশ্বাস ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে যাদের কাঠামো এক ও অভিন্ন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾

'নিশ্চয় এরা তো তোমাদেরই জাতি, একই ধর্মে বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের রব; অতএব আমার ইবাদত করো।'[২৫৯]

২৫৯. সুরা আল-আম্বিয়া : ৯২

তৃতীয়ত, ইসলামি জীবনব্যবস্থা স্পষ্ট

ইসলামে অস্পষ্টতা বলে কিছু নেই। ন্যায়পরায়ণতার ওপর এর ভিত্তিমূল স্থাপিত। ইসলাম তার অবস্থানে সিদ্ধান্ত নেওয়া অথবা কোনো হুকুম প্রকাশের ক্ষেত্রে কারও প্রবৃত্তির অনুসারী নয়; বরং তা প্রকৃত সত্যকে প্রকাশকারী। ইসলাম প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে সত্য ও বাস্তবতার ওপর নির্ভর করে। রাগের বশবর্তী না হয়ে বা কারও প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে শুধু দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকৃষ্ট অবস্থার অনুসরণ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায় ও সত্য থেকে সরে যাওয়া কিংবা কারও ব্যক্তিগত আগ্রহ বা প্রবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা খুবই নিন্দনীয়।

নববি যুগ থেকে চলে আসা সেই আদর্শের ওপর দৃঢ় থাকার দৃষ্টান্ত ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো মতাদর্শ, ধর্ম বা আইনের মাঝে নেই। অবস্থা যাই হোক না কেন, ইসলাম সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সদা ন্যায়ের আলোকেই কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। ইসলাম খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা বা সত্য থেকে পিছিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকার কথা বলে। ইসলামের এ বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে সকলেই পূর্ণভাবে অবগত রয়েছে। একমাত্র মিথ্যাবাদী ও হঠকারী লোকেরাই বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে।

এ বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহয় অসংখ্য প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। সকল প্রমাণাদিই ইসলামের মহান মর্যাদা ফুটিয়ে তোলে। ইসলাম সত্যকে রক্ষা ও মানুষের সাথে প্রকাশ্য ন্যায়ানুগ আচরণ করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। এ বিষয়ে ইসলামের ওপর কোনো ধরনের প্রতারণা বা তোষামোদির অপবাদ আপতিত হয় না। ইসলামে মানুষের ভুল জ্ঞান থেকে উদ্ভাবিত মানদণ্ডের কোনো ভিত্তি নেই। আর মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত মানদণ্ড ন্যায় বা সত্যের ওপর নির্ভর করে হয় না; বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ, আমিত্ববোধ, স্বৈরাচারিতা ও কার্পণ্য করার মতো মন্দ স্বভাবগুলোই হয় এর মূল উৎস।

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে বিচার ও শাসনের ক্ষেত্রে ধনী-গরিব, শাসক-শাসিত, নারী-পুরুষ, সুন্দর-কুৎসিত—সবাই সমান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের ওপর ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিত্তিকে মজবুত রাখার জন্য বলেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও আল্লাহর সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়। কেউ যদি সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের চেয়ে তাদের ব্যাপারে অধিক কল্যাণকামী। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে (জেনে রেখো) আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কেই অবগত।'[২৬০]

সত্য বলা ও সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এরকম গুরুত্ব দেওয়া মূলত দৃঢ়তা ও ন্যায়ের দিক থেকে পূর্ণতার পরিচায়ক। কতিপয় মানুষের চাপে পড়ে ন্যায় থেকে দূরে সরার মতো অপরাধ থেকে ইসলাম সাবধান করে। যখন কোনো ব্যক্তি কারও প্রতি অথবা কোনো গোষ্ঠীর প্রতি রাগান্বিত থাকে, তখন অন্যের প্রতি তার এ ঘৃণা অনেক সময় তাকে সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে, যা কোনোক্রমেই উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ হলো, কোনো ধরনের বক্রতা বা কারও প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ব্যতীত সর্বদা সত্য ও সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করা।

---

২৬০. সূরা আন-নিসা : ১৩৫

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সংগত সাক্ষ্যদান করো। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে অবিচার করার প্রতি প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।'[২৬১]

কোনো ধরনের ঘুরানো-প্যাঁচানো বা ইতস্তত করা ব্যতীত ইসলামের মহান বিধানের ওপর দৃঢ় থাকাকে ওয়াজিব করে রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাথে মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করে কুরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'অতএব তুমি এবং তোমার সাথে যারা তাওবা করেছে, সবাই অটল থাকো; যেভাবে তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। আর সীমালঙ্ঘন করো না, তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।'[২৬২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

২৬১. সুরা আল-মায়িদা : ৮
২৬২. সুরা হুদ : ১১২

'যারা বলে, আমাদের রব তো আল্লাহ এবং এই বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।'[২৬৩]

ইমাম মুসলিম رحمه الله সুফইয়ান বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ : قُلْ، آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ.

'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যে ব্যাপারে আমি আপনার পর আর কাউকে আর জিজ্ঞেস করব না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি বলো, আমি আল্লাহর প্রতি ইমান আনলাম, অতঃপর তার ওপর অবিচল থাকো।'[২৬৪]

চতুর্থত, ইসলামি জীবনব্যবস্থা মানবপ্রকৃতির উপযোগী

মানুষের সৃষ্টিগত ইচ্ছা, ঝোঁক, আগ্রহ ও স্বভাবকে ফিতরাত বলে। প্রত্যেক মানুষেরই সৃষ্টিগতভাবে আত্মিক, মানসিক, শারীরিক কিছু আগ্রহ বা সহজাত বাসনা থাকে। যেমন কেউ সৃষ্টিগতভাবে মেধাবী বা দক্ষ হয়, আবার কেউ ধার্মিক হয়, কারও সন্তানসন্ততি কিংবা ধন-সম্পদের প্রতি প্রবল আসক্তি থাকে। সৃষ্টিগত এমন আরও অনেক চাহিদা আছে, যেগুলোর প্রতি মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় দুর্বল হয়ে যায়। কিংবা মানুষের ভেতরে থ াকা এ স্বভাবের প্রতি তাদের আন্তরিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচ্ছে, এসব কামনা-বাসনা পূরণের ক্ষেত্রে শরিয়ত-নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা যাবে না।

মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহকে স্রষ্টা ও ইসলামকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। তাই বলা যায়, ইসলাম মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ধর্ম।

২৬৩. সুরা আল-আহকাফ : ১৩
২৬৪. সহিহ মুসলিম : ১/৬৫, হা. নং ৩৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

ইসলামে রয়েছে সব ধরনের চাহিদা পূরণের সুষম ব্যবস্থা। মানুষ তার চাহিদা পূরণে ততটুকু এগোতে পারবে, যতটুকু শরিয়তসম্মত হবে। চাই সে চাহিদা আর্থিক হোক, জৈবিক হোক বা মানসিক হোক। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে ইরশাদ করেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ -وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা ওই সব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাদের যেসব বস্তু দান করেছেন, তন্মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তুগুলো আহার করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।'[২৬৫]

যেসব মানুষ হালাল জিনিস পরিত্যাগ করে নিজেদের অনর্থক কষ্ট দেয়, তাদের নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

'হে রাসুল, আপনি জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করেছে? আপনি ঘোষণা করে দিন, এসব তো তাদের জন্যই, যারা পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে। এমনিভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিই।'[২৬৬]

২৬৫. সুরা আল-মায়িদা : ৮৭-৮৮
২৬৬. সুরা আল-আরাফ : ৩২

মুসতাদরাকে হাকিমের বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

'অপচয় না করে এবং অহংকারের বশবর্তী না হয়ে তোমরা খাও, পান করো ও সদকা করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর তাঁর দেওয়া নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন।'[২৬৭]

পৃথিবীতে মানবরচিত এমন কোনো ধর্ম, মতবাদ, আকিদা ও তন্ত্র-মন্ত্র নেই, যা মানুষের স্বভাবজাত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। একমাত্র ইসলামই হচ্ছে এমন ধর্ম, যা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। মানবরচিত সকল মতাদর্শের মাঝে দুটি অবস্থা সর্বদা দৃশ্যমান থাকে। হয় তাতে অতি ছাড়াছাড়ি রয়েছে নতুবা রয়েছে অতি বাড়াবাড়ি। যদি কোনো ধর্মে অতি বাড়াবাড়ি হয়, তাহলে সেই ধর্ম পালন করতে গিয়ে তার অনুসারীরা কষ্ট ও ভোগান্তিতে পড়ে। তাদের এরকম ধর্মের লালনপালন নিজের ওপর জুলুম হয়ে পড়ে। আর যদি কোনো ধর্মের মধ্যে অতি ছাড়াছাড়ি হয়, তাহলে এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই উভয় অবস্থা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের বিপরীত। ফিতরাত কখনো এই দুই অবস্থা মেনে নেয় না। এর মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য।

যদি পরিপূর্ণভাবে মানুষের বিবেক বিবেচনায় কাজ করা হয়, তাহলে মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবই অসত্য থেকে সত্যকে, নকল থেকে আসলকে, আঁধার থেকে আলোকে আলাদা করে নিতে পারবে। অর্থাৎ যদি সঠিকভাবে বিবেক দ্বারা চিন্তা করা হয়, তাহলে বিবেকই যেকোনো মতাদর্শের কল্যাণকামিতা অথবা ভ্রষ্টতা স্পষ্ট করে নিতে পারবে। সুতরাং যেসব মতাদর্শ মানুষের ফিতরাতের বিপরীত, নিঃসন্দেহে তা ভ্রান্ত। এসব মতাদর্শের শেষ পরিণতি

২৬৭. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/১৫০, হা. নং ৭১৮৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

হলো জাতির ধ্বংস ও অধঃপতন। তা ছাড়া বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে যে, মানবরচিত ধর্ম বা সংবিধান জাতিকে হতাশা, অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। বাস্তব পরিসংখ্যানেও এমনই দেখা যায়। আর অন্য ধর্মগুলোতে যেহেতু ফিতরাত বিবেচিত নয়, তাই সেগুলো ফিতরাতের চাহিদা পূরণ করেও না বা করতে সক্ষমও নয়। আর ইসলাম যেহেতু মানুষের ফিতরাতের বিবেচনা করে, তাই ইসলাম ফিতরাতের চাহিদা পূরণ করে থাকে সুষম পদ্ধতিতে।

অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা মধ্যপন্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির স্থান নেই। ইসলামই হলো এমন ধর্ম, যা পুরোপুরি ন্যায়সংগত। ভারসাম্যতা ও মিতাচার ইত্যাদি উন্নত বৈশিষ্ট্য দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে আছে স্বভাবধর্ম ইসলাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

'এভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থী জাতি করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়। তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে, তা আমি এ জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যাতে আমি জেনে নিই যে, কে রাসুলের অনুসরণ করে আর কে তা হতে স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাতে ফিরে যায়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্য নয়, আল্লাহ যাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ইমান বিনষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়।'[২৬৮]

২৬৮. সুরা আল-বাকারা : ১৪৩

সহিহ সনদে মুতাররিফ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا

'সকল কিছুতে মধ্যপন্থাই উত্তম।'[২৬৯]

ফিতরাতের সাথে ইসলামের সামঞ্জস্যতা পরিপূর্ণভাবে বুঝে আসবে, যদি আমরা কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত ইসলামের বিভিন্ন হুকুম-আহকামের প্রতি লক্ষ করি। যেমন : হালাল-হারাম, হুদুদ-কিসাস, বিবাহ-তালাক, মুআমালা-মুআশারা ইত্যাদি মাসআলাসহ এমন প্রতিটি বিধানের প্রত্যেকটি মাসআলার দিকে লক্ষ করলে আত্মিক, মানসিক, মেধাবৃত্তিক বা শারীরিক দিক থেকে ফিতরাতের সাথে ইসলামের সামঞ্জস্যতা সহজে ও স্পষ্টভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

পঞ্চমত, ইসলাম দলিলনির্ভর জীবনব্যবস্থা

ইসলাম কখনো বলপ্রয়োগ ও অন্যায় হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। কারণ, এটা ফিতরাতের বিপরীত। ইসলামের দাওয়াত একজন মানুষের জীবনের শুধু অংশ-বিশেষের জন্য নয়; বরং তার শারীরিক, মানসিক, আত্মিকসহ সকল বিষয়ের সাথেই মিশে আছে ইসলাম। সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধিবিধান প্রযোজ্য।

এটাই হলো ইসলামের অবস্থান। যেমনিভাবে তা একজন পরিপূর্ণ মানুষের ওপর পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য; তেমনিভাবে মানুষের সকল বিষয়ের সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলাম দলিল-প্রমাণের ওপর নির্ভর করে। কারণ, দলিল-প্রমাণ মানুষকে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গভীর জ্ঞান দান করে। তাই আল্লাহ তাআলা ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে এই দাওয়াত ফলপ্রসূ হয় এবং মানুষের হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে।

২৬৯. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৭/১৭৯, হা. নং ৩৫১২৮ (মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ) - হাদিসটি সহিহ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

'তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সুন্দর পন্থায়। তোমার রব ভালো করেই জানেন, কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয় আর কে সৎ পথে আছে।'[২৭০]

কঠোরতা পরিহার করে দয়ার্দ্র ভঙ্গিতে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

'অতএব, আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন। আপনি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আপনার পাশ থেকে সরে পড়ত। তাই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি যখন সংকল্প করেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।'[২৭১]

স্বাভাবিকভাবে ইসলাম দয়া, কোমলতা, নম্রতা, উদারতা ও বদান্যতার ধর্ম, যা অন্তর ও আত্মায় প্রভাব সৃষ্টি করে। তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে কঠোরতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ, কখনো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যখন আর উদারতা ও কোমলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব হয় না; বরং কঠোরতাই

২৭০. সুরা আন-নাহল : ১২৫
২৭১. সুরা আলি ইমরান : ১৫৯

তখন কাম্য হয় এবং কল্যাণের জন্য সেটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সদয় আচরণ কিছু মানুষের অন্তরে রেখাপাত করে না। তাই তাদের সাথে ইসলাম কঠোরতার বিধান আরোপ করেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথেই আছেন।'[২৭২]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

'যে সমস্ত আহলে কিতাব আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ইমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন—তা হারাম মানে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় করজোড়ে জিজিয়া প্রদান করে।'[২৭৩]

ইসলামে অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহ, হত্যাযজ্ঞ চালনা, ধ্বংসের নেশা কিংবা যুদ্ধের প্রতি আসক্তির কারণে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়নি; বরং ইসলামের শান্তির দাওয়াত গ্রহণ না করার কারণে অবাধ্য, পাপিষ্ঠ, সীমালঙ্ঘনকারী কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ আবশ্যক করা হয়েছে। কিছু মানুষ তো মুখের কথাতেই আল্লাহর দ্বীন কবুল করে নেয়। আর কিছু মানুষ আছে, কবুল

২৭২. সুরা আত-তাওবা : ১২৩
২৭৩. সুরা আত-তাওবা : ২৯

তো করেই না; বরং যারা কবুল করে, তাদের বাধা দেয় এবং বিভিন্নভাবে অরাজকতা ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাদের শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহ তাআলা জিহাদের বিধান অবতীর্ণ করেছেন। তা ছাড়া বেইমান কাফিররা মুসলমানদের ওপর অমানবিক নির্যাতন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের এই নির্যাতন বন্ধ করার জন্য জিহাদের কোনো বিকল্প নেই।

আর মুসলমানরা গনিমত লাভের আশায়, পার্থিব লোভে পড়ে অথবা প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য জিহাদ করে না। তারা জিহাদ করে তাদের আকিদা ও ধর্মের তাগিদে। যেন এ মহান মতাদর্শকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কারণ, ইসলাম হচ্ছে সত্যতা, কল্যাণ, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত দাবিদার।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম ও অমুসলিমদের যুদ্ধের পার্থক্য বর্ণনা করে ইরশাদ করেন :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾

'যারা মুমিন, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির, তারা শয়তানের পক্ষে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল দুর্বল।'[২৭৪]

ইসলামের নীতি হলো, প্রথমে দয়া, ভালোবাসা ও কোমলতা দেখিয়ে কাউকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া; যেন সে আল্লাহর রাজত্ব ও ক্ষমতার সামনে নতি স্বীকার করে অনন্তকালের চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু যখন এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে ইসলামের দাওয়াত উপেক্ষা করে, তখন ইসলাম আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠিন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

২৭৪. সুরা আন-নিসা : ৭৬

যেহেতু ইসলাম প্রভূত কল্যাণের ধারকবাহক, সেহেতু বিভিন্ন অন্যায়, অকল্যাণ, অবাধ্যতা থেকে সমাজ, দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য সেসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইসলাম সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। যেমন : চুরি, ডাকাতি, হত্যা, মদপান, অশ্লীল কর্ম ইত্যাদি। এসব অপরাধ দমনের জন্য ইসলাম সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অর্থাৎ অপরাধের মাত্রাভেদে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করেছে। অপরাধের শাস্তি দিতে ইসলাম ফৌজদারি আইনের ব্যবস্থা করেছে। আর এই ফৌজদারি আইনে শাস্তি তিন ধরনের। যথা : হুদুদ, কিসাস ও তাজির। এগুলোর প্রতিটিই সুদীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে, যা দণ্ডবিধির আলোচনায় বিশদভাবে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ষষ্ঠত, ইসলাম মানুষের কষ্টকে লাঘবকারী

ইসলাম হচ্ছে সহজ ও সরল ধর্ম। একজন মুসলমান যেন কোনো কষ্ট বা সমস্যায় না পড়ে, সে জন্য ইসলাম তার জন্য দিয়েছে যথোপযুক্ত বিধান। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে অসংখ্য নস থেকে আমরা এ বিষয়টির সমর্থন পাই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾

'আর তোমরা আল্লাহর জন্য শ্রম শিকার করো যেভাবে শ্রম শিকার করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। তিনি ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের আদর্শ। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও তাই। যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় এবং তোমরা সাক্ষী হও

মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। তিনি তোমাদের অভিভাবক। অতএব, কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!'[২৭৫]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾

'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহে হজ অথবা উমরা পালন করে, তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নয়। আর কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞ।'[২৭৬]

ইসলামের নীতি হলো, ইসলাম কখনো মানুষের ওপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেয় না। সে যতটুকু পারবে, ঠিক ততটুকু কর্তব্যই তার ওপর আরোপিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

'কোনো ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না।'[২৭৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস থেকেও ইসলামের সহজতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন :

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ : الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

২৭৫. সুরা আল-হজ : ৭৮
২৭৬. সুরা আল-বাকারা : ১৫৮
২৭৭. সুরা আল-বাকারা : ২৮৬

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম কোনটি?" উত্তরে তিনি বললেন, সঠিক ও উদারতাময় ধর্ম।'[২৭৮]

ইমাম বুখারি আয়িশা সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন :

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে যদি দুটি জিনিসের মধ্য হতে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে পাপকর্ম না হলে তিনি সবচেয়ে সহজটা গ্রহণ করতেন।'[২৭৯]

ইমাম বুখারি আনাস থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلَا تُنَفِّرُوا

'তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, ভীত-সন্ত্রস্ত করো না।'[২৮০]

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল, ইসলাম সহজতার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি শক্তিশালী ধর্ম। ইসলাম বাড়াবাড়ি, গোঁড়ামি ও অপ্রয়োজনীয় কাঠিন্যকে সমর্থন তো করেই না; বরং এগুলোকে বর্জন করতে বলে।

সপ্তমত, ইসলাম মানুষের কল্যাণকর বিষয় বাস্তবায়নকারী

ইসলাম মানুষের জন্য সকল কল্যাণকর বিষয় বাস্তবায়ন করে এবং সকল অকল্যাণকর বিষয় প্রতিহত করে। এটি আল্লাহপ্রদত্ত একটি মৌলভিত্তি। মানবতাকে সকল গোমরাহি, ভ্রষ্টতা, মানুষের দাসত্ব ও অপদস্থতার অন্ধকার থেকে বের করে এনে কল্যাণ ও শান্তির পথ দেখানোর জন্যই এমন অনন্য বিধান আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। ইসলাম মানুষের

২৭৮. মুসনাদু আহমাদ : ৪/১৭, হা. নং ২১০৮ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।
২৭৯. সহিহুল বুখারি : ৪/১৮৯, হা. নং ৩৫৬০ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
২৮০. সহিহুল বুখারি : ১/২৭, হা. নং ৬৯ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে সত্য ও ন্যায়, দূরীভূত করেছে অসত্য ও অন্যায়কে। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা নবিয়ে রহমত মুহাম্মাদ ﷺ-এর শানে ইরশাদ করেন :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

'আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।'[২৮১]

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾

'আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমালঙ্ঘনকারীদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।'[২৮২]

مصلحة (মাসলাহাত) বা কল্যাণ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ। এ শব্দটি মানুষের ব্যষ্টিক ও সামাজিকসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানসিক, শারীরিক, আর্থিক ও স্বভাবগত সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর যেহেতু এটি একটি ব্যাপক পরিভাষা, তাই এর সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন রয়েছে। আর যখন মানুষ শরিয়া-নির্দেশিত বিধান জানবে, তখন এর মাধ্যমে তারা অনেক উপকার হাসিল করতে পারবে।

ইসলামি শরিয়তের বর্ণনা থেকে আমরা জানি مصلحة (মাসলাহাত) বা কল্যাণকামিতার বহু দিক রয়েছে। তেমনই একটি দিক হলো ক্রয়-বিক্রয়। ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ নানানভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। যেমন : মুদারাবা ব্যবসা, শেয়ার ব্যবসা, বর্গাচাষ, ভাড়াচুক্তি, অগ্রিম অর্থে লেনদেন, বাকি অর্থে লেনদেন, বন্ধক এমন আরও অনেক চুক্তি আছে, যেগুলো দ্বারা চুক্তিকারীরা পরস্পর লাভবান হতে পারে।

আমরা আগেই জেনেছি, ইসলাম মানুষের কল্যাণ কামনা করে এবং অকল্যাণকে দূর করে। مصلحة (মাসলাহাত) বা কল্যাণ-কামনা শব্দটি যেমন ব্যাপক অর্থবোধক, مفسدة (মাফসাদাত) শব্দটিও ক্ষতির অর্থে তেমনই ব্যাপকতাসম্পন্ন। এ শব্দটি মানুষের সব ধরনের অকল্যাণ,

২৮১. সুরা আল-আম্বিয়া : ১০৭
২৮২. সুরা বনি ইসরাইল : ৮২

অন্যায়, অত্যাচারকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এটি মানুষের যেকোনো ধর্মীয়, মানসিক, আর্থিক, পারিবারিক অথবা সামাজিক কষ্ট-ক্ষতিসহ যাবতীয় ক্ষতি ও অনিষ্টের বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইসলাম মানুষের সকল কল্যাণকামিতা আদায়ের পাশাপাশি সব ধরনের অকল্যাণকে দূর করার আদেশও দিয়েছে। এ বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন করতে। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।'[২৮৩]

অকল্যাণ শব্দটি সব ধরনের কষ্ট ও কাঠিন্যকে নির্দেশ করে। উদাহরণত দারিদ্র্য, অসুস্থতা, অজ্ঞতা, ধোঁকাবাজি, ছিনতাই, চুরি, সুদ, ঘুষ, জিনা, আত্মসাৎ ইত্যাদি এ শব্দটির ব্যাপকার্থের মাঝে নিহিত। এসব বিষয়ের প্রতি ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তাই এসব ক্ষতির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং সেগুলো দূর করার নির্দেশ দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

'ক্ষতি করাও যাবে না এবং ক্ষতি সহাও যাবে না।'[২৮৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক অর্থবোধক একটি হাদিস। যেকোনো ধরনের ক্ষতিই এই হাদিসের আওতায় পড়বে। যার মর্মার্থ হলো, ইসলামে অযাচিত সব ধরনের ক্ষতি বা অকল্যাণকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই কেউ যেন কারও অন্যায়ভাবে ক্ষতি না করে।

২৮৩. সুরা আন-নাহল : ৯০
২৮৪. মুসতাদরাকুল হাকিম : ২/৬৬, হা. নং ২৩৪৫ (দারুল কুতবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

শরিয়ত প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

دِين (দ্বীন) তথা ধর্মের অর্থ হলো—উপাসনা করা, বিনয়ী হওয়া, আল্লাহর আদেশ মেনে চলা ও আনুগত্য করা।[২৮৫]

এই শব্দটিকে যখন মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তখন এর অর্থ হয়, 'কষ্ট হলেও আল্লাহ তাআলার হুকুমের আনুগত্য করা, পরিপূর্ণভাবে শরিয়ার অনুসরণ করা।' আল্লাহ তাআলা যেসব বিধান পালন করার আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো মানা এবং যেগুলো থেকে নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকা-ই হলো দ্বীন। অর্থাৎ শোনামাত্রই আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের সামনে কোনোরূপ দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই আত্মসমর্পণের নাম দ্বীন।

যেহেতু এই শরিয়ত ব্যাপক, সেহেতু তা বিভিন্ন ধরনের কষ্ট, কাঠিন্য ও প্রতিকূলতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে হতে কোনোটি ইমান ও আকিদার সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার কোনোটি ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক বা মানবজীবনের যেকোনো অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর শরিয়ত ব্যাপক হওয়ার কারণে আলাদাভাবে রাষ্ট্রের আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ, রাষ্ট্র হলো এই শরিয়তের একটি অংশ ও ভিত্তি। তাই শরিয়ত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে রাষ্ট্র সম্পর্কেও আলোচনা এসে যাবে।

বাস্তবতা হলো, ইসলাম ধর্ম প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে আলোচনা করেছে। যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা এ ধর্মের একটি অংশ, তাই সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং তা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে যথার্থ বিধান দেওয়া হয়েছে ইসলামে। যদি ইসলামে এই আলোচনা না-ই থাকে, তাহলে তো ইসলাম অন্তঃসারশূন্য একটি সীমাবদ্ধ ধর্ম হয়ে পড়বে, যা বাতিল ধর্মের মতো কেবল মানুষের ব্যক্তিজীবন নিয়েই আলোচনা করে।

শরিয়ত তথা আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ মেনে চলার জন্য এবং তাঁর সামনে আত্মসমর্পণের জন্য নিয়ত বা ইচ্ছা পোষণ করতে হবে।

২৮৫. তাজুল আরুস : ৩৫/৫৩-৫৪ (দারুল হিদায়া, বারিদা)

অর্থাৎ অন্তরে নিয়ত করে কথা বা কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করার পদ্ধতিই হলো দ্বীন। আর ইবাদত দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ইবাদত বুঝায়, যদ্দারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। ইবাদতের প্রথমেই রয়েছে সকলের পরিচিত চারটি মূল ইবাদত—নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ। সংক্ষিপ্তভাবে এ চারটি ইবাদতের ব্যাপারে আলোচনা করেছি।

এক. নামাজ

নামাজ হলো ইসলামের আসল খুঁটি। এটি ইসলামের বড় ধরনের একটি শিআর বা নিদর্শন। নামাজ হলো আসমানের সাথে জমিনের যোগসূত্র। নামাজের মর্মার্থ হলো, বান্দা প্রতিদিন কয়েকবার বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে আল্লাহর ক্ষমতা ও রাজত্বের সামনে মাথা নত করবে। প্রতি রাকআত নামাজে সে আল্লাহর সাথে এ বাক্যাবলির দ্বারা কথা বলে :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যিনি অসীম দয়ালু ও পরম করুণাময়। যিনি বিচারদিনের মালিক। আমরা আপনারই ইবাদত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। আমাদের সরল সঠিক পথপ্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।'[২৮৬]

নামাজের গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাবের কারণে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করা ফরজ করে দিয়েছেন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে। এক নামাজের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর অন্য নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। নতুন করে বান্দা আল্লাহ তাআলার ধ্যানে নিমগ্ন হয়।

২৮৬. সুরা আল-ফাতিহা : ১-৭

কোনো বান্দা যদি সঠিক ও সুন্দরভাবে দৈনিক ফরজ নামাজসমূহ আদায় করে, তাহলে তার গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়।[২৮৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾

'দিনের দুপ্রান্তে ও রাতের প্রান্তভাগে নামাজ প্রতিষ্ঠা করুন। নিশ্চয় পুণ্যসমূহ পাপরাশিকে দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি একটি মহাস্মারক।'[২৮৮]

মুমিন বান্দা উত্তমরূপে অজু করে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে তার গুনাহগুলো এমনভাবে ঝরে পড়ে, যেভাবে শীতকালে শুষ্ক পাতাগুলো ঝরে পড়ে। আবু উসমান নাহদি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا عُثْمَانَ، أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا؟ قُلْتُ : وَلِمَ تَفْعَلُهُ؟ فَقَالَ : هَكَذَا فَعَلَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا، فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ : أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا؟ قُلْتُ : وَلِمَ تَفْعَلُهُ؟ قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ، كَمَا يَتَحَاتُّ هَذَا الْوَرَقُ

'আমি সালমান ফারসি ﷺ-এর সাথে একটি গাছের নিচে ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুকনো ডাল হাতে নিয়ে নাড়া দিলেন। এতে

---

২৮৭. নামাজসহ বিভিন্ন আমলের দ্বারা গুনাহ মাফ হওয়ার যেসব আয়াত ও হাদিস পাওয়া যায়, জমহুর উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে এখানে শুধু সগিরা গুনাহ মাফ হওয়া উদ্দেশ্য। কেননা, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো, কবিরা গুনাহ শুধু তাওবা করার দ্বারাই মাফ হয়; কোনো আমলের কারণে নয়। তবে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কাউকে নিজ দয়ায় ক্ষমা করতে পারেন।

২৮৮. সুরা হুদ : ১১৪

তার পাতা ঝরে পড়ল। অতঃপর আমাকে বললেন, হে আবু উসমান, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না, কেন আমি এমন করলাম? আমি বললাম, বলুন, কেন এমন করলেন? তখন তিনি বললেন, আমার সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও এমন করেছিলেন, যখন আমি তাঁর সাথে একটি গাছের নিচে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুকনো ডাল হাতে নিয়ে নাড়া দিলেন। এতে তার পাতা ঝরে পড়ল। অতঃপর আমাকে বললেন, হে সালমান, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না, কেন আমি এমন করলাম? আমি বললাম, বলুন, কেন এমন করলেন? তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় মুসলিম বান্দা যখন উত্তমরূপে অজু করে অতঃপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, তখন তার গুনাহসমূহ এমনিভাবে ঝরে যায়, যেমন এ পাতাগুলো ঝরে পড়ল।'[২৮৯]

সুতরাং নামাজ হলো গুনাহ মাফের একটি মাধ্যম, তাওবা করার জন্য একটি সুন্দর উপায়। ভালোভাবে অজু করে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে অটোমেটিক পাপসমূহ ঝরে পড়তে থাকে। অবশ্য কবিরা গুনাহ করলে তার জন্য ভিন্নভাবে তাওবা-ইসতিগফার করতে হবে। কেননা, কবিরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না।

দুই. রোজা

রোজা হলো নিয়তের মাধ্যমে দিনভর পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম। এর মাধ্যমে মানুষের ধৈর্যশক্তি, স্থিরতা, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তৈরি হয়। আর রোজার অনুভূতি মানুষের অন্তর থেকে দুর্বলতা ও রিপুর কামনা মুছে ফেলে। রোজার আরেকটি উপকারিতা হলো, রোজার মাধ্যমে মানুষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, উচ্চ মনোবল ও ইচ্ছাশক্তি অর্জন করতে পারে। আর উন্নত মনোবল ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছাড়া কেউ রোজার সময় ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে পারে না। কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের প্রশিক্ষণের জন্য ইসলামে রোজার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই যদি কেউ রোজার মাধ্যমে সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তার যেকোনো ধরনের কষ্টকর

---

২৮৯. মুসনাদু আহমাদ : ৩৯/১১১, হা. নং ২৩৭০৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

ও কঠিন কাজ করতে বেগ পেতে হবে না। এমনিভাবে রোজা একজন মুমিনের আত্মাকে পবিত্র করে এবং অনিষ্টতা থেকে মুক্ত করে নিরাপদ রাখে।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ، بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ

'আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়; যতটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "কিন্তু রোজা ব্যতীত। কেননা, রোজা আমার জন্য, আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো। বান্দা আমার জন্য পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থেকেছে।" আর রোজাদারের জন্য দুটি খুশি রয়েছে। একটি খুশি হলো যখন সে ইফতার করে। আরেকটি খুশি হলো, যখন সে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করবে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের ঘ্রাণের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত। রোজা হলো ঢালস্বরূপ, রোজা হলো ঢালস্বরূপ।'[২৯০]

তিন. জাকাত

জাকাতের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্র হওয়া।[২৯১]

পরিভাষায় জাকাত হলো, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এক চান্দ্র বৎসর শেষে তার জাকাতযোগ্য সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ উপযুক্ত প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তবে ফসলের ক্ষেত্রে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়; বরং এ ক্ষেত্রে ফসল কাটার সময়কে বিবেচনা করা হয়।

---

২৯০. মুসনাদু আহমাদ : ১৫/৪৪৫-৪৪৬, হা. নং ৯৭১৪ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

২৯১. আল-মুজামুল অসিত : ১/৩৯৬ (দারুদ দাওয়াহ, ইসকানদারিয়া)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

'আর তিনি ওই সত্তা, যিনি নানান প্রকার বাগান ও গুল্ম-লতা সৃষ্টি করেছেন, যার কতক স্বীয় কাণ্ডের ওপর সন্নিবিষ্ট, আর কতক কাণ্ডের ওপর সন্নিবিষ্ট নয়। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন খেজুর বৃক্ষ ও শস্যখেত; যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। তিনি জাইতুন ও আনার বৃক্ষও সৃষ্টি করেছেন। কতক দৃশ্যত অভিন্ন ও স্বাদে ভিন্ন। এই সব ফল তোমরা আহার করো, যখন ফল ধরে। আর তা হতে শরিয়তের নির্ধারিত যে অংশ রয়েছে, তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপচয় করে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালোবাসেন না।'[২৯২]

জাকাত মানুষের সম্পদকে পবিত্র ও বৃদ্ধি করে। এ বৃদ্ধি তিনভাবে হয় :

১. জাকাতদাতার জন্য কল্যাণ।

২. জাকাতগ্রহীতার জন্য কল্যাণ।

৩. যে সম্পদ থেকে জাকাত প্রদান করা হয়েছে, সে সম্পদে কল্যাণ।

এ তিন ক্ষেত্রেই বরকত বৃদ্ধি পায়।

জাকাতদাতা জাকাত আদায়ের মাধ্যমে মনের কৃপণতা, আমিত্ব ও অহংকার থেকে মুক্তি পায়। এর মাধ্যমে মুসলমানের আকিদা ও বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়। এমনিভাবে জাকাতগ্রহীতাও জাকাত গ্রহণের মাধ্যমে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতার মতো অন্তরের এমন অসংখ্য দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। অন্যদিকে তারা যখন দেখে, তাদের আশপাশে অনেক ধনী লোক প্রাচুর্যময় জীবন উপভোগ করছে, অথচ তাদের প্রতি সামান্য ভ্রুক্ষেপও করছে

---

২৯২. সুরা আল-আনআম : ১৪১

না, তখন তাদের অন্তরে বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হয়। মূলত তাদের দারিদ্র্য, অভাব, দুরবস্থা ও দুর্দশার কারণেই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।

সুতরাং যখন সম্পদের মালিক রিপু, কামনা, অহংকার থেকে মুক্ত হবে এবং তার জিম্মায় থাকা দরিদ্রদের অধিকার তাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে, তখন এটা গ্রহীতার জন্যও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্তির কারণ হবে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির মাধ্যম হবে। এমনিভাবে যখন সময়মতো সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ তার প্রাপকদের দিয়ে দেওয়া হবে, তখন সম্পদের সাথে হারাম মিশ্রণ হবে না। সম্পদ পূত-পবিত্র থাকবে।

লক্ষণীয় বিষয় যে, জাকাত হলো গরিবের অধিকার। তাই জাকাত দিয়ে কেউ গরিবের ওপর ইহসান করার দাবি করতে পারে না। কারণ, নিজের অর্থ দিলে তবেই না ইহসান হয়। সম্পদের মালিককে তার পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্যে ইহসান করার কী আছে? জাকাত তো অন্যের হক। যতক্ষণ না এটি আদায় করা হয়, তা ঋণের মতো থেকে যায় এবং মাথার ওপর বোঝা হয়ে থাকে। যখনই দিয়ে দেওয়া হবে, তখনই মাথা থেকে ঋণের বোঝা সরে যাবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

'আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।'[২৯৩]

জাকাত ফরজ হওয়ার পরও আদায় না করলে এ সম্পদ মালিকের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟، فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ : لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ

২৯৩. সুরা আজ-জারিয়াত : ১৯

'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এসে আমার হাতে রুপোর কয়েকটি বড় আংটি দেখে জিজ্ঞেসা করলেন, হে আয়িশা, এগুলো কী? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার জন্য সাজসজ্জার উদ্দেশ্যে এগুলো বানিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি কি এগুলোর জাকাত দাও? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। তিনি বললেন, তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।'[২৯৪]

চার. হজ

হজ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। হজের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা।[২৯৫] এর শাব্দিক অর্থের সাথে ব্যবহারিক অর্থের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা হজ পালনকারী আল্লাহর ঘর জিয়ারত করার ইচ্ছা নিয়েই সেখানে গমন করেন।

আল্লাহ তাআলা কাবা শরিফকে যুগ যুগ ধরে মানুষের মিলনমেলা ও নিরাপদ স্থান বানিয়েছেন। সারা পৃথিবীর মানুষ এসে সেখানে একত্রিত হয়। পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রতি বছর সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা তাদের এক কাবার দিকে ছুটে যায়। যেখানে নেই কোনো শেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, ধনী, গরিব ভেদাভেদ। সকলে একই কালিমার টানে একই ঘরের পানে ছুটে যায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾

'স্মরণ করো, যখন আমি কাবা গৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলনস্থল ও শান্তির আলয় করলাম। আর তোমরা ইবরাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাজের জায়গা বানাও।'[২৯৬]

২৯৪. সুনানু আবি দাউদ : ২/৯৫, হা. নং ১৫৬৫ (আল-মাকতাবুল আসরিয়া, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

২৯৫. আল-মুজামুল অসিত : ১/১৫৬ (দারুদ দাওয়াহ, ইসকানদারিয়া)

২৯৬. সুরা আল-বাকারা : ১২৫

আয়াতের মধ্যে الْبَيْت (আল-বাইত) দ্বারা কাবা শরিফকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সর্বযুগে এই কাবা ঘরকে মুসলমানদের সম্মিলনস্থল করেছেন। যেন তাদের অন্তরের মেলবন্ধন এক হয়ে যায়। ইবরাহিম عليه السلام এই মর্মে দুআ করেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা যেন কাবা ঘরকে মানুষের জন্য নিরাপদ করে দেন এবং কিছু মানুষের অন্তরকে যেন সর্বদা কাবা ঘরের দিকে ধাবিত রাখেন। তারা যেন তাদের অন্তরে লালিত এক কালিমা ও একই উদ্দেশ্যের তাড়নায় বারবার কাবার পানে ছুটে আসে।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম عليه السلام-এর সে দুআ সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

﴿ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাস করিয়েছি। হে আমাদের পালনকর্তা, তারা যেন নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। তাই আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদের ফল-ফলাদি দ্বারা রিজিক দান করুন, সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।'[২৯৭]

পাঁচ. অন্যান্য ইবাদত

উল্লিখিত চারটি ইবাদত—নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ হলো ইসলামের প্রধান ইবাদত। এর মানে এ নয় যে, এই চারটির মাঝেই ইবাদত সীমাবদ্ধ; বরং ইবাদত অনেক ব্যাপক একটি শব্দ। শরিয়তসম্মত পন্থায় যেকোনো ধরনের কথা ও কাজ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হবে, তাই ইবাদত বলে পরিগণিত হবে। কারণ, ইবাদত অর্থ হলো, 'আল্লাহর কাছে মাথা নত করা এবং তাঁর আনুগত্য করা।'[২৯৮] তাই যে কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায়

২৯৭. সুরা ইবরাহিম : ৩৭
২৯৮. আল-মিসবাহুল মুনির : ২/৩৮৯ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

তাঁর হুকুম মেনে চলা হবে, তাই ইবাদত বলে বিবেচিত হবে। এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হলো, যা পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় পুরস্কারের যোগ্য হয়ে থাকে।

ক. জিহাদ

ইবাদতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ একটি ইবাদত হলো জিহাদ। জিহাদের মাধ্যমে একজন মুজাহিদ সফলকাম ও পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়। জিহাদের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে থাকে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾

'আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়, অতঃপর মারে ও মরে।'[২৯৯]

খ. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার

পিতা-মাতার আনুগত্য করা, তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করা ও কোমল আচরণ করা, তাদের জীবদ্দশায় খিদমত করা এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য দুআ করা—এগুলো সন্তানের কর্তব্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও বটে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾

'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ

২৯৯. সুরা আত-তাওবা : ১১১

করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছর বয়সে। আর মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।'[৩০০]

তিনি আরও বলেন :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾

'আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না।'[৩০১]

গ. অপরকে সহযোগিতা

অপর মুসলিমকে সাহায্য-সহায়তা করা, তাদের কল্যাণকামী হওয়া ও তাদের যেকোনো বিপদাপদ দূর করার ব্যবস্থা করা—এসব আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের অন্যতম উপায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾

'কসম সময়ের। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাগিদ করে সত্যের, তাগিদ করে সবরের।'[৩০২]

৩০০. সূরা লুকমান : ১৪
৩০১. সূরা আল-আনকাবূত : ৮
৩০২. সূরা আল-আসর : ১-৩

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে কোনো মুমিনের কষ্ট দূর করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো দুস্থ লোকের অভাব দূর করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তার দুরবস্থা দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন। আর বান্দা যতক্ষণ তার মুসলিম ভাইয়ের সহযোগিতায় করতে থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সহযোগিতা করতে থাকেন।'[৩০৩]

ঘ. আত্মীয়তার সম্পর্ক

এখানে আত্মীয় দ্বারা উদ্দেশ্য নিকটাত্মীয় নারীরা, যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। যেমন : কন্যা, ফুফু, খালা, বোন, ভাতিজি, ভাগিনী। বংশীয় দিক থেকে হারাম হওয়া সকল নারীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। এদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের দেখাশোনা করা, তাদের প্রতি সদাচরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে আল্লাহর ক্রোধের স্বীকার হতে হয়।

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

الرَّحِمُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ

'আত্মীয়তার সম্পর্ক আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। সে বলতে থাকে, যে আমার সাথে সম্পর্ক রাখে আল্লাহ তার সাথে

৩০৩. সহিহ মুসলিম : ৪/২০৭৪, হা. নং ২৬৯৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

সম্পর্ক রাখেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।'[৩০৪]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।'[৩০৫]

ঙ. ইলম অর্জন

ইলম অন্বেষণ করা বড় ধরনের একটি ইবাদত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ইলমের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করতে পারে। এমনকি কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর নিকট পাপীদের জন্য সুপারিশও করতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার ও যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করে দেবেন।'[৩০৬]

৩০৪. সহিহ মুসলিম : ৪/১৯৮১, হা. নং ২৫৫৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৩০৫. সহিহুল বুখারি : ৮/৩২, হা. নং ৬১৩৮ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৩০৬. সুরা আল-মুজাদালা : ১১

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য পথ চলবে, আল্লাহ তাআলা তার জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন।'[৩০৭]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ

'কেবল আল্লাহর জিকির, জিকিরসংক্রান্ত বিষয়াদি, আলিম ও ইলম অর্জনকারীগণ ব্যতীত দুনিয়া ও তার অন্তর্ভুক্ত বস্তুসমূহ অভিশপ্ত।'[৩০৮]

আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

'যে ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তার জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন। ফেরেশতারা তালিবুল ইলমের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের জন্য নিজেদের ডানা

৩০৭. সহিহ মুসলিম : ৪/২০৭৪, হা. নং ২৬৯৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৩০৮. সুনানুত তিরমিজি : ৪/১৩৯, হা. নং ২৩২২ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

বিছিয়ে রাখেন। আর আলিমের জন্য আসমান ও জমিনবাসী এমনকি পানির মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করে। সাধারণ মানুষের ওপর আলিমের মর্যাদা তারকার ওপর চাঁদের মর্যাদার মতো। আর আলিমগণ হলেন নবিদের উত্তরাধিকারী। নবিরা কখনো দিনার-দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না; বরং তাঁরা ইলমের উত্তরাধিকারী বানান। সুতরাং যে তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশই গ্রহণ করল।'[৩০৯]

চ. প্রতিবেশীদের সহায়তা

প্রতিবেশীর এমন কিছু অধিকার রয়েছে, যেগুলো অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ তাআলা যেভাবে পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন এবং অন্যান্য হকদারের জন্য অসিয়ত করেছেন, সেভাবে প্রতিবেশীর জন্যও অসিয়ত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ﴾

'পিতা-মাতার সাথে এবং নিকটাত্মীয়, এতিম-মিসকিন, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী সহচরের প্রতি সদয় ব্যবহার করো।'[৩১০]

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

'আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী সেই, যে তার সঙ্গীর নিকট উত্তম। আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী সেই, যে তার প্রতিবেশীদের নিকট উত্তম।'[৩১১]

৩০৯. সুনানু আবি দাউদ : ৩/৩১৭, হা. নং ৩৬৪১ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

৩১০. সুরা আন-নিসা : ৩৬

৩১১. সুনানুত তিরমিজি : ৩/৩৯৭, হা. নং ১৯৪৪ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

ছ. পরিবারের দেখাশোনা

নিজের পরিবারের দেখাশোনা করা এবং তাদের বিভিন্ন ব্যয়ভার বহন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটা তো বরং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ও দান-সদকার চাইতেও অধিক পুণ্যের কাজ।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

'আল্লাহর রাস্তায় তুমি একটি দিনার খরচ করলে, গোলাম আজাদের জন্য একটি দিনার খরচ করলে, মিসকিনকে দান করার জন্য একটি দিনার খরচ করলে আর নিজ পরিবারের জন্য একটি দিনার খরচ করলে; এর মধ্যে পরিবারের জন্য খরচকৃত দিনারের প্রতিদান সবচেয়ে বেশি হবে।'[৩১২]

জ. মীমাংসাকরণ

এমনিভাবে কারও মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া একটি বড় ইবাদত। দুই প্রতিপক্ষকে পরস্পর মিলিয়ে দেওয়া এবং তাদের মাঝে সৌহার্দ্য, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব জাগিয়ে দেওয়া খুবই পুণ্যের কাজ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও।'[৩১৩]

৩১২. সহিহ মুসলিম : ২/৬৯২, হা. নং ৯৯৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

৩১৩. সুরা আল-আনফাল : ১

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামি শাসনব্যবস্থা

প্রাক্কথন

পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়ে ইসলামের শরিয়াব্যবস্থা ও তার সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্র সব বিষয়েই কিঞ্চিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় ইসলাম যে মানুষের জন্য সর্বযুগে উপযোগী ও পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনব্যবস্থা, তা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

এ অধ্যায়ে আমাদের এবারের আলোচনার বিষয় হলো ইসলামি শাসনব্যবস্থা নিয়ে। এ বিষয়ে আমাদের সমাজে যথেষ্ট অজ্ঞতার ছড়াছড়ি রয়েছে। অধিকাংশ মানুষেরই এসব বিষয়ে তেমন কোনো ধারণা নেই। সাধারণরা তো দূরে থাক, স্বয়ং আলিমশ্রেণিরও অনেকেই আজ এসব বিষয়ে গাফিল ও বেখবর। আমাদের মুসলিম সমাজে ইসলামের প্রসিদ্ধ ও মৌলিক কয়েকটি ইবাদতের চর্চা থাকলেও এর বাইরে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান বা অনুশীলন শূন্যের কোঠায়ই বলা চলে; অথচ আধুনিক মানবরচিত জীবনব্যবস্থার ধারক-বাহকেরা এসব ক্ষেত্রে তাদের ঠুনকো নীতিমালা দিয়েই কিন্তু বিশ্ব পরিচালনা করছে, মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের মধ্যেও ধীরে ধীরে এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে, ইসলাম তো শুধু নামাজ, রোজাসহ কয়েকটি ইবাদতের নাম। এর বাইরে তো ইসলামের কোনো বিধান বা নির্দেশনা নেই। এজন্য তারা যেমন এসব বিষয়ে কখনো ইসলামের বিধান জানার চেষ্টা করেনি, ঠিক তেমনই আলিমরাও জনসমাজে এ নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা করেনি। মধ্য দিয়ে ফলাফল এ দাঁড়িয়েছে যে, সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে ইসলাম থেকে সরে যাচ্ছে, এর বিধিবিধান থেকে ক্রমান্বয়ে বিমুখতা প্রদর্শন করছে। কারণ, আমরা তাদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য ও চমৎকার বিধিবিধান তুলে ধরতে পারিনি। তাদের এ কথা বুঝাতে সক্ষম হইনি যে, মানবরচিত বিধিবিধান ও নীতিমালার চেয়ে ইসলামের নীতিমালা শতগুনে ভালো ও উত্তম।

এ ব্যর্থতা মূলত ইসলামের নয়, এর সম্পূর্ণ দায়ভার আমাদের, যারা আমরা নবির ওয়ারিস বলে দাবি করি। আমরা কখনো মানুষের কাছে ইসলামের এসব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে যাইনি, সমাজের অবহেলিত ও

অনালোচিত এসব মাসআলা-মাসায়িল তাদের বুঝানোর চেষ্টা করিনি। আমাদের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণেই আজ মানুষ ইসলামের সুমহান বিধিবিধান থেকে দূরে ভাগছে। এর দায় আমরা কোনোভাবেই এড়াতে পারব না।

তাই ইসলামি জীবনব্যবস্থার আলোচনায় এ অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বহ। এতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন হবে, সে ব্যাপারে বিশদ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তারপরও ইসলামের সুবিশাল শাখা-প্রশাখার তুলনায় এখানে সামান্যই আলোচিত হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষ যেন কমপক্ষে এতটুকু জানতে পারে যে, শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিষয়ে ইসলামের রয়েছে পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। এ আলোচনা পড়লে তাদের কমপক্ষে এতটুকু হলেও তো টনক নড়বে যে, ইসলামেরও এ ব্যাপারে সুন্দর ও অতিউত্তম ব্যবস্থাপনা রয়েছে। আর সচেতন ও জ্ঞানবান পাঠক হলে তো স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা পৃথিবীর সকল শাসনব্যবস্থার চেয়ে সকল দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ ও সেরা ।

তাই পাঠককে অনুরোধ করব, আমাদের সমাজে ইসলামের অনালোচিত বিষয়গুলোর অন্যতম এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে অধ্যায়ন করতে। এ বিষয়টির বিধানাবলি ও নীতিমালা গভীর নজরে পড়লে ইসলামের দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। তাই একটু নাতিদীর্ঘ হলেও বিষয়গুলো সবারই জানা ও পড়া উচিত। সমাজে বিরাজমান জাহালাত এতে কিছুটা হলেও দূর হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ-ই সাহায্যকারী ও তাওফিকদাতা।

শাসনব্যবস্থার নীতিমালা

আভিধানিক অর্থ

السياسة (আস-সিয়াসাত) শব্দের ক্রিয়ারূপ হলো : سَاسَ يَسُوْسُ। বলা হয় سَاسَ زَيْدٌ الْأَمْرَ অর্থাৎ জাইদ বিষয়টি পরিচালনা করল। সুতরাং سياسة (সিয়াসাত) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পরিচালনা করা।[৩১৮]

পারিভাষিক অর্থ

تدبير أمور المسلمين ورعاية مصالحهم الدينية والدنيوية

'মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে তাদের সকল বিষয় পরিচালনা করা।'[৩১৯]

ইসলামের রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত। অন্য সকল মতবাদ ও ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর কারণ হলো, ইসলাম আসমানি ধর্ম। মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একমাত্র মনোনীত ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা। ইসলাম পৃথিবীর অন্য সব ধর্ম ও দর্শনের মতো নয়। ইসলাম কমিউনিজমও নয়, পুঁজিবাদও নয়, আবার জাতীয়তাবাদের সাথেও ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এ কারণে ইসলাম সম্পর্কে এটা বলা যাবে না যে, ইসলাম কমিউনিজম, পুঁজিবাদী বা জাতীয়তাবাদী ব্যবস্থার মতো সাধারণ একটি মতবাদ। বরং ইসলাম নিখুঁত একটি ধর্ম, পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনব্যবস্থা। স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআলা এই জীবনব্যবস্থার নাম রেখেছেন 'ইসলাম'।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।'[৩২০]

---

৩১৮. আল-মিসবাহুল মুনির : ১/২৯৫ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৩১৯. সিয়াসাতুত তাদাররুজ : পৃ. নং ২৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৩২০. সুরা আলি ইমরান : ১৯

ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তি পর্যায় থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের সুন্দর ও নিখুঁত সমাধান রয়েছে ইসলামে। সকল স্থানে ও সর্বযুগে মানবজীবনের প্রতিটি বিষয়ের সমাধান এতটাই সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিখুঁতভাবে ইসলাম দিয়েছে, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে না কভু ছিল, না বর্তমানে আছে, আর না ভবিষ্যতে কখনো হবে।

ইসলামের শাসনব্যবস্থা কতিপয় মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল। এ সকল মূলনীতি মোটামুটি ছয়টি।

প্রথম মূলনীতি : সার্বভৌমত্ব আল্লাহর

প্রভুর বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য হলো সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই হবেন একমাত্র বিধানদাতা। তিনি ব্যতীত অন্য কারও বিধান প্রণয়নের অধিকার থাকবে না।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নুহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।'[৩২১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾

'আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।'[৩২২]

৩২১. সূরা আশ-শূরা : ১৩
৩২২. সূরা আল-মায়িদা : ৪৮

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনিই তাদের জন্য ধর্ম নির্ধারণ করে দেবেন, তিনিই তাদের জীবন-চলার জন্য আইন ও বিধান প্রণয়ন করবেন; এটাই তো যৌক্তিক ও উত্তম।

শাসনক্ষমতা ও বিধান প্রণয়নের অধিকারী যেহেতু আল্লাহ তাআলা। সুতরাং আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করাটা হবে ক্ষমতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতা করা।

এ ক্ষেত্রে একটি বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বজগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র—সবকিছুই যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। এর সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই এসব কিছু পরিচালনা করছেন।

আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটিও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টির ক্ষুদ্র একটি অংশ। এই পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, তার সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। এর সবকিছু সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য তিনি একটি নিজাম তৈরি করে দিয়েছেন, যে নিজাম অনুযায়ী পৃথিবীর সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে মানুষ আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। আল্লাহর লক্ষ-কোটি অগণিত সৃষ্টির তুলনায় মানুষ একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তিনি যেহেতু মানুষের স্রষ্টা; বিধায় তাদের পরিচালনার জন্য তিনিই একটি নিজাম বা নিয়ম নির্ধারণ করবেন। আর এটাই স্বাভাবিক। বিবেকবান প্রতিটি লোকই এ কথার সাক্ষ্য দেবে।

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে মানুষের হিদায়াতের জন্য, তাদের সঠিক নিয়মে পরিচালনার জন্য নবি ও রাসুলদের প্রেরণ করেছেন। রাসুলদের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করার নিয়ম ও নিজাম দান করেছেন। সুতরাং এই বিধান বা কানুন অনুযায়ী চললে মানুষের জীবন হবে নিরাপদ ও শান্তিময়। যারা এই বিধান মানার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হলো, তারা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করল, জগৎ পরিচালনার নিয়ম ভঙ্গ করল এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার বিধান অমান্য করল। সুতরাং তারা ক্ষতিগ্রস্ত, অভিশপ্ত ও ধ্বংসমুখে নিপতিত।

আর কীভাবে সে লোককে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন বলা যেতে পারে, যে আসমানের ইলাহ এবং জমিনের ইলাহের মাঝে পার্থক্য করে? তার কথা তো ওই ব্যক্তির অসার মিথ্যা কথার মতো হলো, যে বলছে, আল্লাহ তাআলা আসমানে ইলাহ, কিন্তু জমিনে তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। এই ভ্রান্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং আসমান ও জমিনে আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব সমান—এ বিষয়টি মানুষের মনে ও বিশ্বাসে আরও দৃঢ় করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾

'তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।'[৩২৩]

নিশ্চয় আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়নের অপরাধ অত্যন্ত ভয়াবহ। এ ক্ষেত্রে সামান্য ছাড় দেওয়ারও কোনো অবকাশ নেই। কারণ, এটি তাওহিদের আকিদার সাথে সম্পৃক্ত। যার মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তাআলাকে একক ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করা। কালিমাতুত তাওহিদ لا اله الا الله (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই) এর সাক্ষ্য দেওয়া ও তার দাবিগুলো মেনে নেওয়া।

কালিমাতুত তাওহিদ لا اله الا الله -এর দাবি হলো, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না। ইবাদত কেবল আল্লাহ তাআলারই করতে হবে। আর ইবাদত হলো, আল্লাহ তাআলার সামনে বিনয়ী হওয়া, তার সকল আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলা এবং তার সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ তাআলার আদেশ মেনে চলবে, তাঁর শরিয়তের অনুসরণ করবে। তাঁর আদেশ ব্যতীত অন্য কাউকে মানবে না এবং অন্য কারও প্রণীত আইন-কানুনের অনুসরণ করবে না।

আল্লাহ তাআলা ইলাহ বা মাবুদ। তাই তিনিই বিধান দান করবেন এবং তিনিই মানুষের জীবন-চলার পথ নির্ধারণ করে দেবেন। তিনি ব্যতীত অন্য কারও এই অধিকার নেই, যে এই বৈশিষ্ট্যটি নিজের বলে দাবি করতে পারে এবং নিজের খেয়াল-খুশি মতো বিধান তৈরি করবে। এ ধরনের অজ্ঞতাপূর্ণ বিরোধিতা করতে পারে কেবল অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী ও প্রতারিত জালিম।

---

৩২৩. সুরা আল-জুখরুফ : ৮৪

শাসনক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর—এ বিষয়টি আরও দৃঢ় করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

'আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'[৩২৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴾

'শুনে রাখো, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।'[৩২৫]

মানুষের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সংবিধান রচনা করা আল্লাহর কর্তৃত্বের সাথে এবং তাঁর উলুহিয়্যাতের প্রধান বৈশিষ্ট্যের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের সাংঘর্ষিক। যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীত নিজেদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিধান রচনা করে তারা কাফির। তারা আল্লাহর আদেশ ও তাঁর পথ থেকে সরে গেছে। তারা এ ধরনের কাজের মাধ্যমে নিজেদের মাবুদ হিসাবে দাবি করল এবং এই কাজের মাধ্যমে নিজেদের রবের স্থানে বসানোর চেষ্টা করল।

যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে নিজেদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিধান রচনা করে, তারা কাফির, ফাসিক ও জালিম। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

'যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।'[৩২৬]

---

৩২৪. সুরা ইউসুফ : ৪০
৩২৫. সুরা আল-আনআম : ৬২
৩২৬. সুরা আল-মায়িদা : ৪৪

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

'যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক।'[৩২৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

'যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম।'[৩২৮]

যারা আল্লাহ তাআলার বিধানের বিপরীত বিধান রচনা করে, তাদের জন্য এই কলঙ্কযুক্ত অভিশপ্ত উপাধি নির্ধারণ করা হয়েছে—তারা কাফির, ফাসিক ও জালিম।

১. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ যারা আল্লাহর আদেশ ও বিধিবিধান প্রত্যাখ্যানকারী, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার সামনে নতি স্বীকার করতে অস্বীকারকারী।

২. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ যারা জুলুমে পতিত হয়। কুরআনে জুলম শব্দটি অধিকাংশ স্থানে শিরক অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আর জুলম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কোনো বস্তুকে তার সঠিক স্থানে না রেখে অন্য স্থানে রাখা। যেমন আরবি একটি প্রবাদ আছে : من استرعي الذئب فقد ظلم 'যে বাঘকে রাখাল বানাল, সে ছাগলের ওপর জুলুম করল।' সুতরাং যারা নিজেদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধানের বিপরীত বিধান রচনা করে, তারা মুশরিক। কারণ, তারা হিদায়াতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতা, হকের পরিবর্তে বাতিল এবং সঠিক পথের পরিবর্তে ভুল পথ গ্রহণ করেছে। তারা আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে গেছে এবং কুফুরি ও জুলুমের পথ গ্রহণ করেছে।

৩২৭. সুরা আল-মায়িদা : ৪৭

৩২৮. সুরা আল-মায়িদা : ৪৫

৩. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ যারা আল্লাহর দ্বীন ও তার বিধানের বিরোধিতা করে তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। ফিসক শব্দের আভিধানিক অর্থ বের হওয়া।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, শাসনক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। এই গুণের অধিকার কোনো মানুষের নেই। যে সকল লোক এমন ঘৃণ্য ভয়ংকর কাজ করার দুঃসাহস দেখাবে, তারা নিকৃষ্ট তাগুত, অহংকারী ফাসিক ও অভিশপ্ত শয়তান। তারা যতক্ষণ তাদের ভ্রষ্টতার ওপর থাকবে, তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মুমিনদের ওপর ওয়াজিব।

যে সকল লোক আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান পছন্দ করবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরি বিধানের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, তারাও অপরাধী ও শিরকে পতিত। অনুরূপ যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানের মাধ্যমে বিচার পরিচালনা করবে এবং যারা সন্তুষ্টচিত্তে এসব বিচারকের কাছে বিচার চাইবে; উভয়ই মুশরিক। যদিও তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, জাকাত দেয়। কুরআন আমাদের সামনে আল্লাহর পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বনের খারাবি ও ভয়াবহতা বর্ণনা করেছে এবং এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, যারা আল্লাহর বিধান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তাদের ইমান থাকে না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

'কিন্তু না, আপনার পালনকর্তার কসম, সেসব লোক ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।'[৩২৯]

৩২৯. সুরা আন-নিসা : ৬৫

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা কসম করে বলেছেন, যারা কুফরি বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য মেনে নেবে এবং সে ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে তাদের ইমান নেই। উল্লিখিত আয়াতে ইমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যখন এ তিনটি বা তার কোনো একটির ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে, তখন আর তার মধ্যে ইমান বাকি থাকবে না। সে তিনটি শর্ত হলো :

১. বিবাদমান সকল বিষয়ের মীমাংসা রাসুলের নিকট চাইতে হবে। তাঁকেই বিচারক হিসাবে মানতে হবে, অন্য কাউকে মানলে হবে না।

২. বিচারের ফয়সালা নিজের পক্ষে যাক বা বিপক্ষে যাক; সর্বাবস্থায় বিচারপ্রার্থী অন্তরে কোনো ধরনের সংকীর্ণতা ও কষ্ট রাখতে পারবে না।

৩. বিচারপ্রার্থী অম্লান বদনে তাঁর সকল আদেশ মেনে নেবে। তাঁর ফয়সালার সামনে মাথানত করবে। শরিয়তের বিধান পরিপূর্ণভাবে মেনে নেবে।

শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকেই মানতে হবে। আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজের খেয়াল-খুশিমতো শাসনকার্য পরিচালনা করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন :

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾

'আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।'[৩৩০]

৩৩০. সুরা আল-মায়িদা : ৪৮

অতঃপর আল্লাহ তাআলা সতর্ক করেছেন, তিনি যেন কারও প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন; চাই সে লোক কত বড় ক্ষমতাধরই হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾

'আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদের কিছু পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন। আর বহু লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে।'[৩৩১]

সবশেষে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানগুলোই হচ্ছে জাহিলিয়্যাত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

'তারা কি জাহিলি যুগের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী আর কে আছে?'[৩৩২]

আল্লাহ তাআলা-ই একমাত্র বিধানদাতা, তিনিই একমাত্র আইনপ্রণেতা। কেউ যদি নিজেকে আইনপ্রণেতা দাবি করে, তবে সে কাফির, সে তাগুত। তেমনই স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে তাকে আইনপ্রণেতা হিসাবে মেনে নেওয়া ব্যক্তিরাও কাফির। অবশ্য অজ্ঞতাবশত হলে বা চূড়ান্ত পর্যায়ের বাধ্য হলে

৩৩১. সুরা আল-মায়িদা : ৪৯
৩৩২. সুরা আল-মায়িদা : ৫০

সে ক্ষেত্রে তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ক্ষেত্রবিশেষে কাফির হবে আর ক্ষেত্রবিশেষে কাফির হবে না। এর বিশদ বিবরণের দায়িত্ব বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের, সাধারণ মানুষের নয়।

আল্লাহর আইনের বিপরীত বিচার করার বিধান

এ বিষয়টি নিয়ে অনেকের মাঝে বেশ ইখতিলাফ ও বিতর্ক দেখা যায়। কিছু মানুষ আছে, যারা এটাকে কোনোভাবেই কুফর মানতে চায় না। এর বিপরীতে কিছু লোক সকল ক্ষেত্রেই এটাকে কুফর বলে প্রচার করে। এদিকে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর দেওয়া আইন অনুসারে বিচার না করলে সে কাফির, ফাসিক ও জালিম। এগুলোরই বা রহস্য কী? একই অপরাধীর জন্য তিন রকমের বিশেষণ কেন? এখানে মূল আলোচনার বিষয় হলো, মানবরচিত আইনে বিচার করা কুফরে আকবার বা বড় কুফর কিনা, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়? বস্তুত এর উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে এভাবে উত্তর হবে যে, যদি রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সে আল্লাহর আইনকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও পার্থিব স্বার্থে কখনো ভিন্ন আইনে বিচার করে অথবা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বিচারকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে তাহলে সে কাফির নয়; বরং জালিম বা ফাসিক। এ ধরনের কুফরকে বলা হবে 'কুফর দুনা কুফর'। অর্থাৎ এর কারণে সে মারাত্মক গুনাহগার হলেও দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে না। আর যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আদালতে নিয়মিত সে অনুসারেই বিচার-আচার করা হয় কিংবা সে আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনকেই সঠিক ও শ্রদ্ধাযোগ্য মনে করে অথবা মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে এ আইন অনুসারে ফয়সালা করাকে কল্যাণকর ও আবশ্যক বলে বিশ্বাস করে তাহলে তার কুফর ও ইরতিদাদের বিষয়টি সুস্পষ্ট। এখানে তার কুফরির ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহ করার অবকাশ নেই। এটাকে 'কুফর দুনা কুফর' বলে যারা বিষয়টিকে হালকা করে প্রচার করে, তারা নিশ্চিত দ্বীনের অপব্যাখ্যা করে তাগুতদের খুশি করতে চায়। আমরা এদের থেকে মুক্ত এবং তারাও আমাদের থেকে মুক্ত।

আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম ﷺ বলেন :

وَأَمَّا الَّذِيْ قِيْلَ فِيْهِ «كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ» إِذَا حَاكَمَ إِلَى غَيْرِ اللهِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ عَاصٍ وَأَنَّ حُكْمَ اللهِ هُوَ الْحَقُّ فَهَذَا الَّذِيْ يَصْدُرُ مِنْهُ الْمَرَّةَ نَحْوُهَا أَمَّا الَّذِيْ جَعَلَ قَوَانِيْنَ بِتَرْتِيْبٍ وَتَخْضِيْعٍ فَهُوَ كُفْرٌ وَإِنْ قَالُوْا أَخْطَأْنَا وَحُكْمُ الشَّرْعِ أَعْدَلُ فَفَرْقٌ بَيْنَ الْمُقَرَّرِ وَالْمُثْبَتِ وَالْمُرَجَّحِ جَعَلُوْهُ هُوَ الْمَرْجِعَ فَهَذَا كُفْرٌ نَاقِلٌ عَنِ الْمِلَّةِ.

'আল্লাহর আইনকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য আইনে বিচার-ফয়সালা করে নিজেকে গুনাহগার ভাবলে তার ব্যাপারে বলা হয়েছে 'কুফর দুনা কুফর'। আর এটা কেবল ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার থেকে তা এক দুবার প্রকাশ পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আইনকানুন তৈরি করবে এবং তা মেনে চলবে তখন তা কুফরি বলে বিবেচিত হবে। যদিও সে একথা বলে যে, (এর কারণে) আমি গুনাহগার হয়েছি এবং শরিয়তের ফয়সালাই অধিক নিষ্ঠাপূর্ণ। অতএব, চূড়ান্ত, প্রমাণিত ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত আইনের মাঝে পার্থক্য আছে; যেখানে তারা মানবরচিত আইনকেই মূল বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তা এমন কুফর বলে গণ্য হবে, যা (ব্যক্তিকে) দ্বীন থেকে বের করে দেয়।'[৩৩৩]

এ বিষয়ে অনেক উলামায়ে কিরাম এমনই বক্তব্য পেশ করেছেন। তাদের সকলের তাফসির বা মন্তব্য থেকে একথাই স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করা আল্লাহর সাথে এক জঘন্য ও স্পষ্ট ঔদ্ধত্য। অথচ বর্তমানে প্রায় সকল মুসলিম ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জেনে বা না জেনে মানবরচিত আইনে পরিচালিত কোর্টের সামনে বিচারের জন্য ভিড় জমায়।

উম্মাহর ফকিহগণ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান দ্বারা বিচারকারীদেরকে শুধু কাফিরই বলেননি; বরং তাদের পক্ষ অবলম্বনকারী আলিমদেরকেও কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩৩৩. ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল, মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম : ১২/২৮০, ফতোয়া নং ৪০৬০ (মাতবাআতুল হুকুমাহ, মক্কা)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর অবতীর্ণকৃত কুরআনের বিধান গোপন করে এবং এর বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের উদরে আগুনই ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ তাআলা না তাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন আর না তাদের পবিত্র করবেন। বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।'[৩৩৪]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন :

وَمَتَى تَرَكَ الْعَالِمُ مَا عَلِمَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَاتَّبَعَ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ لِحُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ كَانَ مُرْتَدًّا كَافِرًا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

'আর যখন কোনো আলিম কুরআন-সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারী বিচারকের অনুসরণ করে তখন সে একজন ধর্মত্যাগী এবং কাফির হিসাবে বিবেচিত হবে, যে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।[৩৩৫]

এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বিচার-ফয়সালা এবং বিধান। বিচার-ফয়সালা হলো বিধানেরই একটি অংশ বিশেষ। আর বিধান হলো আল্লাহর তাআলার পূর্ণ আইনব্যবস্থা। সুতরাং শুধু বিচার-ফয়সালা থেকে বিধান বাদ দেওয়া আর সম্পূর্ণ বিধানকেই পরিত্যাগ করা দুটো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। কাজেই যদি কোনো শাসক আল্লাহর শরিয়া অনুযায়ী বিচার না করে তখন বিধানের অন্য ধারার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে, সে কি কাফের নাকি মুসলিম?

৩৩৪. সুরা আল-বাকারা : ১৭৪
৩৩৫. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ৩৫/৩৭৩ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

আর যদি আল্লাহর বিধান বলবৎ থাকা সত্ত্বেও সাময়িকভাবে শরিয়া বাদ দিয়ে সে বিচার করে তাহলে সেটা হবে এক ধরনের কুফর অর্থাৎ ছোট কুফর। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি বিধান বলবৎ থাকে তাহলে শরিয়া আইন বাস্তবায়ন না হলে এটা হবে ছোট কুফর। আর যদি বিধানকে পরিবর্তন করা হয় তাহলে সেটা হবে বড় কুফর। ইবনে আব্বাস ﵁-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে, বিধানের ব্যাপারে নয়। আর এ বিষয়টি হয়তো তখনকার খারিজিরা বুঝেনি।

ইবনে আব্বাস ﵁-এর উদ্ধৃত كفر دون كفر এর ব্যাখ্যা

এ বিষয়টি বুঝতে হলে প্রথমত আমাদেরকে তখনকার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত হতে হবে। সময়টি ছিলো আলি ﵁ ও মুয়াবিয়া ﵁-এর মাঝে মতানৈক্যের কাল। তখন আলি ﵁-এর শিবিরের কিছু লোক (যারা পরবর্তীতে খারিজি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন) আলি ﵁, মুআবিয়া ﵁ ও তাঁদের দুই প্রতিনিধিকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে। নিজেদের দাবির পক্ষে তারা আল্লাহ তাআলার এই বাণী পেশ করে :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

'যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণকৃত আইনানুসারে ফায়সালা করে না তারাই কাফির।'[৩৩৬]

এ আয়াতের ভিত্তিতে খারিজিরা বলতে থাকে, সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসায় আল্লাহর শরিয়া বাস্তবায়িত হয়নি। আর যারা শরিয়া বাস্তবায়িত করেনি তারা কাফির। তাদের এমন বক্তব্যের প্রতিউত্তরে ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, যা ঘটেছে তা হলো 'কুফর দুনা কুফর'। অতএব, উল্লেখিত চারজন সাহাবি ইসলাম থেকে খারিজ হবেন না। উক্ত আয়াতের ব্যাপারে খারিজিদের ধারণা ভুল ছিল। তারা এই আয়াতকে দলিল হিসাবে পেশ করে সাহাবিদেরকে কাফির ঘোষণা করেছিল। অথচ বিষয়টি এরকম নয়। ঠিক একইভাবে বর্তমানেও কিছু মানুষ ইবনে আব্বাস ﵁-এর এই বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করে চলছে। তাই এই আলোচনায় এ অস্পষ্টতা দূর করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

৩৩৬. সুরা আল-মায়িদা: ৪৪

যেকোনো পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে, এই পরিস্থিতির ব্যাপারে শরিয়ার হুকুম, ফতোয়া ও রায় কী? ইবনে আব্বাস ﷺ যে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে 'কুফর দুনা কুফর' বলেছিলেন, সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণ জানতেন যে, এ ব্যাপারে শরিয়তের ফতোয়া, হুকুম ও রায় কী? তাই তিনি সব কিছু জেনেশুনেই তখন খারিজিদের সাথে কথোপকথন চলাকালীন তাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা যে কুফর সম্পর্কে চিন্তা করছ, এটা আসলে সেই কুফর নয়। মূলত খারিজিদের মনে যা ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই ইবনে আব্বাস ﷺ এই রায় দিয়েছেন। এটা নিশ্চিতভাবে শুধু তাদের জন্য এবং ওই সময়ের সাথেই সীমাবদ্ধ। তিনি ঐ সময়ের নেতাদের অবস্থা বিবেচনা করেই তাদের সন্দেহের উত্তর দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাদের উপর শরিয়ার হুকুম প্রয়োগ করেছিলেন। আর যারা আল্লাহর আইন দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে না তাদের ব্যাপারে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন, কুফরের জন্য এটাই (আল্লাহর আইন দ্বারা বিচার না করাই) যথেষ্ট।

অতএব যখন ইবনে আব্বাস ﷺ এটাকে কুফর হিসাবে গণ্য করেছেন তখন এটা কুফরে আকবারই ধরতে হবে। কুরআনের আয়াতের তাফসিরের নিয়মানুযায়ী এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে আমাদের কয়েকটি মূলনীতি বুঝতে হবে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সকল মুফাসসির ও ফকিহ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোনো একজন সাহাবি বা কয়েকজন সাহাবির বক্তব্যের ভিত্তিতে কুরআনের আম (ব্যাপক অর্থবহ) আয়াতকে বাদ দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ যদি কুরআনের কোনো আম আয়াতের পক্ষে ইজমা, কুরআনের অন্য কোনো আয়াত বা হাদিসের দলিল থাকে তাহলে সাহাবির বক্তব্য দ্বারা সেই আম আয়াতকে খাস করে ব্যবহার করা যাবে না। এর অর্থ এই নয় যে, ইবনে আব্বাস ﷺ সে সময় যে ফতোয়া প্রদান করেছেন তা ভুল ছিল; বরং তিনি তখন বাস্তব পরিস্থিতি অবলোকন করে বুঝেশুনে সঠিক ফতোয়াই দিয়েছেন, যা কুরআর-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

২. কুরআনের প্রতিটি আয়াতকে তার বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার করা হবে, যতক্ষণ না বাহ্যিক অর্থের বিপরীত ভিন্ন অর্থে হওয়ার পক্ষে কোনো দলিল পাওয়া যায়। মুফাসিসরগণ বলেন, যদি এই নিয়ম না থাকত তাহলে ভ্রান্তপন্থী লোকদের জন্য বিদআতের দরজা খুলে যেত। তারা কুরআনের ভিন্ন অর্থ খোঁজার চেষ্টা করত এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ উপস্থাপন করত। অর্থাৎ কোনো আয়াতের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অর্থ বুঝাতে হলে তার পক্ষে দলিল উপস্থাপন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ইবনে আব্বাস ﷺ উল্লেখিত সুরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অর্থ বুঝিয়েছেন এবং তিনি তার বক্তব্যের পক্ষে একটি হাদিসকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। ওই আয়াতের বাহ্যিক অর্থে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বিধানমতে বিচার করবে না তারা কাফির।

আর খারিজিরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আলি ﷺ ও মুআবিয়া ﷺ-সহ চারজন সাহাবিকে কাফির বলেছে। তাই তাদের এই বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য ইবনে আব্বাস ﷺ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে দলিলের মাধ্যমে তার ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছেন। দলিল হলো, বুরাইদা ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদিস। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

'বিচারক তিন প্রকারের। তাদের দুজন জাহান্নামে যাবে আর একজন জান্নাতে যাবে। প্রথমত, জান্নাতি সেই ব্যক্তি, যে সত্য জানে এবং সত্যের দ্বারা বিচার করে। দ্বিতীয়ত, এমন বিচারক, যে তার মূর্খতা দিয়ে মানুষের মাঝে বিচার করে, সে জাহান্নামি। তৃতীয়ত, যে সত্য জানে, কিন্তু সত্য থেকে বিমুখ সেও জাহান্নামি।'[৩৩৭]

৩৩৭. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/১০১, হা. নং ৭০১২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

খারিজিরা ওই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ নিয়েছিল। আর ইবনে আব্বাস ؓ দলিলের ভিত্তিতে একই আয়াতের ভিন্ন অর্থ নিয়েছেন, যার মাধ্যমে তিনি সাহাবিদের তাকফিরের বিরোধিতা করেছেন।

৩. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস ؓ শরিয়া পরিবর্তনকারীকে কাফির বলেননি; বরং আয়াতে ওই সব লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যারা ঐশী বিধান বা আইন ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে। আর এটা নিশ্চয় কুফরে আকবার তথা শরিয়া পরিবর্তন করার কুফর থেকে ছোট।

৪. ইবনে আব্বাস ؓ কিছু কিছু মাসআলায় অন্য সাহাবিদের চেয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন। যেমন তিনি নিকাহে মুতআকে হালাল মনে করতেন। পরবর্তী কালে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন। অনুরূপ তিনি সুদি পণ্য কমবেশ করে নগদে লেনদেন করাকে জায়িজ মনে করতেন। তাহলে 'কুফর দুনা কুফর' এর অন্ধ অনুসারীরা কেন অন্যান্য নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁর অন্ধ অনুসরণ করে না?

৫. পূর্ববর্তী মুফাসিসরগণ এবং আধুনিক যুগের মুফাসিসরগণ সবাই ইবনে আব্বাস ؓ-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন এবং তারাও ওই সময়ের বাস্তবতা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতেন। তাহলে কেন তারা এ বিষয়ে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করছেন এবং তাদের যুগের শরিয়া পরিবর্তন করার জন্য কিছু শাসককে কাফির বলেছেন?

একদিন ইবনে আব্বাস ؓ-এর সাথে কতিপয় সাহাবির ভেড়া কুরবানি নিয়ে মতানৈক্য হয়। তখন তিনি তার মতের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল পেশ করলেন। অন্যরা তখন বলল যে, আবু বকর ؓ ও উমর ؓ কখনো এরূপ বলেননি বা এটাকে কখনো ওয়াজিব বলতেন না। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, আমি আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা বলছি আর তোমরা আবু বকর ও উমরের কথা বলছ! তোমরা কি ভীত নও যে, আল্লাহর গজব আকাশ থেকে তোমাদের মাথায় এসে পড়বে? কুরআনের হুকুম অনুসরণের

ক্ষেত্রে যিনি এতটাই দৃঢ়পদ ছিলেন; অথচ আজ কুরআনের বিরুদ্ধে তার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬. এমনিভাবে ইবনে আব্বাস ؓ-এর আরেকটি বক্তব্য ছিল এই যে, তিনি বলেছিলেন, 'এটা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে অস্বীকার করার মতো কুফর নয়।' তাঁর একথা দ্বারা এমন কিছু বুঝার সুযোগ নেই যে, এটা কুফরে আসগর বা ছোট কুফর; বরং তাদের এসব কর্মকাণ্ড কুফরে আকবর বা বড় কুফর ঠিকই, কিন্তু সেগুলো ফেরেশতাদেরকে অস্বীকার করার মতো কুফরের স্তরের নয়। অর্থাৎ তাদের কুফরির স্তরটা বড় হলেও ফেরেশতাদের কুফরির স্তরটা তার চেয়েও বড়। মোটকথা, যখন আল্লাহর সীমা অতিক্রম করা হবে তখনই তা বড় কুফুর বলে বিবেচিত হবে। আর তারা যেহেতু আল্লাহর সীমা অতিক্রম করেছে তাই তারা বড় কুফুরই করেছে।

অতএব, ইবনে আব্বাস ؓ-এর বক্তব্যকে সেই জালিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না, যারা আল্লাহর শরিয়া পরিবর্তন করে দিয়েছে; বরং তাদের ক্ষেত্রে তো উচিত ছিল তরবারির আয়াত ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহর তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾

'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের যেখানে তাদের পাও সেখানেই হত্যা করো, তাদের বন্দী করো এবং অবরুদ্ধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে নামাজ কায়িম করে, জাকাত আদায় করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।'[৩৩৮]

৩৩৮. সুরা আত-তাওবা : ৫

ইমাম ইবনে আসাকির ﷫ বর্ণনা করেন :

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَبِيَدِهِ السَّيْفُ، وَالْمُصْحَفُ، وَهُوَ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نَضْرِبَ بِهَذَا، مَنْ خَالَفَ مَا فِي هَذَا.

'জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা (তরবারি) দ্বারা আমাদেরকে সেসব লোকদেরকে আঘাত করার আদেশ দিয়েছেন, যারা কুরআনের বিরূদ্ধাচরণ করে।[৩৩৯]

এমনিভাবে ইবনে মাসউদ ﷺ থেকেও ইবনে আব্বাস ﷺ-এর বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়। যেমন মুসনাদে আবি ইয়ালাতে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا السُّحْتُ؟ قَالَ: الرِّشَا، فَقَالَ: فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ، ثُمَّ قَرَأَ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: ٤٤]

'কেউ একজন এসে ইবনে মাসউদ ﷺ-কে অবৈধ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, ঘুষ। লোকটি বলল, আমরা বিচার-ফয়সালায় ঘুষ নেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছি। তখন তিনি উত্তরে বললেন, এটা তো কুফর। অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণকৃত আইনানুসারে ফয়সালা করে না তারাই কাফির।"[সুরা আল-মায়িদা : ৪৪][৩৪০]

আল্লামা ইবনে কাসির ﷫ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নিজের কোনো তাফসির উল্লেখ করেননি। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শুধু সাহাবায়ে কিরামের উক্তিগুলোই উল্লেখ করেছেন। তিনি সুরা মায়িদার ৪০ নং থেকে ৫০ নং আয়াত পর্যন্ত একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

---

৩৩৯. তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৫২/২৭৯ (দারুল ফিকর, বৈরুত)
৩৪০. মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৯/১৭৩, হা. নং ৫২৬৬ (দারুল মামুন লিত্তুরাস, দামেশক)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ

الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

'তুমি কি জানো না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে রাসুল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়। যারা মুখে বলে, আমরা ইমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর ইমান আনেনি এবং যারা ইহুদি; মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচরবৃত্তি করে। তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে, যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও তবে গ্রহণ করে নিও। আর যদি নির্দেশ না পাও তবে বিরত থেকো। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার জন্য আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি। এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে

আসে তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করবে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে? অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে, যাতে আছে আল্লাহর নির্দেশ। অতঃপর এরা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনও বিশ্বাসী নয়। আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলিমরা এর মাধ্যমে ইহুদিদের ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ি গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না। আর যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণ আইনানুসারে ফয়সালা করে না তারাই কাফির। আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং আঘাতের বিনিময়ে সমান আঘাত। অতঃপর যে ক্ষমা করে সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণ আইনানুসারে ফয়সালা করে না তারাই জালিম। আমি তাদের পরে মারইয়াম-তনয় ইসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইনজিল প্রদান করেছি। এতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববতী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়ন করে পথ প্রদর্শন করে এবং এটি খোদাভীরুদের জন্যে হিদায়াত ও উপদেশবানী। ইনজিলের অধিকারীদের কর্তব্য, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করা। যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণকৃত আইনানুসারে ফয়সালা করে না তারাই পাপাচারী। আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর

বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহর অবতীর্ণ আইনানুসারে ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সত্যের বাণী এসেছে তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন। কিন্তু এরূপ করেননি; যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, তোমরা দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন করো। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহর অবতীর্ণ আইনানুসারে ফয়সালা করুন। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি মূর্খতা-যুগের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসী লোকদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে আছে?'[৩৪১]

আল্লামা ইবনে কাসির ﵀ এই আয়াতগুলোর তাফসিরে নিজ থেকে কিছু বলেননি। সাহাবিদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তবে তিনি তাঁর যুগেও যখন এমন বাস্তবতা অবলোকন করেছিলেন তখন ঠিকই তিনি এই বিষয়ে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে তাদের বড় কুফরির কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। কেননা, এক্ষেত্রে মাসআলা গোপন রাখার কোনোই সুযোগ নেই। তিনি বলেন :

৩৪১. সুরা আল-মায়িদা: ৪০-৫০

وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جِنْكِزْخَانَ الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ الياسق، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ مَجْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قد اقتبسها من شَرَائِعَ شَتَّى: مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وغيرها، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نظره وهواه، فصارت في بينه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فَلَا يَحْكُمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ.

'যেরকমভাবে মুসলিম নামধারী মোঙ্গলীয় শাসকরা চেঙ্গিস খানের প্রণীত সংবিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করত, যা তাদের নেতা চেঙ্গিস খানের 'ইয়াসিক' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। 'ইয়াসিক' এমন একটি আইনগ্রন্থ, যা বিভিন্ন ধর্ম তথা ইহুদি, খ্রিষ্টান, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত। সেখানে তার নিজস্ব খেয়ালখুশি ও চিন্তাধারারও অনেক আইন সন্নিবেশিত ছিল। এভাবেই এটা তাদের মাঝে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে স্বীকৃতি পায়। তারা আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর উপর এটাকে প্রাধান্য দিত। অতএব, যে কেউ এমনটা করবে সে কাফির হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করতে হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং কমবেশি কোনো বিষয়েই তিনি ছাড়া কেউ ফয়সালা করতে পারবে না।'[৩৪২]

৩৪২. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৩/১১৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

কাফির, ফাসিক ও জালিম বিচারক কারা?

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করবে না তারা কাফির, ফাসিক ও জালিম। তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে এ তিন শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

১. **কাফির :** এর উদাহরণ হলো, যখন কোনো ব্যভিচারীর বিচার করার সময় সকল সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কিন্তু বিচারক তাকে শরিয়াসম্মত শাস্তি না দিয়ে মানবরচিত অন্য কোনো শাস্তি দেয় অথবা জেল-জরিমানা করে। আবার সে এ কথা বলে যে, আমরা এ ধরনের অপরাধের জন্য এমন শাস্তিই দিয়ে থাকি। অর্থাৎ এ অপরাধের জন্য এটাই আমাদের শাস্তির নির্ধারিত ও চূড়ান্ত বিধান। তাহলে এতে সে আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে ফেলায় পরিপূর্ণরূপে কাফির সাব্যস্ত হবে।

২. **জালিম :** এর উদাহরণও একই। তবে পার্থক্য হলো, এই বিচারক আল্লাহর বিধান মানে এবং ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকারও করে না। কিন্তু সে কিছু লোককে শরিয়া-নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করে না। কারণ, তার সাথে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের ভালো সম্পর্ক আছে অথবা তাদের সামাজিক মর্যাদা উঁচু কিংবা তারা তাকে ঘুষ দিয়েছে। তাহলে এমন বিচারক জালিম হিসাবে বিবেচিত হবে।

৩. **ফাসিক :** তার উদাহরণ হলো, সে শরিয়া অনুযায়ী বিচার করে ঠিক, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নিজের সুবিধার জন্য অথবা ভয়ের কারণে সে এমন কিছু অপকৌশল অবলম্বন করে, যাতে নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকা যায়। যেমন ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন শরয়ি সাক্ষী আছে। কিন্তু বিচারক অপরাধীকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বলল, এই সাক্ষী ভালোভাবে ঘটনা দেখেনি বা অমুক সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ নয়। এভাবে সে সাক্ষীদেরকে বিভিন্ন মিথ্যা ও ভুয়া অজুহাত দেখিয়ে সাক্ষ্য দিতে বাধা দিল। তাহলে এমন বিচারক ফাসিক বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় মূলনীতি : শুরা ও পরামর্শ

আভিধানিক অর্থ

الشوري (আশ-শুরা) শব্দটি شَوَّرَ يُشَوِّرُ থেকে নির্গত। ব্যবহারভেদে এ শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন আমরা বলে থাকি : شرت العسل اشوره অর্থাৎ মধু আহরণ করলাম বা পান করলাম। আবার বলা হয় : شرت الدابة شورا অর্থাৎ পশুকে বিক্রির জন্য বাজারে তুললাম। অন্যদিকে شَوَّرَ يُشَوِّرُ تشويرا অর্থ হলো, কথা বলার পরিবর্তে বুঝে আসে এমন ইশারায় কথা বলা। অর্থাৎ বোঝার ক্ষেত্রে ইশারা করাই কথা বলার শামিল। যেমন কেউ যদি কোনো বিষয়ে অনুমতি দিয়ে হাত বা মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করে, তবে তা কথা বলার স্থলাভিষিক্ত বলে ধরা হবে। এমনিভাবে شاورته فِي كذا বা استشرته এর অর্থ হলো, কোনো ব্যাপারে নিজের মত পেশ করার জন্য পুনরায় বলা। اشار علي بكذا অর্থাৎ তার কাছে এ বিষয়ে কী কল্যাণ আছে, সে আমাকে দেখাল। مشورة (শীন বর্ণে সাকিন বা পেশ যোগে—মাশওয়ারা বা মাশুরা) শব্দটির উৎপত্তি হলো মধু আহরণ হতে। কারণ, مشورة দ্বারা উত্তম নসিহত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা মধু পানের সাথে তুলনীয়। এ থেকে আরেকটি শব্দের উৎপত্তি হলো, شورى (শুরা)—যার অর্থ কোনো কিছু নিজের বলে দাবি করা।[৩৪৩]

পারিভাষিক অর্থ

শাইখ আহমাদ মহি উদ্দিন আজুজ বলেন :

> هي تبادل الآراء في أمر من الأمور لمعرفة أصوبها وأصلحها لأجل اعتماده والعمل به
>
> 'মুসলিমদের কোনো একটি কাজে সর্বাধিক সঠিক ও কল্যাণময় পন্থাটির ওপর নির্ভর ও আমল করার জন্য পরস্পর মত বিনিময় করাকে বলা হয় শুরা বা পরামর্শ।'[৩৪৪]

---

৩৪৩. আল-মিসবাহুল মুনির : ১/৩২৬ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৩৪৪. মানাহিজুশ শারিয়াতিল ইসলামিয়া : ২/১২৮ (মাকতাবাতুল মাআরিফ, বৈরুত)

ড. মুহাম্মাদ আবু ফিরাস বলেন :

تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا واختبارها من أصحاب العقول والأفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها أو إلى أصوبها وأحسنها ليعمل به لكي تتحقق أحسن النتائج

'শুরা হলো, কোনো বিষয়ে সর্বোত্তম ফলাফল বের করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মতামত ও চিন্তাভাবনা পেশ করে চিন্তাশীল ও বোদ্ধাজনদের পর্যবেক্ষণে যাচাই-বাছাইয়ের পর সঠিক বা সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সর্বোত্তম সিদ্ধান্তে পৌঁছা।'[৩৪৫]

শুরার গুরুত্ব

শুরার অর্থ ও সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় যে, এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। শুরা মূলত আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই জরুরি। পরিচর্যাগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিকসহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করছি।

ক. পরিচর্যাগত গুরুত্ব

বলা বাহুল্য, মানুষের মনের মাঝে অন্যের জন্য ভালোবাসা, অন্যের ভালো চাওয়া, অন্য কাউকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, তার কাজগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করার প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে। এমনিভাবে মানুষের মাঝে নিজের প্রতি আস্থা এবং সমাজের প্রতিও একটা আস্থা থাকে। তবে এমন সমাজের প্রতি, যে সমাজ সে মানুষকে নিজের পরামর্শ প্রদানের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। আর এ পরামর্শ প্রদানের স্বাধীনতা থাকার কারণে সেসব মানুষকে গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে সে মানুষটি সমাজের কল্যাণ কামনা, সমাজের উন্নতিকে গুরুত্ব প্রদান ও সমাজের বিভিন্ন কাজকে সঠিক পথে বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে।

৩৪৫. আন-নিজামুস সিয়াসি ফিল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ আবু ফিরাস : পৃ. নং ৭০

কিন্তু যখন সমাজের কাউকে এমন সুযোগ না দেওয়া হয়, নিজের পরামর্শ বলার কোনো সুযোগ তার না থাকে, সমাজ তার উপকারী পরামর্শগুলো থেকে বঞ্চিত হয়—যেমনটি আমরা বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে দেখে থাকি—সে সমাজের মাঝে তখন আত্মবিশ্বাসের কমতি দেখা দেয়, মানুষ নিজেকে নিয়ে তিক্ততা ও কষ্ট অনুভব করে, একপর্যায়ে সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে; এভাবে সে মানুষের কল্যাণকামিতার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বস্তুত, পরামর্শ-ব্যবস্থা না থাকার কারণে মানুষের পরিচর্যাগত দিকটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়।

খ. সামাজিক গুরুত্ব

পরামর্শ প্রদানের সুযোগ থাকার কারণে একটি সমাজের সদস্যদের মাঝে মজবুত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে তাদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপোড়া ও ভালোবাসা দৃঢ় হয়। যার কারণে একটি সামাজিক কাঠামো হয় শক্ত ও প্রতিষ্ঠিত। সমাজটিকে মনে হবে শক্ত বাঁধনে বাঁধাই করা একটি সীসাঢালা প্রাচীর।

অন্যদিকে পরামর্শ প্রদানের যদি সুযোগ না থাকে, তবে সমাজের সদস্যদের মাঝে দূরত্ব, সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়া, তিক্ততা ও বিচ্ছিন্নতা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মন-মানসিকতা থাকে বিভক্ত। ফলে তারা পর্যায়ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বসে। তাদের মাঝে কল্যাণের মানসিকতা কমে আসে।

গ. রাজনৈতিক গুরুত্ব

ইসলামি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দিকটির প্রতিষ্ঠা হলো উম্মাহর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য। যদি এতে পরামর্শ ও নসিহত প্রদানের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে উম্মাহর প্রতিটি ভাগ, প্রতিটি সদস্যের প্রতিটি দিকের কল্যাণ সাধিত হয়। ফলে সকল মানুষই উত্তমকে গ্রহণ করতে পারবে, মন্দকে বর্জন করতে পারবে। এ রকম নীতি প্রতিষ্ঠার মাঝেই রয়েছে নিরাপদ ও শান্তিময় জীবনের নিশ্চয়তা।

পরামর্শের সুযোগ থাকার ফলে শাসক ও শাসিতের মাঝে ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে উভয় শ্রেণিই বিচ্ছিন্নতা ও কপটতার

ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত জীবনযাপন করতে পারে। তাদের মাঝে আমিত্ববোধ, জোর-জবরদস্তি বা একচেটিয়া দখলের ভাব থাকে না। তাই শুরার রাজনৈতিক এ অতুলনীয় দিকটি কোনোমতেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ঘ. অর্থনৈতিক গুরুত্ব

অভিজ্ঞজনের পরামর্শের ফলে অর্থনৈতিক দিকটি সমৃদ্ধ হবে। এতে বিভিন্ন ধরনের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। রাষ্ট্রের মাঝে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুসংহত থাকবে। সাধারণ মানুষও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করতে পারবে। তাদের আর্থিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে না।

ঙ. সামরিক গুরুত্ব

সামরিক দিকটি জিহাদের বিভিন্ন কলা-কৌশল ও পরিকল্পনার ওপর গঠিত হয়। ইসলামের এ বিভাগটিতে থাকে শত্রুকে বোকা বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় ধোঁকা দেওয়ার কৌশল। আর উম্মাহর বর্তমান সংকটময় সময়ে এ দিকটির প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। তাই অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞজনদের অবশ্যই সামরিক বিষয়াদিতে পরামর্শ করতে হবে। যেন বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য সঠিক ও উত্তম পরিকল্পনাটি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে যদি ভুল কিছু পরিকল্পনা করা হয়, তবে তা উম্মাহর জন্য যন্ত্রণাদায়ক হবে বৈকি।

শুরা বা পরামর্শের গুরুত্ব সম্পর্কে এ স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়টিতে এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট। ইমাম হাসান বসরি ﵀ এ ব্যাপারে বলেন, 'কোনো জাতি পরামর্শ করে চললে তাদের সর্বাধিক সঠিক পথে পরিচালিত করা হয়।'[৩৪৬]

শুরার শরয়ি হুকুম

পরামর্শ করার হুকুম নিয়ে দুধরনের মত পাওয়া যায়। ইমাম কাতাদা ﵀, ইমাম ইবনে ইসহাক ﵀, ইমাম শাফিয়ি ﵀-সহ প্রমুখদের মতে পরামর্শ

৩৪৬. তাফসিরুল কুরতুবি : ১৬/৩৬ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়া, কায়রো)

করা মুসতাহাব। এর বিপরীতে ইমাম ইবনে আতিয়া ﵀, ইমাম রাজি ﵀, ইমাম নববি ﵀-সহ প্রমুখ এটিকে ওয়াজিব বা আবশ্যক মনে করেন।[৩৪৭]

বিধানগত দিক থেকে পরামর্শ করা ওয়াজিব হোক বা মুসতাহাব, বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এটিকে হালকা করে দেখা, গুরুত্ব না দেওয়া বা শিথিলতা করার কোনো সুযোগ নেই। মুসলমানদের মাঝে পরামর্শের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কমতি বা ছাড়াছাড়ি করার মানসিকতা থাকলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ইতিহাসে এর অসংখ্য নজির রয়েছে। তাই সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত জাতীয় ও গণকাজে পরামর্শ করা নেওয়া একান্ত জরুরি। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের ভাষ্যও পরামর্শ করার আবশ্যকীয়তার দিকে ইঙ্গিত বহন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾

'আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।'[৩৪৮]

এ আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা পরামর্শ করার আদেশ করেছেন। এই আয়াত দ্বারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে পরামর্শ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; অথচ তিনি একজন নবি। বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করার জন্য তাঁর কাছে ওহি আসত। তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আর কী বলার থাকতে পারে, যাদের স্বভাবের মধ্যেই মিশে আছে দুর্বলতা, ভুলে যাওয়া, তাড়াহুড়া করা ও ভুল করা!

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণাগুণের বর্ণনা দিয়ে বলেন :

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾

'নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে তারা নিজেদের কাজ সম্পাদন করে।'[৩৪৯]

৩৪৭. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ২৬/২৭৯-২৮০ (অজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত)
৩৪৮. সুরা আলি ইমরান : ১৫৯
৩৪৯. সুরা আশ-শুরা : ৩৮

তাই মানুষের প্রতিটি দিকের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে পরামর্শ করার গুরুত্ব অনেক বেশি। যাতে করে কার্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে উম্মাহ ভুল ও ভ্রান্তিতে পতিত না হয়। উম্মাহকে যেন অবনতি ও পরাজয়ের গ্লানি আস্বাদন করতে না হয়। উম্মাহকে যেন একচেটিয়া ও নির্দিষ্ট কারও মতের অনুগত হতে না হয়।

মানুষের জীবন সঠিকতা ও উত্তমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এটি একটি মৌলিক নিয়ম। এর ফলে মানুষ প্রকৃত কর্ম তালাশ করতে পারবে, তারা শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগুতে পারবে, কল্যাণের পথে আসতে পারবে। এ নীতিটি ক্ষতির প্রতিবন্ধক হবে। ব্যক্তির ও ক্ষতির উপাদানের মাঝে বাধা হয়ে থাকবে এটি। এ জন্য ইসলাম এর প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে এবং এ ব্যাপারে শিথিলতা করতে নিষেধ করে দিয়েছে। এটির প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দেওয়ার আরেকটি কারণ হলো, যাতে করে মানুষ আমিত্ববোধ ও একনায়কতান্ত্রিকতার ক্ষতিতে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

আরও একটি তাত্ত্বিক দিক হলো, যে ব্যক্তি পরামর্শ করার বিষয়গুলোতে কোনো চিন্তাবিদ বা বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করবে, তাহলে তার সিদ্ধান্ত ভুল হলেও সে ক্ষেত্রে ওই ভুল তার একার ওপর বর্তাবে না। এ ব্যাপারে কোনো এক জ্ঞানী বলেন, 'আমি কখনো ভুল করি না। কারণ, যখন কোনো বিষয়ে আমি চিন্তিত থাকি, তখন আমি আমার জাতির সাথে পরামর্শ করি। তারা যা বলে, তার ওপর ভিত্তি করে আমি কাজ করি।' এমনটি হলে যদি সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে সকলেই তার বাহ বাহ পায়। আর যদি তা ভুল হয়ে থাকে, তবে ভুলের মাশুল সবাইকে গুনতে হয়।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

﴿ إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ﴾

'যখন তোমাদের আমিরগণ হবে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং তোমাদের ধনীরা হবে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল এবং তোমাদের কাজকর্ম পরিচালিত হবে তোমাদের পরামর্শের ভিত্তিতে, তখন জমিনের ভেতরের চেয়ে জমিনের ওপর হবে তোমাদের জন্য উত্তম। আর যখন তোমাদের আমিরগণ হবে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আর তোমাদের ধনীরা হবে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ এবং তোমাদের কর্তৃত্ব থাকবে মহিলাদের হাতে তখন জমিনের ওপরের চেয়ে জমিনের ভেতরটা তোমাদের জন্য উত্তম হবে।'[৩৫০]

দাওয়াতের ক্ষেত্রে পরামর্শ করার জন্য পরামর্শ সংবলিত আয়াতটি মক্কায় নাজিল হয়েছিল। এরপর যখন মদিনায় মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হলো, তখন এ পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেল। নবিযুগে পরামর্শ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল; অথচ তখন মুসলিমদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ! তবুও তখন পরামর্শের আদেশ বহাল ছিল। এ থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয় :

প্রথমত, সাধারণ বিষয়গুলোতে সকল মুসলমানের নিজেদের মাঝে পরামর্শের জন্য আহ্বান করা হয়েছে; চাই তা যত সহজ ও হালকা বিষয়ই হোক না কেন। সুরা শুরার পরামর্শ সংবলিত আয়াতটির নাজিলের সময়ক্ষণ থেকে এটা সহজেই অনুমিত হয়। কেননা, তখন তো মুসলিমদের কোনো রাষ্ট্র ছিল না। তাহলে তাদেরকে নিজেদের স্বল্প পরিসরের বিষয়গুলোতেই পরামর্শ করার আদেশ করা হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, মুসলিমদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাধারণ সকল ব্যাপারেই পরামর্শ করে চলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের সাধারণ ব্যাপারগুলোতে যেহেতু পরামর্শের বিধান রাখা হয়েছে, তাহলে এর চেয়ে জরুরি বিষয়গুলোতে; বিশেষ করে মুসলিমদের পরিচালনার ক্ষেত্রসমূহে অবশ্যই পরামর্শ করার বিষয়টি আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এটা তাদের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হিসাবে দাঁড়াবে।

৩৫০. সুনানুত তিরমিজি : ৪/৯৯, হা. নং ২২৬৬ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

এখানে আরেকটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া জরুরি যে, পরামর্শ কখনো নসনির্ভর বিষয়গুলোতে হবে না। কেননা, যেসব বিধান কুরআন ও হাদিসের নস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সেসব বিষয়ে পরামর্শ করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে কারও কোনো মতামত প্রদানের অবকাশ নেই। নসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এসব বিষয়ে কোনো ধরনের সন্দেহ বা পর্যালোচনার অবকাশ নেই। কেননা, এতে কোনো ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ নেই। পরামর্শ হবে কেবল পার্থিব বিষয়াদিতে, যে বিষয়গুলো বুদ্ধি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। আর وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। এ আয়াতের মধ্যে الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য, উম্মাহর পার্থিব বিষয় সংবলিত শাসকদের কর্মপন্থাসমূহ।[৩৫১]

যদি শাসকদের আকিদা, ইবাদত ও হালাল-হারামের মতো ওহি সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে পরামর্শ করার সুযোগ দেওয়া হতো, তবে ইসলামের মূলভিত্তি পুরোটাই ভেঙে পড়ত, দ্বীনের বিষয়গুলো মানুষের চাহিদার ওপর অর্পিত হতো এবং সর্বদা এগুলো পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ওপর থাকত। অবস্থা এমন হতো যে, যে কেউ মসনদে এসেই দ্বীনের মৌলিক ভিত্তিগুলো একেকবার একেকরকম করে দিত।

তাই পরামর্শের ক্ষেত্র হলো ওই সব পার্থিব বিষয়, যে ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের মধ্যে কোনো নস নেই এবং যে ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের ইজমাও নেই। মূলত যে বিষয়ের ভিত্তি সঠিক চিন্তা-ভাবনা ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্যটি নেই, সেই বিষয়েই কেবল পরামর্শ করতে হবে। আর যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসের সরাসরি নস বা দলিল আছে, সে বিষয়ে কোনো ধরনের দ্বিধা ও সংশয় ছাড়াই দলিলের ওপর আমল করতে হবে।

কোনো ধরনের দ্বিধা ও সংশয় ছাড়া ধৈর্যের সাথে ওহির অনুসরণ করা এবং কাফির-মুশরিকদের এড়িয়ে চলার আদেশ করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾

৩৫১. তাফসিরুল মানার : ৪/১৬৪ (আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যা)

'আপনি আপনার রবের পক্ষ থেকে আদিষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করুন। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।'[৩৫২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾

'আপনার রবের পক্ষ থেকে যা প্রত্যাদেশ করা হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন, যতক্ষণ না আল্লাহ ফয়সালা করেন। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।'[৩৫৩]

অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

'আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা প্রত্যাদেশ করা হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।'[৩৫৪]

নবুওয়াতের যুগে ও খুলাফায়ে রাশিদার যুগে পরামর্শ

পরামর্শ করাটা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল। তিনি পার্থিব বিষয়গুলো সাহাবায়ে কিরামের সামনে পেশ করতেন, তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন এবং পরামর্শের ভিত্তিতে সঠিক ও নির্ভেজাল সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর আশপাশে থাকা বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি এটা করতেন সাধারণ ও বিশেষ উভয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে। তাহলে একবার চিন্তা করে দেখুন, যুদ্ধ বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে অবস্থা কী ছিল?

৩৫২. সুরা আল-আনআম : ১০৬
৩৫৩. সুরা ইউনুস : ১০৯
৩৫৪. সুরা আল-আহজাব : ২

উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা সংগত মনে করছি :

- বদর যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ ﷺ হাব্বাব বিন মুনজির ﵁-এর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বদরে এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে অল্প পানিসম্পন্ন এক স্থানে অবস্থান নিলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে তোমরা পরামর্শ দাও। তখন হাব্বাব বিন মুনজির ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি এই জায়গা সম্পর্কে এবং এখানকার কূপগুলো সম্পর্কে অবগত আছি। আপনি যদি চান, তাহলে আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সমৃদ্ধ ও সুমিষ্ট কূপের নিকট যাব। সেটি হবে আমাদের অবস্থানস্থল। শত্রুপক্ষের আগেই সেখানে পৌছব এবং সেই কূপ ব্যতীত সকল কূপের পানি নষ্ট করে দেবো। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ হাব্বাব ﵁-এর এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন। কারণ, এটি ছিল যুদ্ধের জন্য খুবই উপযুক্ত ও সঠিক একটি পরামর্শ। এ ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ পরামর্শের মাধ্যমেই এই মতটি গ্রহণ করেছিলেন।

- উহুদের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরাম ﵃-এর সাথে পরামর্শ করলেন যে, মদিনা থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করবেন নাকি মদিনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করবেন। এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মত ছিল মদিনা থেকে বের না হয়ে ভেতরেই অবস্থান করা। আর যখন শত্রুপক্ষ মদিনায় প্রবেশ করবে, তখন গলির মুখে তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন এবং নারী ও শিশুরা ঘরের ভেতরে ছাদের ওপর অবস্থান করবে। আর মূলত এটিই ছিল সঠিক মত।

অন্যদিকে যে সকল সাহাবি বদর যুদ্ধে যেতে পারেনি, তারা পরামর্শ দিল মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার এবং তারা এ ব্যাপারে রীতিমতো পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখে তাদের পরামর্শকে প্রাধান্য দিলেন এবং বাইরে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর আগ্রহের বিপরীত অধিকাংশ সাহাবি, বিশেষ করে যুবক সাহাবিদের আগ্রহ ও মতামত প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক পরামর্শকে অগ্রাধিকার প্রদান করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের অন্তরে যেন পরামর্শের গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় এবং এটিকে তাদের জন্য অপরিহার্য বিষয় বানিয়ে নেয়। তাদের কোনো একটি কাজও যেন পরামর্শ ব্যতীত না হয়।

- খন্দক যুদ্ধের সময় যখন সমস্ত মুশরিক এক হয়ে মুসলমানদের সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য মদিনায় আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন সালমান ফারসি ﵁ পরিখা খননের পরামর্শ দিলেন। যেন তা শত্রুদের মদিনায় প্রবেশের প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড়ায়। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ এই মত গ্রহণ করে পরিখা খননের আদেশ দিলেন এবং নিজেও খনন কাজে অংশগ্রহণ করলেন।

- অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারেও সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। তখন আবু বকর ﵁ বন্দীদের ব্যাপারে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিলেন। আর উমর ﵁ তাদের হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ﵁-এর মত গ্রহণ করলেন এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে সবাইকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পরামর্শ করার পদ্ধতি

ইসলাম পরামর্শের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়নি যে, পরামর্শের ক্ষেত্রে তাদের সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে; বরং বিষয়টি তাদের ওপর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে, যাতে করে এটি তাদের জন্য সহজ হয়।

আর ইসলামের একটি বড় মূলনীতি হলো, ইসলাম কঠোরতা ও সংকীর্ণতা চায় না; বরং মানুষ সহজভাবে জীবনযাপন ও ধর্ম পালন করবে, এটিই ইসলামের মূলনীতি।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

'তিনি তোমাদের পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।'[৩৫৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা চান না।'[৩৫৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾

'তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালো জানেন, যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি ভালো জানেন, কে তাকে ভয় করে চলে।'[৩৫৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾

'তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা নিজেদের পূত-পবিত্র বলে থাকে, অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই পবিত্র করেন? বস্তুত তাদের ওপর সুতা পরিমাণ অন্যায়ও করা হবে না।'[৩৫৮]

---

৩৫৫. সুরা আল-হজ : ৭৮
৩৫৬. সুরা আল-বাকারা : ১৮৫
৩৫৭. সুরা আন-নাজম : ৩২
৩৫৮. সুরা আন-নিসা : ৪৯

তৃতীয় মূলনীতি : ন্যায়পরায়ণতা

ন্যায়পরায়ণতার ওপরই ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূলভিত্তি স্থাপিত। ন্যায়পরায়ণতা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। ইসলামে বর্ণিত ব্যবস্থায় এমন কোনো দিক নেই, যেখানে ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজন নেই। একজন মানুষকে ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে তার পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। এটিই ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত মূলনীতি।

ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্র ও পরিধি অনেক বিস্তৃত হলেও এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধু শাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ন্যায়পরায়ণতা। এ ক্ষেত্রটি শাসক ও প্রভাবশালীদের সাথে সম্পৃক্ত। এরাই মূলত মানুষকে পরিচালনা করে থাকে।

ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনা আছে, এমন প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই জানে যে, ইসলামে ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের প্রতিটি বিধানই ইনসাফপূর্ণ। তাই ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত ইসলামি রাজনীতির কোনো ভিত্তিই নেই।

শাসক ও প্রভাবশালী যখন মানুষের অধিকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, মানুষকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেয় না; বরং জনগণের ওপর জুলুম ও জবরদস্তির রাজত্ব কায়েম করে; অবশ্যই সেই শাসনব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত ও নীতিহীন হয়ে থাকে। এমন নিজাম জবরদস্তি ও স্বৈরতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই শাসনব্যবস্থার মূলে ন্যায়পরায়ণতা না থাকার কারণে ইসলাম কখনোই তাকে সমর্থন করে না।

মানুষের বাস্তব জীবনে শাসনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতাই যে মূলভিত্তি, সেই বিশ্বাস ও ইয়াকিন যেন মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে, সেই জন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করো। আল্লাহ তোমাদের সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।'[৩৫৯]

বান্দাকে সকল ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ন্যায়ের ওপর থাকতে হবে। কোনো অবস্থাতেই অন্যায় পথে যাওয়া যাবে না এবং ঘৃণিত পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করে কারও প্রতি জুলুম করা যাবে না। যারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সাক্ষ্য, বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যায়কে পরিহার করে অন্যায়কে গ্রহণ করে, তাদের সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও আল্লাহর সাক্ষীরূপে; যদিও তা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়। কেউ যদি সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের চেয়ে তাদের ব্যাপারে অধিক কল্যাণকামী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কেই অবগত।'[৩৬০]

৩৫৯. সুরা আন-নিসা : ৫৮

মুসলমানদের ওপর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা ও অন্যায় থেকে দূরে থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রতিটি মুসলমানকে তার পরিচিত-অপরিচিত, নিকটবর্তী-দূরবর্তী, একাকী বা জামাতবদ্ধ অবস্থায়—এককথায় সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কারও প্রতি অন্যায় ও জুলুম করা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংগত কাজ ও অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।'[৩৬১]

আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে মানুষের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে বিচার করার আদেশ করেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি সকল শাসক ও ক্ষমতাবানদের উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, তারা যেন মানুষের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। কোনোভাবেই যেন তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচার না করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

'আর আপনি যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়সংগত ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।'[৩৬২]

৩৬০. সুরা আন-নিসা : ১৩৫
৩৬১. সুরা আন-নাহল : ৯০
৩৬২. সুরা আল-মায়িদা : ৪২

যারা মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন করে—আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করে, হাদিসে তাদের অনেক ফজিলতের কথা বলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তারা অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : الإِمَامُ العَادِلُ

'যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কারও ছায়া বাকি থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে ছায়া দেবেন। একজন হলো ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।'[৩৬৩]

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

'ন্যায় বিচারকগণ (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাআলার নিকটে নুরের মিম্বারে মহামহিম দয়াময় প্রভুর ডানপাশে উপবিষ্ট থাকবে—আর তাঁর উভয় হাতই ডান হাত (তথা সমান মহিয়ান)[৩৬৪]—যারা তাদের শাসনকার্যে তাদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে ও তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে।'[৩৬৫]

৩৬৩. সহিহুল বুখারি : ১/১৩৩, হা. নং ৬৬০ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৩৬৪. এর অর্থ হলো, আল্লাহর উভয় হাতই বরকতময়, উত্তম ও সমমর্যাদার। সাধারণত মাখলুকের ডান হাত শক্তিশালী হয় আর বাম হাত দুর্বল হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার এমন কোনো দুর্বলতা নেই। এটাই হাদিসে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, তাঁর উভয় হাতই ডান হাত। আরেকটি বিষয় হলো, এখানে হাত বলতে আমাদের মতো কোনো অঙ্গ বুঝানো হয়নি; বরং এটা আল্লাহর সিফাত, যার অস্তিত্বের কথা তো আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু তার রূপ বা ধরণ আমরা জানি না।
৩৬৫. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৫৮, হা. নং ১৮২৭ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

আওফ বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমাদের সর্বোত্তম শাসক হলো তারা, যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে। তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং তারাও তোমাদের সাথে মিলিত হয়। আর তোমাদের সর্বনিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদের তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে। তোমরা তাদের লানত করো এবং তারাও তোমাদের লানত করে।'[৩৬৬]

আবু সাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ

'কিয়ামতের দিন লোকদের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠ শাসকই হবে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটে উপবেশনকারী। আর তাদের মাঝে অত্যাচারী শাসকই হবে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে ঘৃণিত ও দূরে অবস্থানকারী।'[৩৬৭]

আর এর বিপরীতে জুলম হলো সবচেয়ে বড় ও নিকৃষ্ট অপরাধ। ইসলাম জুলম ও জালিমদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ধমকি দিয়েছে। হাদিসে এ ব্যাপারে ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩৬৬. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৮১, হা. নং ১৮৫৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৩৬৭. সুনানুত তিরমিজি : ৩/১০, হা. নং ১৩২৯ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, জুলুম কিয়ামতের দিন কালো অন্ধকার হয়ে আসবে।'[৩৬৮]

আবু মুসা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

'আল্লাহ তাআলা জালিমকে সুযোগ দেন। আর যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর পালানোর সুযোগ দেন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "আর তোমার রব যখন কোনো পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই যন্ত্রণাদায়ক, বড়ই কঠোর।"' [সুরা হুদ : ১০২][৩৬৯]

আবু বাকরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

'জুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো অন্য কোনো গুনাহ নেই; যার কারণে গুনাহগার ব্যক্তি দুনিয়াতেই শাস্তির অধিক উপযুক্ত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা আখিরাতে তার জন্য শাস্তি জমা করে রেখেছেন।'[৩৭০]

৩৬৮. সহিহ মুসলিম : ৪/১৯৯৬, হা. নং ২৫৭৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৩৬৯. সহিহ মুসলিম : ৪/১৯৯৭, হা. নং ২৫৮৩ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৩৭০. সুনানু আবি দাউদ : ৪/২৭৬, হা. নং ৪৯০২ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

মাকিল বিন ইয়াসার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

'কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিমদের দায়িত্ব লাভ করল, অতঃপর সে তার প্রজাদের সাথে প্রতারণা করে মৃত্যুবরণ করল; তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।'[৩৭১]

ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর এতগুলো নস শুধু আলোচনা ও উপমা বর্ণনা করার জন্য আসেনি; বরং বাস্তবজীবনে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এ নসসমূহ এসেছে। ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এর বাস্তব প্রমাণ অনেক আছে। আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কেউ সামান্য পরিমাণ বিতর্কও করতে পারবে না।

অনুরূপভাবে খুলাফায়ে রাশিদিন—আবু বকর ﷺ, উমর ﷺ, উসমান ﷺ, আলি ﷺ-সহ অনেক মুসলিম শাসক ছিলেন ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা ছিলেন নেক, সৎ ও আল্লাহভীরু। তারা পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের মাঝে আল্লাহভীতি ও ন্যায়পরায়ণতা এমন সমৃদ্ধ পরিমাণে ছিল যে, তাদের জীবনের দিকে তাকালে অবাক হয়ে যেতে হয়। আশ্চর্য হয়ে মনের মধ্য থেকে প্রশ্ন এসে যায়, এটাও কি সম্ভব? আমাদের ইসলামি ইতিহাস এমনই গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে, যার কিয়দাংশও অন্য কোনো জাতি দেখাতে পারবে না।

৩৭১. সহিহুল বুখারি : ৯/৬৪, হা. নং ৭১৫১ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

চতুর্থ মূলনীতি : সাম্য ও সমতা

সমতা ইনসাফপূর্ণ সম্পর্কের একটি দলিল। কেননা, সমতা ইনসাফেরই একটি প্রকার। সুতরাং সমতা নিয়ে কথা বলা মূলত ইনসাফ নিয়ে কথা বলারই নামান্তর।

এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে মানবিক সমতা একমাত্র অভিন্ন বিশ্বাস ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মৌলিক উৎস হিসাবে ইসলামের বিশ্বাস ও ব্যবস্থাপনা হলো পথনির্দেশিকা। আর এ জাতীয় বিষয়াদি তৈরি করার ব্যাপারে ইজতিহাদ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি প্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই। আর সে অবকাশটুকু হলো কেবল ফিকহি বিধিবিধানের শাখাগত মাসায়িল, যা শরিয়তের মূলনীতিসমূহের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ।

তা ছাড়াও অভিন্ন বিশ্বাস ও ব্যবস্থাপনা স্বতঃসিদ্ধভাবেই মানুষের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করে। আর এটি এমন একটি সুদৃঢ় মূলনীতি, যা কোনো কারণেই ভঙ্গ হওয়ার নয়। এখানে নারী বা পুরুষ হওয়া, ধনী বা গরিব হওয়া, শাসক বা শাসিত হওয়া, সুন্দর বা কুৎসিত হওয়া—এভাবে বর্ণ, গোত্র ও জাতীয়তার ভিন্ন কোনো মর্যাদা নেই।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের মাঝে ভাষা, গোত্র ইত্যাদি দিক থেকে ভিন্নতা দিলেও মর্যাদার মাপকাঠি একটিই রেখেছেন। আর তা হলো তাকওয়া। যার তাকওয়া বেশি আল্লাহর নিকটে তার মর্যাদা বেশি। চাই সে বর্ণ, গোত্র, আকৃতি ইত্যাদির বিবেচনায় সবচেয়ে নিম্নস্তরেরই হোক না কেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾

'হে মানবজাতি, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও দল-উপদলে বিভক্ত করেছি; যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হতে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান হলো সর্বাধিক তাকওয়াবান ব্যক্তি।'[৩৭২]

আল্লাহর এ ঐশী বাণীর আলোকে কারও জন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই একে অন্যের ওপর প্রাধান্য ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই তাদের মাঝে মর্যাদার পার্থক্য নির্ণীত হবে। মর্যাদার এ মানদণ্ডের সাথে আরেকটি জিনিস যুক্ত করা যায়। আর তা হলো, উপকারী ইলম। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ও সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি সে, তাকওয়া ও ইলমে যে অধিক অগ্রগামী।

আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে বলেন :

﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

'তোমাদের মধ্য হতে যারা ইমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের অনেকগুণ মর্যাদা উন্নীত করে দেন।'[৩৭৩]

বর্তমান সময়ে নর-নারীর মাঝে পার্থক্যকরণের দৃষ্টিভঙ্গিটি মূর্খতাসুলভ ভ্রান্ত মানসিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ ইসলাম আজ থেকে দেড় সহস্র বছর পূর্বেই এ ভ্রান্ত মানসিকতা প্রত্যাখ্যান করেছে। সৎ আমল করলে সে পুরুষ হোক আর নারী হোক—মর্যাদা সবার সমান। এখানে লিঙ্গভেদে মর্যাদার কোনো হেরফের হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

'মুমিন নর-নারী হতে যারা সৎকর্ম করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি তিল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।'[৩৭৪]

---

৩৭২. সুরা আল-হুজুরাত : ১৩
৩৭৩. সুরা আল-মুজাদালা : ১১
৩৭৪. সুরা আন-নিসা : ১২৪

মেয়েদের বাদ দিয়ে শুধু ছেলেদেরই মর্যাদার আসীনে সমাসীন করা ও এমন পদ পেয়ে উপভোগ করার বাসনা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন ভাবনা তার সামান্য কাজেও আসবে না। তাই আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। যাতে করে মন-মস্তিষ্কে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, একমাত্র সৎকর্মের মাধ্যমেই নিশ্চিত হবে আখিরাতের মুক্তি, লিঙ্গ পরিচয়ের মাধ্যমে নয়।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾

'এটা তোমাদের ভাবনা অনুসারেও হবে না এবং আহলে কিতাবদের কল্পনা অনুযায়ীও হবে না। যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম করবে, তাকে তদনুযায়ীই প্রতিফল দেওয়া হবে এবং সে আল্লাহকে ছাড়া কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে পাবে না।'[৩৭৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বান্দার মাঝে সাম্যের বিষয়টি আমাদের স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। সাথে এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, সকলের প্রাণ সমান মূল্যমান। এতে কোনো ধরনের পার্থক্য করার সুযোগ নেই। তবে কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারটা ভিন্ন। কেননা, শরিয়তের দৃষ্টিতে তাদের কোনো সম্মান ও মর্যাদা নেই।

আলি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

'মুমিনদের সবার প্রাণ সমমর্যাদার। আর তারা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি হাতের মতো (একতাবদ্ধ)। তাদের একজন সাধারণ ব্যক্তিও (অমুসলিম) লোকদের নিরাপত্তা দিতে পারে।'[৩৭৬]

৩৭৫. সুরা আন-নিসা : ১২৩

৩৭৬. সুনানুন নাসায়ি : ৮/১৯, হা. নং ৪৭৩৪ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

আল্লাহ তাআলা আদম عليه السلام-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন; যদ্দরুন তিনি সকল মানুষের পিতা হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। এর পরে কারও জন্য জন্মের ব্যাপারে অন্যের ওপর প্রাধান্য নেই। আরব-আজম এতে সবাই বরাবর। কেননা, সকল মানুষ একটি মূল উপাদান থেকে সৃষ্ট। আর তা হলো মাটি। তারা পরস্পর একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে মর্যাদায় প্রতিযোগিতা করবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

'হে লোকসকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রভু একজন এবং তোমাদের পিতা একজন। সাবধান! অনারবের ওপর কোনো আরবের মর্যাদা নেই এবং আরবের ওপর কোনো অনারবের মর্যাদা নেই। অনুরূপ কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের ফজিলত নেই এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ফজিলত নেই। মর্যাদার মাপকাঠি হলো, একমাত্র তাকওয়া।'[৩৭৭]

আবু হুরাইরা رضي الله عنه রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

'যার আমলের গতি শ্লথ হবে, তার বংশমর্যাদা তাকে ত্বরান্বিত করতে পারবে না।'[৩৭৮]

সর্বোপরি ইসলামে সকল মুসলমানের প্রাণমূল্য সমান। সকলেই এদিক থেকে একই ধরন ও সমপরিমাণ মর্যাদার অধিকারী। তবে যারা তাকওয়া ও ইলমের অধিকারী হবেন, তারা স্ব স্ব তাকওয়া ও ইলমের স্তর অনুযায়ী মর্যাদার বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হবেন।

৩৭৭. মুসনাদু আহমাদ : ৩৮/৪৭৪, হা. নং ২৩৪৮৯ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

৩৭৮. সহিহ মুসলিম : ৪/২০৭৪, হা. নং ২৬৯৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

ইসলামের সাম্যনীতি আলোচনার পর আমরা কাফির, মুশরিকদের কতিপয় মিথ্যা অপবাদ ও প্রোপাগাণ্ডা উল্লেখ করতে চাই, যাদের অন্তর ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসা ও ঘৃণা দিয়ে ভরপুর, যাদের স্বভাব-প্রকৃতি ইসলাম ও মুসলমানদের বিপরীত অন্ধ ঘৃণার আগুনে উত্তপ্ত থাকে। আর তাই তারা নিজেদের অন্তরের তপ্ত আগুন নিভানোর জন্য ইসলামের ব্যাপারে জঘন্য অপবাদ ও মিথ্যা প্রচার করতে থাকে। এ ব্যাপারে খ্রিষ্টান, মূর্তিপূজারি, ধর্মনিরপেক্ষ, কমিউনিস্ট, ইহুদি, ঔপনিবেশিক সবাই এক ও অভিন্ন। এরা সবাই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সমভাবে শরিক। তারা সর্বদা এই দ্বীনের সীমানায় ওত পেতে অপেক্ষা করছে। সদা-সর্বদা ইসলামকে পৃথিবী থেকে উৎখাত ও সব স্থান থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।

যুগে যুগে এভাবে ইসলামবিদ্বেষীরা বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ তৈরি করে এবং সাধারণ মুসলমানদের ইমানি শক্তি নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সংশয় সৃষ্টি করতে থাকে। যেন দ্বীনের ব্যাপারে তারা সন্দেহ-সংশয়ে আক্রান্ত হয়ে দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ে দেখা যায়, তাদের চলচ্চিত্রগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। যেমন : দাস-দাসীর মাসআলা, একাধিক বিবাহের মাসআলা, নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের মাসআলা, মিরাসের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের অর্ধেক সম্পদ পাওয়ার মাসআলা, দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমমানের হওয়ার মাসআলা এবং বাধ্যতামূলক আহলে কিতাবদের জিজিয়া দেওয়ার মাসআলাসহ নানান বিষয়—ইসলামের শত্রু কাফিররা প্রতিনিয়ত যা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তারা এই বলে বিদ্বেষ ছড়ায় যে, দেখো, ইসলাম দাস-দাসীদের মানবেতর জীবনযাপনের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করে না; অথচ তোমরা বলো, ইসলাম নাকি সকলকে তার ন্যায্য অধিকার দেয়! পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতে পারে, কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে কেন এ অবহেলা? পুরুষেরা কর্তৃত্বে থাকে, নারীরা তাদের অধীন হয়ে থাকে! উত্তরাধিকার সম্পদেও কেমন জুলুম! পুরুষরা নারীদের থেকেও বেশি পায়, আরও ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানে আমরা প্রতিটি মাসআলার কিছু ব্যাখ্যা দিতে চাই; যদ্দরুন এসব মাসআলায় ইসলামের যৌক্তিকতা ও ইনসাফপূর্ণ অবস্থান স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে।

দাস-দাসীর ব্যাপারে ইসলামের সাম্যনীতি

দাস-দাসীর মাসআলায় তো ইসলাম সর্বোত্তম অবস্থান গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর শুরুলগ্ন থেকে চলে আসা দাস-দাসী ও সমাজের দুর্বলশ্রেণির লোকদের ইতিহাস তাই বলে। এটি সুস্পষ্ট একটি বিষয়, যা সুস্থ চিন্তা ও বোধসম্পন্ন যে কেউই স্বীকার করবে।

এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামের অবস্থান হলো, যখন ইসলাম এ পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে, তখন দাসপ্রথা মানবসভ্যতাকে গ্রাস করে নিয়েছিল। আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল সমাজের প্রতিটি অংশ ও দলকে। ঘর, মাঠ, রাজমহল, সমাগমস্থল—এমন কোনো চারণভূমি ও বৈঠকখানা ছিল না, যেখানে দাস-দাসীদের অবাধ ব্যবহার করা হতো না।

এটা ছিল এমন এক নিদর্শন, যদ্দারা পুরো অতীত সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলামপূর্ব কোনো সমাজই এ থেকে মুক্ত ছিল না। বিষয়টি এতটাই ভয়ংকর ছিল যে, এমন বললেও অত্যুক্তি হবে না, 'পূর্বযুগে দাসের বিষয়টি ছিল মাটিতে প্রোথিত একটি খুঁটির মতো, যার ওপর প্রত্যেক জাতির ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নির্ভরশীল ছিল।' সুতরাং যদি কোনো ধর্ম, মতবাদ বা বিশ্বাস ধীরতা অবলম্বন না করে প্রথম ধাপেই এর মূলোৎপাটন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, তাহলে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ পুরো ব্যবস্থাপনাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত। ইসলামের একটি মৌলিক নীতিমালা হলো, ইসলাম প্রতিটি সমস্যার সমাধানের জন্য সঠিক ও সুচারু পদ্ধতি দেখিয়ে দেয়। আর তাই ইসলাম পরিমিত পন্থায় সুদৃঢ়ভাবে গুণে গুণে ধাপগুলো অতিক্রম করে তবেই এর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইসলাম এ ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য মৌলিকভাবে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

১. দাসব্যবস্থা নির্মূল ও মূলোৎপাটন।

২. আবশ্যিকভাবে বা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মুক্তকরণ।

৩. অর্থ বা শ্রমের বিনিময়ে মুক্তকরণ।

১. দাসব্যবস্থা নির্মূল ও মূলোৎপাটন

ইসলাম এমন অনেক বিষয়কে স্বীকৃতিই দেয় না, যার ভিত্তিতে লোকেরা মানুষকে দাস-দাসীতে রূপান্তরিত করত। যেমন : ঋণগ্রস্ত হওয়া, স্বাধীন মুক্ত লোকদের ধরে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া, অন্যদের জন্য নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিলীন করে দেওয়া, অপরাধীদের তাদের কৃত অপরাধ ও অন্যায় আচরণের জন্য দাস-দাসী বানানো, পারস্পরিক ঐচ্ছিক লেনদেনের ভিত্তিতে দাস-দাসী বানানো ইত্যাদি। আমরা এখানে প্রতিটি বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব।

ক. ঋণগ্রস্ত হওয়া :

ইসলামপূর্ব যুগের কথা। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অনেক সময় ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে যেত। যখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বারবার ঋণ আদায়ের ওয়াদা দিয়েও আদায়ে সক্ষম হতো না, তখন সর্বশেষ পন্থা হিসাবে ঋণদাতার দাস হিসাবে পরিগণিত হতে বাধ্য হতো। এটা ভুল ও অন্যায়মূলক প্রথা। ইসলাম এটাকে স্বীকৃতি দেওয়া তো দূরে থাক; বরং এমন পদ্ধতিকে হারাম ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়; এমন ক্ষেত্রে ঋণদাতার ওপর আবশ্যক করে দিয়েছে যে, যতক্ষণ না ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ আদায়ে সক্ষম হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত যদি সে ঋণ আদায়ে চূড়ান্তভাবে অক্ষম হয়, তবে তার ঋণ ক্ষমা করে দেবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

'আর যদি সে অসচ্ছল হয়, তাহলে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত মুলতবি করে রাখো। আর যদি দান (ক্ষমা) করে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে।'[৩৭৯]

৩৭৯. সুরা আল-বাকারা : ২৮০

খ. স্বাধীন মুক্ত লোকদের ধরে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া :

এটা হলো মানুষের স্বাধীনতাকে জোরপূর্বক দাসত্বে রূপান্তরিত করা। ইসলাম এটাকে কঠিনভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা, পৃথিবীতে কারও এ অধিকার নেই যে, স্বাধীন কাউকে দাস হিসাবে রূপান্তর করা; এমনকি সে যদি এতে রাজি ও সন্তুষ্ট থাকে, তবুও নয়।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

قَالَ اللهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, তিন শ্রেণির লোকদের জন্য কিয়ামতের দিন আমি নিজে বাদী হব। প্রথমত, যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা করে পরে তা ভঙ্গ করে। দ্বিতীয়ত, যে মুক্ত স্বাধীন মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। তৃতীয়ত, যে কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ দিয়ে তার থেকে কাজ পূর্ণভাবে আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয় না।'[৩৮০]

গ. অন্যদের জন্য নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিলীন করে দেওয়া :

জাহিলি যুগে এ প্রথার প্রচলন ছিল যে, মানুষ নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিলীন করে দাসে রূপান্তরিত হয়ে যেত। এটা হারাম ও সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই অগ্রহণযোগ্য। কেননা, স্বাধীন ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, নিজেকে সে সম্পদের মতো দাসে রূপান্তরিত করবে। যাকে মানুষ ক্রয় করবে কিংবা উপার্জন ও রক্ষণাবেক্ষণে তার প্রতি আগ্রহ দেখাবে।

ঘ. অপরাধীদের অন্যায় ও ভুলের সাজাস্বরূপ দাস-দাসী বানানো :

পূর্বযুগে এ আইন ছিল যে, অপরাধভেদে অপরাধীকে দাস বানানো আবশ্যক ছিল। ইসলামি শরিয়তে এটাকে অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট কর্ম হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, এটা কল্পনাও করা যায় না যে, কোনো

৩৮০. সহিহুল বুখারি : ৩/৮২, হা. নং ২২২৭ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

স্বাধীন ব্যক্তি তার অপরাধের জন্য দাসে রূপান্তরিত হবে। অপরাধের ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা বহাল রেখেই তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। যেহেতু কোনো অবস্থাতেই মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার কোনো অবকাশ নেই, যতই সে অপরাধ ও আইনভঙ্গ করে থাকুক না কেন। এতে শুধু সে তার প্রাপ্য শাস্তিটুকুই পাবে। এতটুকুই যথেষ্ট। এর বেশি অতিরিক্ত করা সীমালঙ্ঘন ও জুলুম বলে বিবেচিত।

ঙ. পারস্পরিক ঐচ্ছিক লেনদেন :

এ ধরনের লেনদেন সন্তানদের পিতা ও অন্যান্য লোকের মাঝে হয়ে থাকে। এর স্বরূপ হলো, নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সব সন্তান বা কিছু সন্তানকে বিক্রি করা। এ লেনদেনকে ইসলাম কঠিনভাবে নিন্দা ও তিরস্কার করেছে। বিবেক ও মানবতাও এটাকে জঘন্য বলে মনে করে। কোনো ব্যক্তিই তার সন্তানকে বিক্রি করতে পারে না; করলে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত হবে। আর আল্লাহর প্রতিপক্ষের জন্য ধ্বংস অবধারিত।

এ জাতীয় বিধি-নিষেধের মাধ্যমে ইসলাম অমানবিক ও অত্যাচারমূলক দাসপ্রথার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে; বরং এ কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, সে তো দাসত্বের উপকরণগুলোরই মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। ইসলামের অনুপম বিধানদানের কারণেই শেষ পর্যন্ত অবৈধভাবে দাসপ্রথার অস্তিত্ব শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

২. আবশ্যকতার কারণে বা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দাস মুক্তকরণ

দাসরা যেন স্বাধীন মানুষে পরিণত হতে পারে, সে জন্য ইসলাম দাসমুক্তির অনুমোদন দিয়েছে। এটি কখনো আবশ্যিকভাবে হয়, আর কখনো সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নফল হিসাবে হয়। যেমন :

ক. কোনো মুসলিম যখন শরিয়তের কিছু বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করে, তখন তাকে ক্ষতিপূরণ ও বিকল্প হিসাবে কাফফারা তথা দাসমুক্ত করা আবশ্যক হয়ে যায়। এ অপরাধগুলো হলো, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কাউকে হত্যা করা, শপথ ভঙ্গ করা, জিহার (স্ত্রীকে মা-বোনের সাথে তুলনা) করা, রমজানে ইচ্ছাকৃত রোজা ভেঙে ফেলা। এ সকল অপরাধের কারণে কাফফারা আবশ্যক হয়। আর কাফফারা আদায় করতে হলে দাসমুক্ত করতে হবে। ইসলামে এ ব্যবস্থা থাকার কারণে দাসদের মুক্তি ত্বরান্বিত হবে।

খ. সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নফল হিসাবে দাসমুক্ত করা মুমিনের সৎ সাহসিকতা ও উদারতার সাথে সম্পৃক্ত। ব্যক্তি ও দলের ভালোবাসা তাদেরকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামও তাদের এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ জোগায় এবং এ বিষয়ে জোর তাগিদ দেয়, যেন তারা দাসমুক্তির ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে। দাসমুক্তির সাওয়াব ও পুরস্কারের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় প্রচুর দলিল রয়েছে।

৩. অর্থ বা শ্রমের বিনিময়ে দাস মুক্তকরণ

এটি মনিব ও দাসের মাঝে কৃত চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন হয়। এ চুক্তির ফলে দাস স্বীয় দাসত্ব থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে মনিবকে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। অতঃপর নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ মনিবকে পরিশোধ করে স্বাধীন হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের জন্য সে বিভিন্ন কাজ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু কাজ করে অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়াতেও যদি সে অক্ষম বা দুর্বল হয়, তখন ইসলাম তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। জাকাত আদায়ের নির্ধারিত খাতের মধ্যে তাকেও অর্ন্তভুক্ত করেছে। যেন দাস-দাসীদের মুক্তি আরও ত্বরান্বিত করা যায়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

'জাকাত-সদকা তো কেবল ফকির, মিসকিন, উত্তোলনকারী কর্মচারী, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট অমুসলিম, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত,

আল্লাহর রাস্তা ও মুসাফিরের জন্য; আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।'[৩৮১]

এটি এ জন্য যে, তারা যেন তাদের মনিবকে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করে দ্রুত স্বাধীন হয়ে যেতে পারে। মনিবদের এ কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মনিবদের নির্দেশনা দিয়ে বলেন :

﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾

'তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখলে তাদের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করো।'[৩৮২]

ইসলামপূর্ব সময়ে প্রচলিত দাসব্যবস্থায় ইসলামের অবস্থান ও এর শিকড়কেই উপড়ে ফেলে দেওয়ার নীতি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ ছিল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ইসলামের পক্ষে এটি সম্ভব হয়েছে সুকৌশল, সহজলভ্য পদ্ধতি অবলম্বন ও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ায়। এমনকি উম্মতের ওপর কিছু কাল অতিক্রম হয়ে কয়েক প্রজন্ম পার হতে না হতেই দাসপ্রথা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে কিংবা ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া অংশ হয়ে গিয়েছে। এরপর দাসমুক্তির পথে যে পদস্খলন ঘটেছে, তা ইসলামি বিধিবিধানের অপপ্রয়োগের ফলাফল কিংবা আল্লাহর পথ থেকে সরে যাওয়ার পরিণতিস্বরূপ; যদ্দরুন শরয়ি বিধিবিধান বাস্তবায়নের ব্যাপারে ধীরতা ও শিথিলতার অভিযোগে দ্বীনকে দোষারোপ করা হয়।

ইসলাম সর্বদা দাস-দাসীদের রক্ষা করেছে এবং তাদের মানবিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। ইসলামি শরিয়তে সকল দাস-দাসীই সুরক্ষিত। এ ব্যাপারে মুলনীতি হলো, মানব সন্তানের মাঝে একমাত্র তাকওয়া ও সৎকর্মের দ্বারাই মর্যাদা ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা সুদৃঢ় শপথের মাধ্যমে বলেন :

৩৮১. সুরা আত-তাওবা : ৬০
৩৮২. সুরা আন-নুর : ৩৩

﴿ وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾

'কসম সময়ের। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাগিদ করে সত্যের, তাগিদ করে সবরের।'[৩৮৩]

এখানে বর্ণ, গোত্র ও জাতীয়তা ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের দৈহিক গঠন, বাহ্যিক আকার-আকৃতি দেখার বিষয় নয়; বরং তার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যই ইসলামে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইমান ও সৎকর্মের চাইতে কোনো কিছু মূল্যবান হতে পারে না। মর্যাদা ও বিবেচনার দিক থেকে মানুষ চাই মনিব হোক বা গোলাম, ধনী হোক বা গরিব, শাসক হোক বা শাসিত—সবাই আল্লাহর নিকট এক সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত ইমান ও সৎকর্মকেই মর্যাদা ও ব্যবধানের মাপকাঠি মানা হবে। আর এটিই তো ইসলামের মূলনীতি।

এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

'সাবধান! না অনারবের ওপর কোনো আরবের মর্যাদা আছে আর না আরবের ওপর কোনো অনারবের মর্যাদা আছে, অনুরূপ না কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের মর্যাদা আছে আর না কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের মর্যাদা আছে।'[৩৮৪]

দাস-দাসীরা আল্লাহর বিধানে মনিবের ভাই বৈ ভিন্ন কিছু নয়। ইসলামের বিশ্বাস তাদের এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছে এবং আল্লাহপ্রদত্ত পদ্ধতির

৩৮৩. সুরা আল-আসর : ১-৩
৩৮৪. মুসনাদু আহমাদ : ৩৮/৪৭৪, হা. নং ২৩৪৮৯ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

একতা তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। নবিজি ﷺ গোলামদের ব্যাপারে বলেন :

هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

'তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যা খাও, তাদেরকেও তা খাওয়াও; তোমরা যা পরিধান করো, তাদেরকেও তা পরিধান করাও। তাদের সাধ্যাতীত কোনো কাজে বাধ্য করো না। একান্ত যদি করেই থাকো, তাহলে তাদের কাজে সাহায্য করো।'[৩৮৫]

ইসলামি ব্যবস্থায় দাসদের মানুষ হিসাবে গণ্য করা এবং মর্যাদা ও নিরাপত্তার দিক থেকে তাদের সুরক্ষিত হওয়ার দলিল হলো, গোলামদের সাথে সীমালঙ্ঘন করলে ইসলাম তার প্রতিশোধের ব্যবস্থা রেখেছে। চাই সীমালঙ্ঘনটি হত্যা জাতীয় কিছু হোক বা সামান্য কোনো আঘাত, সম্মানহানি ও লাঞ্ছনা হোক।

আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে মনিব-গোলাম সবার জন্য সমমানের বিধান অবতীর্ণ করে বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস তথা প্রতিশোধ গ্রহণ আবশ্যক করা হয়েছে।'[৩৮৬]

কিসাস অর্থ পরস্পর সদৃশ ও মিল করা। সুতরাং অন্যায়ভাবে যে কেউ ইচ্ছাকৃত কাউকে হত্যা করবে, সে হত্যার উপযুক্ত হয়ে যাবে; নিহতের অবস্থান ও মর্যাদা যাই হোক না কেন।

৩৮৫. সহিহ মুসলিম :৩/১২৮২, হা. নং ১৬৬১ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)
৩৮৬. সুরা আল-বাকারা : ১৭৮

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾

'আর আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের ওপর এ বিধান অবতীর্ণ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সকল আঘাতের জন্যই প্রতিশোধের বিধান রয়েছে।'[৩৮৭]

অতএব, হত্যা বা আঘাতের ক্ষেত্রে নির্যাতিত ব্যক্তির জন্য সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি থেকে সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের অবকাশ রয়েছে, বেশী করার অনুমতি নেই। তবে হ্যাঁ, নির্যাতিত ব্যক্তি যদি ক্ষমা করে দেয়, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। এটি এমন একটি বিধান, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য, যতক্ষণ তারা মুমিন থাকবে। এখানে অপরাধীর জাতীয়তা, বর্ণ বা সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, বৈষয়িক ইত্যাকার কোনো অবস্থানের কোনো মূল্য নেই।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিধানের দিক থেকে মানুষের মাঝে সাম্যের বিষয়ে ইসলামের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপর ইসলামবিদ্বেষী শত্রু খ্রিষ্টান, ঔপনিবেশক, মূর্তিপূজারি, জায়নবাদি ইহুদি ও কমিউনিস্টদের ইসলামের ব্যাপারে মিথ্যারোপের আর কোনো অবকাশ নেই। যেখানেই তাদের অভিশপ্ত পা পড়েছে, সেখানেই তারা কঠোরতার মাধ্যমে মানবতা বিনষ্ট করেছে এবং মানুষের ওপর অযাচিত কর্তৃত্ব চালিয়েছে। যে দেশ বা জাতিই এ সকল শত্রুদের আগুনের শিকার হয়েছে, তারা লাঞ্ছনা, অপদস্থতা ও ধ্বংসের স্বাদ আস্বাদন করেছে। এ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং পুরো জাতি ও দলই তাদের শিকারে পরিণত হয়ে গেছে।

তারা মুসলিম জনগণের ওপর যে গণহত্যা ও ট্র্যাজেডি চালিয়েছে এবং কয়েক মিলিয়ন মুসলিমকে যেভাবে পাইকারি হারে হত্যা ও দেশত্যাগে

৩৮৭. সুরা আল-মায়িদা : ৪৫

বাধ্য করেছে, তা প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা নেই। যেমনটি তাদের পূর্বসূরি খ্রিষ্টানরা স্পেন ও মুসলিমদের কয়েকটি দেশে ঘটিয়েছে, যেখানে উপনিবেশ চরম বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস ডেকে এনেছে। অনুরূপভাবে যেমনটি ককেশাস, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুখারা, সমরকন্দসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে ঘটিয়েছে। এসব অঞ্চলে তারা চরম নির্যাতন, উচ্ছেদ চালিয়েছে এবং অন্যায়ভাবে কয়েক মিলিয়ন মুসলিমকে হত্যা করেছে।

এরপর দুর্বল মূর্তিপূজারির দল, যারা অসভ্য বর্বর সৈন্যদের মাধ্যমে ভারত ও কাশ্মীরে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা চালিয়েছে। এ সকল কুকীর্তি সত্ত্বেও এ নির্লজ্জ অপরাধীরা ইসলামের ব্যাপারে অভিযোগ ও মিথ্যারোপ করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করে না, যারা কিনা মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ হত্যা করেছে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভিন্ন স্থান থেকে সম্মিলিতভাবে উচ্ছেদ করেছে।

এসব লোক নিজেরা মুসলিমদের হত্যা করে চলছে নির্বিচারে, বিনা অপরাধে। তাদের এ কাণ্ডে মানবতার চরম লঙ্ঘন হলেও এগুলো করতে তাদের হাত এতটুকুও কাঁপে না। কিন্তু তাদের আত্মা তখনই কেঁপে ওঠে, যখন তারা ইসলামে দাসপ্রথার জন্য সামান্য অনুমোদন রাখার কথা শোনে! এমনই তো তাদের বক্তব্য। একদিকে মানবতার চরম লঙ্ঘন করে আবার অন্যদিকে তারাই মানবতার বুলি আওড়িয়ে বেড়ায়।

একাধিক বিবাহের যৌক্তিকতা

এ মাসআলা নিয়ে ইসলামবিদ্বেষীরা খুব সমালোচনা করে। এরা মূলত সমালোচনা, অভিযোগ ও ত্রুটি ধরার ক্ষেত্রে সংকীর্ণমনা হয়ে থাকে। ইসলামের সমালোচনার ক্ষেত্রে এদের সবার স্বভাব-প্রকৃতি এক ও অভিন্ন। অন্যায়ভাবে তারা ইসলামের দোষ-ত্রুটি বের করে। এরা নিজেদের জন্য একটি মাপকাঠি আর ইসলামের জন্য ভিন্ন মাপকাঠি নিয়ে বসে। অথচ যারা বুঝতে চায়, তাদের জন্য একাধিক বিবাহের বিষয়টি স্পষ্ট ও অত্যন্ত যৌক্তিক। বিশেষত যখন আমরা জানি যে, ইসলাম শুধু একাই এর বৈধতা দান করেনি; বরং ইসলাম তো এ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা ও অত্যন্ত মিতাচারের

পরিচয় দিয়েছে। বর্তমানের তাওরাতের ভাষ্য অনুযায়ী ইহুদি ধর্ম তো এক হাজার বিবাহের পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে। আর ইনজিল এক বিবাহের কথা বললেও স্পষ্টভাবে কোথাও একাধিক বিবাহকে নিষিদ্ধও করেনি। ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মমতে যে যত ইচ্ছে স্ত্রী রাখতে পারে। কিন্তু ইসলাম এ সংখ্যাটিকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বেঁধে দিয়েছে।

মূলত একাধিক বিবাহের বিষয়টি এই দ্বীনের প্রশস্ত ও ব্যাপক ভাবনার সাথে সংশ্লিষ্ট, যে দ্বীন সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইসলাম সবার জন্য সর্বযুগেই যথাযথভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু বাকি ধর্মগুলো ছিল নির্দিষ্ট সময়ের সাথে, নির্দিষ্ট গোত্রের সাথে বিশেষায়িত।

ইসলাম সামগ্রিক মানবতাকে আহ্বান করে। আহ্বান করে কল্যাণের পথে; চাই তার জাত, পরিচয়, গোত্র, স্বভাব, মেজাজ-পছন্দ যেমনই হোক না কেন। ইসলাম যেমন মানবতার সকল দিককে শামিল করেছে, যেন সকল ক্ষেত্র, সমস্ত বিষয় এর মাঝে এসে যায়, তেমনই একাধিক বিবাহের এ মাসআলার ক্ষেত্রেও ইসলামের বিশেষ রায় আছে। আর তা হলো মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা, যাতে না আছে বাড়াবাড়ি আর না আছে ছাড়াছাড়ি।

তাফরিত বা ছাড়াছাড়ি হলো, বিবাহ প্রথাকে একটির মাঝে আবশ্যিকভাবে সীমাবদ্ধ করে ফেলা। এমন বিধান প্রণয়ন করলে জীবন সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হয়। যার ফলে মানুষকে নানান সমস্যায় পড়তে হয়।

ইফরাত বা বাড়াবাড়ি হলো, চারটি বিয়ে জায়িজ হলেও এ জায়িজ কাজকে বেশি প্রসারিত করে আগপিছ বিচার না করেই চারটি বিয়ে করে ফেলা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি চারটি বিয়ে করে স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না; এমন ব্যক্তির জন্য চার বিয়ে অনুমোদিত নয়। যদি এমন লোক চার বিয়ে করে, তবে সে সংকীর্ণতার পথে হাঁটতে শুরু করে। জন্য সকল স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ ও সাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

তাই স্বাভাবিক অবস্থায় একটিই বিয়ে করাই যথেষ্ট। আর যদি সামাজিক, আত্মিক কিংবা শারীরিক কোনো প্রয়োজনে কিংবা কোনো মেয়েকে সাহায্য করার নিয়তে একাধিক বিবাহ করার প্রয়োজন হয়, তখন দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহ করা উচিত। এ ছাড়া ইসলামে জায়িজ আছে, শুধু এ

মানসিকতার ভিত্তিতে আগপিছ না ভেবে একাধিক বিয়ে করার চিন্তা করা উচিত নয়। কারণ, মাসআলাগতভাবে জায়িজ হলেও বাস্তবতার ময়দানে তা সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। এতে শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার পাশাপাশি ইনসাফ, সাম্য ও সুষম বন্টনের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তবেই এ পথে পা বাড়ানো উচিত।

ইসলাম বিভিন্ন কারণে একাধিক বিবাহ বৈধ করেছে। এমন একটি কারণ হলো, কারও স্ত্রী বন্ধ্যা—তার কোনো সন্তান হবে না। কিন্তু মানুষ স্বভাবতই চায়, তার বংশবৃদ্ধি হোক; তার মৃত্যুর পর তার বংশের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকুক। এখানে এসে যৌক্তিকভাবেই একাধিক বিবাহের প্রয়োজন হয়। আর ইসলাম এ প্রয়োজনকে আমলে নিয়েই একাধিক বিবাহের অনুমোদন দিয়েছে।

দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ হলো, যদি কোনো ব্যক্তির স্ত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যে রোগে সুস্থতা দুরাশা মাত্র। এমতাবস্থায় বিয়ে না করে থাকা উক্ত ব্যক্তির জন্য অনেক কষ্টকর হবে। তার জীবনটা সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে। সে জন্য তাকে আরেকটি বিয়ে করে জীবনে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

তৃতীয় আরেকটি উদাহরণ হলো, কারও স্ত্রী বদদ্বীন ও বদমেজাজী। দ্বীনি বিষয়ে স্বামীর কমান্ড শুনতে চায় না। অথচ স্বামীর জন্য স্ত্রীর সাপোর্টের দরকার ছিল। অথবা স্বামী দ্বীনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, কিন্তু স্ত্রী তাকে কোনোরূপ সহযোগিতা করে না বা তেমন কোনো মানসিকতাও রাখে না; অথচ তার এক্ষেত্রে একজন যোগ্য সঙ্গিনীর বেশ প্রয়োজন। এমতাবস্থায় সক্ষমতা থাকলে তার জন্য উপযুক্ত কোনো মেয়েকে বিবাহ করে নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সামাজিক লাজলজ্জার কোনো পরোয়া করা ঠিক না। বিশেষ করে যদি এর কারণে তার দ্বীনদারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে এ দিকে নজর দেওয়া জরুরি।

ইসলামি বিধিবিধানের অন্যতম দিক হলো, এর সকল বিষয় পরিপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত। একজন মানুষের জন্য বিয়ে ও জীবনসঙ্গিনী থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহের অনুমতি থাকাও

খুবই স্বাভাবিক বিষয়। বস্তুত ইসলামি বিধানের মাঝেই রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। এর মাঝেই রয়েছে সকল অকল্যাণ দূরীভূতকারী কার্যকর নীতি।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, কিছু অবুঝ লোকদের মুখে এ ধরনের কথা শোনা যায় যে, ইসলাম পুরুষের জন্য চার স্ত্রী রাখার অনুমতি দিল; তাহলে মহিলাকে চার স্বামী রাখার অনুমতি দিল না কেন!?

তাদের এ প্রশ্নটি যে তাদের মূর্খতার প্রমাণ বহণ করে; আদৌ কি তারা তা বোঝে? এ প্রশ্নের উত্তর বিবিধ ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব। আমরা এখানে শুধু দুটি পয়েন্ট উল্লেখ করছি।

প্রথমত, একই স্ত্রীর নিকটে একাধিক স্বামী রাখার অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানের বংশ ও জন্মে স্পষ্ট জারজ হওয়ার সমস্যাটি দেখা দেবে। এমন ব্যবস্থা জিনা ব্যাপক হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠবে। সন্তানের জন্ম হওয়ার ধরনে সমস্যার কারণে তাকে অবর্ণনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। যদি কোনো নারী একাধিক স্বামী রাখে, নিঃসন্দেহে প্রত্যেকের সাথেই শারীরিক সম্পর্ক হবে। তারপর মহিলা গর্ভধারিণী হয়ে বাচ্চা জন্ম দেবে। তখন বাচ্চাটি কার বংশ থেকে এসেছে বলে পরিগণিত হবে? এর জবাব কি এ সকল বুদ্ধিজীবীরা দিতে পারবে?

দ্বিতীয়ত, একজন নারী একাধিক স্বামীর ধকল সইতে পারে না। কেননা নারীকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার শারীরিক গঠন অত্যন্ত নাজুক ও কোমল। একজন নারীর জন্য একজন স্বামীর পক্ষ থেকে আসা শারীরিক, আত্মিক ও স্নায়বিক ধকল সইতেই কষ্টকর হয়ে যায়। এখন যদি একই ঘরে একাধিক সুঠাম দেহধারী স্বামী থাকে, তখন চিন্তা করে দেখুন, অবস্থা কেমন দাঁড়াবে! তাদের নাজুক শরীর কি এমন চাপ বহন করার আদৌ কোনো সক্ষমতা রাখে? স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ভাবলেও তো বিষয়টি বুঝে আসে। এর জন্য তো বড় দার্শনিক হওয়ার প্রয়োজন নেই।

একাধিক স্বামী নিয়ে সংসার করা একজন নারী অচিরেই শারীরিকভাবে ভঙ্গুর হতে থাকবে, ধীরে ধীরে তার মানসিক অবস্থাও শোচনীয় পর্যায়ে চলে যাবে। এভাবে সারাটা জীবন তাকে কষ্ট ও অমর্যাদার বোঝা বয়ে

যেতে হবে। এ নারীর শরীরে নানান রোগ বাসা বাঁধবে। ধীরে ধীরে তার জীবন করুণ পরিণতির দিকে ধাবিত হবে।

নারী স্বাধীনতা, নারী উন্নয়ন ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে বেড়ানো অনেক লোকেরই আনাগোনা আছে আমাদের সমাজে। তারা প্রকৃত অর্থেই যদি নারীর কল্যাণ চাইত, তবে তারা এক নারীর বহু স্বামী থাকার মতো এমন কথা বলত না এবং নারীদের ঘর থেকে বের করে এনে পরপুরুষের কামুক দৃষ্টি ও কর্মের শিকার বানাত না। বস্তুত এমন শ্লোগানধারীরা নারীদের নিয়ে জুয়া খেলে নিজেদের স্বার্থের ঝুলিই কেবল ভারী করে।

পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষদের, নারীদের নয়

القوامة (আল-কিওয়ামা) শব্দটির অর্থ হলো, কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করা, তার ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা করা। এটি قام ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। যেমন আমরা বলে থাকি : قام الرجل المرأة أو عليها 'পুরুষ মহিলার নেতৃত্ব দিল বা তাকে পরিচালনা করল।' অর্থাৎ পুরুষটি মহিলার সকল বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করল এবং তার তত্ত্বাবধান করল।[৩৮৮]

পুরুষদের পরিচালনার এ দায়িত্ব পাওয়ার বিষয়ে কুরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾

'পুরুষেরা নারীদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক।'[৩৮৯]

এ আয়াতটির মর্মার্থ হলো, পুরুষগণ নারীদের তত্ত্বাবধান ও ভরণপোষণ করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এটি পুরো জীবনব্যাপী একজন পুরুষের কাঁধে অর্পিত একটি শক্ত আমানত। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলাম পুরুষদের নির্বাচন করেছে। কেননা, সৃষ্টিগতভাবে পুরুষরাই কেবল এ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত। এ বণ্টন কোনো পক্ষপাতিত্বের কারণে তো নয়ই; বরং এটিই এখানে সুষম বণ্টন হিসাবে পরিগণিত। কিন্তু সর্বদা ইসলামকে নিয়ে

৩৮৮. তাজুল আরুস : ৩৩/৩০৮ (দারুল হিদায়া, বারিদা)
৩৮৯. সুরা আন-নিসা : ৩৪

সমালোচনা করে বেড়ানো এক শ্রেণির অমানুষের নিকট অন্যতম আলোচ্য বিষয়ই হচ্ছে, নারীর ক্ষমতায়ন ও এ ব্যাপারে ইসলামের অবিবেচক বণ্টন!!

এরা জানে না, ইসলাম পরিচালনা-তত্ত্বাবধানের মতো এ গুরুদায়িত্ব পুরুষকে কেন দিয়েছে। তাদের এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই যে, পুরুষ ও নারীর মাঝে শারীরিক, আত্মিক ও স্নায়বিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। এ বিচারে পুরুষগণ নারীদের চেয়েও বেশি উপযোগী হয়ে থাকে। কারণ, পুরুষগণ নারীদের চেয়েও অধিক শারীরিক শক্তি, আত্মিক বল ও স্নায়বিক শক্তির অধিকারী। পরিচালনার মতো কঠিন দায়িত্ব, বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত বিবিধ বিপদাপদের মোকাবেলায় দৃঢ় থাকার ক্ষেত্রে পুরুষ অধিক উপযুক্ত। আর এ সকল ক্ষেত্রে নারীদের ভয় ও বিহ্বলের শিকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবল।

তা ছাড়া পরিচালনা বা তত্ত্বাবধান করার এ দায়িত্ব পুরুষদের মহান করে দেয় না, তাদের অতি উচ্চতায় পৌঁছে দেয় না। এমন নয় যে, দায়িত্ব পেয়েছে তো পুরুষ নারীর ওপর জোর-জবরদস্তি করতে পারে। ইসলামের দর্শনমতে এ দায়িত্ব তো একটি আমানত, যা আদায় করা অত্যন্ত কষ্টকর। যদি পুরুষ এ দায়িত্বে অবহেলা করে, তবে তার জন্য রয়েছে কঠোর সাবধানবাণী। যদি সে বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি করে, তবে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এ দায়িত্ব পুরুষের হলেও ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়কে তা আদায়ে পরস্পরের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়। যেন স্বামীর জন্য এ গুরুদায়িত্ব পালন করা সহজতর হয়। এ দায়িত্বের মাঝে স্বৈরাচারী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পারিবারিক ও জীবনের বিবিধ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরামর্শ করবে। যেমন কুরআনে কারিমে পরস্পর পরামর্শের একটি দৃষ্টান্ত এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾

'কিন্তু যদি তারা পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তাতে উভয়ের কোনো দোষ নেই।'[৩৯০]

৩৯০. সুরা আল-বাকারা : ২৩৩

মিরাসি সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার

ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো, ইসলাম মিরাসি সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীদের ওপর জুলুম করেছে। তাদের উত্থাপিত অভিযোগ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, তারা সত্যান্বেষী হয়ে নয়; বরং বিদ্বেষ ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই শাশ্বত জীবনবিধান ইসলামের পেছনে আধাজল খেয়ে নেমেছে।

ইসলামের বিধান হলো, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদে তার ছেলে সন্তানরা মেয়ে সন্তানদের দ্বিগুণ পাবে। এখানে বিরোধীদের আপত্তি হচ্ছে, পুরুষরা কেন দ্বিগুণ পাবে? বোকারা একটুও ভেবে দেখে না যে, হাতের আঙুল পাঁচটি সমান নয়। যদি সমান হতো, তবে এ আঙুল দিয়ে কাজ করা সম্ভব হতো না। তেমনই নারীদের তুলনায় পুরুষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যেন পুরুষদের সে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সহায়ক হয়, স্বামী-স্ত্রীর একটি সুখের সংসার হয়—এমন একটি লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দরকার সুষম বণ্টনের; সমান বণ্টন এ ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। সব জায়গাতে সমান দেখলে হয় না। বাস্তবতার আলোকে কথা বলতে হবে। এ জন্যই ইসলাম প্রয়োজন বুঝে কোথাও নারীর জন্য অধিকার বেশি দিয়েছে আর কোথাও পুরুষের জন্য অধিকার বেশি দিয়েছে।

কে না জানে, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টের কাজগুলোর দায়িত্ব পুরুষদের? অন্যদিকে ঘরের কাজ, শিশুর পরিচর্যা, বাড়ির দেখাশোনা এগুলো নারীদের দায়িত্ব। পুরুষদের কাজে কঠোরতা ও কষ্ট বেশি। আর নারীদের কাজে স্নেহ ও মায়া-মমতা বেশি। তাই উভয়ে আপন দায়িত্বের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত এবং এভাবেই ইসলাম তাদের জন্য সুষম বণ্টননীতি রেখেছে। এখানে কারও ওপর ন্যূনতম জুলুম করা হয়নি।

এভাবে নারীদের দায়িত্ব হলো, ঘরবাড়িকে মায়ার আঁচলে আগলে রাখা। আর পুরুষদের দায়িত্ব হলো, ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। যদি নারীকে উপার্জন ও ঘর সামলানোর কাজ দেওয়া হয়—যেমনটা অনেক স্বার্থলিপ্সু

নিজের লাভের জন্য তাদের চটকদার কথায় ফুটিয়ে তোলে—তাহলে তা নারীদের ওপর মারাত্মক রকমের জুলুম হয়ে যায়। তাদের ওপর একই সাথে দুটি দায়িত্ব চাপানোর ফলে তাদের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নারীকে যে স্বভাব ও কর্মের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে সেখান থেকেই তার আখিরাতের পথে এগিয়ে যেতে হবে। ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জগতেই তাকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। নারী-পুরুষের এসব পার্থক্যের প্রতি খেয়াল করেই অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। যেন নারী নির্বিঘ্নে তার ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব ও পরিবারের দেখাশোনা সুচারুরূপে করতে পারে।

একজন পুরুষকে পরিবারের সকলের জন্য খরচ করতে হয়। অন্যদিকে একজন নারীকে এমন খরচ করতে হয় না। নারী তার সন্তান, স্বামী, এমনকি নিজের জন্যও ব্যয় করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। কারণ, এ উপার্জন ও ব্যয় করা স্বামীর দায়িত্ব। ইসলাম নারীকে এমন অনেক ব্যয়ক্ষেত্র থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। তা সত্ত্বেও ওয়ারিসি সম্পত্তিতে নারীর জন্য পুরুষের অর্ধেক নির্ধারণ করেছে।

এ ছাড়াও সব সময়ই নারী পুরুষের অর্ধেক সম্পদ পায়, বিষয়টি মোটেও তা নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রেই একজন নারী পুরুষের চেয়ে বহুগুণ বেশিও পেয়ে থাকে। উদাহরণত, একজন ব্যক্তি এক স্ত্রী, এক কন্যা ও পিতা রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায় স্ত্রী পাবে সম্পদের এক-অষ্টমাংশ, কন্যা পাবে অর্ধেক তথা চার-অষ্টমাংশ, আর পিতা পাবে বাকি সম্পদ তথা তিন-অষ্টমাংশ। এ ক্ষেত্রে কন্যা সম্পদের অর্ধেক পেয়ে লোকটির পিতার থেকেও অংশে অনেক বেশিই পেয়েছে। এমন আরও কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে ওয়ারিশদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক সম্পদ পেয়ে থাকে। মোটকথা, আযাচিত ইসলাম কোথাও পক্ষপাতিত্ব করেনি। যার যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, তার জন্য তথায় ততটুকুই নির্ধারণ করেছে। সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলে বিষয়টি খুব সহজেই বুঝে আসবে। তবে যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের হাজারও দলিল-প্রমাণ দিলেও বুঝতে চাইবে না। আল্লাহ তাদের হিদায়াত দান করুন।

নারীদের সাক্ষ্যের মূল্যায়ন

ইসলামের বিধানসমূহ সর্বক্ষেত্রে শতভাগ বাস্তবিক ও কার্যকর হয়ে থাকে। ইসলামের বিধান কখনো এমন হয় না যে, এ বিধানে কারও কোনো অধিকার বিনষ্ট হয়। কিন্তু কতিপয় প্রবৃত্তিপূজারি ইসলামের অনেক বিধান নিয়েই হঠকারিতা প্রদর্শন করে। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সত্য কথার ওপর আপত্তি তোলে। তেমনই একটি বিষয় হলো মহিলাদের সাক্ষ্যদান।

সাক্ষ্য প্রদানের মাসআলার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, সাক্ষী হিসাবে দুজন পুরুষ থাকবে। আর যদি দুজন পুরুষ সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্যও যথেষ্ট হবে। এখানে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান।

এ বিষয়ে কুরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ﴾

'আর তোমাদের মধ্যে দুজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। কিন্তু যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তাহলে তোমাদের পছন্দমতো সাক্ষীগণের মধ্যে একজন পুরুষ ও দুজন নারী যথেষ্ট। এটা এ জন্যই যে, নারীদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।'[৩৯১]

ইসলামের বিধিবিধান সর্বদা বাস্তবসম্মত ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। ফলে মানুষের কল্যাণ ও উপকার নিশ্চিত হয় এবং অকল্যাণ ও অনিষ্ট দূরীভূত হয়। বলা বাহুল্য যে, সাক্ষ্যদানের বিধানের ক্ষেত্রেও প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন পুরুষের সাক্ষ্যকে দুজন নারীর সাক্ষ্যের সমান বলা হয়েছে। আর এ বিধান মানুষের ফিতরাত ও বাস্তবতার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

---

৩৯১. সুরা আল-বাকারা : ২৮২

সকলের নিকট এ বিষয়টি সুনিশ্চিত যে, একজন মহিলা যদিও পরিপূর্ণ সঠিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, তথাপি তার মাঝে লজ্জার দিকটি প্রবল থাকে। তার মাঝে নম্রতা ও দয়ার্দ্রতার আধিক্য বেশি থাকে। তাই যখন কোনো শক্ত কাজ বা কঠিন সময় আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই একজন মহিলার মাঝে অস্থিরতা কাজ করে, তার মাঝে কারও প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার প্রবণতা আসে। বিশেষ করে যখন একজন মহিলাকে বিচারালয়ে নিয়ে আসা হয়, তখন এক পাশে বিচারক, অন্যদিকে সৈন্য-সামন্ত, বাদী-বিবাদী দ্বারা সে বেষ্টিত থাকায়, অস্থিরতায় ভোগে সে। এটা তার দুর্বলতা, যা তার থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হয় না; বরং এটা তার স্বভাব ও ফিতরাতের মধ্যেই রয়েছে।

অন্যদিকে মানুষের মাঝে কৃত লেনদেন ও তর্ক-বিতর্ক থেকে মহিলাদের অবস্থান দূরে থাকে। কেননা, নারীর কাজ সব ঘরকেন্দ্রিক। পরিবারকে সঠিকরূপে সামলানো, সন্তানদের তত্ত্বাবধান করাই তার মূল দায়িত্ব। তাই সে তার কাজের কারণে অন্যদিকে খেয়াল করা বা মানুষের লেনদেন, তর্ক-বিতর্কের খবরাখবর রাখা বা তাতে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। তাই সংগত কারণেই নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের সমান নয়।

পূর্বোক্ত আয়াতে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হওয়ার কারণও বলে দেওয়া হয়েছে যে, সাধারণত নারীরা অনেক বিষয় ভুলে যায়। তাই তাদের একজনের ওপর নির্ভর করা পুরোপুরি নিরাপদ নয়। এ জন্য বলা হয়েছে, নারীদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

দুজন নারীর সাক্ষ্য কেন একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান, তার কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে এ আয়াতটি পরিপূর্ণ। এটি সকল কারণকে একত্র করে ফেলেছে। কেননা, تَضِلَّ শব্দটির পরিব্যাপ্তি ব্যাপক। এটি ভুল, ভয়, লজ্জা ও হতবুদ্ধি হওয়ার সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। তাই সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে কারও কোনো অধিকার বিনষ্ট হওয়ার পথ স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু অনেকে পাগলের প্রলাপ বকে যে, এখন তো নারীরা পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। পুরুষদের সাথে মিশছে। তাই এখন

আগের যুগের নারীদের মতো দুজনের সাক্ষ্য এক পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই! কেননা, এখনকার নারীরা আগের মতো লজ্জাশীল নয়, তারা আগের মতো নরম মনের ও দুর্বল চিত্তেরও নয়।

এরা মূলত নারীদের নারীত্বকে হরণের কথা বলে। কেননা, নারীত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো, দয়ানুভূতি ও কোমলতা থাকা। নারীরা যদি তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও গুণ থেকে বেরিয়ে যায়, তবুও তারা পুরুষ তো আর হতে পারে না। এমতাবস্থায় তারা নারীও থাকে না, আবার পুরুষও হয় না; বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি থাকে। এমন নারীদের রাসুলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন। নারীদের এমন বেসুরো রূপকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

'নারীর রূপধারণকারী পুরুষদের এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীদের রাসুলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন।'[৩৯২]

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত :

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

'মহিলার পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীকে রাসুলুল্লাহ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।'[৩৯৩]

আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ

৩৯২. সহিহুল বুখারি : ৭/১৫৯, হা. নং ৫৮৮৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৩৯৩. সুনানু আবি দাউদ : ৪/৬০ হা. নং ৪০৯৮ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

'জাতে মহিলা কিন্তু সাজে পুরুষ, এমন নারীদের রাসুলুল্লাহ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।'[৩৯৪]

সুতরাং আমাদের সমাজে কথিত বুদ্ধিজীবীরা নারী উন্নয়নের নামে যা করছে, তা চরম বোকামিপূর্ণ একটি কাজ। নারীকে নারীর জায়গায় রেখেই তার থেকে যথোপযুক্ত কাজ আদায় করে নিতে হবে। যুক্তি ও বিবেক এমনই বলে। ইসলামও তা সমর্থন করে প্রত্যেকের দায়িত্ব, কাজ ও বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা করে দিয়েছে। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা যা করছে, সভ্য ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, নারীদের নারীত্ব বিনষ্ট করে তারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ উদ্ধার করছে। এটাকে কেউ উন্নয়ন বললে তা হবে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ও আল্লাহর আইনের সাথে স্পষ্ট বিদ্রোহ।

জিজিয়া-করের বিধান

ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী জিম্মিদের থেকে জিজিয়া কর নেওয়া হয়। এটি দারুল ইসলামে তাদের বসবাস ও তাদের নিরাপত্তা দানের পরিবর্তে দেওয়া একটি অর্থকর। ইসলামি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য মুসলিমগণ জাকাত প্রদান করেন। তদ্রূপ এ জিম্মিরাও যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করছে, তাই রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য তাদের এ কর প্রদান করতে হচ্ছে।

জিজিয়া কেবল আহলে কিতাব—ইহুদি-নাসারা বা আসমানি কোনো ধর্মের অনুসারীদের থেকেই নেওয়া হয়। মুশরিক, মূর্তিপূজারি ও নাস্তিকদের থেকে জিজিয়া নেওয়া যাবে না; বরং এ সকল শ্রেণির ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করাই তাদের বাঁচার একমাত্র পথ।

এসব লোক ইসলামের পক্ষ থেকে কোনোরূপ সম্মান বা মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখে না। সর্বদা তাদের আখিরাতের ভয় দেখাতে হবে, তাদের বুঝানোর পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অতঃপর যদি তারা সত্যের প্রতি এগিয়ে আসে, তবে তাদের থেকে তা কবুল করা হবে এবং তারা বেঁচে যাবে। অন্যথায় মুসলিমদের তলোয়ার তাদের ঘাড় থেকে মাথা আলাদা

৩৯৪. সুনানু আবি দাউদ : ৪/৬০ হা. নং ৪০৯৯ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

করে দেবে। কেননা, তারা তাদের পূজনকর্মের দ্বারা, তাদের নাস্তিকতার দ্বারা আগেই অনেক সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছে। তারা অনেক বড় অপরাধে অপরাধী হয়ে রয়েছে। তাই যদি তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোনো আশা না করা যায়, তবে তারা আল্লাহ ও মুমিনদের থেকে লানত, লাঞ্ছনা পাবে এবং তাদের হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে।

অন্যদিকে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা হলো আহলে কিতাব। ইসলাম দুনিয়াতে তাদের জন্য কিছুটা দয়া ও করুণা রেখেছে। কারণ, আল্লাহ, রাসুল, কিয়ামত, পরকাল বিশ্বাসের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে তাদের মিল রয়েছে। তাই আশা করা যায়, তারা আমাদের ও তাদের মধ্যকার সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোর দিকে তাকিয়ে সহজেই ইসলামের নিকটবর্তী হতে পারবে। আর কেউ একবার ইসলামের নিকটবর্তী হলে সে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ না করে থাকতে পারবে না। আর যদি একান্ত তাদের ভাগ্যে হিদায়াত নসিব না-ই থেকে থাকে, তাহলে তাদের জিজিয়া দিয়ে দারুল ইসলামে থাকার সুযোগ দেওয়া হবে। আর যদি তারা জিজিয়া দেওয়া থেকেও বিরত থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

'যে সমস্ত আহলে কিতাব আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ইমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন—তা হারাম মানে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় করজোড়ে জিজিয়া প্রদান করে।'[৩৯৫]

৩৯৫. সুরা আত-তাওবা : ২৯

তাদের থেকে এ জিজিয়া নেওয়ার মর্মার্থ হলো, তারা ইসলামি শরিয়ার বিধান প্রয়োগকারী ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য স্বীকার করছে। জিজিয়া আদায় শুধু স্বাধীন বিবেকসম্পন্ন সাবালক পুরুষদের ওপরই ওয়াজিব; নারী, শিশু, পাগল ও দাসের ওপর কোনো জিজিয়ার বিধান নেই। কেননা, নারী, শিশু, পাগল ও দাসদের কোনো স্বতন্ত্রতা নেই; বরং তারা সকল বিষয়ে কর্তা পুরুষদেরই অনুগামী হয়ে থাকে।[৩৯৬]

জিজিয়ার পরিমাণ

সচ্ছলতার অবস্থাভেদে জিজিয়ার পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর মতে বাৎসরিক ধনীদের থেকে আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের থেকে চব্বিশ দিরহাম ও দরিদ্রদের থেকে বারো দিরহাম করে নেওয়া হবে। এর কম বা বেশি নেওয়া যাবে না। ইমাম মালিক ﵀-এর মতে জিজিয়ার নির্ধারিত কোনো পরিমাণ নেই। উভয়পক্ষের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বসে এর একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে নেবে। আর এতে এলাকাভেদে জিজিয়ার পরিমাণ কমবেশ হতে পারে। ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর মতে জিজিয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এক দিনার। আর বেশির কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই।[৩৯৭]

এ জিজিয়াকে ইসলাম বিদ্বেষীরা জুলুম বলে প্রচার করে। অথচ ইসলামি রাষ্ট্রে একজন মুসলিম যেসব নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করে, একজন জিম্মিও ঠিক সে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করে। এতে কোনো কমবেশ করা হয় না। কোনো জিম্মি যদি কোনো মুসলমানের ক্ষতি করে, তাহলে যেমন তার সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত বিচার করা হয়, ঠিক তেমনই কোনো মুসলমান যদি কোনো জিম্মির ক্ষতি করে, তাহলে ঠিক একইভাবে তারও সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত বিচার করা হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, একজন মুসলামানকে জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হয়, একজন জিজিয়া প্রদানকারী তার চেয়ে অনেক অনেক কম পরিমাণ অর্থ দিয়েও পরিপূর্ণরূপে একজন মুসলিমের মতো সকল সুবিধা

৩৯৬. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা : পৃ. নং ২২৩ (দারুল হাদিস, কায়রো)
৩৯৭. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা : পৃ. নং ২২৪ (দারুল হাদিস, কায়রো)

পেয়ে থাকে। তাহলে এটি কী করে জুলুম হয়? এটা কি অন্য ধর্মের লোকের প্রতি ইসলামের দয়া ও অনুগ্রহ নয়? মূলত যাদের চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির আর অন্তর মোহরাঙ্কিত, তারাই শুধু এতে জুলুমের গন্ধ খুঁজে পায়।

বাহ্যিকভাবে জাকাত ও জিজিয়ার-কর ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সিস্টেমকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একইরকম অবদান রাখলেও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে উভয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন জাকাত দেওয়া হয় ইবাদত হিসাবে, আল্লাহর আদেশের অনুসরণ ও আনুগত্য করে। কিন্তু জিজিয়া-কর এমনটি নয়; বরং এটি এক প্রকার আর্থিক কর, যা একজন জিম্মি নতি স্বীকার করে কেবল ইসলামি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্যই দিয়ে থাকে। অর্থাৎ জাকাত ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনীতি শক্তিশালী করার পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও বটে। বরং ইবাদত হওয়ার কারণেই মুসলিমদের জাকাত দিতে হয়। পক্ষান্তরে জিজিয়া-করের বিষয়টি শুধুই অর্থসংশ্লিষ্ট একটি ব্যাপার, এখানে ইবাদত বা আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন ব্যাপার নেই।

পঞ্চম মূলনীতি : আনুগত্য ও মান্যতা

আনুগত্য এমন একটি স্তম্ভ, যার ওপর পুরো শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে। মুসলিম জনগণ খলিফার পূর্ণ অনুগত না হলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরয়ি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না, শরিয়তের ওপর পরিপূর্ণভাবে আমল করাও সম্ভব হবে না। আনুগত্য না থাকলে মূলত একটি দেশের ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়। এমন শাসন থাকা মূলত না থাকারই নামান্তর। এ জন্য ইসলামে আনুগত্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। আনুগত্য করা ছাড়া নাগরিকদের বিকল্প পথ নেই। ইসলামি রাষ্ট্রে থাকতে হলে তাদের আনুগত্য করেই চলতে হবে। খলিফা বা আমিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ এবং দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জগতের জন্য ক্ষতিকর।

আমিরের আনুগত্য বিষয়ক আলোচনাটি আমরা কয়েকটি অংশে ভাগ করে করতে পারি। যথা :

ক. আমিরের আনুগত্য করা ফরজ

মুসলিম শাসক হলো শরয়ি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইসলামের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নে খলিফা কোনো ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না; বরং তিনি অনমনীয় হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে যাবেন। খলিফা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজের মনের চাহিদামতো অথবা আল্লাহর আইনের বিপরীত অন্য কোনো আইন দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন না; বরং আল্লাহর বিধান অনুযায়ীই শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

এ কারণেই মুসলিম জনগণের ওপর মুসলিম শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব। তার অবাধ্য হওয়া বা বিদ্রোহ করা জায়িজ নেই। মানুষ যদি তাদের শাসকের আনুগত্য না করে অবাধ্য হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে সে আল্লাহর শরিয়ত থেকে বের হয়ে গেল; বরং প্রকৃত অর্থে কেমন যেন সে তো শরিয়তের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করল।

কথাটি এভাবেও বলা যায়, ব্যক্তি-শাসকের আনুগত্য করা কিংবা তার সন্তুষ্টি অর্জন করা ওয়াজিব নয়; বরং তার আনুগত্যের উদ্দেশ্য হলো, শরিয়তের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করা। কারণ, শাসক ব্যতীত শরয়ি সকল বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। শাসকই জনগণকে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করবে আর জনগণ তা মেনে চলবে। সুতরাং মুসলিম শাসকের অবাধ্য হওয়া মানে শরিয়তেরই অবাধ্য হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মানে শরিয়তের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করা।

মুসলিম শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব, এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আদেশ করে বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল (শাসক ও বিচারক) আছে, তাদেরও।'[৩৯৮]

৩৯৮. সুরা আন-নিসা : ৫৯

এখানে مِنكُمْ তথা 'তোমাদের মধ্য থেকে' বলে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের শাসক হতে হবে তাদের মধ্য থেকেই মুসলমান, ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী, শরিয়তের বিধিবিধানসমূহ পালনকারী। যে ব্যক্তি মুসলমান নয় বা ইসলামের আকিদায় বিশ্বাসী নয় কিংবা শরিয়তের বিধিবিধান পালনকারী নয়, সে কখনো মুসলমানদের শাসক বা বিচারক হতে পারে না। মুসলমানদের শাসক বা বিচারক হওয়ার কোনো অধিকারও তার নেই।

শরিয়ত অনুযায়ী বিচারের জন্য মূলনীতি গ্রহণের উৎস দুটি :

১. কুরআনে কারিম।

২. হাদিসে রাসুল।

সুতরাং যেকোনো সমস্যা-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক অথবা তাদের মধ্যে কোনো ধরনের মতানৈক্য দেখা দিক না কেন, তাদের সে সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

'অতঃপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।'[৩৯৯]

মুসলিম জনগণের ওপর তাদের আমিরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। তারা তাদের আমিরের আনুগত্য করলে তাদের থেকে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দূর হয়ে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

৩৯৯. সুরা আন-নিসা : ৫৯

ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

'প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আমিরের আদেশ শোনা ও মান্য করা ওয়াজিব; চাই সেটা পছন্দের হোক বা অপছন্দের। তবে গুনাহের কাজের আদেশ করলে ভিন্ন কথা। সুতরাং যখন কোনো গুনাহের কাজের আদেশ করা হবে, তখন আর তার কথা শোনা ও মানা যাবে না।'[৪০০]

ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়—সর্বাবস্থায় আমিরের আনুগত্য করতে হবে। যদি এ ক্ষেত্রে আনুগত্যকারী কোনো ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়; তবুও তার জন্য আমিরের আদেশ অমান্য করার সুযোগ নেই।

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ

'তোমার সচ্ছলতায়-অসচ্ছলতায়, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এবং তোমার ওপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও আমিরের কথা শোনা ও তার আনুগত্য করা তোমার জন্য ওয়াজিব।'[৪০১]

আমির যদি আল্লাহর আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধান মেনে চলে, তাহলে তার আনুগত্য করা আবশ্যক; চাই তার বাহ্যিক আকার-আকৃতি যতই কুৎসিত হোক না কেন।

৪০০. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৬৯, হা. নং ১৮৩৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৪০১. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৬৭, হা. নং ১৮৩৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

'তোমরা আমিরের কথা শোনো ও মানো; যদিও তোমাদের ওপর কিশমিশের ন্যায় মাথাবিশিষ্ট নিগ্রো কোনো দাসকে আমির নিযুক্ত করা হয়।'[৪০২]

খ. সাধ্যের ভেতর আনুগত্য

কারও আদেশ পালনের ক্ষেত্রে শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে। শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে আনুগত্যের আদেশ নেই। কারণ, সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু অর্জিত হয় না। ইসলামও কাউকে শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

'আল্লাহ কারও ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।'[৪০৩]

সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার মানে ব্যক্তিকে বিপদের মধ্যে ফেলা। আর এমনটি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ, এতে ব্যক্তি যখন তা আদায়ে সক্ষম হবে না, তখন তার মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হবে। আর এতে তার মধ্যে আমিরকে মানার যে প্রবণতা ছিল, তা নষ্ট হয়ে যাবে।

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا : فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

৪০২. সহিহুল বুখারি : ৯/৬২, হা. নং ৭১৪২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৪০৩. সুরা আল-বাকারা : ২৮৬

'আমরা যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইআত দিতাম, তখন তিনি বলতেন, তোমাদের সামর্থ্যানুসারে মান্য করো।'[৪০৪]

গ. আমিরের বিরুদ্ধে অন্যায় বিদ্রোহ

অন্যায়ভাবে আমিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। এ ব্যাপারে হাদিসে অনেক বড় সতর্কবাণী এসেছে। আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

'যে ব্যক্তি আনুগত্য ছেড়ে দিল এবং দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলি মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করল।'[৪০৫]

বস্তুত ইসলামে আনুগত্য করার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, আমিরের আনুগত্য করা মানে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য করা। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য করার অর্থ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

'যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হলো, সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। যে আমিরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমিরের অবাধ্য হলো, সে আমার অবাধ্য হলো।'[৪০৬]

৪০৪. সহিহুল বুখারি : ৯/৭৭, হা. নং ৭২০২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৪০৫. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭৭, হা. নং ১৮৪৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৪০৬. সহিহুল বুখারি : ৪/৫০, হা. নং ২৯৫৭ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

Scanned with CamScanner

ঘ. আমিরের আনুগত্য হবে বিনয়ের সাথে

আমিরের আনুগত্য করতে হবে বিনয় ও আগ্রহ নিয়ে, মহব্বত ও ইকরামের সাথে। কোনোভাবেই আমিরকে অসম্মান করা যাবে না। তাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া চলবে না। পাপিষ্ঠ ও ফাসিক লোকেরাই কেবল ন্যায়পরায়ণ শাসকের অবাধ্য হতে পারে।

আবু বাকরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الدُّنْيَا، أَهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফাকে অপদস্থ করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসে লাঞ্ছিত করবেন।'[৪০৭]

ঙ. আমিরের স্বল্প ত্রুটিতে করণীয়

আমিরের মধ্যে যদি ব্যক্তিগত কিছু দুর্বলতা দেখা দেয়, তিনি যদি নিজ স্বার্থে ন্যায়পরায়ণতা থেকে কিছুটা দূরে সরে যান, নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য কারও প্রতি সামান্য জুলুমও করে ফেলেন, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে শরিয়তের অনুসরণ করেন, ইসলামের প্রতিটি বিধান মেনে চলেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কারণ, সামান্য ও তুচ্ছ কিছু ভুলের কারণে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে জমিনে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এতে করে দেশে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হবে।

সুতরাং শরিয়তের সীমালঙ্ঘন হয়নি—এমন ব্যক্তিগত ভুল-ত্রুটির কারণে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না; বরং শাসকের কথা শুনতে হবে এবং তার আনুগত্য করতে হবে।

---

৪০৭. মুসনাদু আহমাদ : ৩৪/৭৯, হা. নং ২০৪৩৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

ওয়েল হাজরামি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

'সালামা বিন ইয়াজিদ ﵁ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর নবি, আপনার কী অভিমত? যদি আমাদের ওপর এমন শাসক আসে, যারা আমাদের থেকে তো নিজেদের হক পরিপূর্ণ বুঝে নেয়, কিন্তু আমাদের হক ঠিকমতো দেয় না। তখন আপনি আমাদের কী আদেশ করেন? রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে এড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাদের কথা শোনো এবং তাদের আনুগত্য করো। কারণ, তারা যা বহন করে, তার দায়িত্ব তাদের আর তোমরা যা কিছু বহন করবে, তার দায়িত্ব তোমাদের।'[৪০৮]

চ. আমিরের মাঝে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখলে করণীয়

ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

'যে ব্যক্তি তার আমিরের কোনো কিছুতে অসন্তুষ্ট হয়, সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কারণ, যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও বের হয়ে গেল, সে জাহিলি মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করল।'[৪০৯]

---

৪০৮. সহিহু মুসলিম : ৩/১৪৭৪, হা. নং ১৮৪৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৪০৯. সহিহুল বুখারি : ৯/৪৭, হা. নং ৭০৫৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

'কেউ যদি তার আমিরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তাহলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কারণ, যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করল, তবে সে জাহিলি মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করল।'[৪১০]

ছ. আমিরের ভুল হলে করণীয়

আমিরের ভুল হলে মুসলমানদের কর্তব্য হলো, উত্তম নসিহতের মাধ্যমে এবং সুন্দর ও হিকমতপূর্ণ ভাষায় তাকে সতর্ক করা। তাকে তার ভুলত্রুটি থেকে ফিরিয়ে সৎ পথে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। হয়তো এক সময় আমির তার ভুল বুঝতে পারবে এবং সঠিক পথে ফিরে আসবে।

আমিরের আনুগত্য নিঃশর্ত নয়; বরং তা শরিয়তের বিধানের সাথে শর্তযুক্ত। অর্থাৎ শাসক যখন আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ করবে, তখন তার আনুগত্য করা যাবে না।

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

'প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আমিরের আদেশ শোনা ও মান্য করা ওয়াজিব; চাই সেটা পছন্দের হোক বা অপছন্দের। তবে গুনাহের আদেশ করলে ভিন্ন কথা। সুতরাং যখন কোনো গুনাহের কাজের আদেশ করা হবে, তখন আর তার কথা শোনা যাবে না, তার আদেশ মানা যাবে না।'[৪১১]

৪১০. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭৭, হা. নং ১৮৪৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৪১১. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৬৯, হা. নং ১৮৩৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

উবাদা বিন সামিত ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বাইআত দিলাম এ কথার ওপর যে, আমরা সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিতে হলেও আমরা তাঁর কথা মানব ও আনুগত্য করব। আমরা শাসক বা আমিরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না। তিনি বলেন, তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা তার মধ্যে স্পষ্ট কুফরি দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল আছে, তাহলে ভিন্ন কথা।'[৪১২]

সুতরাং কোনো শাসক যখন ইসলামি রীতিনীতি ছেড়ে দেবে এবং শরয়ি বিধানের বিপরীত সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার মতো কুফরের বিধান গ্রহণ করবে, তখন পূর্ণরূপে সে শাসকের আনুগত্য বর্জিত হবে। কারণ, ইসলামের বিপরীতে এগুলোর প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও কুফরে বাওয়াহ বা স্পষ্ট কুফরি। সুতরাং কোনো শাসক ইসলামি শরিয়তের বিপরীতে—এসব কুফরি ব্যবস্থার কোনো একটা গ্রহণ করলে সাধারণ মুসলমানদের তাকে মান্য করা তো দূরে থাক; বরং তাদের ওপর এসব কুফরি ব্যবস্থার ভিত্তিমূল উৎখাত করে শরিয়াব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

৪১২. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭০, হা. নং ১৭০৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

ষষ্ঠ মূলনীতি : বাইআত

البيعة (আল-বাইআত) শব্দটি البيع (আল-বাইয়ু) থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো, مبادلة مال بمال তথা বস্তু বিনিময়করণ। البيعة (আল-বাইআত) শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো, বিক্রয় আবশ্যক করার চুক্তি। তবে পরবর্তী সময়ে শব্দটি مبايعة (মুবাইয়া) অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। مبايعة (মুবাইয়া) শব্দের অর্থ হলো, আনুগত্য ও সাহায্যের ব্যাপারে ওয়াদা প্রদান করা।[৪১৩]

ইবনে খালদুন ﷺ বলেন, 'বাইআত হলো আনুগত্যের ওয়াদা। বাইআত প্রদানকারী তার ও সকল মুসলমানের বিষয়াদির প্রতি লক্ষ করার অধিকার তার আমিরের নিকট অর্পণ করার অঙ্গীকার করল যে, সে এ ব্যাপারে তার সাথে বিবাদে জড়াবে না এবং মতানৈক্য করবে না। তার আমির তাকে যে বিষয়ে দায়িত্ব দেবেন, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় সে আমিরের আনুগত্য করবে।'[৪১৪]

অর্থাৎ শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে কোনো অবস্থাতেই তার অবাধ্য হওয়া যাবে না এবং বিদ্রোহ করা যাবে না। অন্য কথায় বলা যায়, বাইআত বলা হয়, নেক ও সৎ কাজে আমিরের আদেশ শোনা ও তার আনুগত্য করার অঙ্গীকারকে। কিন্তু গুনাহ বা অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোনো আনুগত্য নেই। যদি সে গুনাহের কাজের আদেশ দেয়, তবে তার কোনো কথা শোনা যাবে না। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, ওকালাত তথা প্রতিনিধিত্ব করার সাথে বাইআতের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন ওকালাতের মধ্যে দুটি পক্ষ থাকবে :

১. موكل (মুয়াক্কিল) - প্রতিনিধি নিয়োগকারী।

২. وكيل (উকিল) - প্রতিনিধি।

মুয়াক্কিল উকিলকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করার অধিকার দেয় এবং তাদের দুজনের মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তি হয়। ফলে চুক্তিকৃত বিষয়কে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য উকিল তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু ওই বিষয়টির ক্ষতি হয়—এমন কোনো কাজ সে করতে পারবে না। কারণ, তা হবে চুক্তি বহির্ভূত কাজ।

৪১৩. আল-মিসবাহুল মুনির : ১/৬৯ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৪১৪. তারিখু ইবনি খালদুন : পৃ. নং ২৬১ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

অনুরূপভাবে বাইআতের ক্ষেত্রেও দুটি পক্ষ রয়েছে :

প্রথমপক্ষ হলো বাইআত প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ। আর তারা হলো মুসলিম জনগণ। প্রথমে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'[৪১৫] খলিফা নির্ধারণ করে তাকে বাইআত দেবেন। অতঃপর মুসলিম জনসাধারণ তাকে এই শর্তে বাইআত দেবে যে, তিনি তাদের ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করবেন এবং তাদের মধ্যে শরিয়তের প্রতিটি আদেশ বাস্তবায়ন করবেন।

দ্বিতীয় পক্ষ হলো বাইআত গ্রহণকারী তথা আমির বা খলিফা। তিনি জনগণের কাছ থেকে এই শর্তে বাইআত গ্রহণ করবেন যে, তিনি তাদের পুরোপুরি শরিয়ত অনুযায়ী পরিচালনা করবেন।

আর এটিই হলো বাইআতের অঙ্গীকার। প্রত্যেক মুসলিম তার পক্ষ থেকে শাসককে হাতে হাত রেখে বা মৌখিকভাবে বাইআত দেবে। তবে বাইআতের বিষয়টা যাতে মজবুত ও দৃঢ় হয় সে জন্য বাইআত দেওয়ার সময় মুসাফাহা করার মতো একজনের হাতের ওপর আরেকজনের হাত রাখবে।

ইবনে খালদুন ﷺ বলেন, 'অঙ্গীকার দৃঢ় ও মজবুত করণার্থে যখন তারা আমিরকে বাইআত প্রদান করবে, তখন তার এক হাতের মধ্যে তাদের হাত রাখবে।'[৪১৬]

বাইআতের শরয়ি ভিত্তি ও তার বিধান

বাইআত কুরআন, সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিলাদির ভিত্তিতে প্রমাণিত। আমরা এখানে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর দালিলিক দিকটি তুলে ধরছি।

১. কুরআনে কারিমে বাইআতের প্রসঙ্গ

কুরআনে কারিমে অনেক আয়াত আছে, যাতে বাইআত ও তার শরয়ি ভিত্তির কথা উল্লেখ আছে। সুরা ফাতহে বাইআতুর রিজওয়ানের কথা এসেছে, 'যারা

৪১৫. 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' ইসলামের বিশেষ একটি পরিভাষা। সাধারণত দেশের সবচেয়ে বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, দূরদর্শী ও প্রভাবশালী আলিমরাই এর সদস্য হয়ে থাকেন। তাঁরা খলিফা নিয়োগ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে খলিফাকে পরামর্শ প্রদান ও সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন।
৪১৬. প্রাগুক্ত

নবিকে বাইআত দেবে, তারা মূলত আল্লাহকেই বাইআত দেবে।' আর এ থেকেই বাইআতের গুরুত্ব ও বাইআত প্রদানকারীদের সম্মানের বিষয়টি ফুটে ওঠে, যারা কোনো প্রকারের দ্বিধা না করে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইআত দিয়েছেন। সাহাবিগণ তাঁকে এই কথার ওপর বাইআত দিয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁদের পরিচালনা করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

'যারা আপনার কাছে বাইআত দেয়, তারা তো (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর কাছেই বাইআত দেয়। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব যে বইআত ভঙ্গ করে, সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।'[৪১৭]

যে সকল মুসলমান গাছের নিচে বাইআতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾

'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে বাইআত দিল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদের আসন্ন বিজয়ের পুরস্কার দিলেন।'[৪১৮]

৪১৭. সুরা আল-ফাতহ : ১০
৪১৮. সুরা আল-ফাতহ : ১৮

অনুরূপভাবে যে সকল মহিলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর প্রতিটি বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার করে তাঁর নিকট বাইআত দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

'হে নবি, ইমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এ শর্তে বাইআত দিল যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্য হবে না, তখন তাদের বাইআত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।'[৪১৯]

২. হাদিস শরিফে বাইআতের প্রসঙ্গ

বাইআতের ব্যাপারে মুসলিম শরিফে এসেছে, মুজাশি বিন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ : إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا، وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ

'আমি মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের ওপর বাইআত দেওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় হিজরতের ফজিলত মুহাজিরদের জন্য গত হয়ে গেছে। তাই ইসলাম, জিহাদ ও কল্যাণকর কাজেই কেবল বাইআত বাকি আছে।'[৪২০]

৪১৯. সুরা আল-মুমতাহিনা : ১২
৪২০. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪২৭, হা. নং ১৮৬৩ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

ইবনে উমর ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا : فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

'আমরা যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মান্য করা ও আনুগত্যের বাইআত দিতাম, তখন তিনি বলতেন, যতটুকুতে তোমরা সক্ষম হও।'[৪২১]

উবাদা বিন সামিত ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বাইআত দিলাম এ কথার ওপর যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিয়ে হলেও আমরা তাঁর কথা মানব এবং আনুগত্য করব। আমরা শাসক বা আমিরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না। তিনি বলেন, তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা তার মধ্যে স্পষ্ট কুফরি দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল আছে, তাহলে ভিন্ন কথা।'[৪২২]

রাসুলুল্লাহ ﷺ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমান থেকেই বাইআত গ্রহণ করতেন। তবে পুরুষরা সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্য করার বিষয়ে মুখে উচ্চারণ করে হাতে হাত রেখে বাইআত দিতেন। আর নারীরা পুরুষের মতো কথার মাধ্যমেই বাইআত দিতেন, তবে হাতে হাত রাখতেন না। কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের সাথে কখনো হাত মিলাতেন না।

৪২১. সহিহুল বুখারি : ৯/৭৭, হা. নং ৭২০২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৪২২. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭০, হা. নং ১৭০৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ : {لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا}، قَالَتْ : وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

'নবিজি ﷺ কথার মাধ্যমে, لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا (তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না) আয়াতের ওপর মহিলাদের থেকে বাইআত গ্রহণ করতেন। আয়িশা ؓ বলেন, 'কিন্তু তাঁর হাত মহিলাদের হাত স্পর্শ করত না, তবে তাঁর মালিকানাধীন মহিলাগণ (স্ত্রী ও দাসী) হলে ভিন্ন কথা।'[৪২৩]

উমাইমা বিনতে রুকাইকা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ : فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ». قَالَتْ : قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

'আমি আনসারি মহিলাদের সাথে নবিজি ﷺ-এর নিকট বাইআত দিতে আসলাম। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার নিকট এই কথার ওপর বাইআত প্রদান করছি যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করব না, চুরি করব না, জিনা করব না, কারও ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেবো না এবং সৎ কাজে আমরা কখনোই আপনার অবাধ্য হব না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের সাধ্যমতো আনুগত্য করবে। উমাইমা ؓ বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ আমাদের ব্যাপারে অধিক দয়াশীল। হে আল্লাহর রাসুল,

৪২৩. সহিহুল বুখারি : ৯/৮০, হা. নং ৭২১৪। (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

আসুন, এখনই আমরা বাইআত হই। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি মহিলাদের সাথে হাত মিলাই না। একজন মহিলার ক্ষেত্রে আমার যে কথা, একশ মহিলার ক্ষেত্রে আমার সে একই কথা।'[৪২৪]

অন্যায়ভাবে আমিরের অবাধ্য হতে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। বাইআত ভঙ্গ করা ও আমিরকে গুরুত্ব না দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ, এগুলো হলো পথভ্রষ্টতা, আল্লাহর আদেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া, আল্লাহর আদেশের স্পষ্ট অবাধ্যতা, দ্বীনের আমানতের ক্ষেত্রে শিথিলতা করার নামান্তর।

ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

'যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিল, সে এমন অবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে আসবে যে, তার এ কর্মের পক্ষে তার কোনো প্রমাণই থাকবে না। আর যে মৃত্যুবরণ করল; অথচ তার কাঁধে কারও বাইআত নেই, সে জাহিলি মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করল।'[৪২৫]

অতএব, মজলিসে শুরার মাধ্যমে যখন আমির নির্ধারিত হবে, তখন সকলেই দ্রুত তাকে বাইআত দেবে। সকল মুসলমান তাদের সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমিরের কথা মান্য ও আনুগত্যের ওপর এবং কল্যাণকর কাজে তার অবাধ্য না হওয়া ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার ওপর বাইআত দেবে। যথাসম্ভব আমিরের হাতে হাত রেখে বাইআত দেবে, যাতে করে বাইআতের বিষয়টি আরও দৃঢ় ও মজবুত হয়। আর মহিলারা মুসাফাহা ব্যতীত শুধু কথার মাধ্যমে বাইআত দেবে।

---

৪২৪. সুনানুন নাসায়ি : ৭/ ১৪৯, হা. নং ৪১৮১ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

৪২৫. সহিহ মুসলিম : ৩/ ১৪৭৮, হা. নং ১৮৫১ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

একের পর এক সকল মুসলমানের থেকে বাইআতের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে কারও জন্য আর এই সুযোগ নেই যে, সে তার কাঁধ থেকে বাইআতের ভার নামিয়ে রাখবে। আবার কারও জন্য বাইআত না দিয়ে মুসলমানদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকারও সুযোগ নেই।

বাইআতের গুরুত্ব

ইসলামি শরিয়তে বাইআতের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমদের একতাবদ্ধ থাকা এবং তাদের শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বাইআত অনেক বড় ভূমিকা রাখে। বাইআতের দুটি দিক রয়েছে। এক. জনগণ। দুই. শাসক। জনগণ বাইআত প্রদান করে এই অঙ্গীকার করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়ন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিদ্রোহ করার কোনো অধিকার নেই।

অন্যদিকে জনগণের পক্ষ থেকে শাসকের প্রতি এই আস্থা ও তাকে এই দায়িত্ব অর্পনের কারণে শাসক সাধারণ মানুষের প্রতি আরও সদয় হবেন, মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তার ইখলাসে পূর্ণতা আসবে। তিনি আরও দৃঢ়ভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলবেন। মানুষের মধ্যে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি চুল পরিমাণও ছাড় দেবেন না। আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোনো কিছুই তাকে টলাতে পারবে না।

এসব কিছুই জনগণের সাথে শাসকদের মহব্বত-ভালোবাসা বৃদ্ধির মাধ্যম, যা তাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় ও মজবুত করে তোলে। তাদের মাঝে দূরত্ব কমে যায়। পরস্পর মহব্বত ও ভালোবাসা, ইকরাম ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলিম উম্মাহ হয়ে ওঠে সুদৃঢ় শক্তিশালী, সীসাঢালা মজবুত এক প্রাচীর। কোনো কিছুই তাদের রুখতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

'হে নবি, ইমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে বলে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের বাইআত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।'[৪২৬]

কাকে বাইআত দেওয়া হবে

আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে বাইআত দিতে হবে মুসলিম ইমামকে। ইমাম নির্ধারণ বা নির্বাচন করবেন 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'। অতঃপর সকল মুসলমান এ ইমামকে বাইআত দেবে। অনুরূপভাবে আমরা বাইআতের স্বরূপ বর্ণনায় বলেছি, সকল মুসলমানের ওপর কতর্ব্য হলো, যতক্ষণ না ইমাম তাদের আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণ ইমামের কথা মানার ব্যাপারে অটল থাকবে। কারণ, সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা হয়, সৃষ্টির এমন কোনো আদেশের আনুগত্য বৈধ নয়। ইমামের দায়িত্ব বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, জনগণের পক্ষ থেকে ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসককে এই শর্তের ওপর বাইআত দেবে যে, তিনি সকলকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করবেন, তাদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে চুল পরিমাণও ছাড় দেবেন না। সংক্ষেপে বাইআতের মূলনীতি এমনই।

কিন্তু এখন 'বর্তমান সময়ে কাকে বাইআত দেওয়া হবে?' এমন একটি প্রশ্ন আসতে পারে। কারণ, বর্তমান সময়ে ইসলাম বাস্তবতার ময়দান থেকে অনেক দূরে। কোনো ক্ষেত্রেই ইসলামের বাস্তবায়ন নেই। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছুটা থাকলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা একেবারেই নেই। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে কুফরি আইন-কানুনের মাধ্যমে।

৪২৬. সুরা আত-তাওবা : ৭১

চাই সেটা সমাজতন্ত্র হোক বা গণতন্ত্র হোক অথবা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো শাসনব্যবস্থা হোক। এসব ব্যবস্থা তো সব স্পষ্টই কুফরি। তাহলে বর্তমানে কাকে আমরা বাইআত দেবো?

বর্তমানে প্রতিটি মুসলিমের কাঁধে অর্পিত একটি দায়িত্ব হলো, নতুন করে ইসলামি জীবনধারা ফিরিয়ে আনা। জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের কাজে আত্মনিয়োগ করা। এ দায়িত্ব তো সাধারণ কোনো দায়িত্ব নয়-ই; বরং সকল মুসলিমের ওপর এটি একটি ফরজ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে শিথিলতা করা, কিংবা দায়িত্ব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার কোনো সুযোগই নেই। তাই সকল সাধারণ মুসলিমের অবশ্যকর্তব্য হলো, বর্তমানে যে বা যারা ইতিদালি ও বিশুদ্ধ মানহাজে কুফর ও কুফরি শক্তিকে প্রতিহত করে জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে, তাদের বাইআত দেওয়া। এ মহান কাজে তাদের শক্তিশালী করা এবং তাদের সহযোগিতা করা। যাতে করে আবার নতুন করে বিশ্বে ইসলাম ও ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে, জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম হয়, ফিরে আসে সোনালি অতীত এবং কায়িম হয় ইনসাফ ও ন্যায়বিচার।

ইসলামে বর্ণিত বিধানে সে ইমাম ও অনুসারীর কথা বলা হয়েছে যারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান করে, যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যায়, বিরোধিতাকারীরা যাদের একটি চুলও বাঁকা করতে পারে না। শত্রুরা যতই ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল করুক না কেন, তারা আল্লাহর আদেশের ওপর অটল থাকে। এ অবস্থায় হয়তো শরিয়ত প্রতিষ্ঠা হবে নয়তো তারা আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴾

'আপনি বলুন, তোমরা আমাদের দুটি কল্যাণের একটির প্রতিক্ষা করছ। আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্য যে, আল্লাহ তোমাদের আজাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।'[৪২৭]

ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান

মুসলমানদের ইমাম বা খলিফা হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি, যিনি তাদের কল্যাণ ও সফলতার দিকে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন, তাদের মাঝে শরিয়তের বিধান বাস্তবায়ন করবেন। যিনি মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন, মানুষের মধ্য থেকে অন্যায় ও জুলুম প্রতিহত করবেন। মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্য তিনি, যিনি মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নিরলসভাবে কঠিন পরিশ্রম করার যোগ্যতা রাখেন।

ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানের গুরুত্বপূর্ণ অনেক দায়িত্ব রয়েছে। যেমন : হদ ও কিসাস বাস্তবায়ন করা, মুলমানদের নামাজে ইমামতি করা, বিভিন্ন অঞ্চলের আমির/গভর্নর নিয়োগ দেওয়া, মানুষদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, জিহাদের জন্য বাহিনী গঠন করা ও বাহিনীর আমির নির্ধারণ করা, দক্ষ ও বিচক্ষণ সমরবিদদের সাথে পরামর্শ করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা সাজানো, জাকাত, ফাই, খারাজ, গনিমতসহ অর্থ সংগ্রহের বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করা।

৪২৭. সুরা আত-তাওবা : ৫২

মুসলিম শাসকের দায়িত্বসমূহ

মুসলিম শাসকের দায়িত্বের পরিধি ব্যাপক। সংক্ষেপে তার কিয়দাংশ উল্লেখ করছি। একজন মুসলিম শাসককে দশটি বিষয় ভালোভাবে পালন করতে হবে। যথা :

১. দ্বীনের হিফাজত

খলিফা দ্বীন হিফাজতের মূলনীতি অনুযায়ী কাজ করবেন। কেউ বিদআত সৃষ্টি করলে অথবা কোনো সংশয়বাদী দ্বীন থেকে সরে গেলে তখন খলিফা তার সামনে স্পষ্ট দলিল পেশ করে তার সন্দেহ দূর করবেন। যদি এর পরেও সংশয়বাদী বা বিদআতকারী সঠিক পথে না আসে, তবে তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। যাতে করে সে কোনো ধরণের বিশ্রঙ্খলা ও ফিতনার বিস্তার ঘটাতে না পারে এবং উম্মত তার পথভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

২. শরয়িভাবে বিবাদ মীমাংসাকরণ

খলিফা বিবাদে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে দেবেন। যাতে করে সবদিকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়, জালিমের জুলুম বন্ধ হয়ে যায় এবং মাজলুম আর নির্যাতিত না হয়।

৩. জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

খলিফাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যেন মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নিরাপদে সারা দেশে ভ্রমণ করতে পারে এবং সফরে তাদের জান ও মালের ক্ষতির কোনো শঙ্কা না থাকে।

৪. হদ ও কিসাস বাস্তবায়ন

খলিফা প্রকাশ্যে জনসম্মুখে অপরাধমূলক কাজের শাস্তি বাস্তবায়ন করবেন। যাতে করে আল্লাহ কর্তৃক পবিত্র কাজ ও বিষয়বস্তু নিরাপদ থাকে এবং বান্দার হকগুলো ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

৫. সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যাতে কোনোভাবেই শত্রুরা দেশের ভেতরে প্রবেশ করে মানুষের জান ও মালের ক্ষতি না করতে পারে।

৬. জিহাদের ইবাদত পালন

ইসলামের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা খলিফার গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। অমুসলিমদের প্রথমে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দেবে। তারা যদি ইসলাম কবুল করে অথবা জিজিয়া দেয়, তাহলে তাদের ছেড়ে দিতে হবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করবে, যাতে করে ইসলাম সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং আল্লাহর কালিমা সবার ঊর্ধ্বে থাকে।

৭. ফাই ও জাকাত সংগ্রহ

শরিয়ত মোতাবেক ফাই ও জাকাত সংগ্রহ করা খলিফার দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

৮. অভাবীদের ভাতা প্রদান

বাইতুল মাল থেকে অভাবীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা এবং সময়মতো তা প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেওয়া খলিফার দায়িত্বসমূহের একটি।

৯. বিশ্বস্ত কর্মী নিয়োগদান

সৎ ও বিশ্বস্ত লোকদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া খলিফার দায়িত্ব। যাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগ দুর্নীতিমুক্ত থাকে এবং সুচারুভাবে দায়িত্ব আদায় হয়।

১০. কর্মকর্তাদের তদারকি

খলিফাকে রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয় ও সকল পরিস্থিতির প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেন তার নিয়োগকৃত কর্মকর্তা কোনো ধরনের দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে না পড়ে এবং জনগণ তাদের অধিকার পেতে অসুবিধায় না পড়ে।

এটিই হলো মুসলিম শাসকের দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি তালিকা। নিঃসন্দেহে এই দায়িত্বগুলো অনেক বড় এবং খুবই ভারী। এ দায়িত্ব বহনে অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বেরও অনেক কষ্ট হয়ে যায়। তাই এমন বড়, সূক্ষ্ম ও ভারী দায়িত্ব পালন করতে হলে আমিরকে হতে হবে দৃঢ় সংকল্পী, অগাধ জ্ঞান ও বুদ্ধির অধিকারী, অভিজ্ঞ আলিম ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। সাথে সাথে তাকে হতে হবে দৃঢ় ইমানদার, মুত্তাকি ও সঠিক আকিদা-বিশ্বাসে অটল, যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখবে।

যে সকল নামে রাষ্ট্রপ্রধানকে ডাকা হবে

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহৃত নামগুলো হচ্ছে ইমাম, খলিফা, আমিরুল মুমিনিন, মালিক বা বাদশাহ। এখানে এসব নামের সংক্ষিপ্ত ব্যাখা প্রদান করা সমীচীন মনে করছি।

ক. ইমাম

এ শব্দের অর্থ নেতা বা প্রধান। জনগণ যার অনুসরণ করে চলবে। চাই তা নামাজের ক্ষেত্রে হোক বা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে হোক; জনগণ সর্বদা ইমামের অনুসরণ করবে। ইমাম তাদের কল্যাণ ও সফলতার দিকে নিয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে শরিয়ত বাস্তবায়ন করবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইবরাহিম ﷺ-কে ইমাম বলেছেন। কারণ, তিনি ইবরাহিম ﷺ-কে মানবজাতির জন্য ইমাম ও নেতা বানিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾

'যখন ইবরাহিমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি

বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছবে না।'[৪২৮]

খ. খলিফা

খলিফা (الخليفة) শব্দটি ইস্তিখলাফ (الاستخلاف) শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ প্রতিনিধি নিয়োগ করা। মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে আবু বকর ﷺ-কে খলিফা নামে ডাকা হতো। কারণ, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপস্থিতিতে নামাজে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ইমামতি করেছেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর মুসলমানগণ তাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খলিফা বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং পরবর্তী সময়ে যারা এ মহান ইমামতের দায়িত্ব পালন করবে এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, তাদেরকে খলিফা বলা যাবে।

গ. আমিরুল মুমিনিন

মুসলমানদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম এই নামে দ্বিতীয় খলিফা উমর ﷺ-কে ডাকা হয়। এর অর্থ মুমিনদের আমির বা নেতা। আর এই নামটি মুসলিম শাসকের জন্য খুবই যথার্থ ও উপযুক্ত একটি নাম।

ঘ. মালিক বা বাদশাহ

তাত্ত্বিক ও দ্বীনি উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এই নামটি মুসলিম শাসকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। মালিক শব্দটি মানুষের মাঝে শাসকের প্রচলিত নাম হওয়া ছাড়াও শব্দটি খলিফা ও ইমাম শব্দেরও প্রতিশব্দ। মুসা ﷺ তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সময় 'মালিক' শব্দের বহুবচন 'মুলুক' ব্যবহার করেছেন। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾

৪২৮. সুরা আল-বাকারা : ১২৪

'যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবি-রাসুল সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন।'[৪২৯]

বিশ্বাসী সেনাপতি তালুত, যিনি অবিশ্বাসী জালুতকে হত্যা করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা তাকে বনি ইসরাইলের মালিক বা বাদশাহ বানিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾

'আর তাদেরকে তাদের নবি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন।'[৪৩০]

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন

খলিফা নির্বাচন করবে উম্মতের 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'। তাঁরা মানুষের মধ্য থেকে খিলাফতের জন্য উপযুক্ত একজনকে খুঁজে বের করবেন। বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ করবেন, কে খিলাফতের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। তারা দেখবেন কার মাঝে বিচক্ষণতা, দুনিয়াবি ও শরয়ি বিষয়ের পরিপূর্ণ ইলম আছে; কার মাঝে হিকমত ও প্রজ্ঞা ফুটে ওঠে এবং মানুষের কাছে তার জনপ্রিয়তা কেমন ইত্যাদি।

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' কোনো ধরনের জোর-জবরদস্তি ব্যতীত খিলাফতের উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট পূর্ণ আদব ও সম্মানের সাথে খিলাফতের বিষয়টি পেশ করবেন। তাঁকে মুসলিম উম্মাহর খলিফা হওয়ার প্রস্তাব দেবেন। এ বিষয়ে তাকে বোঝাবেন। তিনি যদি রাজি হন, তাহলে প্রথমে তাঁরা তাঁর কাছে বাইআত দেবেন। অতঃপর তিনি কোনো মসজিদে অথবা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থানে জনগণের সামনে উপস্থিত হয়ে সকলের বাইআত গ্রহণ করবেন। তিনি যদি খিলাফতের দায়িত্ব নিতে রাজি না হন,

৪২৯. সুরা আল-মায়িদা : ২০
৪৩০. সুরা আল-বাকারা : ২৪৭

তাহলে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' খিলাফতের যোগ্য অন্য আরেকজনকে খুঁজে বের করবেন, যার মধ্যে খলিফা হওয়ার সকল শর্তগুলো পাওয়া যায়। অতঃপর সবাই তাঁর কাছে বাইআত দেবেন।

কিন্তু যদি খিলাফতের জন্য সমান উপযুক্ত দুজন লোক থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে যিনি বয়সে প্রবীণ, তাকে খলিফা হিসাবে মনোনীত করবে। আর যদি এমন হয় যে, একজনের ইলম বেশি আর একজনের বীরত্ব বেশি, তাহলে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে দুজনের একজন অগ্রাধিকার পাবে। উদাহরণত তখন যদি মুসলিম উম্মাহ কাফিরদের সাথে যুদ্ধের অবস্থায় থাকে, তাহলে অধিক বীরত্বের অধিকারীকে খলিফা হিসাবে মনোনীত করা হবে এবং সকলে তাঁর কাছে বাইআত দেবে। আর যদি তখন মুসলিম উম্মাহ মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের মুখোমুখি থাকে। যেমন তাদের মধ্যে বিদআত বা মানতিক-ফালসাফার ছড়াছড়ি থাকে, তাহলে আলিম অগ্রাধিকার পাবে। তাকে খলিফা হিসাবে মনোনীত করবে এবং তাঁর কাছে সবাই বাইআত দেবে।

রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের আরেকটি পদ্ধতি হলো, খলিফা বেঁচে থাকাকালীন খিলাফতের উপযুক্ত কাউকে খলিফা হিসাবে নির্ধারণ করে যাবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। মুসলিম জনগণ যদি তাকে মেনে নেয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে বাইআত দেয়, তাহলেই সে খলিফা হবে। পূর্বের খলিফার এ নিয়োগকে শুধু একটি মতামত বা নসিহত হিসাবে বিবেচনা করা হবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে নয়। 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এই সিদ্ধান্তকে বাতিল করে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে খিলাফতের উপযুক্ত অন্য আরেকজনকে মনোনীত করতে পারবেন।

আবু বকর ﷺ মৃত্যুর পূর্বে এ পদ্ধতিতেই উমর ﷺ-কে খলিফা হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম সবাই তাঁকে মেনে নিয়েছিলেন। এভাবে উমর ﷺ মৃত্যুর পূর্বে শীর্ষস্থানীয় ছয়জন সাহাবিকে নির্ধারণ করেছিলেন এবং ছেলে আব্দুল্লাহকে বাদ দিয়ে এদের মধ্য থেকে কাউকে খলিফা হিসাবে বেছে নিতে বলেছিলেন।

খলিফা কর্তৃক পরবর্তী কোনো খলিফা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল একটি কাজ। এর মাধ্যমে পরবর্তীকালে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কারণ, এ বিষয়ে আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ সঠিক ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে যে অন্যরা সঠিক থাকবে—এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আর উত্তরাধিকারসূত্রে খলিফা নির্ধারণের পদ্ধতি অর্থাৎ বাদশার ইনতিকালের পর তাঁর ছেলে বা পরিবারের অন্য কেউ তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পদ্ধতিটি ইসলামসম্মত নয়। এটা মানবস্বভাব বিরুদ্ধও বটে। ইসলামের স্বাধীন শুরার পরামর্শের ভিত্তিতে উপযুক্ত লোককে নিয়োগের পরিবর্তে যোগ্য হোক বা অযোগ্য পরিবারের কেউ শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে—এটা জ্ঞানী মাত্রই মেনে নিতে পারে না।

খলিফা হওয়ার শর্তসমূহ

খিলাফতের উপযুক্ত হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। ইমাম হতে হলে সেই শর্তগুলো পরিপূর্ণ থাকতে হবে। এ সকল শর্তকে ছয়টি ধারায় একত্রিত করে পেশ করছি।

ক. মুসলিম হওয়া

খলিফাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। ইমাম হওয়ার এটি প্রধান ও মৌলিক শর্ত। কোনো অবস্থাতেই এ শর্ত থেকে খালি হতে পারবে না। এটা তো চিন্তাও করা যায় না যে, মুসলমানদের খলিফা বা শাসক হবে অমুসলিম! একজন অমুসলিম—যে ইসলামি আইন বা শরিয়তে বিশ্বাসী নয়, সে মুসলিমদের শরিয়ত অনুযায়ী কীভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করবে?

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ওপর এ বিষয়টি ওয়াজিব করে দিয়েছেন যে, মুসলমানগণ ওই সকল আমির বা শাসকদের আনুগত্য করবে, যারা তাদের ধর্ম ও আকিদা বিশ্বাসে বিশ্বাসী, যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾

'হে ইমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের।'[৪৩১]

এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, যারা মুসলমানদের আমির হবে তারা মুসলমানদের মধ্য থেকেই হবে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

'আর তিনি মুমিনদের ওপর কাফিরদের কখনোই কর্তৃত্ব দেবেন না।'[৪৩২]

এ আয়াত থেকেও বুঝা যায়, কাফিররা মুসলমানদের ওপর কোনো প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার অধিকার রাখে না। অতএব তাদের যদি মুসলমানদের বাদশাহ হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়, তাহলে তো মুসলমানদের ওপর কাফিরদের আংশিক নয়; বরং পূর্ণ কর্তৃত্বই সাব্যস্ত হয়ে যাবে, যা সম্পূর্ণরূপে এ আয়াতের দাবি পরিপন্থী।

খ. পুরুষ হওয়া

খলিফাকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। নারীদের খলিফা হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, খিলাফতের দায়িত্ব অত্যন্ত ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ। অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে এমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা যাবে না। এর জন্য উপযুক্ত হতে হলে ব্যক্তিকে হতে হবে চিন্তাশীল, সাহসী ও দূরদর্শী। এ ছাড়াও খলিফাকে এমন আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে, যা শুধু পুরুষের মধ্যেই পাওয়া যায়।

কোনো ধরনের কোমলতা, আবেগপ্রবণতা ও মহিলাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের আওতায় পড়ে এমন দুর্বলতা এই দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ, কঠোরতার ক্ষেত্রগুলোতে এমন ব্যক্তি সবকিছু ওলটপালট করে

৪৩১. সুরা আন-নিসা : ৫৯
৪৩২. সুরা আন-নিসা : ১৪১

ফেলবে। যেকোনো জটিল পরিস্থিতিতে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে। মহিলারা সাধারণত সঠিক বিষয়ের পরিবর্তে বেশির ভাগ মনের চাহিদা ও আবেগের দিকেই ধাবিত হয়ে থাকে।

স্বভাবগতভাবেই নারীরা হয়ে থাকে কোমল, আবেগী, নমনীয় ও লাজুক। এসব বৈশিষ্ট্য ইমামতের জন্য একেবারেই অনুপোযোগী। তাই মুসলমানদের খলিফা হবে পুরুষ। কোনো মহিলা এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে না।

আবু বাকরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

عَصَمَنِي اللهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ : مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟ قَالُوا : ابْنَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

'যখন পারস্য সম্রাট কিসরা মৃত্যুবরণ করল, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে আমি এমন জিনিস শুনেছি, যা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে হিফাজত করুন। তিনি বলেন, তারা কাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছে? তারা বলল, তার মেয়েকে। তিনি বললেন, ওই জাতি কখনো সফল হবে না, যারা কোনো মহিলাকে তাদের আমির নিযুক্ত করে।'[৪৩৩]

গ. আদালত ও ন্যায়পরায়ণতা থাকা

এটি বিশেষ একটি পরিভাষা। আদালত বলা হয়, দ্বীনি বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা, সগিরা গুনাহ পরিত্যাগ করা, কবিরা গুনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকা, নিজের ব্যক্তিত্ব ঠিক রাখা, আমানত রক্ষা করা, কোনো বিষয়ে গাফিলতি না করা। কারও মতে, আদালত হলো, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা।

খলিফার গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে হাজাম ﵀ বলেন, 'যার দ্বারা কবিরা গুনাহ হয় না এবং যাকে সগিরা গুনাহ করতে দেখা যায় না।'[৪৩৪]

৪৩৩. সুনানুন নাসায়ি : ৮/২২৭, হা. নং ৫৩৮৮, (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।
৪৩৪. আল-মুহাল্লা : ৮/৪২৫ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

মাওয়ারদি ﵀ বলেন, আদালত বা ন্যায়পরায়ণতার অর্থ হলো, সত্যবাদী হওয়া, আমানতদার হওয়া, হারাম, নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা, সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে দূরে থাকা, আবেগ, ভালোবাসা, রাগ ও ক্রোধের সময় কারও প্রতি প্রভাবিত না হয়ে স্বাভাবিক থাকা। কারও মধ্যে এই গুণগুলো পরিপূর্ণভাবে থাকলে তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় এবং তিনি ইমাম বা খলিফারূপে বরণীয়। আর কারও মধ্যে এগুলোর কোনো একটির ঘাটতি থাকলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, ও তার হুকুমও কার্যকর হবে না এবং তিনি খলিফা হতে পারবেন না।

ঘ. ইলম থাকা

ইলমের দিক থেকে খিলাফতের যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সীমা হলো, সমসাময়িক সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ও হুকুমের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা থাকা। মুসলমানগণ যখন কোনো সমস্যায় পতিত হবে, তখন উলামায়ে কিরাম ও ফুকাহায়ে কিরামের ওপর ওয়াজিব হলো, উক্ত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে একটি সুষ্ঠু ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

এ ধরনের পর্যালোচনাসভায় খলিফা নিবৃত্ত থাকবেন না; বরং তিনি পর্যালোচনা থেকে সঠিক মতটি বের করে আনবেন। ফুকাহায়ে কিরামের গবেষণা ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মতামত থাকবে। তিনি নিজ যোগ্যতায় তা থেকে সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতটি বের করে আনবেন। আর এ কাজটি শরয়ি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন আলিম ব্যতীত সম্ভব নয়।[৪৩৫]

তবে একদল ফুকাহায়ে কিরামের দৃষ্টিতে খলিফার জন্য আলিম হওয়া শর্ত নয়; বরং জেনারেল কেউ-ও খলিফা হতে পারবে। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তার একদল আলিম উপদেষ্টা থাকবে, যারা তাঁকে শরয়ি ফয়সালা করতে সাহায্য করবে। তবে এতে কোনো মতানৈক্য নেই যে, তার জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেক থাকতে হবে। মেধাহীন নির্বোধ কাউকে খলিফা বানানো কারো মতেই জায়িজ নেই।

৪৩৫. আল-আহকামুস সুলতানিয়া : পৃ. নং ১১২ (দারুল হাদিস, কায়রো)

ঙ. খলিফা হবেন দোষ-ক্রটিমুক্ত

দোষ-ক্রটি মুক্ত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দেহগত, মস্তিষ্কগত, আত্মিক ক্রটি থেকে মুক্ত হওয়া। যদি কেউ এমন কোনো সমস্যায় আক্রান্ত হয়, তাহলে সে এ মহান ইমামতের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।[৪৩৬]

দেহগত দোষ-ক্রটি : খলিফা হবেন সুঠাম দেহের অধিকারী। খিলাফতের দায়িত্বভার বহনে সক্ষম। খিলাফতের দায়িত্ব কখনো কখনো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এ দায়িত্ব আদায়ে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। তাই খলিফা যদি রুগ্ন শরীরের অধিকারী হন, তাহলে তার পক্ষে এ গুরুদায়িত্ব আনজাম দেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। সুতরাং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী বা অত্যাধিক রুগ্ন ব্যক্তিগণ খিলাফতের উপযুক্ত নন।

মস্তিষ্কগত ক্রটি : খিলাফতের মতো এত বড় দায়িত্বের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক-ক্রটিযুক্ত কাউকে নির্বাচন করা রীতিমতো ভয়ানক ব্যাপার। উন্মত্ত বা দিগ্‌ভ্রান্ত কারও হাতে মুসলিমদের নেতৃত্ব সোপর্দ করা জায়িজ নেই। এটি এমন স্পষ্ট বিষয় যে, এ ক্ষেত্রে দলিল দেওয়াটা বাহুল্যতা। কোনো একজন ব্যক্তির মস্তিষ্কগত কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু সে যথেষ্ট ইলমের অধিকারী নয়। ইলমের প্রাচুর্যতা না থাকার কারণে এমন একজন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তিকে যেখানে অনেকের দৃষ্টিতে খিলাফতের দায়িত্বের উপযুক্ত মনে করা হয় না; সেখানে মস্তিষ্ক-বিকৃত ব্যক্তিকে যে খিলাফতের যোগ্য মনে করা হবে না, সে কথা বলে কয়ে বুঝাতে হয় না।

আত্মিক ক্রটি : এ ধরনের ক্রটি মস্তিষ্কজনিত ক্রটির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। এগুলোর ফলে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আপন জায়গায় ঠিক থাকে না; বরং তা অনেক নিচু স্থানে অবস্থান করে। এগুলোর ফলে একজন ব্যক্তি পরিণত হয় অস্থির ও অপূর্ণাঙ্গ হিসাবে। যদি আত্মিক ক্রটি পূর্ণতায় পৌঁছে যায়, তবে অনিষ্টের আর কোনো কিছু বাকি থাকে না।

৪৩৬. আল-আহকামুস সুলতানিয়া : পৃ. নং ১৯ (দারুল হাদিস, কায়রো)

চ. কুরাইশি হওয়া

খলিফা হবেন কুরাইশ বংশের। তবে যদি কুরাইশ বংশের কোনো যোগ্য লোক না পাওয়া যায়, তাহলে অন্য কোনো যোগ্য লোক, যার মধ্যে খিলাফতের সকল শর্ত পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়, তাকে খলিফা হিসাবে মনোনীত করা হবে।

খলিফা কুরাইশ বংশ থেকে হওয়ার শর্তের ব্যাপারে হাদিস রয়েছে। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

'খলিফাগণ হবে কুরাইশ বংশ থেকে।'[৪৩৭]

খলিফার মেয়াদ

খলিফার জন্য খিলাফত পরিচালনার নির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারিত নেই। কুরআন ও হাদিসে খিলাফতের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে কোনো নস নেই। আবু বকর ﷺ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খিলাফত পরিচালনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারণ করেননি। তাঁর ওফাতের পর উমর ﷺ, উসমান ﷺ ও আলি ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত খিলাফত পরিচালনা করেছেন। তাঁদেরও কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের খিলাফত পরিচালনার জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করে দেননি।

তবে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' যখন মনে করবেন যে, তার জন্য সময় নির্ধারণ করাই উত্তম হবে, অন্যথায় খলিফা ক্ষমতার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে মানুষের প্রতি জুলুম নির্যাতন শুরু করতে পারেন, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে দেশ ও জনগণের সাথে যা ইচ্ছা তা-ই ব্যবহার করতে পারেন, তখন তাদের জন্য জায়িজ আছে যে, তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাইআত দেবেন। সেই সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে

৪৩৭. মুসনাদু আহমাদ : ১৯/ ৩১৮, হা. নং. : ১২৩০৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

তাদের থেকে বাইআত রহিত হয়ে যাবে। অতঃপর তারা খিলাফতের উপযুক্ত অন্য আরেকজনকে খিলাফতের জন্য নির্ধারণ করে তাকে বাইআত দেবেন, যিনি তাদের কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করবেন।

মন্ত্রী পরিষদ

وزير (উজির) অর্থ মন্ত্রী। এর বহুবচন হলো وزراء (উজারা)। এটা الوزر (আল-বিজরু) ধাতুমূল থেকে নির্গত, যার অর্থ বোঝা বা ভার। সুতরাং وزير (উজির) শব্দের অর্থ বোঝা বহনকারী। যেমন কুরআনে কারিমে এসেছে :

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾

'কোনো বোঝা বহনকারীই অপরের বোঝা বহন করবে না।'[৪৩৮]

কেউ কেউ বলেছেন, وزير (উজির) শব্দটি الْوَزَر (আল-ওজারু) থেকে নির্গত, যার অর্থ আশ্রয়স্থল। শাসক তার দায়িত্ব পালনে পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য উজিরের মতামত ও সাহায্যপ্রার্থী হবেন। এ অর্থে কুরআনের একটি আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴾

'না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই।'[৪৩৯]

আর মন্ত্রী পরিষদ এমন কিছু মানুষের সমষ্টি, যারা বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং যাদের এ বিশেষ দায়িত্বে খলিফা নিয়োগ করে থাকেন। এ নিয়োগের উদ্দেশ্য থাকে দেশ ও জাতির সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনে খলিফাকে সাহায্য করা। তারা উম্মাহর কল্যাণ ও শরিয়তের চাহিদা পূরণে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৪৩৮. সুরা আল-আনআম : ১৬৪
৪৩৯. সুরা আল-কিয়ামাহ : ১১

মুসা ﷺ আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর ভাই হারুন ﷺ-কে তার উজির বা সহযোগী হিসাবে নিয়োগ দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। কুরআনে কারিমে এসেছে :

﴿ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي- هَارُونَ أَخِي -وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي- وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾

'আর আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দিন—আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন।'[৪৪০]

যদি এ মহান নবি নিজের সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে একজন সাহায্যকারী প্রার্থনা করে থাকেন, তাহলে নবি ব্যতীত অন্যদের জন্য তো সাহায্য আরও বেশি প্রয়োজন। যেন খলিফা কাজসমূহ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারেন।

উম্মাহর কল্যাণের বিভিন্ন দিকের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে খলিফারও দায়িত্ব বেড়ে যায়। যেমনিভাবে অবস্থা ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার বিভিন্ন দিকের সেবার পরিমাণ বেড়ে যায়। সে জন্য দরকার পড়ে আরও বেশি মন্ত্রীর। তাই সবার কল্যাণার্থে মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়াতে হয়। আর এভাবেই কাজের খাত বাড়ার সাথে সাথে মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। খলিফা কাজের ক্ষেত্রে দক্ষ এমন ব্যক্তিদেরকেই কেবল নিজ মন্ত্রীসভার জন্য নির্বাচন করবেন। কেউ হয়তো কারিগরি দিক থেকে ভালো হবেন, কেউ ব্যবসা ভালো বুঝবেন, কেউবা কৃষি কাজের ব্যাপারে ভালো জেনে থাকবেন, কেউ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনে পটু হবেন, কেউ জিহাদ ও যুদ্ধের দিকগুলো সামলাবার জন্য উপযুক্ত হবেন, কেউ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ হবেন, এ ছাড়াও অন্যান্য কাজে একেক জন একেক ক্ষেত্রে উত্তম হবেন।

৪৪০. সুরা তহা : ২৯-৩২

উজিরকে হতে হবে বিচক্ষণ, আলিম, মুত্তাকি ও পরহেজগার। তার মধ্যেও ওই শর্তগুলো থাকতে হবে, যেগুলো ইমাম বা খলিফার জন্য শর্ত ছিল। তবে বংশ মর্যাদার শর্তটি বাদ পড়বে। মন্ত্রীপদের জন্য মনোনীত ব্যক্তি যদি কবিরা গুনাহ ও সগিরা গুনাহ বর্জনকারী হয়ে থাকে এবং অন্যান্য আদালতের গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে, তবে সে কুরাইশ না হলেও কোনো সমস্যা নেই। তবে তাকে বীরত্ব, ভদ্রতা, আমানত, সত্যবাদিতা ও উত্তম আচার-আচরণের গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

প্রাদেশিক শাসনকর্তা

মুসলিমদের কোনো শহরের প্রশাসনিক কার্যনির্বাহের নিমিত্তে খলিফা কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে ওয়ালি বা ডিসি বলা হয়।[৪৪১]

কারও নিজের পক্ষ থেকে কোনো অঞ্চলের দায়িত্বশীল হতে চাওয়া জায়িজ নেই। এতে করে ক্ষমতার প্রতি তার লোভ ও তার নফসের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এটাই প্রমাণ করে যে, সে ক্ষমতা লাভের পর মানুষের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে দুর্নীতি ও অত্যাচার করবে। ক্ষমতার লোভ কখনোই মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না; বরং মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়। ক্ষমতার লোভ মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী ও আখিরাতের প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে। কাউকে তো তা জাহান্নাম পর্যন্ত নিয়ে যায়।

আর এ কারণেই রাসুলুল্লাহ ﷺ দায়িত্ব গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হতে নিষেধ করেছেন। এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ফিতনা-ফাসাদের দিকে নিয়ে যায় এবং মানুষের পরকালীন জীবন ধ্বংস করে দেয়।

৪৪১. নিজামুল ইসলাম : পৃ. নং ১৫৭ (দারু ইবনিল জাওজি, কায়রো)

উসাইদ বিন হুজাইর ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

'আনসারদের মধ্য হতে এক লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে একান্তে বলল, আপনি কি আমাকে ওমুক ব্যক্তির মতো কোনো অঞ্চলের আমির হিসাবে নিয়োগ দেবেন না? তখন তিনি বললেন, অবশ্যই তোমরা আমার পরে স্বৈরাচারী ও পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা কিয়ামতের দিন হাওজে কাউসারে আমার সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো।'[৪৪২]

আবু মুসা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَتَانِي نَاسٌ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقَالُوا: اذْهَبْ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً، فَذَهَبْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ قَالَ أَبُو مُوسَى: فَاعْتَذَرْتُ مِمَّا قَالُوا، وَأَخْبَرْتُ أَنِّي لَا أَدْرِي مَا حَاجَتُهُمْ، فَصَدَّقَنِي، وَعَذَرَنِي، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَلَنَا

'আশআরি গোত্রের কিছু লোক আমার কাছে এসে বলল, আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে চলুন। সেখানে আমাদের কিছু প্রয়োজন আছে। অতঃপর আমি তাদের নিয়ে গেলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদের আপনার কাজে সহযোগী হিসাবে নিয়োগ দিন। আবু মুসা ؓ বলেন, তখন আমি তাদের কথার ব্যাপারে ওজর পেশ করে বলি যে, আমি জানতাম না, তাদের আসলে কী প্রয়োজন ছিল? তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার কথা বিশ্বাস করে আমার ওজর গ্রহণ

৪৪২. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭৪, হা. নং ১৮৪৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

করে নেন। অতঃপর তিনি বললেন, যারা দায়িত্ব চেয়ে নেয়, তাদের মাধ্যমে আমরা কাজে সাহায্য নিই না।'[৪৪৩]

আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

'তোমরা নেতৃত্বের লোভ করে থাকো; অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জা ও আফসোসের কারণ হবে। তাদের এই দুনিয়া কতই না সুখের! আর আখিরাত কতই না দুঃখের!'[৪৪৪]

আওফ বিন মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ وَمَا هِيَ؟، فَقُمْتُ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ عَدَلَ وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ أَقْرِبِيهِ

'তোমরা চাইলে আমি তোমাদের নেতৃত্ব সম্পর্কে জানাতে পারি। তখন আমি উচ্চস্বরে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, তা কী? তিনি বললেন, নেতৃত্বের প্রথম ধাপ তিরস্কার, দ্বিতীয় ধাপ লজ্জা আর তৃতীয় ধাপ আখিরাতে শাস্তি ভোগ। তবে যে ন্যায়বিচার করে সে ব্যতীত। কিন্তু সে তার নিকটাত্মীয়ের ক্ষেত্রে কীভাবে ন্যায়বিচার করবে?'[৪৪৫]

৪৪৩. সুনানুন নাসায়ি : ৮/২২৪, হা. নং ৫৩৮২ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।
৪৪৪. সুনানুন নাসায়ি : ৮/২২৫, হা. নং ৫৩৮৫ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।
৪৪৫. মুসনাদুল বাজ্জার : ৭/১৮৮, হা. নং ২৭৫৬ (মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা) - হাদিসটি সহিহ।

আবু জার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম :

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে দায়িত্বশীল বানিয়ে দিন। তিনি (আবু জার ﷺ) বলেন, তখন তিনি স্বীয় হাত দিয়ে আমার কাঁধে আঘাত করলেন। অতঃপর বললেন, আবু জার, তুমি দুর্বল। আর এটি একটি আমানত। নিশ্চয় এটি কিয়ামতের দিন অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। তবে যে ব্যক্তি এর হক আদায় করবে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে সে ব্যতীত।'[৪৪৬]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এভাবেই দায়িত্ব চাওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং যারা দায়িত্ব তলব করে, তাদের ভয় দেখিয়েছেন।

আমির বা গভর্নর

আমির বলা হয়, খলিফার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, যিনি উক্ত অঞ্চলে খলিফার পক্ষ হয়ে প্রতিনিধিত্ব ও শাসন করবেন। উজির হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো ছিল, আমির হওয়ার জন্যও সে শর্তগুলো পরিপূর্ণ থাকতে হবে। কেননা, সামান্য পার্থক্য ব্যতিরেকে আমির ও উজির প্রায় একই। আমির নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল বা সীমানার ভেতরে খলিফার পক্ষ হয়ে প্রতিনিধিত্ব ও শাসন করেন। আর উজির বা মন্ত্রী নির্দিষ্ট এক বা একাধিক কাজের ক্ষেত্রে পুরো খিলাফতের মধ্যে খলিফার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। যেমন কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব হলো, খিলাফতের সমগ্র অঞ্চলজুড়ে কৃষিখাতসংশ্লিষ্ট বিষয়ে খলিফার প্রতিনিধিত্ব করা। এভাবেই অন্যান্য মন্ত্রীদেরও বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

৪৪৬. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৫৭, হা. নং ১৮২৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

আমির নিয়োগের পদ্ধতি

আমির নিয়োগের পদ্ধতি দুটি। যথা :

১. স্বয়ং ইমাম বা খলিফা কোনো অঞ্চলের জন্য কাউকে আমির হিসাবে নিয়োগ দেবেন।
২. খলিফার পক্ষ থেকে তার উজির বা মন্ত্রী নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের জন্য কাউকে আমির হিসাবে নিয়োগ দেবেন। তবে এ ক্ষেত্রে খলিফা যদি মন্ত্রীর নির্ধারিত ব্যক্তিকে যোগ্য মনে না করেন, তবে তার নিয়োগ বাতিল হয়ে যাবে।

সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকরণার্থে, তাদের অনিষ্টতা দূর করে তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করার লক্ষ্যে আমিরকে আটটি বিষয়ে দায়িত্বপালন করতে হবে। যথা :

ক. সেনাবাহিনী গঠন, প্রশিক্ষণ ও সঠিক পরিচালনার প্রতি লক্ষ রাখা।

খ. দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা। অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে কাজি ও বিচারক নিয়োগ দেওয়া এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা।

গ. খারাজ, খাজনা ও জাকাত উত্তোলনের জন্য লোক নিয়োগ করা। উত্তোলনের পর সঠিক খাত ও অধিকারীর নিকট অর্পণ করা।

ঘ. সারা দেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যেন মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নিরাপদে দেশের সব জায়গায় ভ্রমণ করতে পারে এবং সফরের মধ্যে তাদের জান ও মালের ক্ষতির কোনো শঙ্কা না থাকে।

ঙ. হদ ও কিসাস প্রতিষ্ঠা করা।

চ. জুমআর ইমামতি করা।

ছ. হজ করার জন্য লোকদের প্রেরণ করা এবং হাজিদের সাহায্য-সহযোগিতা করা।

জ. অঞ্চলটি যদি কুফরি রাষ্ট্রের নিকটবর্তী হয়, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য বাহিনী পাঠানো এবং যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের সুষম বণ্টন করা।

বিচারকার্য

القضاء (আল-কাজা) এর শাব্দিক অর্থ রায় বা বিচার। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ বিচারে ফয়সালা করা বা রায় দেওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾

'যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত।'[৪৪৭]

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, বিচারকার্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের পরস্পরের মাঝে সংঘটিত ঝগড়া-বিবাদ ও বিরোধ মিটানো। ফয়সালা করা হবে দুটি পদ্ধতিতে। যথা :

ক. সন্তুষ্টির ভিত্তিতে পরস্পরকে মিলিয়ে দেওয়া এবং আপসে তাদের সমস্যার সমাধান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন : وَالصُّلْحُ خَيْرٌ 'আপসে মীমাংসা করাই উত্তম।'[৪৪৮]

খ. প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করে মূল হকদারকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া। এটিও আবার দুপদ্ধতিতে হয়ে থাকে। যথা :

১. স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে। অর্থাৎ বিবাদী নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেবে।

২. প্রমাণের ভিত্তিতে। অর্থাৎ বাদী শরয়ি সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিবাদীর অপরাধ প্রমাণ করবে।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাজির দায়িত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কঠিন। বলা বাহুল্য, এই দায়িত্বের উপযুক্ত হতে হলে কতিপয় শর্ত আছে। আমরা সেগুলো একটু পরে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

৪৪৭. সুরা আশ-শুরা : ১৪
৪৪৮. সুরা আন-নিসা : ১২৮

বিচারকার্য পরিচালনা করা এমন একটি দায়িত্ব, যে কেউ চাইলেই তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া যায় না। জালিম ও জাহিলরা না বুঝেই নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। তারাই মূলত এই পদের লোভ করতে পারে। 'কেউ যেন এই পদের লোভ না করে এবং নিজের পক্ষ থেকে এই পদ গ্রহণে আগ্রহী না হয়'—মর্মে রাসুলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ

'যে কাজির দায়িত্ব পেতে চায় এবং এর জন্য মানুষের সাহায্য কামনা করে, এই দায়িত্বের ভার একাকী তার ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। আর যে নিজের পক্ষ থেকে তা কামনা করে না এবং তা পেতে মানুষের সাহায্যও কামনা করে না; আল্লাহ তাআলা তার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান, যে তাকে সংশোধন করতে থাকে।'[৪৪৯]

বুরাইদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

'কাজি তিন প্রকারের। তন্মধ্যে দুশ্রেণি জাহান্নামি ও এক শ্রেণি জান্নাতি। প্রথমত, যে ব্যক্তি হকের ব্যাপারে ভালোভাবে জানে, অতঃপর সে অনুসারে ফয়সালা করে, সে জান্নাতি। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি মূর্খতা সত্ত্বেও মানুষের মাঝে ফয়সালা করে, সে জাহান্নামি।

৪৪৯. সুনানু আবি দাউদ : ৩/৩০০, হা. নং ৩৫৭৮ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা. বৈরুত) - হাদিসটি জইফ। অবশ্য মুসতাদরাকুল হাকিমে ইমাম হাকিম رحمه الله হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তালখিসে ইমাম জাহাবি رحمه الله তা সমর্থন করেছেন। দেখুন : মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/১০৩, হা. নং ৭০২১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

তৃতীয়ত, যে হক সম্পর্কে ভালোভাবে জেনেও জুলম করে মিথ্যা ফয়সালা করে, সে জাহান্নামি।'[৪৫০]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

'যে কাজির পদে অধিষ্ঠিত হলো কিংবা তাকে কাজি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হলো, তাকে যেন ছুরি ছাড়াই জবাই করা হলো।'[৪৫১]

কাজি নিয়োগদান

কাজি নিযুক্ত করার দায়িত্ব খলিফার। খলিফা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করবেন এবং তার মধ্যে কাজি হওয়ার শর্তগুলো পরিপূর্ণ আছে কিনা, তা ভালোভাবে যাচাই করে তাকে বিচারকের পদে নিয়োগ দেবেন।

কাজি হওয়ার শর্তসমূহ

কাজি হওয়ার জন্য শর্ত ছয়টি। কারও মধ্যে এ ছয়টি শর্ত পরিপূর্ণভাবে পাওয়া গেলে তবেই সে বিচারক হতে পারবে, অন্যথায় নয়। এখানে আমরা শর্ত ছয়টি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করছি।

ক. বিচক্ষণ হওয়া

বিচারক হতে হলে অবশ্যই তাকে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হতে হবে। যাতে সে হক-বাতিল ও সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে পারে এবং জটিল ও কঠিন বিষয়গুলো বিচক্ষণতার সাথে সমাধান করতে পারে।

---

৪৫০. সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৯৯, হা. নং ৩৫৭৩ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

৪৫১. সুনানুত তিরমিজি : ৩/৭, হা. নং ১৩২৫ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

খ. মুসলিম হওয়া

কাফির কখনোই মুসলমানদের বিচারক হতে পারবে না। কারণ, বিচারককে অবশ্যই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনা করতে হবে এবং সে বিষয়ে তার পূর্ণ ইমান ও বিশ্বাস থাকতে হবে। তাহলে কাফির কীভাবে মুসলমানদের বিষয়ে ফয়সালা করবে; অথচ শরিয়তের প্রতি তার ইমান নেই এবং শরিয়ত সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই! এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, কাফির কোনোভাবেই মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾

'আর কিছুতেই আল্লাহ কাফিরদেরকে মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব দান করবেন না।'[৪৫২]

গ. স্বাধীন হওয়া

কাজি হওয়ার জন্য স্বাধীন হওয়া শর্ত। কেননা, গোলাম তো নিজেই তার মনিবের কাজে ব্যস্ত থাকবে, তাহলে সে লোকদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবে কখন? তা ছাড়া সমাজে সাধারণত গোলামদের কোনো প্রভাব ও মর্যাদা থাকে না। অথচ বিচারকার্যের জন্য প্রভাব ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো গোলাম কাজি বা বিচারক হতে পারে না।

ঘ. আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা থাকা

ন্যায়পরায়ণতা থাকার অর্থ হলো সত্যবাদী হওয়া, আমানতদার হওয়া, হারাম, নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা, সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে দূরে থাকা, আবেগ-ভালোবাসা এবং রাগ ও ক্রোধের সময় কারও দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বাভাবিক থাকা। বিচারকার্যের জন্য এ গুণগুলোর প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট।

---

৪৫২. সুরা আন-নিসা : ১৪১

ঙ. শারীরিক ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা

যেমন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও কথা বলার শক্তি ঠিক থাকা। কারও মধ্যে এগুলোর কোনো একটি না থাকলে সে কাজি হতে পারবে না। অর্থাৎ বোবা, কানা ও বধির লোক বিচারক হতে পারবে না। কারণ, বিচারের কাজটি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। বিচারককে সবকিছু বুঝেশুনে ফয়সালা করতে হবে। কিন্তু যদি বিচারক বোবা-কানা-বধির হয়, তাহলে সে বাদী-বিবাদী, সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তির মধ্যে ভালোভাবে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে সে সত্য-মিথ্যা গুলিয়ে ফেলবে এবং সঠিক ফয়সালা করতে হিমশিম খাবে।

চ. শরিয়তের হুকুম-আহকামের জ্ঞান থাকা

শরিয়তের হুকুম-আহকাম, উসুল-ফুরু জানা থাকতে হবে এবং তদনুযায়ী আমলকারী হতে হবে। এই বিষয়টিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনে কারিমের ইলম থাকতে হবে। অর্থাৎ হুকুম-আহকামের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো জানা থাকতে হবে। জানা থাকতে হবে নাসিখ, মানসুখ, আম, খাস, মুহকাম, মুতাশাবিহ, মুজমাল ও মুফাসসার সম্পর্কে।

২. হাদিসের ইলম থাকতে হবে। মুতাওয়াতির, খবরে ওয়াহিদ, সহিহ, জইফ তথা রিওয়ায়াতুল হাসিদ ও উলুমুল হাদিসের ভালো ধারণা থাকতে হবে।

৩. সালাফের তাবিল ও মতামত সম্পর্কে ইলম থাকতে হবে। কোন মাসআলার ক্ষেত্রে তাদের ইজমা আছে আর কোন মাসআলার ক্ষেত্রে তাদের মতানৈক্য হয়েছে, তা জানা থাকতে হবে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের ইজমা, সে বিষয়ে তাদের অনুসরণ করবে; আর যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য রয়েছে, সে বিষয়ে ইজতিহাদ করবে।

৪. কিয়াসের ইলম থাকতে হবে। শরিয়তে অস্পষ্ট ও অবর্ণিত কোনো ফুরুয়ি মাসআলাকে শরিয়তে বর্ণিত কোনো স্পষ্ট মাসআলার সাথে একই ইল্লতের ভিত্তিতে মিলিয়ে তার সঠিক সমাধান বের করার জ্ঞান থাকতে হবে।

সুতরাং কারও মধ্যে যখন এই চার বিষয়ের ইলম থাকবে, তখন তাকে মুজতাহিদ হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। যারা ফতোয়া দিতে পারবে এবং মানুষের মাঝে ফয়সালা করতে পারবে।

এ সকল উসুলের মধ্যে থেকে যদি কোনো একটিতে ঘাটতি থাকে, তাহলে সে মুজতাহিদদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে কাজির দায়িত্বও গ্রহণ করতে পারবে না। এ সকল উসুলের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকার পরও যদি কেউ বিচারকের পদ গ্রহণ করে এবং মানুষের মাঝে ফয়সালা করে, তাহলে তার ফয়সালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

একজন কাজির জন্য এ ছয়টি শর্ত থাকা আবশ্যক। এ শর্তগুলোর কোনোটি না পাওয়া গেলে সে শরয়ি কাজি বলে বিবেচিত হবে না। এখানে আরেকটি শর্ত আছে, যা মতানৈক্যপূর্ণ। শর্তটি হলো পুরুষ হওয়া। অধিকাংশ ফকিহদের মতে পুরুষ হওয়া শর্ত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ﷺ-এর মতে যেসব ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, সে সকল ক্ষেত্রে তাদের কাজি হওয়া জায়িজ আছে। মোটকথা, পূর্ণ কাজি হওয়ার জন্য অবশ্যই কাজিকে পুরুষ হতে হবে। আংশিক কিছু ক্ষেত্রে নারীদের কাজি হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা ﷺ মত পেশ করলেও অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের নিকট এটাও জায়িজ নেই।[৪৫৩]

৪৫৩. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা : পৃ. নং ১১০-১১৩ (দারুল হাদিস, কায়রো)

ইসলামি সমরব্যবস্থা

ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য সমরব্যবস্থা শক্তিশালী থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ইসলামি শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে একটি মৌলভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়। কেননা, প্রশিক্ষিত ইসলামি সেনাবাহিনী ব্যতীত ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা অসম্ভব। এ সেনাবাহিনী ইসলামি ভূখণ্ড রক্ষা করবে, ইসলামের পক্ষে লড়াই করবে, মুসলিমদের সম্মান রক্ষা করবে এবং শত্রু ও জালিমদের প্রতিহত করবে।

নিঃসন্দেহে মুসলিমরা তাদের সেনাবাহিনী ব্যতীত শত্রুদের কাছে হাতের মোয়ার মতো। শত্রুরা যেকোনো সময় যেকোনোভাবেই, চাই তা যত নিকৃষ্ট পন্থায় হোক না কেন; তারা নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাবে মুসলিমদের ধন-সম্পদ দিয়ে, মুসলিম নারীদের ওপর যৌন নির্যাতন করে, পুরুষদের ওপর অত্যাচার করে এবং তাদের গোলামিতে আবদ্ধ করে। এ কুকর্মে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে সকল কাফির, উপনিবেশবাদী, মুসলিম নামধারী মুনাফিক শ্রেণি সবাই সমান। মুসলিমদের সৈন্যভিত্তিক সামরিক ও প্রতিরোধশক্তি না থাকলে তাদের কোনো মানবিক অধিকারও থাকে না, যা আমরা বাস্তবতায় দেখেছি এবং দেখছি।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ﴾

'তারা তোমাদের ওপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোনো মর্যাদা দেবে না।'[৪৫৪]

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, মুসলিমদের যদি প্রশিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও আদর্শিক কোনো সেনাবাহিনী না থাকে, তবে মুসলিমদের দ্বীন-আকিদা, সম্মান-সম্পদ, নারীদের ইজ্জত-আব্রু সবই ভূলুণ্ঠিত হবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ইসলাম প্রথমেই যুদ্ধের দিকে আগায় না। ইসলাম প্রথমে মানুষকে দলিল-প্রমাণাদি দ্বারা ইসলামের পথে দাওয়াত প্রদান করে।

৪৫৪. সুরা আত-তাওবা : ৮

মানুষকে সন্তুষ্টরূপে ইসলামে প্রবেশের জন্য আহ্বান করে। কোনো ধরনের জোর-জবরদস্তির পথে যায় না। কুরআনে এ পদ্ধতিতেই দাওয়াত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

'আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাতা, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদের, যারা সঠিক পথে আছে।'[৪৫৫]

জোর-জবরদস্তিমূলক পন্থার প্রতি নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

'তুমি কি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে ইমান আনার জন্য?'[৪৫৬]

ইসলামি দাওয়াতের প্রাথমিক রীতি এটিই। কিন্তু এ প্রাথমিক রীতি অনুসারে খানিকটা আগানোর পর এ পথে অনেক বাধা-বিপত্তি এসে দাঁড়ায়। অনেকে ইসলামের বাণীকে অস্বীকার করে আর অনেকে তো দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে পূর্ব নীতিতে সামনে আগানোর আর কোনো পথ থাকে না। তাই এমন অহংকারী, অন্যায়কারী, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর অনিষ্টকর, অন্যায় ও অশ্লীল কর্মকে রুখে দিতে, দাওয়াতের পথের প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে দিতে, মাজলুমদের রক্ষা করতে, দুর্বিনীতদের বিনয়াবনত করতে ইসলাম কিতালের বিধান দান করেছে এবং জিহাদকে ফরজ করেছে।

৪৫৫. সুরা আন-নাহল : ১২৫
৪৫৬. সুরা ইউনুস : ৯৯

ইসলাম সকল মুসলিমের ওপর অস্ত্রধারণ ও অস্ত্র ব্যবহার করা ফরজ করেছে। এ অস্ত্র ফাসাদকারী কাফিরদের ওপর প্রয়োগ করা হবে, যারা দুনিয়াতে শান্তি বিনষ্টকারী, যারা আল্লাহর দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী। ইসলাম এমন কঠিন পরিস্থিতিতে কিতালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং বিশুদ্ধ আকিদা, কল্যাণ ও উত্তমতার পথে চলার জন্য কিতালের বিধান প্রদান করে। পার্থিব কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলাম কিতালের অনুমতি দেয়নি; বরং কিতালের বিধান দেওয়া হয়েছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়িম করার জন্য, আল্লাহর শত্রুদের ভয় দেখানোর জন্য এবং জমিন থেকে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য কিতালের প্রস্তুতি নেওয়া আল্লাহ আমাদের ওপর ফরজ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾

'তোমরা কাফিরদের মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যদ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, এ ছাড়া অন্যদেরকেও যাদের তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।'[৪৫৭]

শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ-তে ঝাঁপিয়ে পড়ার সর্বোচ্চ আহ্বান হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন :

৪৫৭. সুরা আল-আনফাল : ৬০

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

'আল্লাহ মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে প্রদত্ত এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে তিনি অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে কে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী? সুতরাং তোমরা তাঁর সাথে কৃত লেনদেনের ওপর আনন্দিত হও। আর এটিই মহাসাফল্য।'[৪৫৮]

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ সবার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব কোনো একটি জামাআতের একার নয়। এ কর্তব্য সকলকে সমবেত করে। সকলের ওপর ফরজ এ দায়িত্ব থেকে পালানোর কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

'তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারো।'[৪৫৯]

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾

৪৫৮. সুরা আত-তাওবা : ১১১
৪৫৯. সুরা আত-তাওবা : ৪১

'আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে রয়েছেন।'[৪৬০]

ইসলামের শত্রুদের প্রতিহতকরণ ও বিশৃঙ্খলাকারীদের দমনের ব্যাপারে অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন :

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

'আল্লাহর রাস্তায় তথা জিহাদের ময়দানে এক সকাল ও এক বিকাল কাটানো দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ থেকে উত্তম।'[৪৬১]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ

'আল্লাহর পথে আহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, যার রং তো হবে রক্তের, কিন্তু ঘ্রাণ হবে মিশকের।'[৪৬২]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟ قَالَ : لَا أَجِدُهُ قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟ قَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟

৪৬০. সুরা আত-তাওবা : ৩৬

৪৬১. সহিহুল বুখারি : ৪/১৬, হা. নং ২৭৯২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৪৬২. সহিহুল বুখারি : ৭/৯৬, হা. নং ৫৫৩৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমান আমলের কথা বলে দেন। তিনি বললেন, আমি এরকম কোনো আমল পাইনি। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কি পারবে, যখন মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় বের হবে, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করে মুজাহিদের ফিরে আসা পর্যন্ত একটানা একাধারে বিরতিহীনভাবে নামাজ পড়তে থাকবে এবং রোজা পালন করতে থাকবে? লোকটি বলল, এমনটি কার সাধ্যে কুলায়?'[৪৬৩]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'নিশ্চয় জান্নাতে একশটি মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এসব মর্যাদা মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। একটি মর্যাদা থেকে আরেকটি মর্যাদার পার্থক্য হচ্ছে আকাশ-জমিন সমান।'[৪৬৪]

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ

'দুটি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী চোখ এবং আল্লাহর রাস্তায় রাতের পাহারায় জাগ্রত থাকা চোখ।'[৪৬৫]

৪৬৩. সহিহুল বুখারি : ৪/১৫, হা. নং ২৭৮৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৪৬৪. সহিহুল বুখারি : ৪/১৬, হা. নং ২৭৯০ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৪৬৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩/২২৭, হা. নং ১৬৩৯(দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

إِنَّ رَسُولَ اللهِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ، انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

'শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কার দিনগুলোর কোনো একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা করছিলেন। তখন সূর্য ঢলে পড়েছে। তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে তখন বললেন, হে মানুষ সকল, তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করো না। তোমরা আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করো। অতঃপর যখন তোমরা শত্রুর সাথে মিলিত হবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখো, জান্নাত তলোয়ারের ছায়াতলে।'[৪৬৬]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

'যে ব্যক্তি জিহাদ করা কিংবা অন্তরে জিহাদের প্রতি আগ্রহ রাখা ব্যতীত মারা গেল, সে একপ্রকার মুনাফিক হয়ে মারা গেল।'[৪৬৭]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

'তোমাদের সম্পদ, জীবন ও মুখের মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো।'[৪৬৮]

এ ছাড়াও জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করে, জিহাদের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম বর্ণনা করে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল আয়াত ও

৪৬৬. সহিহুল বুখারি : ৪/৬৩, হা. নং. : ৩০২৪ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৪৬৭. সহিহ মুসলিম : ৩/১৫১৭, হা. নং ১৯১০ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৪৬৮. সুনানু আবি দাউদ : ৩/১০, হা. নং ২৫০৪ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

হাদিস বাতিলের বিরুদ্ধে, কাফির-মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কিতাল করা আবশ্যক প্রমাণ করে। শরিয়তের এ সকল বিধান জালিম ও কাফিরের শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দেয় এবং মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিক ও ঘরে বসে থাকা লোকদের আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়।

ফরজে কিফায়া ও ফরজে আইন জিহাদ

ফরজে কিফায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদের যদি একটি দল এ ফরজ আদায় করে তাহলে বাকি সকলে এ ফরজ পরিত্যাগের গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি বা ফরজে কিফায়া আদায় হয়—এমন সংখ্যক লোক সে ফরজ আদায় না করে, তবে সকলেই গুনাহগার হবে। আর ফরজে আইন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ফরজ ব্যক্তিগতভাবে সকলের ওপর ফরজ। কেউই এ ফরজের আওতার বাইরে নয়। সকলকেই এ ফরজ আদায় করতে হবে।[৪৬৯]

জিহাদের সাধারণ হুকুম হলো, এটি ফরজে কিফায়া। মুসলিমদের পক্ষ থেকে মুজাহিদ জামাআত জিহাদ করলে সকলেই ফরজে কিফায়া পরিত্যাগের গুনাহ থেকে মুক্ত হবে।[৪৭০] মুসলিমদের সকলেই একই সময়ে জিহাদে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ অবস্থায় যদি সকলের ওপরই এটি ফরজ হতো, তবে এটি অনেক কষ্টকর হতো, যার সামর্থ্য মানুষের ছিল না। তাই সাধারণ অবস্থায় সকলেই নিজ নিজ কাজে থাকবে। ছাত্ররা শিক্ষার্জন করবে, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে, শ্রমিকরা কাজ করবে। মোটকথা, প্রত্যেকেই আপন আপন কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং একদল মুসলিম মুজাহিদ ময়দানের জিহাদে মশগুল থাকবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

৪৬৯. উসুলুল ফিকহ : পৃ. নং ২৯ মুহাম্মাদ সালাম কর্তৃক রচিত
৪৭০. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ২/১৪৩ (দারুল হাদিস, কায়রো)

'আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং যাতে তারা নিজ কওমকে (নাফরমানি হতে) ভয় প্রদর্শন করে, যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা বাঁচতে পারে।'[৪৭১]

এ আয়াতের মধ্যে মুসলিমদের তাদের কাজের ক্ষেত্র ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের কর্তব্যের ক্ষেত্রে তাদের পৃথক পৃথক শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। তাদের মাঝে তালিবে ইলম থাকবেন, যারা ইলম তালাশ করবেন; মুজাহিদ থাকবেন, যারা শত্রুদের প্রতিহত করবেন; জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিবর্গ থাকবেন। কিন্তু যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে, তখন মুসলিমদের মাঝে কোনো শ্রেণিভেদ থাকবে না। বিভিন্ন শ্রেণি বিভিন্ন কাজ করবে তা হবে না; বরং সকলেই একই সাথে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন অবস্থা হবে একদম পৃথক। মুসলিমরা তখন নানা ধরনের বিপদাপদ ও সংকটের মাঝে থাকবে। যেমন শত্রুরা যদি মুসলিম ভূখণ্ড আক্রমণ করে, তাদের ভূমি দখল করে ফেলে, শত্রুদের দাপট বেড়ে যায়, তারা যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ঝলকানি দেখায়, মুসলিমদের কষ্ট দেয়, তাদের হত্যা করে, তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে; তখন মুসলিমদের জাগরিত হওয়া ব্যতীত কোনো উপায় থাকবে না, তাদের সকলকে অবশ্য অবশ্যই মুজাহিদদের সারিতে গিয়ে যোগ দিতে হবে। মুসলিম চাই সে পুরুষ হোক বা নারী, যুবক হোক বা বৃদ্ধ, দুর্বল হোক বা সবল, ধনী হোক বা দরিদ্র—সকলকেই অস্ত্রধারণ করতে হবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

ইমাম জাসসাস ﷺ বলেন :

'মুসলমানদের প্রসিদ্ধ আকিদা হলো, যখন সীমান্তবর্তী মুসলমানরা শত্রুর আশঙ্কা করবে, কিন্তু তাদের মাঝে শত্রুকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকবে না, তারা নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ ও জানের ব্যাপারে শঙ্কাগ্রস্ত হবে, এমতাবস্থায় পুরো উম্মাহর ওপর ফরজ হয়ে যায়

৪৭১. সুরা আত-তাওবা : ১২২

যে, যে ব্যক্তিই শত্রুদের ক্ষতি থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে সক্ষম, সে জিহাদে বের হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারে উম্মাহর মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। কেননা, তাদের সাহায্য না করে বসে থাকা বৈধ—এটা কোনো মুসলমানের কথা হতে পারে না, যখন নাকি শত্রুরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করছে ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করছে।'[৪৭২]

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি ﷺ বলেন :

'যদি শত্রুরা মুসলমানদের কোনো সীমানায় আক্রমণ চালায়, তাহলে যুদ্ধে সক্ষম নিকটবর্তী মুসলমানদের ওপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে, তাদের ওপর জিহাদ ফরজে কিফায়া। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে, তারা যদি শত্রুকে প্রতিরোধ করতে অপারগ হয়, অথবা অপারগ না হলেও অলসতাবশত জিহাদ ত্যাগ করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের ওপর নামাজ, রোজার ন্যায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, যা ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়। এভাবে ক্রমানুসারে পূর্ব-পশ্চিমের সকল মুসলমানের ওপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।'[৪৭৩]

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমরা এক ভয়ংকর জীবনযাপন করছে। বিশ্বের সকল মুসলিম আজ লাঞ্ছনা-অপমান, নির্যাতন, অত্যাচার, হত্যা ও লুণ্ঠনের শিকার। মুসলিমরা বীরের জাতি, যারা মাথা নত করা কাকে বলে জানত না! আজ তারাই সর্বদা মাথা নিচু করে রাখতে বাধ্য হচ্ছে। মুসলিমদের এ ন্যাক্কারজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার জন্য সকল মুসলিমকে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সন্দেহ নেই যে, আজ আমাদের ওপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেছে; তবুও আমরা বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে এটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এতে কেউ তো কবিরা গুনাহে লিপ্ত আর কেউ এর বিরোধিতা করে কুফরের সীমায় প্রবেশ করছে। তাই আজ আমাদের সকলকে আল্লাহর পথের সৈনিক হয়ে যেতে হবে। শত্রুদের বিরুদ্ধে সকলকে এক সারিতে দাঁড়িয়ে সীসাঢালা প্রাচীর হয়ে পৃথিবীর সকল তাগুতি শক্তিকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

৪৭২. আহকামুল কুরআন, জাসসাস : ৩/১৪৬-১৪৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)
৪৭৩. রদ্দুল মুহতার : ৪/১২৪ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾

'আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।'[৪৭৪]

মুসলিমদের বর্তমান সময়ের এ চরম মুহূর্তে বসে না থেকে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রু প্রতিরোধে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে। আজকের এমন পরিস্থিতিতে সকল মুসলিমের ওপর তাদের সর্বশক্তি নিয়ে জিহাদে বেরিয়ে পড়া আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

'তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারো।'[৪৭৫]

আল্লাহ আরও বলেন :

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾

'আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে থেকে।'[৪৭৬]

সর্বোপরি জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেলে এ ফরজ আদায় করা না করার দিক থেকে চারটি অবস্থা সৃষ্টি হয়। যথা :

---

৪৭৪. সুরা আস-সফ : ৪

৪৭৫. সুরা আত-তাওবা : ৪১

৪৭৬. সুরা আল-আনফাল : ৬০

১. **আজিমত :** জিহাদ ফরজে আইন জানার পর সরাসরি তা আদায়ে সচেষ্ট ব্যক্তি আজিমতের ওপর রয়েছে।

২. **রুখসত :** জিহাদ ফরজে আইন জানার পর আদায়ের জন্য আকুল ব্যক্তি প্রস্তুতি এ পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে তা হবে রুখসত।

৩. **কবিরা গুনাহ :** জিহাদ ফরজে আইন জানার পরও আদায়ে অগ্রসর না হয়ে বসে থাকা কবিরা গুনাহ।

৪. **কুফর :** জিহাদ না করে উল্টো জিহাদের বিরোধিতা করা, জিহাদকে সন্ত্রাস বাদ আখ্যা দেওয়া কুফর।

যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার গুরুত্ব

যুদ্ধের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করা মুসলিমদের ওপর ফরজ। ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সর্বদিক থেকে পরিকল্পনা করার জন্য সর্বোচ্চ সাধনা করা মুসলিমদের ওপর ফরজ। এ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা তৈরি করার স্বার্থে উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ, পার্থিব সরঞ্জামাদি একত্রিকরণ, দক্ষতা অর্জন, সাংগঠনিক কাঠামো গঠন, মানসিক প্রস্তুতি অর্জনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ আবশ্যক।

আমাদের এমন প্রস্তুতি ফরজ করে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾

'আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে থেকে।'[৪৭৭]

সাবধানতা ও সচেতনতা গ্রহণকে ফরজ করে, এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴾

---

৪৭৭. সুরা আল-আনফাল : ৬০

'হে ইমানদারগণ, তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়ো।'[৪৭৮]

যে সকল মুসলিম ইসলামি তালিমের অধীনে ইসলামি নিজামের অধীনে, সুবিন্যস্ত হুকুম-আহকামের পাবন্দির সাথে বেড়ে উঠেছে, তারাই হচ্ছে কিতালের জন্য যোগ্য মুসলিম। এমন মুসলিমরা সংগঠন পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সঠিক দিকনির্দেশনা, সঠিক পরিকল্পনার জন্য অধিক যোগ্য। সকল ক্ষেত্রে মুসলিমরা সঠিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এটাই কাম্য। আর যুদ্ধের বিষয়ে তা তো বলাই বাহুল্য।

যুদ্ধের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। কেননা, যুদ্ধ শুধু জজবা ও আবেগের দ্বারা হয় না; বরং এর জন্য লাগে নিখুঁত পরিকল্পনা, দক্ষ পরিচালনা ও পূর্ণ প্রস্তুতি। অতএব, আমাদের এ বিষয়টি জেনে নেওয়া উচিত যে, যুদ্ধক্ষেত্রে কীভাবে সফলতা আসবে এবং এর জন্য পর্যায়ক্রমে কোন কোন ধাপ পূরণ করতে হবে।

প্রথমত, শক্তি অর্জন

শক্তি অর্জন করার একটি অংশ হচ্ছে, আধুনিক সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করা। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করা। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা। মুসলিমদের জন্য আধুনিক সরঞ্জামাদি ও আধুনিক প্রযুক্তির কৌশল রপ্ত করা ফরজ। সে ক্ষেত্রে আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য বর্তমানে আবিষ্কৃত সরঞ্জামাদি যেমন : ট্যাংক, জঙ্গি বিমান, রণতরী, মর্টারসহ অন্যান্য অস্ত্রের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা অপরিহার্য। এমন সকল যন্ত্র, বাহন, অস্ত্র ইত্যাদি তৈরি করা, চালনা করা বর্তমানে মুসলিমদের ওপর ফরজ হয়ে গেছে। এ ফরজটি ফরজে কিফায়া। মুসলিমদের মধ্যকার যেকোনো একটি দল এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলে অন্যদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মুসলিমরা সবাই এ ফরজ কাজ ছেড়ে দেয়, তবে সকলেই গুনাহগার হবে।

৪৭৮. সুরা আন-নিসা : ৭১

দ্বিতীয়ত, উত্তম প্রশিক্ষণ ও দক্ষ সৈনিক সংগ্রহ

সৈনিকগণ শারীরিকভাবে শক্তিশালী হবে। যুদ্ধকৌশলে হবে অনন্য। বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র চালনায় হবে পারদর্শী। তাদের চিন্তা হবে পরিশুদ্ধ, পরিকল্পনা হবে শানিত। ইসলামি বিশুদ্ধ আকিদা হবে তাদের হৃদয়ের চাবিকাঠি। তাদের জ্ঞান হবে উন্নত। তারা হবে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। এমন সৈনিকরাই হবে ইসলামি বাহিনীর যোগ্য সৈনিক।

অন্যদিকে সৈনিক যদি হয় জাহিল, অমনোযোগী ও অগোছালো, অস্ত্র চালনায় দুর্বল, চিন্তায় অদূরদর্শী, চরিত্র হয় কলুষিত, তাদের মধ্যকার হৃদ্যতা হয় দুর্বল এবং সৈনিক যদি হয় হীনচেতা; তবে এমন সৈনিকই পরাজয়ের জন্য যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে একদল সেনাবাহিনীর পরাজয় ডেকে আনার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয়ত, একনিষ্ঠ উত্তম সেনানায়ক নির্বাচন

একনিষ্ঠ, দায়িত্ব পালনে সক্ষম সেনানায়ক, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষ হবে, যারা যুদ্ধ পরিচালনায় চতুর হবে, যারা বীরত্ব, বিচক্ষণতা, ও শ্রেষ্ঠ পর্যবেক্ষণের গুণে গুণান্বিত হবে—এমন সেনানায়কই হবে মুসলিম সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্য যথাযোগ্য।

অন্যদিকে যে সেনানায়ক ইসলামের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে মসনদের লোকদের চাটুকার হয়, মদের আসরে, জুয়ার আড্ডায় যার দিন-রাত কেটে যায় এবং অধিকাংশ সময় যে অশ্লীলতার মাঝে ডুবে থাকে—এমন সেনানায়ক যোগ্য তো নয়ই; বরং মুসলিম জাতির নির্মম পরিণতির জন্য কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

চতুর্থত, মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

মুসলিমদের মিডিয়ার শক্তিকে নিজ আয়ত্তাধীন করতে হবে। যেমন : পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, ম্যাগাজিনসহ ইত্যাদি প্রচারমাধ্যমকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। যাতে মুসলিমদের সাহস বৃদ্ধি ও তাদের প্রতিজ্ঞাকে শক্তিশালী করা যায় এবং উম্মাহর মধ্যে গতি সঞ্চার করে যুদ্ধের জন্য তাদের প্রস্তুত করা যায়।

ফলে উম্মাহ হবে ইমানি বলে বলীয়ান। উম্মাহ হবে ইসলামি আকিদার শক্তিতে শক্তিমান। উম্মাহ সত্যিকার অর্থে হবে গৌরবদীপ্ত। উম্মাহ হবে একদেহ, একপ্রাণ। যাদের একটি অঙ্গ ব্যথা পেলে সারা দেহ সে ব্যথা অনুভব করবে সমানভাবে। হাদিসে এটি মুসলিমদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

নুমান বিন বাশির রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ، اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

'সকল মুসলিম একটি দেহের ন্যায়। যদি চোখে ব্যথা হয়, তবে পুরো শরীর ব্যথা অনুভব করে। যদি মাথা ব্যথা হয়, তবে পুরো শরীর সে ব্যথা অনুভব করে।'[৪৭৯]

পঞ্চমত, অর্থনীতিতে উন্নয়ন

শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। উন্নত অর্থনীতি তার একটি। যুদ্ধের ক্ষেত্রে অর্থনীতি একটি মৌলিক উপাদান হিসাবে কাজ করে। যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিমগণ স্বাবলম্বী না হয়ে থাকে, তবে তা সুখকর হবে না। কেননা, সম্পদ না থাকলে মুসলিমদের দারিদ্র্য গ্রাস করার কারণে উপনিবেশবাদীরা সে এলাকা দখল করে ফেলবে। যার কারণে আবার সে আগের মতোই জুলম-নির্যাতনের রাজত্ব কায়িম হবে।

যুদ্ধের মতো এত বিরাট একটি ক্ষেত্রে অধিক অর্থনৈতিক শক্তির প্রয়োজন। তাই মুসলিম বাহিনীর সম্পদ অর্জন করা, অন্যান্য মুসলিম কর্তৃক তাদের সম্পদ জোগান দেওয়া, সম্পদ অপচয় না করার মতো নীতিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সম্পদ খরচে বিলাসী হওয়া, বিনোদনের জন্য সম্পদ খরচ করা মোটেও সমীচীন নয়।

৪৭৯. সহিহ মুসলিম : ৪/২০০০, হা. নং ২৫৮৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

এগুলো ছাড়াও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা মুজাহিদদের মধ্যে থাকা একান্ত জরুরী। যেমন : ইমান, আকিদা, দ্বীনের জ্ঞান, সত্য প্রতিজ্ঞা, সৎ সাহসের মতো অতীব প্রয়োজনীয় গুণসমূহ বিদ্যমান থাকা। এ সকল গুণের ওপর মুসলিমদের গড়ে তোলার মাধ্যমে এমন একটি জাতি তৈরি হবে, যারা হবে সৎ ও একনিষ্ঠ, যারা অন্য কোনো বস্তু বা জীবের ওপর ভরসা না করে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করবে, যারা অন্য কাউকে ভয় না করে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবে। তারা হবে ধৈর্যশীল, তারা হবে তাকওয়াবান, তারা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে। তারা অবিচল, অটল হয়ে আল্লাহর পথে চলবে, দ্বীনের মানহাজ অনুসরণ করবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

'আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।'[৪৮০]

আরও ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾

'হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগল দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।'[৪৮১]

জিহাদ ও মুজাহিদ বাহিনী ব্যতীত মুসলিমরা প্রায় কোনো আমলই পরিপূর্ণভাবে করতে সক্ষম হবে না; বরং তারা দিনে দিনে আরও জুলম, অত্যাচার, অবিচার, অনাচার, ধ্বংস ও কাঠিন্যতার মাঝে তলিয়ে যাবে। একদিন মুসলমানদের সোনালি দিন ছিল। আজ তা অতীত ইতিহাস। যে সোনালি দিনের কথা আজ আমরা বইতে পড়ি। একদিন তার অস্তিত্ব ছিল।

৪৮০. সুরা আল-হজ : ৪০
৪৮১. সুরা মুহাম্মাদ : ৭

কিন্তু এখন আর তা নেই। এভাবে দিনে দিনে মুসলিমদের অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকবে, যদি না আমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরি। যদি আমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে না ধরি, তবে কাফির, মুশরিক, ক্রুসেডার, ইহুদি, উপনিবেশবাদী, মূর্তিপূজারি, সকলেই একে একে আমাদেরকে তাদের গ্রাসে পরিণত করতে থাকবে।

ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামি রাষ্ট্রের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রকে কিছু দায়িত্ব বহন করতে হয়, যার ওপর নির্ভর করে জনগণের শান্তি-নিরাপত্তা এবং উভয় জাহানের কল্যাণ ও সফলতা। ইসলামি রাষ্ট্র যদি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হয় এবং তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে, তাহলে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ হবে। তাদের মধ্যে দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য; এভাবে সত্যপথ থেকে বিচ্যুতির ফলে তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। তাদের শক্তি ও প্রভাব শেষ হয়ে যাবে। যে সকল দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রকে পালন করতে হবে, তন্মধ্যে হতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

এক. প্রয়োজনমতো সামরিক শক্তি ব্যবহার করা

ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী থাকা আবশ্যক, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে আসা যেকোনো আক্রমণ বা বিদ্রোহ রুখে দিতে পারে। যুদ্ধ-বিগ্রহ যেহেতু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ, তাই এ দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রই যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে। ব্যক্তিগতভাবে করতে গেলে অনেক সমস্যা ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হতে হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কখনও পৃথিবীর কোথাও ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকে, তখন বড় কোনো নির্ভরযোগ্য জামাআত এটা পরিচালনা করবে এবং ইসলামি রাষ্টব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রাম করে যাবে।

সাধারণত সামরিক শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন দুই ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এক : অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করতে। দুই : বহিরাগত আক্রমণ

প্রতিহত করতে। ইসলামি রাষ্ট্র উভয় দিকেই পূর্ণ নজরদারি করবে এবং প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা নেবে। সময়মতো নফিরে আমের ঘোষণা দেবে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে কাফির ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে। কেননা, এরাই আল্লাহর জমিনে সবচেয়ে বেশি ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই এদেরকে সমূলে মূলোৎপাটন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

ক. নফিরে আমের ঘোষণা

এটি খিলাফাভিত্তিক শাসনব্যবস্থার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। ব্যক্তিবিশেষ কারও জন্য এ আদেশ করা ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যুদ্ধের যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া, সৈন্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা এবং সামরিক আক্রমণ পরিচালনার মতো কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো একমাত্র রাষ্ট্রই আঞ্জাম দিয়ে থাকে। এটি সত্য যে, জিহাদ আল্লাহর একটি ফরজ বিধান, যা থেকে পিছিয়ে থাকা মুনাফিকের আলামত। কেবল হতভাগ্যরাই জিহাদ থেকে পিছিয়ে থেকে নিজেদের সফল মনে করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

'তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জাম নিয়ে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো নিজেদের মাল ও জান দিয়ে।'[৪৮২]

﴿ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾

'যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আজাব দেবেন এবং অপর একটি জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।'[৪৮৩]

অনেক ফকিহ ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে বের হওয়া হারাম বা মাকরূহ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একই স্থানে তারা এ মাসআলাও লিপিবদ্ধ করেন যে, কয়েকটি অবস্থায় খলিফার নিকট

৪৮২. সুরা আত-তাওবা : ৪১
৪৮৩. সুরা আত-তাওবা : ৩৯

জিহাদের অনুমতি নেওয়া শর্ত নয়। যথা :

১. ইমাম যখন জিহাদে বাধা দেয়।

২. যখন জিহাদে কল্যাণ থাকা সত্ত্বেও খলিফার কাছে অনুমতি পাওয়া যায় না।

৩. যখন জানা থাকে যে, খলিফা কূটস্বার্থে জিহাদের অনুমতি দেবে না।

বাকি থেকে যায়, যদি খলিফাই না থাকে, তাহলে কী বিধান? তো এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা এতই বেশি যে, কখনো যদি খলিফা নাও থাকে, জিহাদ বন্ধ করা যাবে না। অর্থাৎ জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে, যদিও কখনো ফলিফা না পাওয়া যায়। তাই যারা বলে, খলিফা না থাকলে জিহাদ করা যাবে না, তাদের কথা ভিত্তিহীন ও ভুল।

ইমাম ইবনে কুদামা ﷫ বলেন :

فَإِنْ عُدِمَ الْإِمَامُ، لَمْ يُؤَخَّرْ الْجِهَادُ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهِ

'যদি কখনো খলিফা না থাকে, তবে জিহাদ বন্ধ রাখা যাবে না। কেননা, এতে জিহাদের কল্যাণ ও লক্ষ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে।'[৪৮৪]

খ. কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ

মুসলমানদের ওপর থেকে ফিতনা-ফাসাদ, বিপদ-মুসিবত দূর করার একটি মৌলিক ও কার্যকর পদ্ধতি হলো জিহাদ। পাশাপাশি এটি মুসলমানদের ওপর থেকে লাঞ্ছনা ও জিল্লতি দূর করার একমাত্র কার্যকর পথ।

আমরা পূর্বেও এই বিষয়টি বলেছি এবং এখানেও বলছি যে, অনেক মানুষ এমন আছে, যাদের উত্তম নসিহত ও স্পষ্ট দলিলসমৃদ্ধ বয়ান কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। হক ও সত্য গ্রহণে তারা তেমন উদ্বুদ্ধও হয় না। তাদের মধ্যে এমন হঠকারিতা ও দাম্ভিকতা কাজ করে, যা তাদের দ্বীনের পথে আসতে বাধা দেয়।

৪৮৪. আল-মুগনি : ৯/২০২ (মাকতাবাতুল কাহিরা, মিশর)

এমন শত্রুদের মোকাবেলা করা ও তাদের প্রভাব দূর করার জন্য জিহাদ এবং জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾

'আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে। যদ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে এবং অন্যদেরকেও, যাদের তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করো, তার প্রতিদান তোমাদের পুরোপুরি প্রদান করা হবে। (প্রতিদান কম দিয়ে) তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।'[৪৮৫]

ইসলামের শত্রুরা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের বিতাড়িত করতে হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে কারিমে বলেন :

﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾

'আর তাদের হত্যা করো যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদের বের করে দাও সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করেছে। বস্তুত ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মাসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদের হত্যা করো। কাফিরদের শাস্তি এমনই।'[৪৮৬]

৪৮৫. সুরা আল-আনফাল : ৬০

৪৮৬. সুরা আল-বাকারা : ১৯১

কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, কারণ তারা ইসলাম ও মানবতার বিরুদ্ধে সর্বদা বিদ্বেষ পোষণ করে এবং ইসলাম ও মানবতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। জমিনে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তো তাদের জুড়ি মেলা ভার। কাফিররা জমিনে ন্যায়ানুগ শরিয়ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কাফির নেতারা সাধারণ মানুষদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দেয়।

আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে বলেন :

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾

'আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে কারও প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই। কিন্তু যারা জালিম, তাদের ব্যাপারটি ভিন্ন।'[৪৮৭]

বুরাইদা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا

'তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো। যারা আল্লাহর সাথে কুফরি করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো। তোমরা যুদ্ধ করে যাও, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করো না, গনিমতের মাল চুরি করো না, লাশ বিকৃত করো না এবং শিশু সন্তানকে হত্যা করো না।'[৪৮৮]

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

৪৮৭. সুরা আল-বাকারা : ১৯৩

৪৮৮. সুনানু আবি দাউদ : ৩/৩৭, হা. নং ২৬১৩ (আল-মাকতাবুল আসরিয়া, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

'তোমরা আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্যে ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীনের ওপর থেকে জিহাদের পথে যাত্রা করো। তোমরা অতিবৃদ্ধ, শিশু, নাবালক ও নারীকে হত্যা করো না। গনিমতের সম্পদ চুরি করো না। তোমরা তোমাদের গনিমতের মাল একত্রে জমা করবে। নিজেদের অবস্থান সংশোধন করবে এবং সৎ কাজ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'[৪৮৯]

যুদ্ধক্ষেত্রে কাফিরদের পরাজিত করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা যাবে। কাব বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

'নবিজি ﷺ যখন কোনো যুদ্ধের ইচ্ছা করতেন, তখন বাস্তবতার বিপরীত অন্য একটি বিষয় প্রকাশ করতেন এবং বলতেন যে, যুদ্ধ হলো ধোঁকা ও কৌশল।'[৪৯০]

এ সকল দলিল থেকে কেবল জিহাদের ফরজিয়াত প্রমাণিত হয়। জিহাদ যেমন ফরজ, তেমনই পূর্ণ সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করাও ফরজ। কারণ, জিহাদ অত্যন্ত কঠিন একটি আমল। সুতরাং এর জন্য চাই পূর্ণ সতর্কতা ও দক্ষতা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

﴿ خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾

'তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো।'[৪৯১]

৪৮৯. সুনানু আবি দাউদ : ৩/৩৭-৩৮, হা. নং ২৬১৪ (আল-মাকতাবুল আসরিয়া, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

৪৯০. সুনানু আবি দাউদ : ৩/৪৩, হা. নং ২৬৩৭ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) হাদিসটি সহিহ।

৪৯১. সুরা আন-নিসা : ৭১

গ. মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

اَلرِّدَّةُ অথবা اَلْإِرْتِدَادُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে অন্য কোনো ধর্ম, দর্শন বা মতাদর্শে প্রবেশ করা।

একজন মুসলিম তার ধর্ম ইসলাম থেকে বের হয়ে ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু বা অন্য কোনো ধর্মে প্রবেশ করা যেমন রিদ্দাহ, অনুরূপ মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে কমিউনিস্ট, অজ্ঞেয়বাদীসহ বিভিন্ন নাস্তিক্যবাদে প্রবেশ করাও রিদ্দাহর শামিল। রিদ্দাহর কারণে আল্লাহর ক্রোধ আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ, সে আল্লাহর আদেশ থেকে বের হয়ে পথভ্রষ্ট অস্বীকারকারীদের পথ অবলম্বন করেছে এবং সত্য ধর্ম থেকে বাইরে চলে গেছে। এই অবাধ্য ও পাপিষ্ঠ লোকটি শাশ্বত সত্যকে হালকা ও তুচ্ছ মনে করেছে। ইসলাম ধর্ম তো এতটাই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার যে, জ্ঞানসম্পন্ন কোনো লোক এ ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারে না। কেবল পথভ্রষ্ট, নির্বোধ ও বোকারাই ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে এবং ইসলামকে হালকা মনে করতে পারে।

সুতরাং যারা ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্মে প্রবেশ করবে, তাদের সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। তাদের জন্য থাকবে জাহান্নাম ও লাঞ্ছনাকর জীবন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোজখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।'[৪৯২]

যে সকল লোক সম্মান ও ইজ্জতের পথ ছেড়ে হতভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ইসলাম তাকে হত্যা করা ওয়াজিব করেছে। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে হাকিম বা বিচারক তার জন্য এক বা একাধিক দক্ষ আলিম নিযুক্ত

৪৯২. সূরা আল-বাকারা : ২১৭

করবেন, যারা তার সাথে কথা বলবে এবং ইসলামের ব্যাপারে তার সমস্ত সন্দেহ-সংশয় দূর করার চেষ্টা করবেন। অতঃপর সে যদি আবার ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে তো ভালো। তাকে তার আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে না। আর যদি এরপরও সে তার রিদ্দাহর ওপর অটল থাকে, তাহলে বিচারক তাকে হত্যার আদেশ দেবেন এবং কোনো ধরনের সংশয় ছাড়াই তাকে হত্যা করতে হবে।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

'যে ইসলাম ধর্ম পরিবর্তন করবে, তোমরা তাকে হত্যা করো।'[৪৯৩]

রিদ্দাহ কখনো ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইসলামের অকাট্য একটি বিধানের ব্যাপারেও যদি কোনো গোত্র বা জাতি আপত্তি জানায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও পূর্ণ সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে। তাদেরকে সমূলে উৎখাত করে তবেই ক্ষান্ত হবে। যেমন আবু বকর رضي الله عنه একদল লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, যারা ইসলামের সব বিধান মানলেও শুধু জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। অনুরূপ যারা মিথ্যা নবুওয়াত দাবি করবে, তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নিতে হবে। এখানে সামান্যও নমনীয় হওয়া যাবে না। যেমনিভাবে আবু বকর رضي الله عنه নমনীয় হননি; বরং এর বিরুদ্ধে পুরো ইসলামি সেনাবাহিনী ব্যবহার করেছেন। মোটকথা, রিদ্দাহ জাতীয় কোনো ফিতনাকেই জিইয়ে রাখা যাবে না। কঠিনভাবে তাদের দমন করতে হবে এবং রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা ও শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

দুই : জাতি ও সমাজকে ইসলামের রঙে রাঙানো

এতে কোনো সন্দেহে নেই যে, জাতি ও সমাজকে ইসলামের রঙে রাঙানো ইসলামি রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রধান দায়িত্ব। ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষে এমনটি করা কঠিন কিছু নয়। কারণ, রাষ্ট্র জাতি ও সমাজকে সঠিক পথ ও মতের

৪৯৩. সহিহুল বুখারি :৪/৬১, হা. নং ৩০১৭ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

ওপর রাখার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম সহজেই অবলম্বন করতে পারে। যেমন : প্রচার মাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ সকল মাধ্যম খুব সহজে এবং অতিদ্রুতই ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে পরিবর্তন করতে ও জাতি গঠনে সাহায্য করে।

মুসলিম উম্মাহকে ইসলাম অনুযায়ী আকৃতি দেওয়া ওয়াজিব। উম্মাহকে এমনভাবে ইসলাম অনুযায়ী সাজাতে হবে, যেন তাদের চিন্তা-চেতনা ও আকিদা-বিশ্বাসের সাথে ইসলাম মিশে যায়। ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার ওপর তাদের জীবন পরিচালিত হয়। যেন মানুষ কোনো ধরনের কঠোরতা না করে আল্লাহর বিধান মেনে নেয় এবং তাঁর দেওয়া বিধান বা পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾

'আল্লাহ রঙে রঙিন হও। আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আর শুধু আমরা তাঁরই ইবাদত করি।'[৪৯৪]

ইসলামি রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব হলো, মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের ওপর উঠানোর জন্য সে তার শক্তির বিরাট একটি অংশ ব্যয় করবে। আর এর জন্য সে অনুমোদিত বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করবে। যার একটি হলো দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। কারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুশিক্ষার মাধ্যমেই একটি জাতির চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে।

আরেকটি হলো প্রচার মাধ্যম। যেমন : রেডিও, পত্র-পত্রিকা, অনলাইন মাধ্যম ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। অশ্লীল, নোংরা ও ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক এবং মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারে— এমন কোনো বিষয় যেন কোনোভাবেই কোনো প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত না হয়, সে বিষয়টি রাষ্ট্রকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে।

---

৪৯৪. সুরা আল-বাকারা : ১৩৮

তিন : দণ্ডবিধি কার্যকর করা

ইসলামি বিধানের বড় একটি অধ্যায় হলো, হদ-কিসাস বা দণ্ডবিধি। এই অধ্যায়টি বিস্তৃত ও প্রশস্ত। এতে আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয়টিই শামিল। কোনো বান্দা যখন অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করবে, তখন তাকে স্বীয় অপরাধের কারণে এই দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করতে হবে, যাতে সে পরবর্তী সময়ে ওই ধরনের অপরাধে আর জড়িয়ে না পড়ে এবং অন্য সকল মানুষ দণ্ড কার্যকরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়।

ইসলামে দণ্ডবিধি মোট তিন প্রকার :

১. কিসাস (القصاص)

২. হদ (الحد)

৩. তাজির (التعزير)

ক. কিসাস

শাব্দিক অর্থ হলো অনুরূপ করা বা সমান করা। শরিয়তের পরিভাষায়, 'হত্যা বা জখমের ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতিভিত্তিক ন্যায়বিচারকে কিসাস বলে।' যদি কেউ ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। তবে যদি নিহতের অভিভাবকরা ক্ষমা করে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিসাস প্রয়োগ করা ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ, কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাজ নয়।

সুতরাং কোনো নিরপরাধ লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে সাজাস্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। অথবা হত্যা করেনি, কিন্তু কারও আংশিক ক্ষতি করেছে, যেমন অন্যায়ভাবে কারও হাত, পা বা আঙুল কেটে ফেলেছে অথবা এ সকল অঙ্গপ্রতঙ্গ ভেঙে ফেলেছে অথবা অন্যায়ভাবে আঘাত করে কারও মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, কারও দাঁত ভেঙে দিয়েছে, তাহলে প্রহারকারীকেও অনুরূপ শাস্তি দিতে হবে। অর্থাৎ জানের বিনিময়ে জান, হাতের বিনিময়ে হাত, পায়ের বিনিময়ে পা, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করার শাস্তি প্রদান করা হবে। এটাকেই কিসাস

বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, হত্যা বা আঘাতের ক্ষেত্রে অনুরূপ শাস্তি প্রদানের বিচারের নাম কিসাস।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।'[৪৯৫]

আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

'আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম।'[৪৯৬]

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

'হে বুদ্ধিমানগণ, কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।'[৪৯৭]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ

৪৯৫. সুরা আল-বাকারা : ১৭৮
৪৯৬. সুরা আল-মায়িদা : ৪৫
৪৯৭. সুরা আল-বাকারা : ১৭৮

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। কিন্তু যদি কেউ তার ভাই কর্তৃক কোনো বিষয়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ন্যায়সংগতভাবে পাওনা (রক্ত বিনিময়) সাব্যস্ত করা এবং সদ্ভাবে তা পরিশোধ করা কর্তব্য। এটি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজকরণ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'[৪৯৮]

একটি বিশেষ মাসআলা

পেটে থাকা শিশুকে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাহলে এটাকেও অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং এই অপরাধের কারণে হত্যাকারীর ওপর গুররা (الغرة) ওয়াজিব হবে। গুররা বলা হয় দিয়তের বিশ ভাগের এক ভাগকে।

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَتِ امْرَأَتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا، قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا : إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ : إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكِهَانَتِهَا إِنَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً

৪৯৮. সুরা আল-বাকারা : ১৭৮

'দুই প্রতিবেশী মহিলার মধ্যে কথা কাটাকাটি ও চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হলো। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে এক মহিলা অপর মহিলাকে একটি পাথর মারল। এতে আঘাতপ্রাপ্ত মহিলাটির সন্তানের গর্ভপাত ঘটল, যার চুল গজিয়েছিল। সাথে আঘাতপ্রাপ্ত মহিলাটিও নিহত হলো। তখন হত্যাকারী মহিলার ওপর দিয়তের ফয়সালা করা হলো। নিহত মহিলার চাচা বলল, হে আল্লাহর রাসুল, সে একটি বাচ্চা শিশু প্রসব করেছে, যার চুল গজিয়েছিল। তখন হত্যাকারী মহিলার বাবা বলল, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহর কসম, শিশুটি তার মায়ের পেট থেকে জীবিত বের হয়নি—পৃথিবীতে এসে খায়ওনি এবং পানও করেনি। আর এমন শিশুর জন্য কোনো দিয়ত নেই। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটি কি জাহিলি যুগের কবিতার ন্যায় কবিতা এবং জাহিলি জ্যোতির্বিদদের মন্ত্র? নিশ্চয় শিশুর জন্য গুররা (দিয়তের বিশ ভাগের এক ভাগ) নির্ধারিত।'[৪৯৯]

খ. হদ

حد (হদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা দেওয়া, প্রতিরোধ করা। পরিভাষায় হদ বলা হয়, এমন নির্দিষ্ট শাস্তিকে, যা আল্লাহ তাআলার অধিকার হিসাবে সাব্যস্ত।[৫০০]

যখন আল্লাহ তাআলার নির্দিষ্ট কিছু নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা হবে, তখন হদ কার্যকর করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে হদ কার্যকর করা থেকে বিরত থাকা বা এতে কোনো ধরনের শিথিলতা করা বা হদের ক্ষেত্রে কমবেশ করার কারও কোনো অধিকার নেই।

আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত যে, উসামা বিন জাইদ رضي الله عنه যখন স্বর্ণালংকার ও আসবাবপত্র চুরিকারী মাখজুম গোত্রের এক নারীর ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছিলেন :

৪৯৯. সুনানুন নাসায়ি : ৮/৫১, হা. নং ৪৮২৮ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) -হাদিসটির সনদ জইফ।

৫০০. আত-তারিফাত, জুরজানি : ৮৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

'তুমি কি আল্লাহর হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?' অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তো এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যকার সম্মানিত কোনো লোক চুরি করত, তখন তারা হদ প্রয়োগ না করে তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল অসহায় লোক চুরি করত, তখন তারা তার ওপর হদ প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও যদি চুরি করত, তাহলেও আমি তার হাত কাটতাম।'[৫০১]

হদ প্রকরণ

হদ পাঁচ প্রকার :

১. চুরির হদ (حد السرقة)

২. জিনার হদ (حد الزنا)

৩. মদপানের হদ (حد الشرب)

৪. অপবাদের হদ (حد القذف)

৫. ডাকাতির হদ (حد الحرابة)

৬. জাদুর হদ (حد السحر)

৭. সমকামিতার হদ (حد اللواطة)

নিম্নে হদের প্রকারগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো :

৫০১. সহিহুল বুখারি : ৪/১৭৫, হা. নং ৩৪৭৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

১. চুরির হদ :

কারও অনুপস্থিতিতে বা অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে তার রক্ষিত মাল নিয়ে যাওয়াকে চুরি বলা হয়। চুরি করা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। এতে সমাজের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয় এবং মানুষের মালের নিরাপত্তা থাকে না, ফলে সমাজে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো, বিশৃঙ্খলা দূর করে সমাজে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা। আর এতে যদি কিছুটা কঠোরতা করতে হয় তবুও তা করতে হবে। সুতরাং চুরির মাধ্যমে কেউ যদি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাহলে ইসলামের বিধান হলো, তার হাত কেটে দেওয়া হবে। এতে করে সে যেমন আর চুরি করতে পারবে না বা চুরি করার সাহস পাবে না, সাথে অন্যরাও চুরি করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

কিছু দুষ্কৃতিকারী বলে, ইসলামের বিধান অনেক কঠিন ও বর্বর। সামান্য চুরির কারণে একজন মানুষের হাত কাটা হবে!?

এ ধরনের অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা ইসলাম ও ইসলামের বিধান সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ অথবা ইসলাম ও ইসলামের বিধানের ব্যাপারে শত্রুতা পোষণ করে। কোনো মুসলমান এ ধরনের অভিযোগ করতে পারে না। আর যদি কোনো মুসলমান এ ধরনের অভিযোগ আনে, তাহলে সে মুরতাদ তথা দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। কারণ, যে মুসলিম নামধারী ব্যক্তি ইসলামের কোনো বিধানের ব্যাপারে অভিযোগ করে, কোনো বিধানকে নিয়ে কটাক্ষ করে, তাতে কোনো দোষ বা ত্রুটি আছে বলে মনে করে, কোনো বিধানকে অসম্পূর্ণ মনে করে—তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ ও মুরতাদ হয়ে যায়।

ইসলামে চুরির হদ হলো হাত কাটা। পবিত্র কুরআনে কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি হুঁশিয়ারি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৫০২]

কারও ব্যাপারে চুরির অভিযোগ উঠলেই যে তার হাত কাটা ওয়াজিব হয়ে যায়, বিষয়টা মোটেও এমন নয়; বরং চুরির অপরাধে কারও হাত কাটতে হলে তিনটি শর্ত পাওয়া অপরিহার্য। তিনটি শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল চোরের হাত কাটতে হবে, অন্যথায় নয়। শর্ত তিনটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

এক. চুরির সময় চোরের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং আর্থিক সচ্ছলতা থাকতে হবে। তাকে চুরির সময় সম্পূর্ণ সুস্থ পাওয়া গেলে তবেই তার মাঝে এ শর্তটি পাওয়া গেছে বলে ধর্তব্য হবে। পাগল বা অচেতন অবস্থায় চুরি করেনি, এমন হতে হবে। সে কাজ করতে সক্ষম হবে। সে যদি এমন হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সীমালঙ্ঘনকারী হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং সে শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আর যদি সে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে চুরি করে এবং তার সামনে কোনো কাজ করে জীবিকা নির্বাহের কোনো পথ না থাকে, তাহলে তার হাত কাটা হবে না। কারণ, এগুলো এমন ওজর, যার কারণে শরয়ি হদ মওকুফ হয়ে যায়।

মুআজ ﷺ, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ ও উকবা বিন আমির ﷺ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন :

إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ، فَادْرَأْهُ

'হদের ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হলে তোমরা হদ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকো।'[৫০৩]

অনন্যোপায় লোকদের হারাম খাওয়ার অপরাধ ক্ষমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

---

৫০২. সুরা আল-মায়িদা : ৩৮

৫০৩. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৫/৫১১, হা. নং ২৮৪৯৪ (মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ)

'অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানি ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোনো পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।'[৫০৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

'অতএব যে ব্যাক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু কোনো গুনাহের প্রতি প্রবণতা না থাকে; তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল।'[৫০৫]

তাই যখন চুরির সাথে কোনো সন্দেহ যুক্ত থাকবে, তখন হদ মওকুফ হয়ে যাবে। যখন চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি আর্থিক অসচ্ছলতায় থাকবে, তখনও হদ মওকুফ হবে। যখন উক্ত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য ঠিক না থাকবে, তখনও হদ মওকুফ হবে।

দুই. চুরির মাল সংরক্ষিত স্থানে থাকতে হবে। যখন চোর চুরি করে, তখন সে সম্পদ নিরাপদ ও সংরক্ষিত স্থানে ছিল বলে প্রমাণিত হতে হবে। যদি চুরিকৃত মাল নিরাপদ ও সংরক্ষিত স্থানে না থাকে; বরং প্রকাশ্য কোনো স্থানে অরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে না। কারণ, অনেক দুর্বল হৃদয়ের মানুষ আছে, যারা মালামাল সামনে পাওয়ার কারণে লোভ সামলাতে না পেরে চুরি করে। মূলত সেই সম্পদ যদি তার চোখের সামনে না থেকে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষিত থাকত, তাহলে হয়তো সে চুরি করত না। কারণ, চুরি করা তার পেশা নয়, কিন্তু সামনে সম্পদ দেখে মনের কুমন্ত্রণায় সে চুরি করেছে। এ ক্ষেত্রে তার ওপর চুরির হদ প্রয়োগ হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, নিরাপদ সংরক্ষিত জায়গা বলতে কী বোঝায়? প্রত্যেক চোরই তো চুরি করার পর নিজের ওপর হদ প্রয়োগ হওয়া থেকে বাঁচার জন্য এই দাবি করবে যে, ওই সম্পদকে সে অরক্ষিত অবস্থায়

৫০৪. সুরা আল-বাকারা : ১৭৩
৫০৫. সুরা আল-মায়িদা : ৩

পেয়েছে, তাই চুরি করেছে। কিন্তু হয়তো বাস্তবতা আসলে ভিন্ন, সে মূলত রক্ষিত স্থান থেকেই সম্পদ চুরি করেছিল। এখন শাস্তির ভয়ে মিথ্যে বলছে।

মূলত নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান বলতে ওই স্থানকেই বলা হয়, প্রত্যেক অঞ্চলে যেটাকে সংরক্ষিত স্থান হিসাবে ধরা হয়। এখানে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই, যার ভিত্তিতে বলা হবে, এটা সংরক্ষিত স্থান আর ওটা অসংরক্ষিত স্থান। তাই যে এলাকায় যে সকল স্থানকে সংরক্ষিত স্থান হিসাবে গণ্য করা হয়, সে অঞ্চলে চুরির হদ প্রয়োগের জন্য সেটাই সংরক্ষিত স্থান হিসাবে ধরা হবে। সুতরাং কেউ যদি সমাজের দৃষ্টিতে সংরক্ষিত সম্পদ চুরি করে, তবেই কেবল তার হাত কাটা হবে, অন্যথায় নয়।

তিন. চুরিকৃত সম্পদের মূল্য নিসাব পরিমাণ হতে হবে। যদি চুরিকৃত সম্পদের মূল্যমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মূল্যমান থেকে কম হয়, তাহলে চুরির হদ প্রয়োগ হবে না। নিসাবের পরিমাণ কতটুকু, এ নিয়ে আহলে ইলমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সবচেয়ে অগ্রগণ্য মত হলো, দশ দিরহাম[৫০৬] বা তার সমমূল্যের অন্য যেকোনো সম্পদই নিসাবের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ যদি দশ দিরহাম বা তার সমমূল্যের অন্য কোনো সম্পদ অথবা তার চেয়ে বেশি মূল্যের কিছু চুরি করে, সাথে তার মধ্যে পূর্বোল্লিখিত শর্ত দুটিও পাওয়া যায়, তাহলে হদ হিসাবে তার হাত কাটা হবে।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, চুরির হদ প্রয়োগ করতে হলে উল্লিখিত তিনটি শর্ত একসাথে থাকতে হবে। তিনটি শর্তের দুটি পাওয়া যায়, কিন্তু একটি শর্ত পাওয়া যায়নি; যদি অবস্থা এমন হয়, তাহলে হদ প্রয়োগ হবে না। কারণ, একটি শর্ত না পাওয়ার কারণে এতে এক ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর সন্দেহযুক্ত বিষয়ে শরিয়তের হদ প্রয়োগ করা যায় না; বরং সন্দেহ হদকে রহিত করে দেয়।

অন্যদিকে হাদিসে নির্দেশনা এসেছে, কোনোভাবে যদি হদ প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকা যায়, তাহলে বিরত থাকাই নীতি। আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

৫০৬. বর্তমানে দশ দিরহামে দুই ভরি সাত মাশা তথা আড়াই তোলার একটু বেশি রুপা হয়। আধুনিক পরিমাপে হয় ৩০.৬১৮ গ্রাম রুপা।

ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا

'যদি হদ প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা থাকে, তার মাধ্যমে তোমরা হদ প্রয়োগ প্রতিরোধ করো।'[৫০৭]

অন্য হাদিসে এসেছে :

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ

'তোমরা যথাসম্ভব মুসলমানদের ওপর হদ প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকো। যদি হদ প্রয়োগ না করে বের হওয়ার কোনো পথ থাকে, তাহলে রাস্তা ছেড়ে দাও। কারণ, খলিফার মাফ করে ভুল করাটা শাস্তি দিয়ে ভুল করার চেয়ে উত্তম।'[৫০৮]

ওপরের আলোচনা থেকে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, চোরের হাত তখনই কাটা হবে, যখন তার চুরির ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ বাকি থাকবে না। যখন সন্দেহাতীতভাবে চুরির বিষয়টা প্রমাণিত হবে এবং হদ থেকে বাঁচানোর সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে, কেবল তখনই চোরের ওপর চুরির হদ প্রয়োগ হবে।

২. জিনার হদ

জিনা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য একটি কাজ। জিনাকারী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির শত্রু। জিনার কারণে মানুষের প্রকৃত পরিচয় ও বংশ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। কারণ, জিনার ব্যাপকতার কারণে প্রকৃতভাবে কে কার সন্তান, এটা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৫০৭. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২/৮৫০, হা. নং ২৫৪৫ (দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, কায়রো) - হাদিসটি জইফ।

৫০৮. সুনানুত তিরমিজি : ৩/৮৫, হা. নং ১৪২৪ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

ইসলামের দৃষ্টিতেও জিনা অত্যন্ত জঘন্য একটি অপরাধ ও কবিরা গুনাহ। সংগত কারণেই জিনার ক্ষেত্রে ইসলাম কঠিন হদ নির্ধারণ করেছে। সমাজ থেকে যেন জিনা নির্মূল হয়ে যায়, সে ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

জিনার হদের পরিমাণ

অবিবাহিত নারী-পুরুষের জিনার হদ হলো, একশ বেত্রাঘাত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে বলেন :

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

'ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ—তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।'[৫০৯]

আর বিবাহিত নারী-পুরুষের জিনার হদ হলো মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত পাথর মারতে থাকা। উবাদা বিন সামিত ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ

'তোমরা আমার নিকট থেকে বিধান জেনে নাও। তোমরা আমার নিকট থেকে বিধান জেনে নাও। আল্লাহ তাআলা নারীদের সতীত্ব রক্ষার জন্য পথ বাতলে দিয়েছেন। অবিবাহিত নারী-পুরুষ জিনা করলে শাস্তি একশ বেত্রাঘাত। আর বিবাহিত নারী-পুরুষ জিনা করলে একশ বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা।'[৫১০]

৫০৯. সুরা আন-নুর : ২

৫১০. সহিহ মুসলিম : ৩/১৩১৬, হা. নং ১৬৯০ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ؓ থেকে বর্ণিত :

أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

'জনৈক ব্যক্তি এক নারীর সাথে জিনা করেছিল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তাকে বেত্রাঘাত করা হলো। অতঃপর সংবাদ দেওয়া হলো যে, সে বিবাহিত। তখন তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো।'[৫১১]

পূর্বের মতো এখানেও একটি কথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহ থাকলে এই হদও রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ জিনার অভিযোগে অভিযুক্ত নারী-পুরুষ থেকে জিনার হদ রহিত হয়ে যাবে, যদি উপযুক্ত প্রমাণ না থাকে। শাস্তি যেহেতু অনেক বড়, তাই অপরাধও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ খুঁত থাকলে হদ প্রয়োগ করা যাবে না।

উমর ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'তোমরা যথাসম্ভব হদসমূহ প্রতিহত করো।'[৫১২]

৩. মদপানের হদ

মদ মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে। মদপান করলে মানুষের আকল ও বুদ্ধি-বিবেক ঠিক থাকে না। তখন সে উন্মাদের মতো অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে।

মদ কাকে বলে, এ বিষয়ে আহলে ইলমদের মাঝে কিছুটা মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, আঙুর, খেজুর, জলপাই, জব, গম ইত্যাদি দিয়ে তৈরি

---

৫১১. সুনানু আবি দাউদ : ৪/১৫১, হা. নং ৪৪৩৮ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।
৫১২. মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক : ৭/৪০২ (আল মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

নেশা জাতীয় প্রতিটি জিনিসই মদ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, শুধুমাত্র আঙুর দিয়ে তৈরি নেশা জাতীয় বস্তুই মদ। তবে মদের গুণাগুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সেটার হুকুমও মদের মতোই হারাম। প্রকৃত মদ কাকে বলে, এ নিয়ে কিছুটা মতভেদ থাকলেও সকলেই কিন্তু একটি বিষয়ে একমত যে, মদ যেরকম হারাম তদ্রূপ প্রতিটি নেশা জাতীয় বস্তুই হারাম। যে জিনিস মানুষের আকলকে পরিবর্তন করে ফেলে সেটাই হারাম।

আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

'প্রতিটি নেশা জাতীয় দ্রব্যই মদ। আর প্রত্যেক নেশা জাতীয় জিনিসই হারাম।'[৫১৩]

বড় বড় অপরাধ ও গুনাহের কারণে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। মদপান করা সে সকল অপরাধেরই একটি। মদপানকারীর হদ বা শাস্তি হলো আশি বেত্রাঘাত।

আনাস ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ এক লোককে মদপান করার অপরাধে খেজুরের দুটি ডাল দিয়ে চল্লিশটি আঘাত করেন। তিনি (আনাস ؓ) বলেন, আবু বকর ؓও এমনটি করেছেন। অতঃপর উমর ؓ-এর খিলাফতের সময় তিনি সাহাবিদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ؓ বললেন, সর্বনিম্ন হদ হলো আশিটি বেত্রাঘাত। অতঃপর উমর ؓ মদপানের ক্ষেত্রে এ হদ প্রদানের আদেশ দেন।'[৫১৪]

---

৫১৩. মুসনাদু আহমাদ : ৮/২৬৯, হা. নং ৪৬৪৫ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।
৫১৪. সহিহ মুসলিম : ৩/১৩৩০, হা. নং ১৭০৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

সায়িব বিন ইয়াজিদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ

'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সময় এবং আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ-এর খিলাফতের শুরুর দিকে মদ পানকারীর দিকে ধেয়ে যেতাম। আমাদের হাত, জুতা ও চাদর দিয়ে তাকে প্রহার করতাম। এরপর উমর ﷺ স্বীয় খিলাফতের শেষভাগে এর জন্য চল্লিশটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করলেন। অতঃপর তারা যখন অবাধ্য হয়ে গেল এবং পাপাচারে আরও বেশি লিপ্ত হতে থাকল, তখন তিনি তাদের আশিটি করে বেত্রাঘাত করলেন।'[৫১৫]

খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ পত্রবাহকের মাধ্যমে উমর ﷺ-এর নিকট লিখে পাঠালেন :

إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الشُّرْبِ، وَتَحَاقَرُوا الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ، قَالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ، وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، فَسَأَلَهُمْ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ،

'মানুষ মদপানে লিপ্ত হয়ে গেছে এবং তারা এর জন্য নির্ধারিত শাস্তিকে তুচ্ছ মনে করছে। উমর ﷺ (পত্রবাহককে) বললেন, এরা তোমার পাশে আছে, এদের জিজ্ঞেস করো। সে সময় তাঁর পাশে আনসার ও মুহাজির সাহাবিগণ বসা ছিলেন। অতঃপর পত্রবাহক তাঁদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা সকলে একমত হলেন যে, মদপানকারীকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে।'[৫১৬]

৫১৫. সহিহুল বুখারি : ৮/১৫৮, হা. নং ৬৭৭৯ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৫১৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪/১৬৬-১৬৭, হা. নং ৪৪৮৯ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

আর সে যদি মদপান না ছেড়ে মদপান করতেই থাকে, আর প্রতিবারই তার ওপর হদ প্রয়োগ করা হয়; তবুও সে তৃতীয়বারের হদ ডিঙিয়ে চতুর্থবারেও মদপান করে, তবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ

'যদি সে মদপান করে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করো। এরপর সে যদি আবার পান করে, তাহলে আবার বেত্রাঘাত করো। এরপর যদি তৃতীয়বার পান করে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করো। যদি চতুর্থবার পান করে, তাহলে তাকে হত্যা করো।'[৫১৭]

৪. অপবাদের হদ

এখানে অপবাদ বলতে বুঝানো হয়েছে, সতী নারীকে জিনা-ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। কেবল নোংরা চরিত্রের অধিকারী, ধারণাপ্রবণ অবিশ্বাসীরাই এমন অন্যায়মূলক কথা বলার দুঃসাহস দেখিয়ে সতী স্বাধীন ওপবিত্র-চরিত্রের নারীদের অপবাদ দিতে পারে; তাদের মর্যাদা, পবিত্রতা ও সততার ওপর আঘাত করতে পারে।

একজন স্বাধীন সতী নারী সব ধরনের অপবাদ থেকে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে রক্ষা করে। সে নিজের সতীত্ব রক্ষা ও নিজেকে পবিত্র রেখে সব ধরনের অপবাদ থেকে আত্মরক্ষাকে ইমান ও আকিদার পর সবচেয়ে বড় ও পবিত্র দায়িত্ব মনে করে। সে কিছুতেই তার ওপর মিথ্যা অপবাদ সহ্য করতে পারে না এবং তা মেনে নিতে পারে না। অন্যদিকে কিছু জঘন্য নোংরা চরিত্রের অধিকারী লোক সতী-সাধ্বী নারীর পরিচ্ছন্ন, শুভ্র ও পবিত্র চরিত্রের ওপর কলঙ্কের দাগ দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়। এ অপরাধ ছোট বা সাধারণ কোনো অপরাধ নয়, বরং এটি বড় ও জঘন্য একটি অপরাধ।

৫১৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪/১৬৪, হা. নং ৪৪৮৪ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

স্বাধীন সতী নারীদের অপবাদদাতাদের কঠিন শাস্তির ধমকি দিয়ে মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে বলেন :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

'যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ইমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।'[৫১৮]

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক অপরাধ থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, সেগুলো কী? তিনি বললেন, আল্লাহ সাথে শরিক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, অন্যায়ভাবে নিরপরাধ লোককে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ও সতী-সাধ্বী সরলমনা ইমানদার নারীদের অপবাদ দেওয়া।'[৫১৯]

যারা সতী-সাধ্বী সরলমনা ইমানদার নারীদের অপবাদ দেয়, ইসলাম তাদের জন্য কঠিন শাস্তি আবশ্যক করেছে। যাতে তারা তাদের এই নিকৃষ্ট কাজের সাজা পায় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ করার দুঃসাহস না পায়। অন্যরাও যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এ ধরনের অশ্লীল কথা মুখে উচ্চারণ করার দুঃসাহস না দেখাতে পারে।

৫১৮. সুরা আন-নুর : ২৩
৫১৯. সহিহুল বুখারি : ৪/১০, হা. নং ২৭৬৬ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

সতী নারীদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। আর এরাই নাফরমান।'[৫২০]

কেউ সতী-সাধ্বী সরলমনা ইমানদার নারীদের মিথ্যা অপবাদ দিলে তার ওপর হদ ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তার হদ হলো আশিটি বেত্রাঘাত; যেমনটি উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও আজীবনের জন্য তার কোনো ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। যদিও সাক্ষ্য গ্রহণ করা-না করার মাসআলার ক্ষেত্রে আহলে ইলমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে তাওবা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আর অন্যরা বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

৫. ডাকাতির হদ

ডাকাতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অস্ত্র বা শক্তি দেখিয়ে কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া। এক্ষেত্রে ডাকাতির চারটি প্রকার রয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের জন্য আলাদা আলাদা বিধান। এক : ডাকাতি করতে এসে শুধু সম্পদ লুট করবে, কিন্তু কাউকে হত্যা করবে না। দুই : সম্পদ নেবে না, কিন্তু কাউকে হত্যা করবে। তিন : সম্পদও নিয়ে যাবে এবং কাউকে হত্যাও করবে। চার : সম্পদ ছিনতাই বা হত্যা কোনোটিই করবে না; বরং শুধু ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি করবে। সুতরাং প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে অপরাধীর হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা কিংবা বাম হাত ও ডান পা কেটে ফেলা হবে। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে অপরাধীকে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া

৫২০. সুরা আন-নুর : ৪

ছাড়া সরাসরি হত্যা করা হবে। তৃতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে অপরাধীর হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে তারপর তাকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করবে। চতুর্থ প্রকারের ক্ষেত্রে তাকে দেশান্তর করবে।[৫২১]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।'[৫২২]

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ، أَوْ قَالَ : عُرَيْنَةَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : مِنْ عُكْلٍ، قَدِمُوا المَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. فَشَرِبُوا حَتَّى إِذَا بَرِئُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ «فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَأُلْقُوا بِالحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ

৫২১. বাদায়িউস সানায়ি : ৭/৯৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৫২২. সুরা আল-মায়িদা : ৩৩

'উকল গোত্রের কিছু লোক মদিনায় আসল। (কিন্তু মদিনার আলো-বাতাস তাদের অনুকূলে ছিল না। তাই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল।) তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের উটের দুধ ও মূত্র পান করতে নির্দেশ দিলেন। তারা যখন তা পান করল, তখন সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা উটের রাখালদের হত্যা করে জন্তুগুলো ছিনতাই করে নিয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সকাল বেলা এই সংবাদ পৌছল। তখনই তিনি তাদের ধাওয়া করে ধরার জন্য একদল লোক পাঠালেন। দুপুরের আগেই তাদের ধরে নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি তাদের হাত পা কাটার এবং চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাদের উত্তপ্ত রোদের মধ্যে ফেলে রাখা হলো, এমনকি তারা পানি পান করতে চাইলে তাদের পানি পর্যন্ত দেওয়া হলো না। আর এভাবেই তাদের মৃত্যু হলো।'[৫২৩]

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে' এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা ডাকাতি করে মানুষের ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। এর জন্য প্রয়োজনে মানুষও হত্যা করে এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ফলে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, নিজেদের জানমালের ব্যাপারে তারা সর্বদা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

সুতরাং এই নির্দয় বিপথগামী লোকদের ব্যাপারে কোনো ধরনের দয়া, সহানুভূতি ও নমনীয়তা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। কারণ, তারা দয়া ও কোমল আচরণ পাওয়ার উপযুক্ত নয়; বরং তারা কঠিন শাস্তির উপযুক্ত। যাতে এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর দেহ থেকে এই পচা দূষিত অংশটুকু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সমস্ত মুসলিম উম্মাহ আতঙ্কমুক্ত নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারে। তাদের জন্য ইসলামের নির্ধারিত হদ বা শাস্তি হলো, উল্লিখিত কুরআনের আয়াতে যা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ শুধু মালামাল লুটের ক্ষেত্রে বিপরীত দিক থেকে তার হাত-পা কেটে দেওয়া হবে। আর শুধু হত্যার ক্ষেত্রে তাকেও হত্যা করা হবে। আর যদি সে লুট ও হত্যা উভয়টি করে তাহলে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে তারপর শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। যেন এ ভয়ংকর শাস্তি দেখে জীবনে আর কেউ ডাকাতির সাহস না

৫২৩. সহিহুল বুখারি : ৮/১৬৩, হা. নং ৬৮০৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

করে। এটাই ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, সে কোনো ধরনের অপরাধকে সামান্য পরিমাণ প্রশ্রয় না দিয়ে গোড়া থেকে সেটাকে উপড়ে ফেলে। আর লুট বা হত্যা কোনোটিই না করলে বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সৃষ্টি করার অপরাধে তাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে।

সমাজ ও জাতির শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য ইসলাম এই পাঁচ ধরনের হদ বা শাস্তি নির্ধারণ করেছে। এই হদগুলো এমন যে, এগুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নমনীয়তা দেখানো যাবে না। আর ক্ষমা করার তো প্রশ্নই আসে না। এ ক্ষেত্রে কারও থেকে কোনো ধরনের সুপারিশও গ্রহণীয় হবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ নমনীয়তা উম্মাহকে কঠিন ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যে ফেলতে পারে।

বি.দ্র. : আমরা যে সকল কিসাস ও হুদুদের কথা উল্লেখ করলাম, ইসলামি রাষ্ট্রই কেবল এগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। আর এ সকল বিধান বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও ইসলামি রাষ্ট্রেরই। রাষ্ট্র তার শক্তি ও প্রভাব দিয়ে অপরাধ দমনের জন্য এ সকল কিসাস, হুদুদ ও তাজিরসহ ইসলামের প্রতিটি বিধানই বাস্তবায়ন করবে। রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কেউ এ সকল বিধান বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। কারণ, একমাত্র রাষ্ট্রেরই হুদুদ ও কিসাসগুলো বাস্তবায়ন করা ও তার পরবর্তী বিশৃঙ্খলা কঠিন হাতে দমন করার শক্তি আছে।

৬. জাদুর হদ

জাদু করা হারাম বা কুফর। অর্থাৎ কিছু জাদু আছে কুফর, যেমন : কুরআনের অবমাননা করা, তারকারাজি বা শয়তানের উপাসনা করা, কুফরি কালাম বা কাজ করা; আর কিছু আছে হারাম, যা কুফরি বা শিরকি কাজ না করে পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদির মাধ্যমে করা হয়। [৫২৪]

জাদুকরের শাস্তি নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ﵀, ইমাম মালিক ﵀ ও ইমাম আহমাদ ﵀-সহ অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে জাদুকরের শাস্তি হলো হত্যা।[৫২৫]

৫২৪. রদ্দুল মুহতার : ১/৪৫ (দারুল ফিকর, বৈরুত)
৫২৫. ফাতহুল কাদির : ৬/৯৯ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

জুনদুব ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

'জাদুকরের হদ বা শাস্তি হলো তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া।'[৫২৬]

উমর ﵁ তার মৃত্যুর এক মাস পূর্বে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ

'তোমরা প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা জাদুকরকে হত্যা করো।'[৫২৭]

জাদুকরকে হত্যার বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে কিছু শর্ত থাকা ও না থাকা নিয়ে ইখতিলাফ আছে। হানাফি মাজহাবমতে জাদু যদি কুফরি হয় কিংবা কুফরি না হলেও এর কারণে জমিনে ফাসাদ ও কারও ক্ষতি হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। মালিকি মাজহাবমতে যদি তার কুফরি ইসলামি আদালতে সাব্যস্ত হয় কিংবা সে প্রকাশ্যে কুফরিমূলক জাদু করে বেড়ায়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। শাফিয়ি মাজহাব মতে জাদুর মাধ্যমে কাউকে হত্যা করা হলে তবেই তাকে হত্যা করা হবে। আর হাম্বলি মাজহাব অনুসারে জাদুকর কুফরি কাজের মাধ্যমে জাদু করলে তখন তাকে হত্যা করা হবে; যদিও তার জাদু দ্বারা কাউকে হত্যা করা না হোক।[৫২৮]

৭. সমকামিতার হদ

ইসলামে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘন্য পাপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সমকামিতা। এটা এমন পাপ, যা সুস্থ রুচি পরিপূর্ণভাবে ঘৃণা করে এবং স্বাভাবিক বিবেক এটাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। এ অপরাধের জন্য

৫২৬. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/৪০১, হা. নং ৮০৭৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।
৫২৭. মুসনাদুল বাজ্জার : ৩/২৬৮, হা. নং ১০৬০ (মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা) - হাদিসটি সহিহ।
৫২৮. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ২৪/২৬৬-২৬৭ (অজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যা, কুয়েত)

আল্লাহ তাআলা লুত আ.-এর জাতিকে এমন ভয়ংকর আজাব দিয়েছিলেন, যা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতিকে দেননি। এটা হারাম ও নিকৃষ্ট কবিরা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। তবে এর শাস্তি বা হদ নিয়ে মতানৈক্য পাওয়া যায়।

আল্লামা ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া ﵀ বলেন, 'ইমাম মালিক ﵀ ও ইমাম আহমাদ ﵀-এর মাজহাবে সমকামিতার শাস্তি হত্যা করা; চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। আবু বকর ﵁, আলি ﵁, খালিদ বিন ওয়ালিদ ﵁, আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﵁, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵁, খালিদ বিন জাইদ ﵁, আব্দুল্লাহ বিন মামার ﵀, জুহরি ﵀, রবিআ বিন আব্দুর রহমান রহ, ইসহাক বিন রাহুয়া ﵀-সহ প্রমুখ এমনই বলেছেন। আর ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর মাজহাবমতে সমকামিতার শাস্তি হুবহু জিনার শাস্তির মতোই। বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপে হত্যা এবং অবিবাহিত হলে একশ বেত্রাঘাত। আতা বিন আবু রাবাহ., হাসান বসরি ﵀, সাইদ বিন মুসাইয়িব ﵀, ইবরাহিম নাখয়ি ﵀, কাতাদা ﵀, আওজায়ি ﵀, আবু ইউসুফ ﵀, মুহাম্মাদ ﵀,-সহ অনেকে এমন মতই পোষণ করেন। আর ইমাম আবু হানিফা ﵀ ও ইমাম হাকিম ﵀-এর মতে এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি নেই; বরং তাকে তাজির করা হবে।'[৫২৯]

অনেক ফকিহ এ মাসআলায় সমকামীকে হত্যার ব্যাপারে সাহাবিদের ইজমার কথা বর্ণনা করেছেন। হাদিস থেকেও এ মতটি শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত হয়। ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

'তোমরা কাউকে লুত আ.-এর জাতির মতো কুকর্মে লিপ্ত হতে দেখলে কর্তা ও যার সাথে করা হয়েছে, উভয়কে হত্যা করো।'[৫৩০]

৫২৯. আল-জাওয়াবুল কাফি : পৃ. নং ১৬৮ (দারুল মারিফা, মাগরিব)
৫৩০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/৩৯৫, হা. নং ৮০৪৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'সমকামিতার ব্যাপারে একদল উলামায়ে কিরাম বলেন, এর শাস্তি জিনার শাস্তির মতোই। আর কারও মতে এর চেয়েও নিম্ন শাস্তি (তথা তাজির) হবে। তবে বিশুদ্ধ মত সেটাই, যেটার ওপর সাহাবায়ে কিরাম ﵁-এর ইজমা হয়েছে যে, সমকামিতায় লিপ্ত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে; চাই তারা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক।'[৫৩১]

এ মাসআলায় দলিল-প্রমাণাদির দিকে তাকালে ইমাম মালিক ﵀ ও ইমাম আহমাদ ﵀-এর মতই শক্তিশালী বুঝা যায়। তাছাড়া এ মতের ওপর সাহাবায়ে কিরামের ইজমাও রয়েছে। তাই বিচারকের উচিত এক্ষেত্রে কোনো নমনীয়তা না দেখিয়ে তাদের কঠিনভাবে হত্যা করা। হত্যা কীভাবে করবে, সে ব্যাপারে কয়েকটি পন্থা রয়েছে। কারও মতে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। কারও মতে পাহাড় বা উঁচু কোনো স্থান থেকে ফেলে দিয়ে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করে মারা হবে। আর কারও মতে প্রচণ্ড দুর্গন্ধময় জায়গায় তাকে কোনোরূপ খাবার-দাবার না দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ফেলে রাখবে। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার কথা বলেছেন। মোটকথা, ভয়ংকর শাস্তি দিয়ে তাকে মারার ব্যাপারে সবাই একমত।

গ. তাজির

হদ ও কিসাসের মতো শাস্তির আরেকটি প্রকার হচ্ছে তাজির। যে সমস্ত অপরাধের জন্য শরিয়াহ কর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি নেই, সেসব অপরাধের জন্য তাজিরের ব্যবস্থা রয়েছে। তাজিরের সীমা ও পরিমাণের ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো নস নেই। রাষ্ট্রের অভিজ্ঞ আলিম ও ফকিহরা বসে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করবেন। এটি বিচারকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। বিচারক অপরাধের বিবেচনায় শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। কেউ ব্যক্তিগতভাবে তাজিরের দায়িত্ব নিতে পারবে না। তবে যাদের ওপর শিষ্টাচারের দায়িত্ব, তারা তাজিরের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। যেমন : অভিভাবক, পিতা, স্বামী প্রমুখ তাদের অধীনদের শিষ্টাচার ঠিক রাখার জন্য সীমিত পরিসরে তাজিরের দায়িত্ব পাবে।

৫৩১. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ২৮/৩৩৪ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

আভিধানিক অর্থে তাজির : تعزير (তাজির) শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে মর্যাদা প্রদান, সম্মান প্রদর্শন। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, শিষ্টাচার শিক্ষাদান, শাস্তিপ্রদান।

পারিভাষিক অর্থে তাজির : যে সকল অপরাধের নির্দিষ্ট শরয়ি হদ নেই, সে সকল অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করে শিক্ষা প্রদান করা।[৫৩২]

বিস্তারিত বলতে গেলে, যে সকল অপরাধের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহমতে কোনো শাস্তি নির্ধারিত নেই, সে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানকে তাজির বলে। এ ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী সেই শাস্তিগুলো নির্ধারণ করবেন ইসলামি হাকিম বা বিচারক। বিচারক অপরাধীকে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করবেন।

তবে বিচারককে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী ও গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। যে বিচারক ন্যায়পরায়ণতার সাথে মানুষের বিচার করেন, বিচারের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব করেন না, আবেগতাড়িত হয়ে কাউকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেন না, ব্যক্তি বিদ্বেষবশত কারও ওপর অন্যায় ফয়সালা করেন না; বরং তিনি ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাজ থেকে ফিতনা-ফাসাদ, অন্যায়-অপরাধ দূর করতে সচেষ্ট; সর্বদা তিনি তটস্থ থাকেন যে, তার ভুল ও অন্যায় বিচারের মাধ্যমে সমাজে না জানি ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে—এমন বিচারকই বিভিন্ন অপরাধের তাজিরভিত্তিক শাস্তি নির্ধারণের অনুমতিপ্রাপ্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

'আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকো, যা বিশেষত শুধু তাদের ওপর পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে জালিম। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠোর।'[৫৩৩]

৫৩২. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা : পৃ. নং ৩৪৪ (দারুল হাদিস, কায়রো)
৫৩৩. সুরা আল-আনফাল : ২৫

তাজিরের কতিপয় উদাহরণ :

আমরা এখানে এমন কিছু অপরাধের কথা উল্লেখ করছি, কুরআন-হাদিসে যার নির্দিষ্ট কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ নেই। এ ধরনের অপরাধগুলোর শাস্তি নির্ধারণ করবেন ইসলামি হাকিম বা বিচারক।

১. রমজান মাসে দিনের বেলা প্রকাশ্যে আহার করা

রমজান মাসে দিনের বেলা প্রকাশ্যে আহার করার মাধ্যমে সে এই মাসের পবিত্রতা নষ্ট করল। একটি ফরজ বিধানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল। ফরজ বিধান পালনকারী রোজাদারদের মনে কষ্ট দিল। আর এতগুলো অপরাধের কারণে হাকিম বা বিচারক তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। যেহেতু এই অপরাধের জন্য নির্ধারিত কোনো শাস্তি নেই, তাই বিচারক চাইলে অপরাধীকে জেলে আটকে রাখা বা দেশান্তর কিংবা বেত্রাঘাত করার শাস্তি নির্ধারণ করতে পারবেন।

২. রাস্তাঘাটে মহিলাদের উত্যক্ত করা

মহিলাদের ইভটিজিং করা অত্যন্ত নোংরা ও খারাপ একটি কাজ। ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে এবং নারীর সম্মান রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। কেউ যদি কোনো নারীকে ইভটিজিং করে, তাহলে এ কুকর্মের মাধ্যমে সে নারীর সম্মান ও মর্যাদার ওপর আঘাত হানল। আর ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, উত্যক্তকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া; যাতে অপরাধী ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ করতে আর সাহস না পায় এবং অন্যরাও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

৩. অহেতুক মানুষকে কষ্ট দেওয়া

অহেতুক রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো, রাস্তার পাশে অনর্থক বসে থাকা, সময় নষ্ট করা, শিস দেওয়া, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে অথবা নোংরা ও খারাপ কথার মাধ্যমে রাস্তার মানুষদের বিরক্ত করা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ও জঘন্য কাজ। প্রতিটি মুসলিম সন্তান যেন সুশিক্ষিত কর্মঠ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

তাই যারা বখাটে হয়ে অহেতুক রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াবে, রাষ্ট্র তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করবে, যাতে কোনো মুসলিম সন্তান বখে না যায়।

৪. ধূমপান করা

কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তি কখনো ধূমপান করতে পারে না। কেবল বিকৃত রুচি, অসুস্থ হৃদয় ও বিকল মস্তিষ্কের লোকেরাই ধূমপান করে থাকে। ধূমপানের মাধ্যমে মানুষ দুধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে :

এক. শারীরিক ক্ষতি। ধূমপানের কারণে যক্ষা, হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, ব্রেন ক্যান্সারসহ অনেক বড় বড় রোগ মানুষের শরীরে বাসা বাঁধে।

দুই. আর্থিক ক্ষতি। ধূমপানের কারণে অযথাই মানুষের অনেক অর্থ নষ্ট হয়।

তাই ইসলামি বিচারক মানুষকে ধূমপান করার কারণে শাস্তি প্রদান করবেন। যাতে তারা শারীরিক ও অর্থিক ক্ষতি থেকে বেঁচে সুস্থ ও সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

৫. অরক্ষিত মাল চুরি করা

কেউ যদি অরক্ষিত মাল চুরি করে, তাহলে তার ওপর হদ প্রয়োগ হয় না ঠিক, কিন্তু হাকিম চোরের জন্য একটা শাস্তি নির্ধারণ করবেন। কারণ, এটা পূর্ণ অর্থে চুরি না হলেও এর মাধ্যমে চুরি করার অভ্যাস হয়ে যেতে পারে। তাই প্রথমেই এর শাস্তির ব্যবস্থা করলে সামনে থেকে এ বিষয়ে সে পূর্ণ সতর্ক থাকবে।

৬. নিসাব-নিম্ন সম্পদ চুরি করা

কেউ যদি রক্ষিত মাল চুরি করে, কিন্তু তা নিসাব পরিমাণ না হয়, অথবা রক্ষিত মাল চুরি করতে গিয়ে চুরি করার পূর্বেই ধরা পড়ে, তাহলেও তার ওপর হদ প্রয়োগ করা না হয়েও বিচারক তাকে শিক্ষাপ্রদ একটা শাস্তি দেবেন, যাতে করে সামনে সে আর এ ধরনের কাজ করার সাহস না পায় এবং মানুষও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৭. গালি-গালাজ করা

একে অপরকে অন্যায়ভাবে গালিগালাজ করা, অন্যায়ভাবে মিথ্যা অপবাদমূলক কথা বলা যেমন : একজন অপরজনকে ফাসিক, কাফির, মুনাফিক, খবিস, চোর ইত্যাদি বলা। এ ধরনের কথা বলা বা গালি দেওয়ার মাধ্যমে অন্যজনকে খাটো করা হয়। তার সম্মানের ওপর আঘাত দেওয়া হয়। তাই যারা এমন করবে ইসলামি রাষ্ট্র তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

৮. জিনার নিম্নবর্তী গুনাহ করা

ইমাম মাওয়ারদি ﷺ জিনার নিম্নবর্তী কিছু গুনাহের তাজির বর্ণনা করে বলেন, 'যদি তাজিরের শাস্তিটা জিনা জাতীয় কোনো কাজে হয়ে থাকে, তবে জিনাকারী ও জিনাকারিণীর অবস্থা বিবেচনায় শাস্তির মাত্রায় কমবেশ হবে। যদি উভয়কে এ অবস্থায় পাওয়া যায় যে, উভয়ের যৌনাঙ্গ এখনো মিলিত হয়নি, তবে তাদের সর্বোচ্চ তাজিরের শাস্তি ৭৫ চাবুক মারা হবে। যদি তাদের উভয়ের মাঝে শরীরের নিম্নভাগে কাপড় জড়ানো থাকে এবং তারা দুজন কাছাকাছি তো থাকে, কিন্তু সহবাসের কর্ম থেকে বিরত থাকে, তবে ৬০ চাবুক মারা হবে। যদি তাদের উভয়কে পূর্বের অবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু কাছাকাছি না পাওয়া যায়, তবে ৪০ চাবুক মারা হবে। যদি তাদের খালি বাড়িতে পাওয়া যায়, তাদের গায়ের পোশাক গায়েই থাকে, এমতাবস্থায় তাদের ৩০ চাবুক মারা হবে। যদি রাস্তায় কথা বলা অবস্থায় তাদের পাওয়া যায়, তবে ২০ চাবুক মারা হবে। যদি তাদের ইশারা ইঙ্গিতে মনোভাব আদান-প্রদান করতে দেখা যায়, তবে ১০ চাবুক মারা হবে।'[৫৩৪]

বিশেষ জ্ঞাতব্য

হদ ও কিসাসের মতো তাজির বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও ইসলামি রাষ্ট্রের। কোনো একক ব্যক্তি এই দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করতে পারবে না এবং কারও একার পক্ষে এগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভবও নয়। কারণ, একাকী কেউ এগুলো বাস্তবায়ন করতে গেলে তাকে অনেক সময় বাধার সম্মুখীন হতে হবে এবং বাস্তবায়ন করার পর বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকবে। সেই বাধার

---

৫৩৪. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা : পৃ. নং ৩৪৫ (দারুল হাদিস, কায়রো)

মোকাবেলা ও বিশৃঙ্খলা দমন করার শক্তি কারও একার নেই। তবে যদি কোনো একক ব্যক্তি এগুলো বাস্তবায়ন করে ফেলে, তাহলে মৌলিকভাবে যদিও তা বৈধ হবে, কিন্তু আইনগতভাবে তা বৈধ হবে না।

কিসাস ও হুদুদ ব্যতীত অন্য সব অপরাধই তাজিরের আওতায় পড়বে। তাজিরের শাস্তির পরিমাণ পরিবর্তনযোগ্য। কতিপয় ফুকাহায়ে কিরামের নিকট তাজিরের শাস্তি সর্বোচ্চ উনচল্লিশটি বেত্রাঘাত হতে পারবে, এর বেশি হতে পারবে না। তাজির তো পরিবর্তনযোগ্য, কিন্তু কিসাস ও হুদুদের ক্ষেত্রে তাজিরের মতো এই শিথিলতার কোনো অবকাশ নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

وَيُؤْتَى بِالَّذِي ضَرَبَ فَوْقَ الْحَدِّ فَيَقُولُ عَبْدِي لِمَ ضَرَبْتَ فَوْقَ مَا أَمَرْتُكَ فَيَقُولُ غَضِبْتُ فَقَالَ أَكَانَ غَضَبُكَ أَنْ يَكُونَ أَشَدَّ مِنْ غَضَبِي وَيُؤْتَى بِالَّذِي قَصَّرَ فَيَقُولُ عَبْدِي لِمَ قَصَّرْتَ فَيَقُولُ رَحِمْتُهُ فَيَقُولُ أَكَانَتْ رَحْمَتُكَ أَنْ تَكُونُ أَشَدَّ مِنْ رَحْمَتِي فَيُؤْمَرُ بِهِمَا جَمِيعًا إِلَى النَّارِ

'কিয়ামতের দিন একজন শাসককে আনা হবে, যে কিনা নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে অধিক প্রহার করেছিল। অতঃপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি আমার নির্দেশিত শাস্তির চেয়ে কেন বেশি প্রহার করলে? জবাবে সে বলবে, (আপনার নাফরমানির কারণে) আমি ক্রোধান্বিত হয়েছিলাম। আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা! তাহলে আমার চেয়ে তোমার ক্রোধ বেশি হয়ে গেছে? এরপর আরেকজন শাসককে আনা হবে, যে কিনা শাস্তি প্রদানে কম করেছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কেন শাস্তি কম দিয়েছিলে? সে জবাব দেবে, দয়াপরবশ হয়ে। আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা! তাহলে আমার দয়ার চেয়ে তোমার দয়া অধিক হয়ে গিয়েছিল? তারপর তাদের উভয়কে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হবে।'[৫৩৫]

---

৫৩৫. আল-মাতালিবুল আলিয়া : ১০/১০০, হা. নং ২১৫৫ (দারুল আসিমা, সৌদিআরব) - হাদিসটি হাসান।

চার. সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার-প্রসার করা

পৃথিবীর সব দিকে, প্রতিটি প্রান্তে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়া ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক একটি দায়িত্ব। ইসলামি রাষ্ট্রের মহান একটি লক্ষ্য হলো, পৃথিবীর সব জায়গায় যেন ইসলামি শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ যেন এই মহান ধর্ম সম্পর্কে ভালো করে বুঝতে পারে এবং স্বেচ্ছায় আগ্রহী হয়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে।

ইসলাম হলো সমস্ত মানবজাতির ধর্ম। আল্লাহ তাআলা ইহজগতে মানবজাতির জন্য একটি পথ প্রদর্শক আলোকবর্তিকা নির্ধারণ করে রেখেছেন, যাতে মানুষ তার সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। তাদের জন্য দিয়েছেন একটি পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনবিধান, যার ওপর নির্ভর করে মানুষ সর্বস্থানে সদা কল্যাণের সাথে থাকতে পারে। এই জীবনবিধান এতই বিস্তৃত, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, মানুষ যখন যেখানেই থাকুক, ইসলাম তার জন্য সমস্ত কল্যাণের বিষয় নিশ্চিত করবে, তাকে সমস্ত অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে।

ইসলাম একটি স্বভাবজাত ধর্ম। আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানবজাতির জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন। তিনি এই ধর্মের প্রতিটি মূলনীতি, প্রতিটি বিধান ও প্রতিটি বিশ্বাসকে এতটাই বিস্তৃত ও বাস্তবসম্মত করে দিয়েছেন যে, সর্বযুগে সব ভাষা-বর্ণ-গোত্রের মানুষের জন্য ইসলামই একমাত্র উপযুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়। আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানবজাতিকেই এই ধর্ম গ্রহণ ও পালনের জন্য আহ্বান করেছেন, যাতে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারিমে বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক পরিহার করো। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[৫৩৬]

ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। এই ধর্ম কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতি বা শ্রেণির জন্য নয়; বরং এই ধর্ম সমগ্র মানবজাতির ধর্ম। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

'আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'[৫৩৭]

ইসলাম প্রচার-প্রসারের বিভিন্ন মাধ্যম

ইসলাম প্রচারের এই গুরুদায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করা একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ও সক্ষমতা থাকে। যা কোনো ব্যক্তির বা দলের পক্ষে কখনই অর্জন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং কোনো একক ব্যক্তি কখনোই ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব সঠিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে সক্ষম হবে না। কারণ, এটি এমন এক দায়িত্ব, যা আদায় করতে বিভিন্ন উপকরণ ও মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। এ সকল উপকরণ কেবল রাষ্ট্রই জোগান দিতে পারে। ইসলাম প্রচারের জন্য এ সকল মাধ্যম ও উপকরণ রাষ্ট্র প্রথমে মুসলমানদের মধ্যে প্রয়োগ করবে, অতঃপর পৃথিবীর সকল দিকের সকল মানুষের মধ্যে তা প্রয়োগ করবে। ইসলাম প্রচারের মাধ্যম বিভিন্ন রকমের হতে পারে। আমরা এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যে সকল মাধ্যম ও উপকরণ গ্রহণ করে রাষ্ট্র ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসের সত্যতাকে মানুষের মন-মগজ ও চিন্তা-চেতনার মাঝে প্রসারিত করতে পারবে

---

৫৩৬. সুরা আল-বাকারা : ২০৮

৫৩৭. সুরা সাবা : ২৮

সেগুলোর একটি হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশের স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্র এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। সঠিক ও দৃঢ় ইসলামি আকিদা বিশ্বাসের অধিকারী খাঁটি মুমিন-মুত্তাকি ও পরহেজগার শিক্ষিত লোকদের হাতে এ বিভাগের দায়িত্ব থাকবে। তারা তাদের ছাত্র ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তুলবেন সঠিক ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী খাঁটি মুমিন, মুত্তাকি, পরহেজগার, শিক্ষিত, বিনয়ী, নিঃস্বার্থ ও পরোপকারী হিসাবে।

কোনোভাবেই এমন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ফাসিক, পথভ্রষ্ট, চরিত্রহীন নীচু লোকদের হাতে থাকা চলে না। এরা মানুষের অন্তরে নোংরা ও পচা চিন্তা-চেতনার বিষাক্ত বিষ ঢুকিয়ে দেবে। যার ফলে জাতি দুশ্চরিত্র ও স্বার্থপর একটি প্রজন্ম পাবে। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ফাসিক, পথভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন নীচু লোকদের থেকে মুক্ত রাখতে হবে। তা না হলে এ সকল পথভ্রষ্ট লোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নোংরামি ও অশ্লীলতায় পূর্ণ করে দেবে।

খ. ইলেকট্রিক মিডিয়া

ইসলামি আদর্শ প্রচারের আরেকটি মাধ্যম হলো, ইলেকট্রিক মিডিয়া তথা রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট ইত্যাদি। এ সকল মাধ্যম থেকে মুসলিম উম্মাহর সকল সংবাদ প্রচারিত হবে। এতে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হবে। এ সকল প্রচারমাধ্যম ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠনে অনেক কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে প্রচারমাধ্যমগুলোতে কেবল বিকৃত সংবাদ, খারাপ গান-বাজনা, অশ্লীল নাটক-সিনেমা, বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করে যুবক-যুবতিদের নাচ-গানই প্রচার হয়। এ সকল অশ্লীল প্রচারণা সমাজ ও জাতিকে ধ্বংসমুখে পতিত করে। নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েগুলো যখন পর্দার সামনে খোলামেলা পোশাকে অশ্লীল অঙ্গিভঙ্গির সাথে তাদের দেহ প্রকাশ করে, তখন যুবক-বৃদ্ধ সকল পুরুষের মনের মধ্যে নোংরা চিন্তা-চেতনা ও অবৈধ বাসনা বাসা বাঁধতে থাকে, যা ধীরে ধীরে ভয়ংকর টর্নেডো হয়ে বিস্ফোরিত হয়। এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে জাতিকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের বর্তমান সমাজের অবস্থা তো আমাদের চোখের সামনেই বিদ্যমান।

গ. প্রিন্ট মিডিয়া

দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাতে মুসলিম উম্মাহর সকল সংবাদ ও পর্যালোচনা প্রকাশিত হবে। বিভিন্ন সমস্যা ও ইসলামি দৃষ্টিতে তার সমাধানের কথা বলা হবে। জাতির সামনে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা তুলে ধরা হবে প্রকৃষ্ট ভাষায়। অশ্লীলতা ও ধ্বংসের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করে সুন্দর ও নিরাপদ জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

সুস্থ ধারার পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠনে অনেক বড় ভূমিকা রাখে। কিন্তু আফসোস ও দুঃখজনক হলো, বর্তমানে যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, তা মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদে ভরা থাকে। এতে বিভিন্ন অশ্লীল ছবি ও লেখা প্রকাশিত হয়। এ সকল পত্র-পত্রিকা সর্বদা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংবাদ প্রচার করে।

ঘ. বইপুস্তক প্রকাশ

রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের ইসলামি ও ধর্মীয় বই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, কবিতা ও সাহিত্যের বই প্রকাশ করবে। যাতে ইসলামের সৌন্দর্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে। মুসলিম মনিষীদের আলোকিত জীবনের আলোকময় বর্ণনা থাকবে।

নিঃসন্দেহে একটি ভালো বই যেমন একজন মানুষকে ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে বের করে হিদায়াতের আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারে। আবার একটি খারাপ বই একজন মানুষকে ধ্বংসের চূড়ান্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্র সর্বদা খেয়াল রাখবে যে, কোনোভাবেই যেন খারাপ, নোংরা ও চরিত্র-বিধ্বংসী কোনো বই প্রকাশ না হয়। চরিত্র-বিধ্বংসী কোনো বই যেন কারও হাতে না পৌছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. অনুবাদ কর্ম

মুসলিম উম্মাহর দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে, এমন ভিনদেশি বিভিন্ন উপকারী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই নিজ দেশের ভাষায় অনূদিত হবে। কারণ, মুসলিম তো সব ধরনের সংকীর্ণতা পরিহার করে জ্ঞানের সকল ঝর্ণা থেকেই পান করবে।

বিখ্যাত তাবেয়ি সাইদ বিন আবি বুরদা ﵀ বলেন, (আমাদের সময়ে) এ কথাটি বলা হতো :

الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَأْخُذُهَا إِذَا وَجَدَهَا

‘জ্ঞান হলো মুমিনের হারানো সম্পদ। যখনই তা খুঁজে পাবে, তখনই গ্রহণ করবে।’[৫৩৮]

চ. দায়ি প্রেরণ

দায়িগণ বিভিন্ন বসতিতে গিয়ে মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচার করবেন, মানুষের মধ্যে ইসলামি দাওয়াত ছড়িয়ে দেবেন, তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

‘আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম।’[৫৩৯]

উপরে আমরা যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, পরিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে একক কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র কোনো জামাআতের পক্ষে এ সকল পদক্ষেপ পুরোপুরিভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। কারণ, দুষ্কৃতিকারী ও ইসলামবিদ্বেষীর পক্ষ থেকে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আর এ সকল বাধা প্রতিহত করার জন্য শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, যা কেবল একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র কোনো জামাআতের পক্ষে তা প্রয়োগ করা খুবই কঠিন।

---

৫৩৮. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৭/২৪০, হা. নং ৩৫৬৮১ (মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ) - হাদিসটি সহিহ।

৫৩৯. সুরা আলি ইমরান : ১০৪

পাঁচ. জাকাত উসুল ও দারিদ্র্য দূরীকরণ

এ বিধানটি জাকাতসংক্রান্ত একটি বিধান, যা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম প্রধান খুঁটি, যা থেকে একমাত্র ফাসিক-ফাজিররাই দূরে থাকে। জাকাতব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়, শ্রম ও ঘাম দিতে হয়। জাকাতের অর্থ জমা করার জন্য বহুসংখ্যক মানুষকে নিয়োগ করতে হয়। তাই প্রতি বছর নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকদের কাছ থেকে জাকাত উত্তোলন করার এই গুরুদায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾

'তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করো, যাতে এর মাধ্যমে তুমি সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারো। আর তুমি তাদের জন্য দুআ করো। নিঃসন্দেহে তোমার দুআ তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ।'[৫৪০]

এমনিভাবে কেউ যদি জাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে জাকাত দিতে বাধ্য করা এবং জরিমানা হিসাবে তার উৎকৃষ্ট মাল বেছে নেওয়াও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। জাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللهِ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিদানের আশায় তা স্বেচ্ছায় দেবে, তবে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করবে, আমি তার সম্পদের ভালো অংশ নিয়ে নেব; আমাদের প্রভুর অধিকারসমূহের একটি অধিকার হিসাবে। এ থেকে সামান্য পরিমাণও মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের জন্য হালাল নয়।'[৫৪১]

৫৪০. সুরা আত-তাওবা : ১০৩

৫৪১. সুনানুদ দারিমি: ২/১০৪৩, হা. নং ১৭১৯ (দারুল মুগনি, সৌদিআরব) - হাদিসটি হাসান।

জাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। সহিহ বুখারিতে এসেছে, আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন সাহাবিদের সামনে এলেন। তখন জিবরিল ﷺ এসে বললেন, ইসলাম কী? তিনি বললেন :

الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ

'তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরিক করবে না। নামাজ আদায় করবে। ফরজ জাকাত দেবে এবং রমজানের রোজা রাখবে।'[৫৪২]

ইবনে উমর ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর। আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, রমজানের রোজা রাখা ও হজ করা।'[৫৪৩]

জাকাত দরিদ্রদের অধিকার, ধনীর পক্ষ থেকে কোনো দান নয়। জাকাত প্রদানের খাত মোট আটটি। আট শ্রেণির প্রত্যেক শ্রেণিকে বা যেকোনো এক শ্রেণিকে জাকাত প্রদান করলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

৫৪২. সহিহুল বুখারি : ১/১৯, হা. নং ৫০ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৫৪৩. সহিহ মুসলিম : ১/৪৫, হা. নং ১৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

'জাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়কারী ও (ইসলামের দিকে) যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[৫৪৪]

কিন্তু জাকাত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্রদের হক। যাতে তার প্রয়োজন পূরণ হয়, তার অসহায়ত্ব দূর হয়। যেকোনো ধরনের কষ্ট, দুর্দশা ও অসহায়ত্ব ব্যতীত সে সুখ-শান্তি ও সচ্ছলতার সাথে জীবনযাপন করতে পারে।

ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মুআজ বিন জাবাল ﵁-কে ইয়ামানের গভর্নর হিসাবে প্রেরণ করেন, তখন তাকে বলেছিলেন :

إِنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদের মালের মধ্যে তাদের ওপর জাকাত ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের দিয়ে দেওয়া হবে।'[৫৪৫]

এখান থেকে একটি মাসআলা বের হয় যে, মুসলমানদের আমির আল্লাহর শরিয়ত অনুযায়ী তাদের পরিচালনা করবেন। তিনিই ধনী ও নিসাবের মালিকদের থেকে জাকাত উসুল করার দায়িত্ব পালন করবেন। যাতে বিন্যস্ততার সাথে দরিদ্রদের নিকটে তা সুচারুভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ মুআজ বিন জাবাল ﵁-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাদের পরিচালনা করতে এবং তাদের থেকে জাকাত উসুলের দায়িত্ব পালন করতে। চাই তারা স্বেচ্ছায় দিক বা তাদের থেকে জোর করে আদায় করা হোক।

৫৪৪. সুরা আত-তাওবা : ৬০
৫৪৫. সহিহুল বুখারি : ২/১০৪, হা. নং ১৩৯৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

এর ওপর ভিত্তি করে এ কথা বলা যায় যে, নিসাবের মালিকদের থেকে জাকাত উসুলের দায়িত্ব মুসলিম রাষ্ট্রের কাঁধে বর্তিত হবে; হোক সেটা নগদ অর্থ, সোনা-রুপা বা গবাদি পশু অথবা ব্যবসায়িক পণ্যের জাকাত। সর্বোপরি, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, জাকাত উসুল ও বিতরণের কার্যক্রমকে একটি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে রূপদান করা এবং এতে দক্ষ ও বিশ্বস্ত লোকদের দায়িত্বশীল হিসাবে নিয়োগ দেওয়া।

এ সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক মালের মালিকদের কাছ থেকে তাদের মালের হিসাব নেবে। অতঃপর সেখান থেকে তাদের জাকাতের পরিমাণ মাল গ্রহণ করবে। কেউ যদি জাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে জাকাত দিতে বাধ্য করা এবং জরিমানা হিসাবে তার উৎকৃষ্ট মাল বেছে নেওয়াও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। জাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللهِ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিদানের আশায় তা স্বেচ্ছায় দেবে, তার জন্য প্রতিদান রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করবে, আমি তার সম্পদের ভালো অংশ নিয়ে নেব, আমাদের প্রভুর অধিকারসমূহের একটি অধিকার হিসাবে। এ থেকে সামান্য পরিমাণও মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের জন্য হালাল নয়।'[৫৪৬]

অনুরূপভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো জনগণের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যাতে তারা সব ধরনের অশান্তি, দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়ে সম্মানের সাথে নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারে। আর দারিদ্র্য মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা ও অশান্তিতে নিপতিত করার অনেক বড় একটি কারণ। রাষ্ট্রের সার্থকতা তো এটাই যে, রাষ্ট্র যেমনিভাবে মানুষের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব নেবে, অনুরূপভাবে সে তার জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দায়িত্বও গ্রহণ করবে। কারণ, মানুষের বাহ্যিক সুখ-শান্তির অনেকটাই নির্ভর করে অর্থিক সচ্ছলতার ওপর।

৫৪৬. সুনানুদ দারিমি: ২/১০৪৩, হা. নং ১৭১৯ (দারুল মুগনি, সৌদিআরব) - হাদিসটি হাসান।

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম মুসলিম জাতির তত্ত্বাবধানের জন্য, উম্মাহকে রক্ষা করার জন্য, বিপদকে প্রতিহত করার জন্য, কল্যাণের ফোয়ারায় সিক্ত করার জন্য; এগুলো হলো ইসলামি রাষ্ট্রের মূল ভূমিকা। ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের ওপর আবশ্যক হলো, উম্মাহকে কল্যাণের সাথে সঠিক পথে পরিচালনা করা। উম্মাহকে পরকালীন সমৃদ্ধি ও দুনিয়াবি কল্যাণের ওপর রাখা। উম্মাহর প্রতি ন্যায়বিচার করা। যদি শাসকরা এমন না হয়, তবে তারা মুসলিমদের শাসক হবার যোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ। তিনি স্বীয় বান্দাদের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উৎসাহিত করে, অবিচারের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عُبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ بِحَقِّهِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ عَامًا

'ন্যায়পরায়ণ বাদশার একদিন ষাট বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আর পৃথিবীতে যথাযথভাবে হদ (আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধি) প্রতিষ্ঠা করা চল্লিশ বছরের বৃষ্টির চেয়েও অধিক পবিত্র।'[৫৪৭]

বিশর বিন আসিম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُوقَفَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَجَا، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ فَهَوَى فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

'যে ব্যক্তি মুসলিমদের শাসনভার গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তাকে এনে জাহান্নামের সেতুর ওপর রাখা হবে। যদি সে তার

৫৪৭. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১১/৩৩৭, হা. নং ১১৯৩২ (মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়া, কায়রো) হাদিসটিকে ইমাম মুনজিরি ﷺ ও হাফিজ ইরাকি ﷺ হাসান বলেছেন। আর শাইখ আলবানি ﷺ হাদিসটিকে জইফ বলেছেন।

দায়িত্ব পালনে আন্তরিক থাকে, তবে সে সেতু পার হতে পারবে। আর যদি সে দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন না করে, তবে সেতুটি তাকে নিয়ে ধসে পড়বে। সে জাহান্নামের উক্ত স্থানে সত্তর বছর পর্যন্ত অবস্থান করবে।'[৫৪৮]

ছয়. বিচারকার্য পরিচালনা

রাষ্ট্রের এমন আরেকটি মহান দায়িত্ব হলো বিচারকার্য পরিচালনা করা। আল্লাহর শরিয়া অনুযায়ী ন্যায়সংগতভাবে মানুষের যেকোনো সমস্যার সমাধান দেওয়ার ব্যাপারে অনেক নস বর্ণিত হয়েছে। মানুষের যেকোনো ধরনের সমস্যার ন্যায়সংগত ও সত্যনিষ্ঠ সমাধানকেই বিচারকার্য বলা হয়। এটি ইসলামি রাষ্ট্রের মূল কাঠামোর অন্যতম অংশ। ইসলামি রাষ্ট্র ছাড়া এই কাজ অন্য কারও করার ক্ষমতা নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

'আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন মীমাংসা করো ন্যায়ভিত্তিক।'[৫৪৯]

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾

'নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান।'[৫৫০]

৫৪৮. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২/৩৯, হা. নং ১২১৯ (মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়া, কায়রো) - হাদিসটি জইফ।

৫৪৯. সুরা আন-নিসা : ৫৮

৫৫০. সুরা আন-নিসা : ১০৫

সাত. বিবিধ দায়িত্ব

এমনিভাবে ইসলামি শরিয়া কর্তৃক নিষিদ্ধ এমন কিছু কঠিন বিষয় রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করা, ভীতি প্রদর্শন করা এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সক্ষমতা শুধু ইসলামি রাষ্ট্রেরই আছে। যেমন : সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, মজুদকরণ, সিন্ডিকেটসহ সকল অবৈধ বিষয় থেকে সতর্ক করা, বারণ করা এবং শাস্তি প্রয়োগ করা একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা সংগঠনের পক্ষে সতর্ক করা ও বারণ করা সম্ভব হলেও শাস্তি প্রয়োগ করা সম্ভব নয় এবং তাদের সে অধিকারও নেই।

অজ্ঞতা, অসুস্থতা, দারিদ্র্যের ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া এবং শিক্ষা, সুস্থতা, প্রাচুর্যতা, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অন্যায়, অনিষ্ট, জুলুম বন্ধ করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। রাষ্ট্র প্রয়োজনে জেল, জরিমানা, প্রহার, দেশান্তরসহ বিভিন্ন শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে। রাষ্ট্র ছাড়া কার ক্ষমতা আছে, এই কঠিন কাজগুলো আনজাম দেওয়ার?

এমনিভাবে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়া, এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষেই কেবল সম্ভব। রেডিও, টেলিফোন, পত্রিকা, পুস্তক প্রকাশনা, বিভিন্ন ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে লেখালেখি ইত্যাদি কর্ম সুচারুভাবে পরিচালনা করা ইসলামি রাষ্ট্র ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আকর্ষণীয়ভাবে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে প্রচার করাও ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্য। যাতে মানুষ এই দ্বীনকে আগ্রহ সহকারে সানন্দে গ্রহণ করে এবং তারা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ানীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর এরাই হলো সফলকাম।'[৫৫১]

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের এসব নস দ্বারা এই দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি শরিয়ায় রাষ্ট্রের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থাৎ একটি শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান রাষ্ট্র ছাড়া ইসলামের ভিত মজবুত হয় না। রাষ্ট্র থাকলেই তথায় পূর্ণাঙ্গভাবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾

'আর আমি আদেশ করছি, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন।'[৫৫২]

শরিয়া অনুযায়ী বিচার করা, ইসলামি রাষ্ট্রের কাছে বিচার প্রার্থনা করা কাফির মুশরিকদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

'যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানানুসারে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।'[৫৫৩]

---

৫৫১. সুরা আলি ইমরান : ১০৪
৫৫২. সুরা আল-মায়িদা : ৪৯
[illegible]. সুরা আল-মায়িদা : ৪৪

যদি ইসলামের এমন কোনো ভূখণ্ড না থাকে, যা আল্লাহর শরিয়া অনুযায়ী সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাহলে এই দ্বীন মানুষের মস্তিষ্কে, বই-পুস্তকেই শুধু আবদ্ধ থেকে যাবে। দ্বীন কেবল তাত্ত্বিকতার মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়ে যাবে। মানুষ শুধু এতটুকু জানবে যে, ইসলাম নামে একটি ধর্ম আছে। কিন্তু জীবনে এর কার্যকারিতা কী, উপকারিতা কী—এগুলো কিছুই জানার সুযোগ পাবে না। বই-পুস্তকে শুধু 'ইসলাম শিক্ষা' শিরোনামে কয়েক লাইন লেখা-ই থাকবে, কিন্তু ইসলামের বাস্তবতা কেউ জানবে না। আবার অনেকাংশে ওই সামান্য লেখাটুকুও বিকৃত হতে থাকবে ।

একশ্রেণির কুচক্রি মহল ইসলামের যতটুকু তাদের জন্য ফায়দাজনক মনে করে, ততটুকুই কেবল তাদের মতো করে ব্যাখ্যা করে বিকৃতাকারে উল্লেখ করে। তাদের হীন পরিকল্পনা হলো, ইসলাম শুধু মানুষের মুখে থাকবে, কিন্তু তাদের জীবনে ইসলামের ওপর কোনো আমল থাকবে না। ঘরের কোণে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকেই মনে করা হবে ইসলাম, জীবনের আর সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে অচল মনে করা হবে। যদি ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশ ও জাতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করার সুযোগ না পায়, তাহলে ইসলাম অচল-অবশ, পরিত্যক্ত অবস্থায় নির্জনে-গহীনে কিংবা মসজিদের কোণে আবদ্ধ একটি চেতনাহীন নিষ্প্রাণ ধর্মে পরিণত হবে। অথবা ইসলাম বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, নিষ্প্রভ ও বিকৃত একটি ধর্মে রূপান্তরিত হবে, যাকে তখন আর মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ-এর আনীত ইসলাম বলা যাবে না।

বস্তুত ইসলাম ঘরের কোণে সীমাবদ্ধ কোনো ধর্মের নাম নয়। ইসলাম পালন শুধু ঘরে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলাম কেবল একটি ইবাদতের ধর্ম নয়; বরং রাষ্ট্রসহ পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম। ইসলাম একটি ক্ষমতা ও শক্তির নাম। অতএব, এই জাতিকে জাগতে হবে। ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রাককথন

'দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একই বংশোদ্ভুত' এ মতের ওপরই ইসলামি সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে। ইসলামে এ শিক্ষা খুব জোরালোভাবে দেওয়া হয়েছে যে, গোত্র, বর্ণ, বংশ, দেশ, ভাষা ইত্যাদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি নয়। পার্থিব এসব গুণাগুণ দিয়ে কোনো মানুষের মর্যাদা ও মান ঠিক করা ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। বরং এসব ক্ষেত্রে সকলের এক অধিকার ও সমান মর্যাদা প্রদান করে। হ্যাঁ, একটি মৌলিক জায়গায় এসে ইসলাম পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়। আর তা হলো আকিদা-বিশ্বাস। ইসলাম এ কথা বলে যে, যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী, যারা কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী, যারা শেষ নবির নবুওয়াতে বিশ্বাসী তারা সবাই এক সমাজ, তারা সবাই এক জাতি। এ বিশ্বাসের গণ্ডিতে প্রবেশের পর মর্যাদার মাপকাঠি হবে শুধু তাকওয়া দিয়ে। যার তাকওয়া বেশি সে-ই অধিক মর্যাদাবান; যদিও সে কালো, হাবশি ও কুৎসিত চেহারার কেউ হোক। এভাবেই বিশ্বাসী মুমিনদেরকে ইসলাম এক সমাজ ও এক জাতি বলে অভিহিত করেছে। এখানে সাদা-কালো, আরব-অনারব, ধনী-গরিবের কোনো ভেদাভেদ নেই।

সমাজব্যবস্থা উন্নত করতে এবং সুন্দর করতে ইসলাম অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন ব্যক্তিক জীবনে তার আচার-আচরণ কেমন হবে, পারিবারিক জীবনে তার চলাফেরা কেমন হবে, পড়শীদের সাথে তার উঠাবসা কেমন হবে; ইত্যাকার সব বিষয়েই তার জন্য ইসলাম সুনিপুণ নির্দেশনা দিয়েছে। আফসোস যে, আজ মুসলিমদের মধ্যে বিজাতীয় সংস্কৃতি ও কালচার প্রবেশ করে আমাদের মুসলিম সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে দিচ্ছে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভ্রাতৃত্ববোধ, দয়া, ইনসাফ, সাম্য সব ধীরে ধীরে আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছে। আমরা আজ সমাজকে পরিশুদ্ধ করার জন্য কত পদক্ষেপই না গ্রহণ করে থাকি, তবুও সমাজের অধঃপতন দমাতে পারছি না। এজন্য সমাজের নীতিনির্ধারকরা চিন্তিত ও পেরেশান। অথচ তারা একটু কষ্ট করে ইসলামের দিকে নজর দেওয়ার ফুরসতও খুঁজে পায় না। একমাত্র ইসলামেই রয়েছে সমাজব্যবস্থা সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায়,

কেবল এতেই রয়েছে সমাজের সকল অনাচার দূর করার সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি; তথাপি আমরা এ শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা পেছনে ফেলে মানবরচিত ব্যবস্থা নিয়ে পড়ে থাকি।

তাই মুসলিমদের জন্য অবশ্যকর্তব্য হলো, আমাদের সমাজব্যবস্থায় গেড়ে বসা বিজাতীয় সব সংস্কৃতি ছুড়ে ফেলে পুরোপুরিভাবে ইসলামপ্রদত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমরা যদি আজ সবাই মানবরচিত সমাজনীতি বর্জন করে ইসলাম নির্দেশিত নীতি গ্রহণ করে চলি, তাহলে সমাজের এ দুরবস্থা দূর হতে খুব বেশি সময় লাগবে না, সে কথা গ্যারান্টি দিয়েই বলা যায়।

আমরা এ অধ্যায়ে ইসলামি সমাজব্যবস্থার সৌন্দর্য ও দিকনির্দেশনা নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব। এতে আমাদের উপলব্ধি করা সহজ হবে যে, একটি উন্নত সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণে ইসলাম আমাদের কত সুন্দর ও নিখুঁত নীতিমালা দিয়েছে! কত সুন্দরভাবে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক—সব বিষয়ের ওপর উত্তম নির্দেশনা দিয়েছে!

ইসলামি সমাজের রূপরেখা

ইসলামি সমাজের রূপরেখার ব্যাপারে কথা বলতে হলে প্রথমত মানব জীবনের কয়েকটি মৌলিক অংশ নিয়ে কথা বলতে হয়। এ অংশগুলো একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেগুলো হলো :

১. ব্যক্তি

২. পরিবার

৩. সমাজ

ক্রমানুসারে আলোচনায় প্রথমে আসে মানুষের ব্যক্তিজীবন। এ আলোচনাতে ব্যক্তিজীবনের তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। যথা :

প্রথমত, স্রষ্টার সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক।

দ্বিতীয়ত, আপন সত্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তির করণীয়।

তৃতীয়ত, সামষ্টিক পটভূমিতে ব্যক্তির অবস্থান।

ব্যক্তির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক

সত্যিকার মুমিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হবে। অন্য সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে মনোযোগী হবে আল্লাহর প্রতি। রবের সাথে তার এরকম সম্পর্ক আল্লাহকে এক বলে মানা এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার সাক্ষ্য দেয়। মুমিন ব্যক্তির মন-মস্তিষ্কে থাকবে তাওহিদের কথা, মুমিনের অস্তিত্বই হবে আল্লাহর একত্ববাদ জানা ও মানার মাধ্যমে। মুমিন ব্যক্তির বিশ্বাস হবে যে, আল্লাহ স্রষ্টা, তিনি রূপদাতা, তিনি সৃজনকারী, তিনি রক্ষাকর্তা। তিনি সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন। কোনো কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। পৃথিবীর কোনো শস্যদানা, পানির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফোঁটা, গাছ থেকে ঝরে পড়া কোনো পাতা—কোনোটির এমন কোনো অংশ, পরিমাণ বা অবস্থা নেই, যা তাঁর অগোচরে রয়েছে। মুমিন ব্যক্তি মাত্রই এসবে বিশ্বাস করবে এবং তার কর্মে এর প্রতিফলন ঘটবে। তিনটি কাজের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর ও গাঢ় করতে পারি। যথা : আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশে মুমিন ব্যক্তির পূর্ণতা থাকা। আল্লাহকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা। একনিষ্ঠ হয়ে একমাত্র রবের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। এখানে প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ তুলে ধরছি।

ক. আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশে মুমিন ব্যক্তির পূর্ণতা থাকা

স্বীয় অন্তর, মস্তিষ্ক, অনুভূতি ও গঠন-আকৃতি—সবকিছু দিয়ে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করবে। এ মনোনিবেশের ফলে আল্লাহর প্রতি অবনত হওয়া, তাঁর সামনে নম্র হওয়া, তাঁর অপরিসীম ক্ষমতার সামনে ভয়ার্ত থাকার সৌভাগ্য লাভ হবে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট মন নিয়ে থাকবে। তার অনুভূতি, তার কাকুতি-মিনতি হবে ভাষায় :

﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

‘আমার মুখমণ্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।’[৫৫৪]

খ. আল্লাহকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা

মুমিন বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবে শুধু আল্লাহ তাআলাকে, অন্য কাউকে নয়। এমন মুমিনই আল্লাহর নিকটবর্তী হবে। এমন মুমিনই তার সকল ধ্যান-জ্ঞান নিয়োগ করে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে পারবে।

আল্লাহ বলেন :

﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

‘বলো, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমার অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করব, যিনি হলেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি রিজিক দান করেন, কিন্তু কারও রিজিক গ্রহণ করেন না। তুমি বলো, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আমিই যেন প্রথম হই। আর (আমাকে এই বলে আদেশ করা হয়েছে যে,) তুমি মুশরিকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে না।’[৫৫৫]

গ. একনিষ্ঠ হয়ে একমাত্র রবের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা

এমনিভাবে আল্লাহর আদেশের অনুগত হওয়া, তাঁর ইবাদত করা সবই হতে হবে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ইখলাস রেখে। এ ক্ষেত্রে ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করলে ইবাদতের এ মনোনিবেশ আল্লাহর প্রতি হবে না; বরং তা কিছু অংশে আল্লাহর প্রতি আর কিছু অংশে গাইরুল্লাহর প্রতি হবে। ফলে

৫৫৪. সুরা আল-আনআম : ৭৯
৫৫৫. সুরা আল-আনআম : ১৪

ইবাদত যত কষ্ট করে বা যত বেশি পরিমাণেই করা হোক না কেন, তার কোনো দাম থাকবে না। ইবাদত মূল্যহীন হবে, যদি তাতে ইখলাস না থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾

'তাদের শুধু এই নির্দেশই করা হয়েছে যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। আর এটাই সঠিক ধর্ম।'[৫৫৬]

﴿ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ﴾

'তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।'[৫৫৭]

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾

'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না।'[৫৫৮]

৫৫৬. সুরা আল-বাইয়্যিনা : ৫
৫৫৭. সুরা আল-আনআম : ১০২
৫৫৮. সুরা বনি ইসরাইল : ২৩

মুমিনের সাথে রবের সম্পর্কের স্বরূপ

মুমিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহর সম্পর্ক গড়ে উঠবে পূর্ণ স্বীকৃতির মাধ্যমে। এ সম্পর্ক গঠিত হবে আল্লাহকে এক মেনে নেওয়া, একমাত্র তাঁর ইবাদত করা ও মাবুদ হিসাবে একমাত্র তাকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে। এ সম্পর্ক গঠিত হবে তাঁকে এক ও অমুখাপেক্ষী মেনে নেওয়ার মাধ্যমে। এ বিশ্বাস রাখার মাধ্যমে যে, কোনো উপকার হলে তিনিই করেন, তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কোনো কিছুই ক্ষতি করার এতটুকু শক্তি পর্যন্ত রাখে না। তিনিই মুক্তিদাতা, তিনিই বিপদে উদ্ধারকারী, অন্য কেউ নয়। এ বিরাট বিষয়গুলোই পবিত্র কুরআন মাজিদের ছোট একটি সুরাতে বর্ণিত হয়েছে। গুরুত্ব, মর্মার্থ ও গূঢ়তত্ত্বের অধিকারী হওয়ার কারণে যে সুরাকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান বলা হয়। সে সুরাটি হলো সুরা ইখলাস। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ - اللهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾

'বলুন, তিনি আল্লাহ অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'[৫৫৯]

তাওহিদের এ পবিত্র অনুভূতি যদি কারও মাঝে থাকে, তবে সে মানুষের অন্তরে সূক্ষ্ম মর্মোপলব্ধি থাকা আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়। এ অনুভূতির ফলে মুমিন অন্তরের সাথে আল্লাহর এক মজবুত সম্পর্ক তৈরি হয়। এ অনুভূতি মহান আল্লাহর প্রতি সঠিকরূপে সঠিক অর্থে পূর্ণ মনোনিবেশে সাহায্য করে। তাওহিদের এ চেতনা মানুষকে এ বোধ দান করে যে, আল্লাহ সর্বদা প্রতিটি কর্মের ব্যাপারে অবগত। কী গোপন কী প্রকাশ্য— সকল ব্যাপারেই তিনি জ্ঞাতা। তাওহিদের এ চেতনার ফলে মুমিন ইবাদত ও আনুগত্যে এগিয়ে আসে এবং তার পরিপূর্ণ বোধ থাকে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। তিনি তার দিকে তাকিয়ে আছেন। যদি আমি ইবাদত

৫৫৯. সুরা আল-ইখলাস

করি, তবে তিনি আমার পক্ষে সাক্ষী হয়ে থাকবেন। কিন্তু যদি ইবাদত না করে নাফরমানি করি, তবে তিনি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে থাকবেন। তাওহিদের এ চেতনা থাকার ফলে তার মাঝে এ বোধ থাকে যে, তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ আল্লাহ দেখছেন। এমন কোনো পর্দা নেই, যা কারও প্রকাশ্য গুনাহকে ঢেকে দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে লুকোতে পারে। এমন কোনো আড়াল নেই, যা অপ্রকাশ্য গুনাহকে আল্লাহর অগোচরে রাখতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾

'তারা কি জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ তাদের রহস্য ও সলা-পরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়?'[৫৬০]

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

'আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন, তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদের জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'[৫৬১]

৫৬০. সুরা আত-তাওবা : ৭৮
৫৬১. সুরা আল-মুজাদালা : ৭

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, জিবরাইল ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন :

مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'ইহসান কী?' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এমনভাবে তোমার রবের ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না-ই পাও, তবে ভাববে তিনি তো তোমায় দেখছেন।'[৫৬২]

বিশুদ্ধ ও সঠিক ইমানের দাবি হলো, আল্লাহর একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া, একমাত্র তাঁর ইবাদত করা, তাঁকেই ইলাহ হিসাবে মানা, অন্য কাউকে নয়। এ বিষয়গুলো সাধিত হবে আল্লাহর শরিয়তের পূর্ণ অনুগত হওয়ার মাধ্যমে সারাটি জীবন তাঁর শরিয়তের অনুসরণের মাধ্যমে এ বিশ্বাস ও ইবাদত পূর্ণ হবে। কিন্তু যদি তাঁর শরিয়ত ব্যতীত অন্য কোনো মানবরচিত আইন-কানুন মানা হয়, তবে তা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আল্লাহর শরিয়ত ব্যতীত অন্যান্য ব্যবস্থা সুস্পষ্ট কুফরি। মানবরচিত সংবিধান মানেই হলো আল্লাহর শক্তিমত্তার চেয়ে অন্য কারও শক্তিমত্তা অধিক হওয়ার দাবি করা। অথচ পূর্ণতা, শক্তিমত্তায় আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। বিধানদাতা হওয়ার যোগ্য সত্তা একমাত্র তিনিই, অন্য কেউ নয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾

'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ অমান্য করে। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।'[৫৬৩]

৫৬২. সহিহুল বুখারি : ১/১৯, হা. নং ৫০ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৫৬৩. সুরা আল-আহজাব : ৩৬

মোটকথা, ব্যক্তির সাথে রবের সম্পর্ক হলো সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক। অন্যভাবে বললে, এ সম্পর্কের মূল কথা হবে, বান্দা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হওয়া। এ আত্মসমর্পণ যত বেশি ও যতটুকু পরিমাণে হবে, ততই সম্পর্ক মজবুত ও গাঢ় হতে থাকবে। ফলে বান্দা আল্লাহর নৈকট্যশীল হয়ে যায়।

আপন সত্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তির করণীয়

ইসলাম ব্যক্তিকে সকল ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকার আদেশ দিয়েছে। এমন কোনো কাজ করার অনুমতি ইসলাম দেয় না, যা তাকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়। এজন্য বলা যায়, ইসলামি নীতিমালা হলো ব্যক্তির জন্য রক্ষাকবচ।

ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর নিজের প্রতি পূর্ণ আমানতদারিতাকে হওয়া আবশ্যক করেছে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে কল্যাণকর কাজে প্রবৃত্ত করা, সঠিক ও শুদ্ধতার পথে চলা আবশ্যক করেছে। এমনিভাবে নিরাপদ থাকার স্বার্থে সকল ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ করেছে।

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে নিজের ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন উপাদান তথা নিজ শরীর, আত্মা, ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি এবং এদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু যদি এ সকল উপাদানে বা তাদের অধিকারে সামান্য পরিমাণও সীমালঙ্ঘন হয়; তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তা আল্লাহর শরিয়ত লঙ্ঘনের সমান অপরাধ, আল্লাহর দেওয়া নীতিমালা থেকে বের হয়ে যাওয়ার নামান্তর। প্রভুপ্রদত্ত এ মানহাজের বৈশিষ্ট্যই হলো এমন যে, এটি মুসলিম ব্যক্তির সম্পূর্ণ রক্ষাকবচ। তাকে রক্ষা করে আত্মিক, শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আর্থিকসহ তার সকল ব্যক্তিসত্তা-সংশ্লিষ্ট দিক থেকে। যেন সে ব্যক্তি নিজে এবং তার মতো অন্যরা সুপ্রসন্ন জীবনযাপন করতে পারে।

আত্মহত্যা ভয়াবহ এক সীমালঙ্ঘন

নিঃসন্দেহে নিজের আত্মার ওপর সীমালঙ্ঘন করা গুরুতর একটি অপরাধ। কেউ যদি নিজেকে ধ্বংস করে অথবা হত্যা করে সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে নিজের ওপর জুলম করে নিজেই নিজের ক্ষতি করল। আত্মহত্যা করে নিজেকে ধ্বংস করার এ সীমালঙ্ঘন ইসলামের দৃষ্টিতে অনেক বড় পাপকর্ম।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴾

'আর তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে শীঘ্রই আমি আগুনে নিক্ষেপ করব। এটি আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।'[৫৬৪]

আত্মহত্যাকারী আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকারকারী

আল্লাহর বিশেষ দান হলো মানুষের আত্মা। আত্মহত্যাকারী স্বীয় আত্মার ওপর জুলমকারী। আত্মহত্যাকারীর ব্যাপারে হাদিসের মাঝে কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

'যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে অবস্থান করে সব সময়ের জন্য তা দিয়ে তার পেটে ঘা মারতে

৫৬৪. সুরা আন-নিসা : ২৯-৩০

থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে সেই বিষ তার হাতে থাকবে, আর জাহান্নামের আগুনে অবস্থান করে সব সময়ের জন্য সে তা গলধঃকরণ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে, সে ব্যক্তি সর্বদা জাহান্নামের নিচের দিকে পড়তে থাকবে।'[৫৬৫]

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فَجَزِعَ مِنْهُ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَجَرَحَ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ : عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ. حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

'তোমাদের পূর্বকার সম্প্রদায়ের এক লোকের দেহে একটি টিউমার দেখা দেয়। এতে সে ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ে। একসময় সে একটি ছুরি নিয়ে নিজ হাতের টিউমারটি কেটে ফেলে। ফলে তার রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে। এ বিষয়ে আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা নিজের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। তার জন্য আমি জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।'[৫৬৬]

এ সকল নস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আত্মহত্যা করা একটা জঘন্য পাপকাজ। এতে তো নিজেকে ধ্বংস করার ব্যাপারটা রয়েছেই, অন্যদিকে রয়েছে ঘোর ক্ষতি ও জাহান্নামের আজাব। এটি অত্যন্ত গর্হিত একটি কাজ। তবে আত্মহত্যাকারী মুসলিম হলে এ পাপের কারণে কাফির হয় না বা কাফিরের মতো চিরস্থায়ী আজাব ভোগ করে না, বরং সে অন্যান্য কবিরা গুনাহকারীর মতো। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন এবং চাইলে জাহান্নামের আজাব ভোগ করিয়ে তারপর মুক্তি দিতে পারেন।

৫৬৫. সহিহ মুসলিম : ১/১০৩, হা. নং : ১০৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৫৬৬. সহিহুল বুখারি : ৪/১৭০, হা. নং ৩৪৬৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

ইমাম নববি ﵀ বলেন, এ হাদিসের[৫৬৭] মাঝে আহলুস সুন্নাহর জন্য একটি মূলনীতির দলিল আছে। তা হলো, যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে অথবা এ জাতীয় কোনো কবিরা গুনাহ করবে এবং তাওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করবে, সে কাফির হবে না এবং অকাট্যভাবে তার দোজখে অবস্থানও সুনিশ্চিত নয়; বরং সে আল্লাহর ইচ্ছায় থাকবে—চাইলে তাকে মুক্তি দেবেন আর না চাইলে জাহান্নামে রাখবেন।[৫৬৮]

আত্মহত্যা কবিরা গুনাহ ও অত্যন্ত গর্হিত একটি কাজ। মানুষের উচিত নিজেকে এ ধরনের কাজ ও অন্যান্য মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করা। নিজেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে নিয়ামত ও কল্যাণের ওপর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করা।

এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾

'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে সফল হলো। আর পার্থিব জীবন ধোঁকার আসবাব ছাড়া আর কিছু নয়।'[৫৬৯]

৫৬৭. তুফাইল বিন আমর ﵁ হতে বর্ণিত তাঁর সমগোত্রীয় এক লোকের আত্মহত্যা করার হাদিসটি দ্রষ্টব্য। ঘটনা হলো তুফাইল রা.-এর গোত্রের এক লোক তাঁর সাথে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। এখানে এসে হাতের আঙুলে ফোড়া জাতীয় কিছু হলে তিনি সহ্য করতে না পেরে তা কেটে ফেললেন। এতে অধিক রক্তক্ষরণ হওয়ায় শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে তাঁকে স্বপ্নে দেখা গেল, সীমালঙ্ঘন করায় তাঁর হাত ভালো না হলেও হিজরতের কারণে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সা. সব জানার পর তাঁর হাত ভালো করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। দেখুন : সহিহ মুসলিম : ১/১০৮, হা. নং ১১৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৫৬৮. শারহু মুসলিম : ২/১৩১-১৩২ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৫৬৯. সুরা আলি ইমরান : ১৮৫

মুমিনের শক্তিশালী হওয়া

শারীরিক দিক থেকে প্রত্যেক মুসলিমকে ইসলাম আহ্বান করে নিজের শরীরের উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করতে, শরীরচর্চা ও অনুশীলন করতে। যেন শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। কেননা, শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে উত্তম; যদিও উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে।

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ،

'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিন হতে উত্তম ও অধিক পছন্দনীয়। তবে উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি উপকারী বস্তুর প্রতি আগ্রহী হও। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। অক্ষম হয়ো না।'[৫৭০]

শক্তি অর্জন ও শারীরিক শক্তির অন্যতম উপাদান হলো নিক্ষেপণ। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

'জেনে রেখো, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা; জেনে রেখো, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা; জেনে রেখো, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা।'[৫৭১]

ইসলামে উদ্যমতা অর্জন ও শারীরিক কসরত করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। শক্তি অর্জনের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। যেমন : নিক্ষেপ করা, সাঁতার কাটা, দৌড়ানো। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَهْوٌ وَسَهْوٌ، إِلَّا أَرْبَعَ خِصَالٍ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ

৫৭০. সহিহ মুসলিম : ৪/২০৫২, হা. নং ২৬৬৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৫৭১. সহিহ মুসলিম : ৩/১৫২২, হা. নং ১৯১৭ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

'আল্লাহর জিকির ব্যতীত সকল কাজই অনর্থক ও তামাশা। তবে চারটি জিনিস ব্যতীত। এক. দু'লক্ষ্যের মাঝে দৌড়ানো। দুই. ঘোড়সওয়ারি শেখা। তিন. স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা ও হাসি কৌতুক করা। চার. সাঁতার কাটা।'[৫৭২]

আবু রাফি ﵁ বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম :

حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ، وَالسِّبَاحَةَ، وَالرَّمْيَ، وَأَنْ يُوَرِّثَهُ طَيِّبًا

'হে আল্লাহর রাসুল, সন্তানের ওপর আমাদের যেমন হক আছে, সন্তানেরও কি আমাদের ওপর হক আছে? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। পিতার ওপর সন্তানের অধিকার হলো, পিতা সন্তানকে লেখা শেখাবে, সাঁতার শেখাবে, নিক্ষেপণ শেখাবে এবং তাকে উত্তম ওয়ারিস বানাবে।'[৫৭৩]

অসুস্থতা থেকে আরোগ্য

ইসলাম রোগ থেকে সাবধান করে। সাবধান করে যেন কোনো রোগ আক্রমণ করতে না পারে। রোগের কারণে কাউকে যেন ক্ষতিতে পড়তে না হয়। কারণ, রোগের কারণে ইবাদত পালনে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়।

তেমনই প্লেগ রোগের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এটি একটি সংক্রামক রোগ। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ হলো, যে সম্প্রদায় এতে আক্রান্ত হয়েছে, তারা তাদের দেশ থেকে বের হবে না। কারণ, হতে পারে তারা এ দেশ থেকে বের হয়ে অন্য স্থানে গেলে অন্যরাও এ রোগে আক্রান্ত হবে। তাই এরকম রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য অন্য কোনো লোকালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

৫৭২. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৮/১১৯, হা. নং ৮১৪৭ (দারুল হারামাইন, কায়রো) -হাদিসটি সহিহ।
৫৭৩. আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১০/২৬, হা. নং ১৯৭৪২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি জইফ।

উসামা বিন জাইদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللهُ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

'প্লেগ শাস্তির লক্ষণ। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে এর মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। যখন তোমরা এ রোগের কোথাও ছড়িয়ে যাওয়ার কথা শুনবে, তোমরা সেখানে গমন করবে না। আর যদি তোমাদের বসবাসের স্থানে এটি ঘটে, তবে তোমরা সেখান থেকে বের হবে না।'[৫৭৪]

খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কারণে বদহজম হয়ে থাকে। এ রোগে পেটের তো অসুবিধে হয়-ই, সাথে সমস্ত শরীরের ওপর এর প্রভাব পড়ে। কোনো মানুষ যদি খাওয়ার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে খায়, তবে এ রোগ অনিবার্য। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে অলসতা ও স্থূলতা বেড়ে যায়। দুর্বলতা, হীনম্মন্যতা জেঁকে বসে। ইসলাম কখনো এটি আশা করে না যে, কোনো মুসলিম অলসতা, দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতায় ভুগবে; বরং ইসলাম চায়, প্রত্যেক মুসলিম যেন সুঠামদেহী, উদ্যমী ও সাহসী হয়।

পেট পূর্ণ করে খাওয়া সম্পর্কে হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে। মিকদাম বিন মাদিকারাব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ

'বনি আদমের পেট পুরে খাওয়া অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়।'[৫৭৫]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، يَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، أُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي

৫৭৪. সহিহ মুসলিম : ৪/১৭৩৭, হা. নং ২২১৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৫৭৫. মুসনাদু আহমাদ : ২৮/৪২২, হা. নং ১৭১৮৬ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) হাদিসটি সহিহ।

'অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে কিছু লোক বিভিন্ন পদের খাবার খাবে, বিভিন্ন রকমের পানীয় পান করবে, বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরবে, তারা আড্ডায় মেতে উঠবে। এরাই হবে আমার উম্মতের মাঝে সর্বনিকৃষ্ট শ্রেণি।'[৫৭৬]

মিকদাম বিন মাদিকারাব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

'মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক লোকমা খাবারই তার জন্য যথেষ্ট। তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলির এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।'[৫৭৭]

এ হাদিসে মুমিনদের দুনিয়ার খাবার-দাবারের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। খাবারের ক্ষেত্রে জরুরত পরিমাণ বা পরিমিত খাবারই যথেষ্ট। বেশি খাওয়া মুমিনদের গুণ নয়। তবে এ থেকে এমনটি ভাবা উচিত নয় যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষুধার্ত থাকাই উত্তম। অবশ্য ক্ষুধার্ত থাকার ফজিলত প্রয়োজনভেদে ভিন্ন স্থানে প্রযোজ্য। তাই উত্তম হবে একবেলা ক্ষুধা সহ্য করা, আরেক বেলা খাবার খাওয়া। এতে দেহে শক্তি বৃদ্ধি ঘটে, শরীরে উদ্যমতা আসে। তাই সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকা বর্জনীয়। কেননা, তা শরীরের ওপর জুলুম।

৫৭৬. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৩/২৪, হা. নং ২৩৫১ (দারুল হারামাইন, কায়রো) - হাদিসটি সহিহ।
৫৭৭. মুসনাদু আহমাদ : ২৮/৪২২, হা. নং ১৭১৮৬ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুআ ছিল :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ

'হে আল্লাহ, আমি ক্ষুধা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। কেননা, তা বিছানায় জড়িয়ে দেবার কারণ। আপনার কাছে আশ্রয় চাই খিয়ানত করা হতে। কারণ, খিয়ানতের বন্ধুত্ব কতই না মন্দ!'[৫৭৮]

হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ : لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا، أَوْ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ

'আল্লাহ তাআলা আমার কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন যে, তিনি আমার জন্য মক্কার মরুভূমিকে স্বর্ণ বানিয়ে দেবেন। আমি বললাম, না, হে রব, বরং আমি একদিন তৃপ্তিসহ খাব, একদিন ক্ষুধার্ত থাকব। যেদিন আমি ক্ষুধার্ত থাকব, সেদিন আপনার নিকট বিনীত হব, আপনাকে স্মরণ করব। আর যেদিন আমি তৃপ্তি সহকারে খাব, সেদিন আপনার প্রশংসা করব এবং আপনার শোকর আদায় করব।'[৫৭৯]

বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে মুসলিম নিজ মস্তিষ্ককে ইলমে নাফি বা উপকারী জ্ঞান দিয়ে সজীব রাখবে। যেন সে আলিম বা আরিফ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ইলমে নাফি অর্জন করার প্রতি সচেষ্ট থাকবে, সে আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদাবান হবে। কারণ, যাদের জ্ঞান রয়েছে আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা অনেক। এরাই মূলত জীবিত মস্তিষ্কের অধিকারী, জীবিত অন্তরের মানুষ। এরাই উত্তমতা ও কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে।

---

৫৭৮. সুনানুন নাসায়ি : ৮/২৬৩, হা. নং ৫৪৬৮ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

৫৭৯. সুনানুত তিরমিজি : ৪/১৫৩, হা. নং ২৩৪৭ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

ইসলামের মতো অন্য কোনো ধর্ম বা মতাদর্শ মানুষকে ইলম অর্জনের প্রতি এত উৎসাহিত করেনি। ইসলাম জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করে, জ্ঞানের পাথেয় অর্জন করতে বলে। ইসলাম জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য রেখেছে বহু নিয়ামত। পবিত্র কুরআনে ইলম ও আলিমের মর্যাদা এভাবে বর্ণিত হচ্ছে :

﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন। আল্লাহ খবর রাখেন, যা কিছু তোমরা করো।'[৫৮০]

সর্বোপরি একজন মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে নিজের প্রতি খেয়াল রাখবে, স্বীয় আত্মার সংশোধন করবে, নিজেই নিজের ক্ষতি ত্বরান্বিত করবে না এবং সীমালঙ্ঘন করবে না। নিজের শরীরের সুস্থতা ও শক্তিমত্তা নিশ্চিত করবে। রোগ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। সর্বদা উত্তম ও কল্যাণের বাহক হবে। উপকারী জ্ঞান অর্জন করবে। এভাবে সে একজন আদর্শ মুমিনে পরিণত হবে।

সামষ্টিক পটভূমিতে ব্যক্তির অবস্থান

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, একজন মুসলিম হবে ইতিবাচক চিন্তাধারার। সে নেতিবাচক চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। দূরে থাকবে হীনম্মন্যতা, পরাজয়বোধ থেকে। অলসতা, অক্ষমতা ও দুর্বলতা তাকে ছুঁতে পর্যন্ত পারবে না। একজন মুসলিম হবে প্রভাবক, কর্মঠ, উদ্যমী, সাহসী ও পরিশ্রমী। নিজের চারপাশের লোকদের প্রতি সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। নিজ সমাজের কল্যাণকামী হবে, সকলের উপকারে কাজ করবে। সমাজ থেকে ক্ষতিকর বস্তু ও মাধ্যম দূর করবে ও অকল্যাণকে ঝেড়ে ফেলবে। এমনিভাবে একজন মুসলিম হবে অহংকার, আমিত্ববোধ, আত্মপ্রীতি থেকে মুক্ত। এর বদলে সে হবে বিনয়ী, সরল ও অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী।

---

৫৮০. সুরা আল-মুজাদালা : ১১

যেমন হবে একজন মুসলিম

একজন মুসলিম হবে কল্যাণের পাহারাদার, বিশ্বস্ততার প্রতীক। ফলে সমাজ থাকবে অকল্যাণ থেকে মুক্ত। মুমিনের দৃষ্টি হবে প্রখর, অন্তর হবে বিশুদ্ধ। মুমিন হবে সদাসচেতন, সদাজাগ্রত। যেন কোনো দিক থেকে শত্রু বা অনিষ্ট আঘাত হানতে না পারে।

এ ব্যাপারে ইয়াজিদ বিন মারসাদ ﷺ সূত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে :

كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَغْرَةٍ مِنْ ثُغَرِ الْإِسْلَامِ، اللهَ اللهَ لَا يُؤْتَى الْإِسْلَامُ مِنْ قِبَلِكَ

'প্রত্যেক মুসলমানই ইসলামি ভূখণ্ডের অতন্দ্র প্রহরী। তাই তোমার দিক থেকে যেন কোনো অনিষ্ট আসতে না পারে, সে ব্যাপারে খুব সচেতন থাকো।'[৫৮১]

কোনো মুমিন হতাশায় ভোগে—এমন যেন না হয়। সে যেন নেতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন না হয়। মুমিনদের কারোই অমনোযোগী বা বেখেয়ালি হওয়া উচিত নয়।

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ

'যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো কাজে গুরুত্বারোপ করে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৫৮২]

ইসলামি সমাজের প্রত্যেক সদস্য নিজেদের পরস্পর সহযোগিতা করবে। তারা একে অপরের কল্যাণকামী হবে। কোনো ক্ষতি হোক কখনো এমনটি চাইবে না। সমাজের প্রত্যেক সদস্যই চাইবে যে, মুসলিমদের কল্যাণ

৫৮১. আস-সুন্নাহ, মারুজি : পৃ. নং ১৩, হা. নং ২৮ (মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি মুরসাল সহিহ।

৫৮২. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/৩৫৬, হা. নং ৭৯০২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

হোক। সে জন্য সে কল্যাণকর কাজগুলোই করবে। এভাবে প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হবে অপর মুসলিম ভাইদের সকল দিক থেকে রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা, তাদের বিষয়গুলোতে সজাগ দৃষ্টি রাখা। যেন কোনো অনিষ্ট বা শত্রু তাদের ক্ষতি করতে না পারে।

যখন সকল মুসলিম এমন সচেতন ও গুরুত্বদানকারী হবে, তখন মুসলিমদের মাঝে শান্তির ফোয়ারা বয়ে যাবে। তারা জুলুম থেকে সহজেই মুক্তি পাবে, বাঁচতে পারবে ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে।

নুমান বিন বাশির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا : لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

'প্রত্যেক মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হলো, সে অপর মুসলিমের সাহায্যকারী হবে। একজন অপরজনের ওপর জুলুম করবে না, তাকে জালিমের কাছে সোপর্দ করবে না, অপমানিত করবে না। এভাবেই গঠিত হবে সুরক্ষিত মুসলিম সমাজ। যে সমাজে থাকবে সৎ কাজে সাহায্য এবং একে অপরকে ভালোবাসা।'[৫৮৩]

আবু মুসা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীরস্বরূপ। এর এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।'[৫৮৪]

৫৮৩. সহিহুল বুখারি : ৩/১৩৯, হা. নং. : ২৪৯৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৫৮৪. সহিহুল বুখারি : ৮/১২, হা. নং. : ৬০২৬ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'পারস্পরিক দয়া-ভালোবাসার ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মতো। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন অনিদ্রা ও জ্বরের মাধ্যমে পুরো দেহ সাড়া দেয়।'[৫৮৫]

মুমিনদের সাদৃশ্য হলো একটি দেহের ন্যায়। তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ। তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে পরস্পর সহযোগী। অন্যদিকে যে সকল মুসলিম নামধারী ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে গিয়ে বিধর্মীদের সহযোগী হয়, সে তার ইমান হারায়। সে আর মুসলিম থাকে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

'তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদের পথপ্রদর্শন করেন না।'[৫৮৬]

প্রত্যেক মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হলো, তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সে গুরুত্বারোপ করবে। পাগল, শিশু ব্যতীত কেউই এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দায়িত্ব পালন করতে হবে সঠিকরূপে।

ইবনে উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

৫৮৫. সহিহ মুসলিম : ৪/১৯৯৯, হা. নং ২৫৮৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৫৮৬. সুরা আল-মায়িদা : ৫১

'তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হবে। ইমাম দায়িত্বশীল, তাকে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর সংসারে দায়িত্বশীল, তাকে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। খাদিম তার মনিবের সম্পত্তিতে দায়িত্বশীল, তাকে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।'[৫৮৭]

মুসলিমদের কল্যাণ কামনাও প্রকৃত মুসলিমদের একটি বৈশিষ্ট্য। আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ. قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

'নিশ্চয় দ্বীন হলো কল্যাণকামনা, নিশ্চয় দ্বীন হলো কল্যাণকামনা, নিশ্চয় দ্বীন হলো কল্যাণকামনা। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, কার কল্যাণকামনা? তিনি বললেন, আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসুলের, মুমিনদের নেতৃবর্গের ও তাদের সাধারণ জনগণের কল্যাণকামনা।'[৫৮৮]

মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য হলো, অপর মুসলিমের সাহায্যে উদ্যমী হওয়া, অপর ভাইয়ের উপকারে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, এক লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসুল, 'আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় মানুষ কে?' তিনি বললেন :

৫৮৭. সহিহুল বুখারি : ২/৫, হা. নং ৮৯৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৫৮৮. সুনানুন নাসায়ি : ৪১৯৯, হা. নং ৭/১৫৭ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব)
- হাদিসটি সহিহ।

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دِينًا، أَوْ تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ

'মানুষের মাঝে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় হলো, মানুষের জন্য অধিক উপকারী মানুষটি। আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল হলো, কোনো মুসলিমকে আনন্দিত করা, অথবা তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা কিংবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা মিটিয়ে দেওয়া। কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আমি যদি তার সাথে যাই, তবে তা এ মসজিদে নববিতে একমাস ইতিকাফ করার চেয়েও আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি তার রাগ প্রতিরোধ করবে, আল্লাহ তার লজ্জার কর্মটি গোপন রাখবেন। যদি কেউ নিজ ক্রোধের প্রতিফলন ঘটানোর সামর্থ্য রেখেও ক্রোধ সংবরণ করে, তবে আল্লাহ তার অন্তরে কিয়ামত দিবসের কল্যাণের আশা পূর্ণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনে তার ভাইয়ের সাথে হেঁটে যায় ও তার প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে সুস্থির রাখবেন, যেদিন সবার পা কম্পমান থাকবে।'[৫৮৯]

৫৮৯. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৬/১৩৯-১৪০, হা. নং ৬০২৬ (দারুল হারামাইন, কায়রো) - হাদিসটি সহিহ।

পরিবার

পরিবার সমাজ গঠনের একটি মূল উপাদান। মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই পরিবারবান্ধব। প্রত্যেকেই পরিবারের প্রতি নির্ভরশীল। পরিবার এমন এক বন্ধন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য অপরের যত্ন নেয়। পরিবারের প্রতিটি সদস্য, যথা বাবা, মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির মাঝে এক অনুপম আবহ বিরাজ করে। এ অতুলনীয় সুখানুভূতি একমাত্র পরিবারেই মিলতে পারে; অন্য কোথাও নয়। পরিবারের প্রতিটি সদস্যই একে অপরের খেয়াল রাখে, সুস্থতা-অসুস্থতায় পাশে থাকে।

পরিবার নিয়ে কথা বলতে গেলে পরিবার গঠনের এককদের নিয়ে কথা বলতে হয় সর্বাগ্রে। কারণ, পরিবার এ সকল একক নিয়েই গঠিত হয়। আর অনেক পরিবার নিয়ে গঠিত হয় সমাজ। পরিবার গঠিত হওয়ার উপাদানগুলো হলো :

১. বৈবাহিক বন্ধন।
২. স্বামী।
৩. স্ত্রী।
৪. সন্তান।

বৈবাহিক বন্ধন

মোহর প্রদান ও বিবিধ বিষয়ের সামর্থ্য থাকলে বিবাহের হুকুম হলো :

১. বিবাহ না করলে জিনা-ব্যভিচারে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিবাহ করা ফরজ।
২. জিনায় জড়িত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে বিবাহ করা সুন্নত।
৩. বিবাহ করা না-করা সমান হলে বিবাহ করা মুবাহ।[৫৯০]

শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে ইসলাম বিয়ে করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

৫৯০. বাদায়িউস সানায়ি : ২/২২৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

'হে যুবকেরা, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি অক্ষম, তার ওপর আবশ্যক হলো রোজা রাখা। কারণ, এটি তার রক্ষাকবচ হবে।'[৫৯১]

আয়িশা ﷺ থেকে আরও বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

'বিবাহ আমার একটি সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অনুসারে আমল করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ করো। কেননা, আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করব। তাই যে সামর্থ্যবান, সে যেন বিবাহ করে নেয়। আর যে সামর্থ্যবান নয়, সে যেন রোজা রাখে। কেননা, রোজা তার জন্য (কামনা-বাসনা দমিত রাখার ক্ষেত্রে) রক্ষাকবচ।'[৫৯২]

বিয়ে মানুষের কামনা মেটাবার শরিয়তসম্মত একটি মাধ্যম। মানুষের সৃষ্টিগত এ চাহিদা মেটাবার ক্ষেত্রে বিয়ে ছাড়া অন্য যে সকল অবৈধ পন্থা রয়েছে, তা সবই গর্হিত ও বর্জিত। ইসলাম এগুলোকে কঠিনভাবে হারাম করেছে। এগুলোতে প্রবৃত্ত হলে রয়েছে কঠিন শাস্তি। বিয়ে থেকে বিরত থাকা বা একে হেয় জ্ঞান করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ : يَا عُثْمَانُ، أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟ قَالَ : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ

৫৯১. সহিহুল বুখারি : ৭/৩, হা. নং. : ৫০৬৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৫৯২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১/৫৯২, হা. নং ১৮৪৬ (দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যি) - হাদিসটি হাসান।

أَطْلُبُ، قَالَ : فَإِنِّي أَنَامُ، وَأُصَلِّي، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ উসমান বিন মাজউন ﷺ-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, উসমান, তুমি কি আমার সুন্নাতে অনীহা প্রকাশ করো? উসমান ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! কখনো না। আমি তো আপনার সুন্নাত খুঁজে খুঁজে আমল করি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি ঘুমাই, নামাজ পড়ি, কোনোদিন রোজা রাখি, কোনোদিন রাখি না, আর আমি বিবাহও করেছি। তাই হে উসমান, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, তোমার ওপর তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে, তোমার মেহমানের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে, তোমার নিজের অধিকার রয়েছে তোমার ওপর। তাই সব সময় রোজা না রেখে থেমে থেমে রোজা রাখো, নামাজ পড়ো, আবার বিরতি দিয়ে কিছু সময় ঘুমিয়ে নাও।'[৫৯৩]

স্বামী

পরিবার গঠনে অপরিহার্য একটি উপাদান হলো স্বামী। স্বামী পরিবারের পরিচালক ও দায়িত্বশীল। পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর। স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ তার কর্তব্য। পরিবার হলো সমাজ গঠনের উপাদান। সমাজ একটি বড় আকারের স্থূল হলে পরিবার তার ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

স্বামীর ওপর তার পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত। পরিবারের সদস্যদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে সে। স্বামী যদি পরিবারের ভরণপোষণে মনোযোগ না দেয় বা সঠিকরূপে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তবে সে তার কাঁধে অর্পিত আমানত ঠিকমতো আদায় করেনি। এর কারণে সে গুনাহগার হবে।

৫৯৩. সুনানু আবি দাউদ : ২/৪৮, হা. নং ১৩৬৯ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব স্বামীকে দেওয়া হয়েছে, স্ত্রীকে নয়। কারণ, উভয় শ্রেণি সমান নয়। স্ত্রীরা আবেগপ্রবণ হয় বেশি, ফলে অনেক সময় পরিবার পরিচালনায় তারা সক্ষম হবে না। এ ছাড়াও নারী-পুরুষের মাঝে পরিচালনার জন্য পুরুষই হলো উপযুক্ত। তাই পুরুষই পরিবারের পরিচালক হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾

'পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল; এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'[৫৯৪]

স্ত্রী

স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। বাড়ির সুবিধা-অসুবিধা দেখা, সন্তানদের তত্ত্বাবধান করা স্ত্রীর দায়িত্ব। এ হিসাবে সন্তানদের লালনপালন করা স্ত্রীর অতি গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব। কারণ, এ সন্তানদের নিয়েই সমাজের প্রতিষ্ঠা। এ সন্তানদের নিয়েই উম্মাহর ভবিষ্যৎ। সন্তান পালনের মতো এ গুরুদায়িত্বটি স্ত্রীরই।

স্ত্রী পরিবারে সম্মান ও মর্যাদার মাঝে থাকবে। প্রথমত, এ সম্মান সে স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবে। দ্বিতীয়ত, সন্তানদের থেকে পূর্ণ অর্থেই সম্মান ও মর্যাদা পাবে। এটাই আল্লাহর নির্ধারিত নীতি। এমন নীতি অন্য কোনো আদর্শের মাঝে দেখা যায় না বা অন্য কোনো মানবরচিত ব্যবস্থায় চোখে পড়ে না। স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি এ সম্মান প্রদর্শন হবে পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি অটুট রাখার জন্য।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

৫৯৪. সুরা আন-নিসা : ৩৪

'নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। অতঃপর যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'[৫৯৫]

স্ত্রীর পক্ষ থেকে আসা কটু আচরণে করণীয়

ইসলাম স্বামীকে তার স্ত্রীর খোঁচা, কটু আচরণ, স্ত্রীর পক্ষ থেকে আসা বিরক্তি উৎপাদনের কারণগুলোতে ধৈর্যধারণ করার প্রতি উৎসাহিত করে। কারণ, নারীদের নারীত্বটা এমনই। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে একেবারেই সোজা করে ফেলতে চায়, তবুও তা কখনো হবার নয়। এমনটি আশা করাও বোকামি। আর এমন আশার পরবর্তী পদক্ষেপে যদি স্ত্রীর ওপর জোর খাটিয়ে তাকে সঠিক করার বিষয়টি এসে যায়, তবে তা হবে সীমালঙ্ঘন।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণপ্রত্যাশী হও। কারণ, তাদের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড় তো অধিক বক্র। যদি তোমরা নারীদের স্বভাব একেবারেই ঠিক করে ফেলতে চাও, তবে তা ভেঙে যাবে। আর যদি তুমি তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও, তবে তা সর্বদা বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণপ্রত্যাশী হও।'[৫৯৬]

৫৯৫. সুরা আন-নিসা : ১৯
৫৯৬. সহিহুল বুখারি : ৭/২৬, হা. নং ৫১৮৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

মুমিন স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মাঝে কোনো অপছন্দনীয় আচরণ পেলেও অন্য সকল ভালো গুণের কারণে সে অপছন্দনীয় হতে পারে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

'মুমিন স্বামী যেন মুমিনা স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত না হয়। যদি স্ত্রীর মাঝে কোনো অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তবে অন্য ভালো গুণের কারণে তার প্রতি আবার সন্তুষ্টি আসবে।'[৫৯৭]

স্ত্রীর প্রতি সদাচরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে ইসলাম। আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে নিজ পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম।'[৫৯৮]

সর্বোপরি মুমিন নর-নারী উভয়ে একে অপরের পরিপূরক। যেকোনো একজন না থাকলে জীবন অপূর্ণ থেকে যায়। তাদের উভয়কে মিলেমিশে আল্লাহর নির্ধারিত নীতিতে চলতে হবে। তবেই জীবন হবে সৌন্দর্যে ও সৌকর্যে পরিপূর্ণ। এভাবে মুমিন নর-নারী উভয়ে সিরাতুল মুসতাকিমে অটল থেকে আল্লাহর ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কার লাভ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

৫৯৭. সহিহ মুসলিম : ২/১০৯১, হা. নং ১৪৬৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৫৯৮. সুনানুত তিরমিজি : ৬/১৯২, হা. নং ৩৮৯৫ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান সহিহ।

'নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ইমানদার পুরুষ, ইমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'[৫৯৯]

সন্তানসন্ততি

সন্তানের উত্তম লালনপালনের দায়িত্বটি মাতা-পিতার ওপর অর্পিত একটি বড় আমানত। এটি এমন এক আমানত, সর্বদাই যার ব্যাপারে খেয়াল-খবর রাখতে হয়। এটি একটি গুরুভার দায়িত্ব। প্রতিটি পদে পদে তাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, তাদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে যায় কিনা, সন্তানের প্রতিপালনে কোথাও কোনো কমতি হচ্ছে কিনা।

এ সন্তানই একদিন বড় হবে। তারাই হবে উম্মাহর কর্ণধার। তাই তারা যেন সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে, উম্মাহর নেতৃত্বের হক পুঙ্খানুপুঙ্খ আদায় করতে পারে, সে জন্য তাদের উত্তমভাবে প্রতিপালন করতে হবে। তাদের শারীরিক ও আত্মিকভাবে সামর্থ্যবান বানাতে হবে। তাদের মধ্য থেকেই একদিন আসবে উম্মাহর সাধারণ নেতৃত্ব, সামরিক নেতৃত্ব, উম্মাহর দিশারি—আলিম, দায়ি, সংস্কারক ও অনন্য ব্যক্তিত্বগণ।

ইসলাম সকল মুসলমানদের ওপর, বিশেষ করে মাতা-পিতার ওপর ফরজ করেছে যে, তারা যেন সন্তানকে আল্লাহর নির্ধারিত নীতির ওপর গড়ে তোলে। এটি ইসলামি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বও বটে। ইসলামি রাষ্ট্রের কাছে এর যথাযথ উপাদান ও উপকরণও আছে। তাই রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো—শিশুদের উত্তমরূপে প্রতিপালন করা, তাদের আকিদার উন্নয়ন করা এবং তাদের মাঝে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা প্রোথিত করা।

৫৯৯. সুরা আল-আহজাব : ৩৫

অনুরূপভাবে মুরব্বিদের দায়িত্ব হলো, সন্তানদের শিশুকাল হতেই শিরকমুক্ত ইমান ও তাওহিদের শিক্ষা দেওয়া, পাপাচারিতা ও ফিতনা-ফাসাদ থেকে দূরে রাখা এবং তাদের ইসলামি আদর্শের ওপর গড়ে তোলা; যাতে তাদের ভেতর উত্তমভাবে জীবনযাপনের উপলব্ধি প্রবেশ করে। যেন তাদের মাঝে সুস্থতা ও পবিত্রতার সমীরণ প্রবাহমান থাকে এবং তারা অন্যকে প্রাধান্যদান, ধৈর্যধারণ করার মতো মহৎ গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠে।

পিতা-মাতা ও সংশ্লিষ্টদের সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। কারণ, সন্তানদের মন্দ প্রতিপালনের কারণে পিতা-মাতা আখিরাতে শাস্তির উপযুক্ত হবে। তাই সন্তান প্রতিপালনে অবহেলা করা বা তাদের মন্দ প্রতিপালন করা কোনোক্রমেই উচিত নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।'[৬০০]

সন্তানকে ইসলামি আদব ও শিষ্টাচারের ওপর গড়ে তুলতে হবে। সাইদ বিন আস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

'উত্তম আদব শিক্ষা দেওয়া পিতার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য সর্বোত্তম উপহার।'[৬০১]

৬০০. সুরা আত-তাহরিম : ৬

৬০১. সুনানুত তিরমিজি : ৩/ ৪০২, হা. নং ১৯৫২ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

জাবির বিন সামুরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

'সন্তানকে একটি উত্তম আদব শেখানো এক সা' পরিমাণ সদকা করা থেকেও উত্তম।'[৬০২]

পক্ষপাতিত্বহীন প্রতিপালন

সন্তানদের মধ্য থেকে কোনো সন্তানের পক্ষপাতিত্ব করা, কাউকে প্রাধান্য দেওয়া, অন্যদের চেয়ে তাকে আলাদা করে দেখা জঘন্য কর্ম। সন্তানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করার জন্য এটিই যথেষ্ট। এর কারণে সন্তানদের মাঝে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়, যার ফলে পিতা-মাতার কারণে সন্তানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও একে অপরের প্রতি হিংসা সৃষ্টি হয়।

নুমান বিন বাশির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ : أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ : لَا، قَالَ : فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ : أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ : بَلَى، قَالَ : فَلَا إِذًا

'আমার বাবা আমাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি নুমানকে আমার এ সব সম্পদ উপহার দিলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যেভাবে নুমানকে দিলে এমন করে কি সকল সন্তানকে দিয়েছ? বাবা বললেন, না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে আমি ছাড়া অন্য কাউকে এ কাজের সাক্ষী বানাও। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি কি সমানভাবে সকল সন্তানের কাছ থেকে সদাচরণ আশা করো? বাবা বললেন, হ্যাঁ। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তবে এরকমটা করো না।'[৬০৩]

৬০২. মুসনাদু আহমাদ : ৩৪/ ৪৯১-৪৯২, হা. নং ২০৯৭০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

৬০৩. সহিহু মুসলিম : ৩/১২৪৩, হা. নং ১৬২৩ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ

'সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো এবং তাদের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হও।'[৬০৪]

মেয়ে সন্তানকে ছেলে সন্তানদের মতো সমান তত্ত্বাবধান করা

সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ছেলে সন্তানকে মেয়ে সন্তানের ওপর প্রাধান্য দেওয়া বর্জনীয় ও চরম নিন্দনীয়। কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা, সমতা রক্ষা করতে আদেশ করেছেন। তাদের মাঝে পার্থক্য করতে বা একজনকে অপরজনের ওপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন।

ইবনে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ

'যার কোনো মেয়ে সন্তান থাকবে, যাকে সে জীবন্ত প্রোথিত করেনি, অপমানিত করেনি, তার ওপর ছেলে সন্তানকে প্রাধান্য দেয়নি—আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[৬০৫]

মেয়ে সন্তানের তত্ত্বাবধান

ইসলাম নারীদের যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, অন্য কোনো মতাদর্শ, অন্য কোনো ধর্ম তা দিতে অক্ষম। এমনকি তারা অনেকে তো নারীদের মানুষই মনে করে না! কিন্তু ইসলাম নারীদের সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করে তাদের দিয়েছে এক উন্নত স্থান। সে হিসাবে ইসলাম মেয়ে সন্তানকে সুন্দর ও উত্তমভাবে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলে। এটি এমন একটি বাস্তবতা, যা কুরআন, হাদিস ও স্বীয় মেয়েদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপম আচরণ ও তত্ত্বাবধান থেকে প্রমাণিত হয়।

৬০৪. সহিহ মুসলিম : ৩/১২৪২, হা. নং ১৬২৩ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৬০৫. সুনানু আবি দাউদ : ৪/৩৩৭, হা. নং ৫১৪৬ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানানোর জন্য পিতাকে প্রস্তুত করা

অনেকেই কন্যা সন্তানের জন্মের কথা শুনলে মুখ কালো করে ফেলে। তাদের কাছে কন্যা সন্তান অকল্যাণকর মনে হয়। আল্লাহর পানাহ! ইসলাম এমন মনোভাবকে একেবারে হীনচরিত্র লোকের মনোভাব বলে আখ্যায়িত করে। ইসলাম পিতাদের প্রস্তুত করে কন্যা সন্তানকে উত্তমভাবে স্বাগত জানানোর জন্য। যেন প্রশস্ত ও প্রশান্ত বুকে একজন পিতা তার কন্যাকে পৃথিবীতে স্বাগত জানায়। কন্যাকে তেমনই আদর দেয়, তেমনই যত্ন করে—যেভাবে তারা ছেলে সন্তানকে করে থাকে। কন্যা সন্তানের আগমনে তাদের মনে যেন এতটুকু গ্লানিবোধ না আসে। কারণ, কন্যা সন্তান মানেই এক অনুপম নিয়ামত, আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় উপহার ও দান। কন্যা সন্তানের আগমনে মলিনমুখো লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ- يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾

'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, নাকি তাকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখো, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।'[৬০৬]

কন্যা সন্তানের উত্তম প্রতিপালন

ইসলাম পিতা-মাতার ওপর আবশ্যক করেছে যে, কন্যা সন্তানকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করতে হবে। তাদের প্রতি আগ্রহী হতে হবে। তাদেরকে উত্তম চরিত্র, আদব ও উপকারী ইলম শিক্ষা দিতে হবে। যাতে তারা ভবিষ্যতে সমাজের কতর্ব্যগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে।

৬০৬. সুরা আন-নাহল : ৫৮-৫৯

সুন্নাতে নববির অনেক হাদিসেই স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি উঠে এসেছে। সেখানে এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, কন্যা সন্তানের উত্তম প্রতিপালন, আদব শেখানো, ইলম শেখানো, তাদের উত্তম তত্ত্বাবধান করা আবশ্যক। কন্যা সন্তানকে আদর করতে হবে, তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এর মাধ্যমে পিতা-মাতা জান্নাতের নিয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত হবে।

আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوِ ابْنَتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، وَاتَّقَى اللهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

'যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে, অথবা তিনটি বোন আছে, কিংবা দুটি কন্যা আছে বা দুটি বোন আছে; অতঃপর সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করল, আল্লাহকে ভয় করে তাদের উত্তম প্রতিপালন করল, তাহলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত।'[৬০৭]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ وَابْنَتَيْنِ فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ ، فَلَهُ الْجَنَّةُ

'যে ব্যক্তি তিন কন্যা বা তিন বোনের প্রতিপালন করল কিংবা দুবোন ও দুকন্যার প্রতিপালন করল, তাদের উত্তম শিষ্টাচার শেখাল, তাদের প্রতি সদাচরণ করল, তাদের বিয়ে দিল—তার জন্য জান্নাত অবধারিত।'[৬০৮]

ইসলাম কন্যা সন্তানের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া, তাদের ওপর ছেলে সন্তানকে প্রাধান্য না দেওয়ার শিক্ষা দেয়। ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

৬০৭. সুনানুত তিরমিজি : ৩/৩৮৪, হা. নং ১৯১৬ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।
৬০৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৮/৪১৩, হা. নং ১১৯২৪ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ

'যার কোনো মেয়ে সন্তান থাকবে, যাকে সে জীবন্ত প্রোথিত করেনি, অপমানিত করেনি, তার ওপর ছেলে সন্তানকে প্রাধান্য দেয়নি—আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[৬০৯]

ইসলামের শিক্ষা হলো, কন্যাকে আদর-যত্ন করো, তাদের প্রতি অনুরাগী হও। সর্বোপরি তাদের সেভাবে ভালোবাসো, যেভাবে তাদের ভালোবাসা উচিত। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপম এক হাদিস :

لَا تُكْرِهُوا الْبَنَاتِ، فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ

'তোমরা কন্যা সন্তানদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো। কারণ, তারা হৃদয় প্রশান্তকারী, তারা মূল্যবান ও দামি।'[৬১০]

ইসলাম নারীদের এ সুযোগ করে দিয়েছে যে, যখন তারা সাবালিকা হবে, তখন তারা স্বীয় সম্পদে পুরুষদের মতোই হস্তক্ষেপ করতে পারবে। তারা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন বিনিময়-চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। উদাহরণত ক্রয়-বিক্রয়, বস্তু ভাড়া দেওয়া, বর্গা দেওয়া, সুপারিশ করা ইত্যাদি। তেমনই তারা নিজেদের ইচ্ছায় বিভিন্ন অনুদানও দিতে পারবে। যেমন : দান করা, অসিয়ত করা, ওয়াকফ করা, ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত করা ইত্যাদি।

ইসলাম আসার আগে নারীদের এ স্বাধীনতা এ মর্যাদা কোথায় ছিল? ইসলামই তাদের স্বাধীন করেছে, মর্যাদার অতি উচ্চ স্থানে তাদের সমাসীন করেছে। অন্যদিকে ভিন্ন ধর্ম ও মতের লোকেরা গত একশ বছর আগেও নারীকে মানুষের মর্যাদা পর্যন্ত দিত না। কিন্তু এখন নারীকে মুখে মানুষ বললেও তাদেরকে তারা কাজের মেশিন ও নিজেদের মনোবাঞ্ছনা পূরণের উপকরণ হিসাবেই ব্যবহার করছে! ভোগ্যবস্তু হিসাবে তাদের উপভোগ

৬০৯. সুনানু আবি দাউদ : ৪/৩৩৭, হা. নং ৫১৪৬ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।
৬১০. মুসনাদু আহমাদ : ২৮/৬০১, হা. নং ১৭৩৭২ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

করছে। বাস্তব মনে তাদের মানুষ বলে আজও স্বীকার করছে না। নারীর প্রতি এ সীমালজ্ঘন ইসলাম কখনো সহ্য করেনি, করবেও না। কিন্তু আফসোস! নারীদের এ নারীনীতি নিয়েই আজ মানবতার মুখোশধারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে টোপ হিসাবে ব্যবহার করছে।

ইসলাম আগমনের পূর্বে সম্পদের মধ্যে নারীর কোনো অধিকার ছিল না। অনায়াসে মানুষ নারীকে হত্যা করত। তাদের জীবনের কোনো মূল্যই ছিল না। কিন্তু এখন আর তা হবার নয়। ইসলাম নারীর প্রতি অসদাচরণকারীকে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। যে কেউ নারীর ওপর সীমালজ্ঘন করবে, চাই সে নির্যাতনকারী পুরুষ হোক বা মহিলা, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। তাকে কিসাস দিতেই হবে।

এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ﴾

'আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই।'[৬১১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটি তোমাদের পালনকর্তার তরফ

৬১১. সুরা আশ-শুরা : ৪০

থেকে সহজকরণ ও বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।'[৬১২]

এ বিধানটি ব্যাপক। নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস, ছোট-বড় যে কেউই সীমালজ্ঘন করবে, সবাই এ নীতির আওতায় শাস্তি পাবে। কারও জন্য এখানে শিথিলতা রাখা হয়নি। অথচ ইসলামপূর্ব যুগে নারীদের এমন অধিকার ও মর্যাদার কথা চিন্তাও করা যেত না। ইসলাম যে নারীকে এত এত মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে, সেই আজ কিনা নারীর প্রতি ইসলামের অবদান নিয়ে কথা বলার দুঃসাহস দেখায়!

মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ

পিতা-মাতার প্রতি সুন্দর আচরণ করা একজন মুসলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামি শরিয়তে পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও তাদের প্রতি সদাচরণ করার যে নির্দেশ ও গুরুত্ব রয়েছে, কথিত উন্নত বিশ্বের কোনো মতাদর্শে তা নেই। ইসলামি সমাজে মাতা-পিতা যে সম্মান ও সদাচরণ লাভ করেন, অন্য সমাজে তা চিন্তাও করা যায় না।

ইসলামে মাতা-পিতার মর্যাদা ও সম্মান

মাতা-পিতার প্রতি এমন সম্মান ও সদাচরণ করার নির্দেশের প্রথম কারণ হলো, মাতা-পিতা এ পৃথিবীতে সন্তান আগমনের মাধ্যম। জন্মের পর থেকে শুরু করে তারা সন্তানের লালনপালন, দেখাশুনা, পরিচর্যা, ভরণপোষণে যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেন, তা তুলনাহীন। পিতা-মাতার অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমেই একজন সন্তান ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। এ সকল কারণেই নিজ সন্তানকে হত্যা করলেও পিতা-মাতার ওপর কিসাস ধার্য হয় না।

উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

'সন্তানকে হত্যার অপরাধে পিতাকে হত্যা করা হবে না।'[৬১৩]

৬১২. সুরা আল-বাকারা : ১৭৮

৬১৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩/৭০, হা. নং ১৪০০ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

এ ক্ষেত্রে পিতার মর্যাদার দিকে তাকিয়ে কিসাসস্বরূপ তার হত্যার বিধান না থাকলেও বিচারক তাকে অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে। এ মাসআলায় পিতা ও মাতার একই বিধান। এই যে কিসাস থেকে তারা বেঁচে গেল, এটি তাদের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের মর্যাদার কারণেই। নিঃসন্দেহে এ বিধান মাতা-পিতার সম্মানকে অতি উচ্চে প্রতিস্থাপন করে। ইসলাম মাতা-পিতাকে এত উচ্চ মর্যাদা দান করেছে, যার কিয়দাংশও অন্য কোনো ধর্ম দিতে পারেনি।

সদাচরণ করা

কুরআনে কারিমে মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই তাদের সম্মান করার প্রতিটি উপলক্ষ্যকে শামিল করে নিয়েছে। সে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হচ্ছে, بر الوالدين ও الاحسان اليهما। তথা মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। একইভাবে তাদের প্রতি সদাচরণের মাত্রা নির্ধারণে বলা হচ্ছে যে, তাদের উদ্দেশ্যে 'উহ' শব্দটিও বলা যাবে না। যদি তাদের 'উহ' শব্দের মতো হালকা শব্দও না বলা যায়, তবে বলা বাহুল্য যে, অন্য কোনো অসদাচরণের তো কল্পনাই করা যায় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾

'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে শিষ্টাচার বজায় রেখে

কথা বলো। তাদের সামনে ভালোবাসার ডানা প্রসারিত করে দাও এবং বলো, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালনপালন করেছেন।'[৬১৪]

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়ার অর্থ হলো, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাদের প্রতি সদাচরণে তো ইচ্ছুক নয়-ই, উল্টো মাতা-পিতার আদেশের পরও তাদের অবাধ্য হওয়া। এটি নিকৃষ্ট কবিরা গুনাহগুলোর একটি। মাতা-পিতার অবাধ্যতার ভয়াবহতা সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে।

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

الْكَبَائِرُ : الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ

'কবিরা গুনাহগুলো হলো—আল্লাহর সাথে শিরক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, আত্মহত্যা করা ও মিথ্যা বলা।'[৬১৫]

সদাচরণের সর্বোচ্চ হকদার হলেন মা

পিতা সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। অন্যদিকে মা সন্তান জন্মদান ও লালন করেন। সন্তান জন্মদান, সন্তানের যত্ন নেওয়ার কাজ মা অনেকটা একাই করেন। এদিক থেকে বলতে গেলে মা-ই সন্তানের জন্য বেশি কষ্টভোগ করেন। বাহজ বিন হাকিম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ : أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ

৬১৪. সুরা বনি ইসরাইল : ২৩-২৪

৬১৫. সুনানুন নাসায়ি : ৭/৮৮, হা. নং ৪০১০ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, কার প্রতি আমি অধিক সদাচরণ করব? তিনি বললেন, তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার বাবা। তারপর পর্যায়ক্রমে তোমার নিকটাত্মীয়রা।'[৬১৬]

মাতা-পিতার প্রতি অভিশাপ দেওয়া

মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের একটি রূপ হলো মাতা-পিতার অনুপস্থিতিতে মানুষের সাথে আদবের সাথে আচরণ করা, অন্য মানুষের প্রতি কটু আচরণ না করা। যেন সন্তানের অসদাচরণের ফলে মাতা-পিতার সম্মানে আঁচড় না লাগে। আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ : أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَلْعَنُ أَبَاهُ، وَيَلْعَنُ أُمَّهُ، فَيَلْعَنُ أُمَّهُ

'সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহগুলোর অন্যতম হচ্ছে নিজের পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেওয়া। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, কোনো ব্যক্তি নিজের পিতাকে কীভাবে অভিশাপ দিতে পারে? তিনি বললেন, অন্য কোনো ব্যক্তির পিতাকে অভিশাপ দেওয়ার মাধ্যমে। সে অন্য ব্যক্তির পিতাকে অভিশাপ দেবে, সেও উল্টো তার পিতাকে অভিশাপ দেবে। সে অন্য ব্যক্তির মাকে অভিশাপ দেবে, সে ব্যক্তিও তার মাকে অভিশাপ দেবে।'[৬১৭]

অন্যের মাতা-পিতাকে গালি দেওয়া নিজের মাতা-পিতাকে গালি দেওয়ার মতোই। তাই এমন কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, এতে অন্যের অসম্মান করতে গিয়ে নিজেই নিজের পিতা-মাতার অসম্মান করল।

---

৬১৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪/৩৩৬, হা. নং ৫১৩৯ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

৬১৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪/৩৩৬, হা. নং : ৫১৪১ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

মৃত্যুর পরে মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করা

মাতা-পিতা হলেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানীয়। আম্বিয়ায়ে কিরামের পর তারাই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি সদাচরণ করতে হবে। তাদের মৃত্যুর পরে তাদের প্রতি সদাচরণের কিছু পদ্ধতি হলো :

১. তাদের প্রশংসা করা।
২. তাদের জন্য দুআ করা।
৩. তাদের বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করা।
৪. তাদের জন্য দান-সদকা করা।

মালিক বিন রবিআ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ : نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا

'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে বনু সালামা গোত্রের এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি সদাচরণের কোনো পন্থা আছে কি? উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তুমি তাদের জন্য দুআ করবে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাদের মৃত্যুর পরে তাদের কৃত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে, যে আত্মীয়তা তাদের মাধ্যমে সুরক্ষিত হতো—সেসব আত্মীয়তা রক্ষা করবে, তাদের বন্ধুদের সম্মান করবে।'[৬১৮]

ইসলাম মাতা-পিতার সর্বোচ্চ সম্মান ও সদাচরণ নিশ্চিত করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোনো মতাদর্শ আসবে না, যার মাঝে মাতা-পিতাকে সম্মান ও সদাচরণের এমন নিশ্চয়তা থাকতে পারে। কারণ, ইসলাম স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত, আর অন্য সকল মতাদর্শই মানব ও শয়তানের মস্তিষ্ক প্রসূত।

---

৬১৮. সুনানু আবি দাউদ : ৪/৩৩৬, হা. নং : ৫১৪২ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

তালাক বলা হয় :

هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة

'বিশেষ কিছু শব্দবন্ধ দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের ইতি টানার নাম তালাক।'[৬১৯]

পতনোন্মুখ সংসারে স্বামী-স্ত্রীকে ঝামেলা মুক্ত করে দেওয়ার জন্য তালাকের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কেননা, এমন অনেক সংসারই আছে, যার মাঝে দম্পতিগুলো সফল জীবন নির্বাহ করতে সক্ষম হয় না। যার ফলে তাদের জীবনটা পতনমুখী হয়ে যায়। তাদের পারিবারিক জীবন সংকটে জর্জরিত হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে উত্তম থেকে উত্তম সমাধানও কোনো কাজে আসে না। তাই স্বামী-স্ত্রীর আলাদা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তাই তালাকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজ নিজ পথের পথিক হয়ে যায়।

দুর্ভাগা দম্পতিকে এমন নানা ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দেওয়ার মাধ্যম তালাক। যদিও তালাক শরিয়তে বৈধ, তবে এটি শরিয়তে অপছন্দনীয়। তালাকের মাঝে রয়েছে দুটি প্রাণের বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ, তাই আল্লাহর কাছে এটি ঘৃণিত।

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

'আল্লাহর নিকট সর্বনিকৃষ্ট হালাল কর্ম হলো তালাক।'[৬২০]

তালাকের পথে প্রতিবন্ধকতা

যদিও তালাক শরিয়তে বৈধ, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় শরিয়ত তালাক হওয়াকে কামনা করে না। সে জন্য তালাক দেওয়ার আগে কিছু ধাপ

---

৬১৯. তাফসিরুল কুরতুবি : ৩/১২৬ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)

৬২০. সুনানু আবি দাউদ : ২/২৫৫ , হা. নং ২১৭৮ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

অতিক্রম করতে হয়। এ সকল ধাপ যদি ঠিকমতো আদায় করা হয়, তবে তালাকের সম্ভাবনা একেবারেই কমে আসে। ফলে অধিকাংশ সময়ই তালাক আর ঘটে না। এ সকল ধাপ হলো :

ক. উত্তম উপদেশ দেওয়া

এমন কথা, যেগুলো মনের মধ্যে উত্তম অনুভূতি জাগ্রত করে, যে কথাগুলো মনের দরজায় কড়া নাড়তে সমর্থ হয়, যে কথাগুলো সহজেই অপরপক্ষের নিকট কবুল হয়। যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কটু আচরণ, রূঢ় কথা আসে, তবে স্ত্রীকে সঠিক পথের ওপর আনার নিমিত্তে স্বামী তাকে উত্তম উপদেশ প্রদান করবে।

খ. স্ত্রীকে বিছানায় ত্যাগ করা

এ পন্থাটি একটি সক্রিয় পন্থা। এ প্রক্রিয়ায় কিছু সময়ের জন্য স্বামী স্ত্রী-সহবাস ত্যাগ করে। স্ত্রীকে সাময়িক ত্যাগ করার কারণে তার মাঝে একাকিত্ব জেগে ওঠে। তার মধ্যে এ চিন্তা সৃষ্টি হয় যে, এতদিন তারা দুজনে একসাথে আনুগত্যের পথে ছিল। কিন্তু এখন তো গুনাহের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। এ চিন্তা ও একাকিত্বের ভয়ে স্ত্রী কটু আচরণে লাগাম লাগাতে সচেষ্ট হয়।

গ. হালকা প্রহার করা

এ প্রক্রিয়াটি এক শ্রেণির মহিলাদের জন্য উপযোগী। এ সকল মহিলা স্বামীর উত্তম উপদেশ, উত্তম কথার পরেও স্বামীর ডাকে সাড়া দেয় না; বরং অহংকারে পূর্ণ থাকে তাদের মন। এদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি কাজে দেয়। এ মহিলারা কিছুটা কঠোর প্রকৃতির হয়ে থাকে, তাই তাদের জন্য এটি মোক্ষম ওষুধ হিসাবে কাজ করে। এদের ক্ষেত্রে আশা করা যায়, তাদের এ বক্রতা হালকা প্রহার দ্বারা ঠিক হয়ে যাবে।

যদিও আদব শেখানোর জন্য কখনো কখনো মৃদু প্রহার করার অনুমতি আছে, কিন্তু ইসলাম সত্তাগতভাবে এটা পছন্দ করে না। কেননা, এমন পন্থা অবলম্বন সাধারণত নীচু চরিত্রের লোকদের দ্বারাই হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

ما أكرمهن الا كريم وما أهانهن الا لئيم

'মহানুভবরাই একমাত্র স্ত্রীদের সম্মান করে, আর নিকৃষ্ট লোকেরাই একমাত্র তাদের অপদস্থ করে।'

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়, তবে স্বামীকে সে ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করতে হবে। এ ধৈর্যধারণের মাধ্যমে সে নিজে আল্লাহর নিকট সাওয়াব তালাশ করে থাকে। এ ধরনের স্বামীরা হন উত্তম চরিত্রের। অন্যদিকে অনেক স্বামীই স্ত্রীর সামান্য কটু আচরণেও ধৈর্যধারণ করতে না পেরে তাড়াহুড়ো করে প্রহার করে বসে, স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করে; ফলে স্ত্রী তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এ সকল স্বামী হীন চরিত্রের হয়ে থাকে। হীন চরিত্রের লোকেদের এটা বুঝতে কষ্ট হয় যে, স্ত্রীর আচরণ যখন অতিরিক্ত মন্দের দিকে চলে যায়, তখনই কেবল ক্ষেত্রবিশেষ হালকা প্রহারের প্রক্রিয়াটির ওপর আমল করতে হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময়টিতে কাউকে প্রহারের উদ্দেশ্যে আঘাত করেননি। আয়িশা رضي الله عنها বলেন :

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ خَادِمًا، وَلَا امْرَأَةً قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো খাদিম বা মহিলাকে প্রহার করেননি। কখনো স্বীয় হাত দ্বারা কোনো প্রাণীকে আঘাত করেননি।'[৬২১]

ইয়াজ বিন আবু জিয়াব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ. فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ

৬২১. মুসনাদু আহমাদ : ৪৩/৯২, হা. নং ২৫৯২৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

'তোমরা আল্লাহর দাসীদের (তোমাদের স্ত্রীদের) প্রহার করো না। অতঃপর উমর رضي الله عنه আসলেন এবং বললেন, মহিলারা তাদের স্বামীর অবাধ্য হচ্ছে। এরপর তিনি মৃদু প্রহারের অনুমতি দিলেন। অতঃপর অনেক মহিলা এসে নবি ﷺ-এর কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করল। তখন নবিজি ﷺ বললেন, মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছে। সুতরাং যারা স্ত্রীদের প্রহার করে, তারা তোমাদের মধ্যে ভালো নয়।'[৬২২]

এ তিনটি প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কারিমে এসেছে :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

'আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যায় ত্যাগ করো এবং প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও মহান।'[৬২৩]

ঘ. বিচার করা

তালাক ঠেকানোর চতুর্থ প্রক্রিয়াটি হলো বিচার-মীমাংসার চেষ্টা করা। এ প্রক্রিয়াটির উৎপত্তি হচ্ছে আল্লাহর এ বাণী থেকে :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾

৬২২. সুনানু আবি দাউদ : ২/২৪৫-২৪৬, হা. নং ২১৪৬ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

৬২৩. সুরা আন-নিসা : ৩৪

'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতিরই আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মিলিয়ে দেবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সবকিছু অবহিত।'[৬২৪]

আয়াতের মর্মার্থ হলো, যদি কখনো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হয় ও তাদের মাঝে বিরোধিতা দেখা দেয়, তখন বিচারক স্বামীর পরিবার থেকে একজন ন্যায়পরায়ণ ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করবে। তারা দম্পতির জন্য কল্যাণকর বিষয় বের করে তাদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেবে। তারা যদি পৃথক হওয়াকে উত্তম মনে করে, তবে তাই করবে। আর যদি উভয়ের মাঝে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তাই করতে হবে। তবে আয়াতের মাঝে স্বামী-স্ত্রীকে মিলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এ বলে যে, إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا 'তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মিলিয়ে দেবেন।'[৬২৫]

তালাকের প্রকারভেদ

তালাক প্রতিরোধের ব্যবস্থা এ চারটিতে নিবদ্ধ। কিন্তু যদি এ সকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা পেরিয়ে তালাক সংঘটিত হওয়ার পর্যায়ে চলেই যায়, তবে সামনে রয়েছে তিনটি স্তর। এ স্তরগুলো তালাককে তার স্বভাব ও গুণের ওপর শ্রেণিবদ্ধ করে নির্ণীত। এ তিনটি স্তর হলো :

ক. তালাকে রজয়ি।
খ. তালাকে বাইন।
গ. তালাকে মুগাল্লাজা।

৬২৪. সুরা আন-নিসা : ৩৫
৬২৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ২/২৫৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

১. তালাকে রজয়ি

রজয়ি অর্থ প্রত্যাহারযোগ্য। এ প্রকারের তালাকে যেহেতু স্বামী তার স্ত্রীর মতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা ব্যতীতই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারে, তাই এটাকে তালাকে রজয়ি বলা হয়। সাধারণত তালাক শব্দের মাধ্যমে প্রদত্ত তালাককে তালাকে রজয়ি বলে। অনুরূপ তালাকের অর্থে প্রচলিত শব্দের দ্বারাও তালাকে রজয়ি হয়। যেমন স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ করে বলল, 'তোমাকে তালাক দিলাম' বা বলল, 'তোমাকে ছেড়ে দিলাম' তাহলে এতে স্ত্রীর ওপর তালাকে রজয়ি পতিত হয়ে যাবে। তালাকে রজয়ি এক বা দুই তালাক পর্যন্ত হয়ে থাকে। তিন তালাক দিলে সেটা আর তালাকে রজয়ি থাকে না; বরং তা তালাকে মুগাল্লাজা হয়ে যায়, যার আলোচনা শীঘ্রই আসছে।

তালাকে রজয়ি হওয়ার জন্য শর্ত হলো বিবাহের পর তালাক দেওয়ার আগে স্ত্রীর সাথে একবার হলেও সহবাস হতে হবে। আর যদি বিবাহ পরবর্তী তাদের মাঝে কখনো সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে এমন স্ত্রীকে যে দেই তালাক দেওয়া হোক না কেন, তা বাইন তালাক হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।[৬২৬]

কুরআনের ভাষায় :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾

'হে নবি, (আপনি বলে দিন) তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিয়ো এবং ইদ্দত গণনা কোরো।'[৬২৭]

অর্থাৎ যখন তোমরা সহবাসকৃত মহিলাকে তালাক দেবে, তোমরা তাদের হায়িজের সময় বা সহবাস হয়েছে এমন তুহুরে (পবিত্রতাকালীন সময়ে) তালাক দেবে না; বরং তোমরা তাদের এমন তুহুরে তালাক দাও, যে তুহুরে তোমরা তাদের সাথে সহবাস করোনি।[৬২৮]

৬২৬. আল ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবাআ : ৪/৩৭৭-৩৭৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৬২৭. সুরা আত-তালাক : ১
৬২৮. আহকামুল কুরআন, জাসসাস : ৩/৬০৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

তালাকের এ প্রকারে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তালাকদাতা স্বামীর জন্য বিরাট সুযোগ রয়েছে। স্ত্রীকে সে তালাক পতিত হওয়ার পর থেকে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনতে পারবে। ইদ্দতের সময়টার পরিমাণ তিন হায়িজ। অর্থাৎ তালাকের পর থেকে তিন হায়িজ শেষ হওয়া পর্যন্ত। এর মাঝে যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেওয়া হয়, তাহলে ইদ্দত শেষে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালাকে বাইনে পরিণত হয়ে যাবে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾

'অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌছে, তখন তাদের যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে।'[৬২৯]

২. তালাকে বাইন

বাইন অর্থ পৃথককারী, বিচ্ছেদকারী। এ তালাকের দ্বারা যেহেতু বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, তাই এটাকে তালাকে বাইন বলে। এটা সাধারণত অস্পষ্ট শব্দ বা রূপক শব্দের মাধ্যমে তালাকের নিয়ত করলে তাবেই পতিত হয়। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে তালাকের নিয়তে বলল, 'বের হয়ে যাও' বা বলল 'বাপের বাড়ি চলে যাও' তাহলে কথাটি তালাকের নিয়তে বলে থাকলে এদ্বারা তালাকে বাইন হয়ে যাবে। এ তালাকে বাইনও এক বা দুই তালাক পর্যন্ত থাকে। তিন তালাক দিলে সেটা আর সাধারণ বাইন তালাক থাকবে না; বরং তা মুগাল্লাজা হয়ে যাবে।

রজয়ি তালাকে স্ত্রীকে রুজু বা ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো ওলি বা সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না, এমনকি স্ত্রীর সন্তুষ্টি বা তার সম্মতি জানারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তালাকে বাইনের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। তালাকে বাইনের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে হলে নতুন মোহর আদায় করতে হয়, নতুন করে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে আকদ নবায়ন করতে হয়।

---

৬২৯. সুরা আত-তালাক : ২

৩. তালাকে মুগাল্লাজা

মুগাল্লাজা অর্থ কঠিন, শক্ত। এ তালাকের দ্বারা যেহেতু বিচ্ছেদ কঠিনভাবে হয়, এমনভাবে যে, স্বামী চাইলে নতুন আকদের মাধ্যমেও আর তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে না, তাই এটাকে মুগাল্লাজা বলা হয়। একসাথে বা পৃথক পৃথকভাবে স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে তা তালাকে মুগাল্লাজা বলে গণ্য হয়।

তালাকে মুগাল্লাজা হলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কঠিনভাবে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এ ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে আর বিয়ে করতে পারবে না। সে তার জন্য স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে। তবে হ্যাঁ, মুগাল্লাজা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি ইদ্দত পালনের পর অন্য কারও সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, অতঃপর বিবাহ পরবর্তী তাদের সহবাস হয়, এরপর সে দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দিয়ে দেয় বা মারা যায়, তবেই সে পুনরায় ইদ্দত পালনের পর আগের স্বামীর সাথে বিবাহ করতে পারবে, অন্যথায় নয়। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾

'তালাকে রজয়ি হলো দুবার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে।'[৬৩০]

এরপরে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

'অতঃপর যদি সে (দুই তালাকের পর তৃতীয়) তালাক প্রদান করে, তাহলে এরপর অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ না করা পর্যন্ত সে তার

---

৬৩০. সুরা আল-বাকারা : ২২৯

(আগের স্বামীর) জন্য বৈধ হবে না। অতঃপর সে (নতুন স্বামী) তাকে তালাক প্রদান করলে যদি উভয়ে পরস্পর প্রত্যাবর্তিত হয়, তাহলে এতে তাদের কোনো দোষ নেই, যদি তাদের আল্লাহর সীমারেখা বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। এগুলোই আল্লাহর সীমাসমূহ, যা তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য ব্যক্ত করে থাকেন।'[৬৩১]

তালাকের ব্যাপারে এ কথাগুলো সংক্ষিপ্ত, তবে পূর্ণাঙ্গ। সন্দেহ নেই যে, ইসলাম তালাকের ব্যাপারে যে পূর্বকরণীয় ও বিধান প্রদান করেছে, এর ফলে মুসলিম সমাজে তালাকের ঘটনা একেবারেই নিম্নসীমায় রয়েছে। এটাই বাস্তবতা। অন্যদিকে মানবরচিত বা বাতিল ধর্মের লোকদের দিকে তাকালে দেখা যায়, তাদের মাঝে তালাকের কেমন হিড়িক পড়ে গেছে। এসব কুফরি দেশগুলো আল্লাহর অবাধ্য হয়ে দুনিয়াবি অন্যান্য নিয়ামত ভোগ করতে পারলেও পরিবারের এ মানসিক শান্তি তাদের অনেকের কাছে এখনো অধরা। তারা টাকা দিয়ে দুনিয়ার সব কিনতে পারলেও এ মানসিক প্রশান্তির কোনো ছোয়া পায় না। এসব কুফরি রাজ্যের প্রথম দিকে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। সভ্যতার দাবিদার এসব দেশে তালাকের হার একেবারে তুঙ্গে। ১৯৫৬ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, আমেরিকায় প্রতি হাজার বিয়ের মধ্যে ২৪৬ টি বিয়ে তালাকের কারণে ভেঙে যায়। আর বর্তমানের কথা তো বলাই বাহুল্য।

৬৩১. সুরা আল-বাকারা : ২৩০

আল-জামাআহ

ইসলামের মৌলিক নীতিমালার চাহিদা হলো, মুসলিমগণ পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা রাখবে, পরস্পরের সহযোগী হবে। যদিও তারা সংখ্যায় অনেক হোক, যদিও তারা এলাকায় ভিন্ন হোক, যদিও তাদের গায়ের রং এক না হোক, যদিও তারা শত-সহস্র মাইল দূরে থাকুক, তবুও তারা থাকবে একটি দেহের মতো। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আমরা 'জামাআহ' এর দাবি পূরণ করতে পারি। 'জামাআহ' এর লক্ষ্য পূরণে এখানে নয়টি উপায় ও কাজ উল্লেখ করা হলো। আমরা এগুলোর প্রতি যত্নবান হলে আমাদের জামাআহ বা ঐক্য সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে এবং আমাদের সমাজব্যবস্থা অনুপম আদর্শ ও অন্যদের জন্য অনুসরণীয় হবে।

সমস্ত মুসলমান এক উম্মাহ

পৃথিবীর মুসলিমগণ মনের নিজস্ব বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও উপলব্ধির দিক থেকে ভিন্ন হলেও তারা একটি উম্মাহ, তারা এক পতাকার অধীনে সকলে ঐক্যবদ্ধ। এখানে এসে প্রাণগুলো, চিন্তা ও নৈতিকতাগুলো এক হয়ে যায়। এক উম্মাহের বন্ধনে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদের একটি দেহে পরিণত করে তাওহিদের কালিমা।

মুসলিমগণ যখনই নামাজ পড়তে জামাআতবদ্ধ হয়, তখন তারা এক কিবলার দিকেই ফিরে দাঁড়ায়। তারা স্বল্প পরিসরে এক ইমামের আনুগত্য করে নামাজ আদায় করে। আবার বৃহৎ পরিসরে আল্লাহর শরিয়ত দ্বারা শাসনকারী এক খলিফার আনুগত্য করে।

তদ্রূপ মুসলিমগণ সময়ের একই মানদণ্ডে রোজা পালন করে। তারা সময়ের একই মানদণ্ডে মুআজ্জিনের আজানে ইফতার করে। যখন নির্দিষ্ট সংখ্যক রোজা পালন শেষ হয়, তখন তারা ইদের খুশিতে আনন্দিত হয়।

এমনিভাবে যদি পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে কোনো মুসলিম নির্যাতিত হয়, তখন পৃথিবীর অপর মেরুর মুসলিমের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। যদি কোনো কাফির মুসলিমদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায়, তখন মুসলিমগণ তাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে আসে।

এভাবে দ্বীনের বিভিন্ন বিধান ও ঐতিহ্যে এসে মুসলিমদের ঐক্য ফুটে ওঠে। দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এ উম্মাহ সত্যিকার অর্থে ঐক্যবদ্ধ। একনিষ্ঠতা ও ভালোবাসার এক অনুপম বন্ধনে জড়িয়ে আছে এ উম্মাহ।

ইসলামি উম্মাহর স্বরূপ এমনই, ইসলামের শিক্ষার আলোকে এমন বর্ণনা যথার্থ। মুসলিমগণ তাদের সংখ্যা অনেক হলেও, তারা অনেক দূরে দূরে থাকলেও তারা সকলেই একটি দেহের ন্যায়। যদি দেহের একটি অঙ্গ ব্যথা অনুভব করে, তবে অন্য অঙ্গগুলোও এতে সাড়া দান করে।

নুমান বিন বাশির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

'মুসলিমগণ এক দেহের ন্যায়। যদি তার চোখ ব্যথা অনুভব করে, তবে পুরো শরীর সে ব্যথা অনুভব করে। যদি মাথা ব্যথা অনুভব করে, তবে পুরো শরীর সে ব্যথা অনুভব করে।'[৬৩২]

মুসলিমদের সারিতে অহংকার বা নেতিবাচকতার কোনো স্থান নেই। সংকীর্ণতম প্রবৃত্তির কোনো স্থান নেই মুসলিম সমাজে। মুসলিমরা হলো পরস্পর ভালোবাসার সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ। তারা একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ। নিজেদের এ ঐক্যবদ্ধতা রক্ষা করা নফল বা ঐচ্ছিক কর্ম হিসাবে নয়; বরং একতা রক্ষা করতে হয় এজন্য যে, তা হলো ফরজ ও দ্বীনের মৌলিক চাহিদা।

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৬৩২. সহিহ মুসলিম : ৪/২০০০, হা. নং ২৫৮৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। মুসলিম তার ভাইয়ের ওপর অত্যাচার করবে না, তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনের বিপদগুলোর একটি বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবেন। যে মুসলিম অপর মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে মুসলিমের দোষ গোপন করবেন।'[৬৩৩]

অপর একটি হাদিসে সত্যিকার ভ্রাতৃত্বের বিভিন্ন ধারাকে শামিল করে: ভ্রাতৃত্বের মাঝে চিড় ধরিয়ে দেয় এমন অহংকার, নেতিবাচকতা ও নীচুতা পরিহার করে; পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি পোষণ করে; পরস্পরের বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট ও মন্দকে দূর করে—এমন একটি চমৎকার বর্ণনা এসেছে। আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

'তোমরা পরস্পর হিংসা করো না। একে অপরকে ধোঁকা দিও না। তোমরা পরস্পর শত্রুতা রেখো না। একে অপরের বিরোধিতা করো না। (ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) একজনের দামের ওপর অন্যজন দাম বলো না। তোমরা আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলম করে না, তাকে অপমানিত করে না, তাকে হেয় করে না।' রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বীয় বুকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, তাকওয়া থাকে এখানে। তোমাদের কারও অনিষ্টের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে হেয়

৬৩৩. সহিহ মুসলিম : ৪/১৯৯৬, হা. নং ২৫৮০ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

করেছে। এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের রক্ত ঝরানো, মাল লুণ্ঠন ও সম্মান হরণ হারাম।'[৬৩৪]

মোটকথা, মুসলমানগণ তাদের বংশ, জাতি, দেশ ভিন্নতায় ভৌগলিকভাবে দূরত্বে থাকলেও আকিদা ও দ্বীনগতভাবে সবাই এক ও অভিন্ন। ইসলাম তাদের একত্রিত করেছে, তাদের মাঝে হৃদ্যতা স্থাপন করেছে, যেন তারা একটি অপ্রতিরোধ্য ও সংঘবদ্ধ উম্মাহতে রূপ নিয়ে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করে।

এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।'[৬৩৫]

মুসলিমদের পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, পরস্পরের দায়িত্ব বহন করা কখনো আবশ্যক হয়ে যায়। নিজের পরিবারের খরচ, আত্মীয়-স্বজনদের খরচ, দারিদ্র্য পীড়িতদের সাহায্য করা সবই একজন সক্ষম মুসলিমের কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব। একজন মুসলিমকে তার অভাবগ্রস্ত আত্মীয়কে সাহায্য করতে হবে। এটি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব। আত্মীয়দের সাহায্যার্থে ব্যয় করা দায়িত্ব। ব্যয় করার এ প্রক্রিয়াটি উর্ধ্বতন ও অধস্তন উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। অধস্তন যেমন, সন্তানগণ ও সন্তানের সন্তানগণ; চাই সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। আবার উর্ধ্বতন হলো, মাতা-পিতা ও তাদের মাতা-পিতাগণ। তারপর ব্যয়ের অধিক হকদার হিসাবে আসে প্রান্তসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ। তারা হলেন, চাচা, মামা, ফুফু, খালা প্রমুখ। আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করা এবং অভাবীদের সাহায্য করার ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে :

---

৬৩৪. সহিহ মুসলিম : ৪/১৯৮৬, হা. নং ২৫৬৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৬৩৫. সুরা আল-হুজুরাত : ১০

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾

'বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিজিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দেবেন।'[৬৩৬]

আত্মীয়তার সম্পর্ক

আত্মীয়স্বজনের জন্য ব্যয় করাটাই কেবল তাদের প্রতি দায়িত্বের সমাপ্তি নয়; বরং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাও আবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। একজন মুসলিমকে এ সম্পর্ক অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। এ পথে আসা প্রতিবন্ধকতাগুলো কাটিয়ে উঠতে হবে। যদি সে এমনটা না করে থাকে, তবে সে আল্লাহর আদেশকৃত সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার অপরাধে অপরাধী।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নিন্দায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ - أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾

'ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।'[৬৩৭]

ইবনে জুবাইর বিন মুতইম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

---

৬৩৬. সুরা আত-তালাক : ৭
৬৩৭. সুরা মুহাম্মাদ : ২২-২৩

'আত্মীয়তার সম্পর্ক কর্তনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৬৩৮]

উমর বিন আবাসা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ، قَالَ : أَنَا نَبِيٌّ، فَقُلْتُ : وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ : أَرْسَلَنِي اللهُ، فَقُلْتُ : بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ : أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ

'নবিজি ﷺ মক্কা থাকাকালীন আমি তাঁর কাছে গেলাম। বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, নবি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, নবি কাকে বলে? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে আল্লাহ দূত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আমি জানতে চাইলাম, আপনাকে কী বিষয়বস্তু দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, মূর্তি ভাঙা, আল্লাহর তাওহিদ প্রতিষ্ঠা এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শিরক করার প্রথা বন্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।'[৬৩৯]

সামাজিক সহযোগিতা

সামাজিক সহযোগিতার ক্ষেত্রটি ব্যাপক। আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-সম্পর্কীয় লোকদের ডিঙিয়ে প্রতিবেশী থেকে শুরু হয় এ সামাজিক সহযোগিতার আওতা। ইসলামে প্রতিবেশীর এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইসলামে তাদের এমন সম্মান ও মর্যাদার স্থান দান করা হয়েছে, যা অন্য কোনো ধর্ম ও আদর্শ দিতে পারেনি। ইসলাম প্রতিবেশীকে এত বেশি গুরুত্ব ও সম্মান দান করেছে যে, মনে হচ্ছিল, হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দেওয়া হবে।

আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

৬৩৮. সহিহুল বুখারি : ৮/৫, হা. নং ৫৯৮৪ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৬৩৯. সহিহ মুসলিম : ১/৫৬৯, হা. নং ৮৩২ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

'জিবরাইল আমাকে অনবরত প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করতে থাকলেন। একপর্যায়ে আমার ধারণা হচ্ছিল, হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দেওয়া হবে।'[৬৪০]

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

'আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী হলো সে, যে তার সঙ্গীর নিকট উত্তম। আর আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী হলো যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।'[৬৪১]

আবু শুরাইহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ : وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

'আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, সে কে? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।'[৬৪২]

প্রতিবেশীর ব্যাপারটি শুধু মুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং খ্রিষ্টান, ইহুদিসহ অন্যান্য অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথেও প্রতিবেশীর অধিকারগুলো জড়িত। প্রতিবেশীর অধিকার সংবলিত শরিয়তের দলিলগুলোতে অমুসলিম প্রতিবেশীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

৬৪০. সহিহুল বুখারি : ৮/১০, হা. নং. : ৬০১৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৬৪১. মুসনাদু আহমাদ : ১১/১২৬, হা. নং ৬৫৬৬ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।
৬৪২. সহিহুল বুখারি : ৮/১০, হা. নং ৬০১৬ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ-এর বাড়িতে একটি ছাগল জবাই করা হলো। তিনি তখন বললেন, 'তোমরা কি ইহুদি প্রতিবেশীকে এ থেকে হাদিয়া দিয়েছ? কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

'জিবরাইল আমাকে অনবরত প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করতে থাকলেন। একপর্যায়ে আমার ধারণা হচ্ছিল, হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দেওয়া হবে।'[৬৪৩]

জাকাত ছাড়াও সম্পদে আরও অধিকার আছে

জাকাত দ্বীনের একটি মৌলভিত্তি। তবে সম্পদের ক্ষেত্রে শুধু যে জাকাত আদায় করলেই সম্পদে অন্যের অধিকার শেষ হয়ে গেছে, বিষয়টি এমন নয়। কেননা, মানুষকে যখন দারিদ্র্য গ্রাস করে বা কেউ যখন দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট হয় বা ক্ষুধায় অনাহারে থাকে, তখন সে মানুষকে দান করা কর্তব্য হয়ে যায়। তাই শুধু জাকাত আদায় করে সম্পদের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আদায় হয়ে গেছে, এমনটি ধারণা করা উচিত নয়। আশপাশের দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও অভাবীদের কষ্ট-ক্লেশ দূর করাও সম্পদশালীর দায়িত্ব।

ফরজ জাকাত আদায় করা সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে একটি স্বল্প পরিমাণ মাত্র। একজন মুসলিমকে এর চেয়ে ঢের বেশি আল্লাহর রাস্তায় দান করতে হবে। ফাতিমা বিনতে কাইস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাকাত সম্পর্কে আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমায় বলেন :

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾

'নিশ্চয় জাকাত ছাড়াও সম্পদে আরও হক রয়েছে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে।"'[৬৪৪]

৬৪৩. সহিহুল বুখারি : ৮/১০, হা. নং ৬০১৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৬৪৪. সুনানুত তিরমিজি : ২/৪১, হা. নং ৬৫৯ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

একজন মুসলিমের নিকট তার প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ থাকতে পারে। তখন তাকে অভাবীদের জন্য ব্যয় করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, একজন মুসলিম নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর তার অতিরিক্ত সম্পদ থেকে গরিব-দুঃখীদের দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। এ সম্পদ সে গরিব-দুঃখীদের অনুগ্রহ করে দান করছে, বিষয়টি এমন নয়; বরং এটা তার সম্পদে অভাবীদের অধিকার।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

'আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের অধিকার।'[৬৪৫]

যখন অভাব, দুর্ভোগ, বিপদ ও দুর্যোগ ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন মুসলিমদের মাঝে তাদের সম্পদ বণ্টন করে দিতে হবে। কারও সম্পদ থেকে যা কিছু অতিরিক্ত থেকে যাবে, তাতে দারিদ্র্য, অভাব, বিপদ ও দুর্ভোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকার থাকবে।

আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ

'যার কাছে পিঠে নেওয়ার মতো সম্পদের অতিরিক্ত আছে, সে যেন তা থেকে যার কাছে এ পরিমাণ নেই, তাকে দিয়ে দেয়। আর যার কাছে পাথেয়ের অতিরিক্ত আছে, সে যেন যার পাথেয় নেই, তাকে কিছু দিয়ে দেয়।' অতঃপর তিনি সম্পদের প্রকারের বর্ণনা দিতে লাগলেন। এমনকি আমরা দেখলাম যে, অতিরিক্ত সম্পদের মাঝে আমাদের কোনো অধিকারই নেই।'[৬৪৬]

৬৪৫. সুরা আজ-জারিয়াত : ১৯
৬৪৬. সহিহ মুসলিম : ৩/১৩৫৪, হা. নং ১৭২৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

যখন মুসলিমদের মাঝে অভাব-অনটন বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন তাদের সম্পদশালীদের নিকট থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে উত্তমভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়, প্রাচুর্যবানদের অতিরিক্ত সম্পদ অভাবীদের মাঝে বাটোয়ারা করে দেওয়া হয়।

আবু মুসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

'আশআরি গোত্রেরা লোকেরা যখন কোনো যুদ্ধে থাকে আর তাদের পাথেয় শেষ হওয়ার পথে থাকে অথবা শহরে থাকাবস্থায় তাদের পরিবারের খাবার কমে যায়, তখন তারা সকলের খাবারকে একটি কাপড়ে একত্রিত করে, তারপর তাদের মাঝে একটি পাত্রে তা সমভাবে বণ্টন করা হয়। এরকম আমলকারী আমার অন্তর্ভুক্ত, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।'[৬৪৭]

ইসলাম মুসলিমদের সমাজে সর্বোচ্চ পূর্ণতায় ও সর্বোচ্চ ধরনে পরস্পরের দায়িত্ববহনকে পাকাপোক্ত করে। যেন তারা প্রত্যেক ঘরে বা মহল্লায় বা গ্রামে সংঘবদ্ধ থাকে। যেন তাদের মাঝে কাউকে ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হতে না হয়। কেননা, যখন সকল মানুষ তৃপ্তি সহকারে খেয়ে থাকে; অথচ তাদের মধ্যকার একজন না খেয়ে থাকে, তবে তারা সিরাতুল মুসতাকিমের ওপর আমলকারী নয়; বরং তারা নিজেদের দায়িত্বে শিথিলতাকারী।

যৌথ দায়ভার গ্রহণ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَى

৬৪৭. সহিহুল বুখারি : ৩/১৩৮, হা. নং ২৪৮৬ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

'যে আঙিনার অধিবাসীরা এরকম যে, তাদের মধ্যকার একজন ক্ষুধার্ত রয়ে গেছে; তাদের ওপর থেকে আল্লাহর জিম্মা উঠে যায়।'[৬৪৮]

এ মূলনীতির আমল জোরদার করার মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে যারা ধনী আছে, তাদের সম্পদ প্রয়োজনের সময় মুসলিমদের মাঝে ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়, ফলে সম্পদশালীদের মাঝ থেকে অহংকার ও স্বার্থপরতা বিদায় নেয়।

এ মূলনীতির মাধ্যমে স্বার্থপরায়ণতা, কার্পণ্য, নীচুতা বিদূরিত হয়ে যায়। ফলে মুসলিমদের ওপর যখন অভাব-অনটনের সময় আসে, তখন তারা সমান সমান থাকে। কেউ সুখে থাকে, আর কেউ দুঃখে থাকে; এমনটা হয় না।

এ মূলনীতির মাধ্যমে আবশ্যক হয়ে যায় যে, মুসলিমরা হবে একটি দেহের ন্যায়। এ ব্যাপারে উমর ইবনে খাত্তাব ﵁ বলেন :

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَأَخَذْتُ فُضُولَ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَقَسَمْتُهَا عَلَى فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

'গতবার যেরকম হলো, যদি এমন পরিস্থিতি আবার আসে, তবে আমি ধনীদের অতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেবো।'[৬৪৯]

এসব দলিল থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম মুসলিমদের জন্য এক চমৎকার বিধান দিয়েছে। এ বিধানের ফলে সামাজিক দায়-দায়িত্ব বহন আরও দৃঢ় হয়। এ বিধানের ফলে সমাজে এক অপূর্ব অনুভূতির শিহরণ বয়ে যায়। মুসলমানগণ পরস্পরের দায়িত্ব বহন করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হয়।

ইসলামের শিক্ষা হলো, স্বাবলম্বী মুসলিমরা দরিদ্র মুসলিমদের হাত ধরবে, দরিদ্রকে সাহায্য করা নিজেদের কর্তব্য মনে করবে। ফলে সকলের মাঝে হৃদ্যতা স্থাপিত হবে, তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব মজবুত হবে, তাদের মাঝে প্রতিফলিত হবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাণী।

৬৪৮. মুসনাদু আহমাদ : ৮/৪৮১, হা. নং ৪৮৮০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।
৬৪৯. আল-মুহাল্লা, ইবনু হাজাম : ৪/২৮৩ (দারুল ফিকর, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

'মুসলিমগণ এক দেহের ন্যায়। যদি দেহের চোখ ব্যথা করে, তবে পুরো শরীর সে ব্যথা করে। যদি মাথা ব্যথা অনুভব করে, তবে পুরো শরীর সে ব্যথা অনুভব করে।'[৬৫০]

নিত্যব্যবহার্য বস্তু

الماعون (আল-মাউন) শব্দটি পাত্র, গ্লাস, বালতি, দিয়াশলাইসহ অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য উপকারদায়ক বস্তুকে বোঝায়।[৬৫১]

ইবনে আরাবি ﷺ বলেন, الماعون (আল-মাউন) শব্দটি عون(আউন) থেকে নির্গত। এ শব্দের মর্মার্থ হলো, শক্তি, যন্ত্র ও আসবাব দ্বারা কোনো কাজে সাহায্য করা।[৬৫২]

এ ধরনের বস্তুগুলো এককভাবে নিজেই ব্যবহার করা এবং অন্য কেউ চাইলে তা দিতে অস্বীকার করা উচিত নয়। বরং একজন মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, তার কাছে উপকারী এমন কোনো বস্তু থাকলে সে তার অপর ভাইয়ের প্রয়োজনের সময় অবশ্যই তাকে তা দিয়ে সাহায্য করবে।

কুরআনে কারিমে الماعون (আল-মাউন) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এরকম বস্তু কেউ চাইলে তাকে ব্যবহার করতে দেওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমন বস্তু দিতে অস্বীকার করার বিপরীতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। সুরা মাউনে আল্লাহ তাআলা কার্পণ্য করা ও মাউন দেওয়া থেকে নিষেধ করার ব্যাপারে ভয়ংকর শাস্তির কথা বলেছেন।

৬৫০. সহিহু মুসলিম : ৪/২০০০, হা. নং ২৫৮৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৬৫১. মুখতারুস সিহাহ : পৃ. নং ২৯৬ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)
৬৫২. আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবি : ৪/৪৫৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

ইরশাদ হচ্ছে :

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ - وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾

'অতএব, দুর্ভোগ সেসব নামাজির, যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বেখবর, যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।'[৬৫৩]

الماعون (আল-মাউন) শব্দটির তাফসিরে অনেক মতামত পাওয়া যায়। আমরা সেগুলো থেকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করছি, যদিও সব অর্থই প্রায় কাছাকাছি।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'সকল ভালো কাজই সদকা। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাউন বলতে আমরা বুঝতাম, বালতি ও পাত্র ব্যবহার করতে দেওয়া।'[৬৫৪]

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'মাউন অর্থ কাউকে কোনো জিনিস ব্যবহার করতে দেওয়া।'[৬৫৫]

ইকরামা ﷺ বলেন, 'মাউনের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো জাকাত, আর তার সর্বনিম্ন সীমা হলো আসবাবপত্র ব্যবহার করতে দেওয়া।'[৬৫৬]

জাজ্জাজ, মুবাররিদ ﷺ প্রমুখ আলিম বলেন, 'জাহিলি যুগে মাউন দ্বারা কুঠার, পাত্র, বালতি, দিয়াশলাইর মতো বস্তুগুলোকে বোঝানো হতো। এগুলো দ্বারা উপকার কম হোক বা বেশি, এগুলোকে মাউন বলা হতো।'[৬৫৭]

৬৫৩. সুরা আল-মাউন : ৪-৭
৬৫৪. আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ১০/৩৪৫, হা. নং ১১৬৩৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) -হাদিসটি হাসান।
৬৫৫. মুসতাদরাকুল হাকিম : ২/৫৮৫, হা. নং ৩৯৭৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।
৬৫৬. সহিহুল বুখারি : ৬/১৭৭, সুরা মাউনের তাফসির-সংশ্লিষ্ট আলোচনা, (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৬৫৭. তাফসিরুল কুরতুবি : ২০/২১৪ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)

মোটকথা, মাউন শব্দটি বাড়ি-ঘরে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কাজে ব্যবহার্য জিনিসগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

অতীতে মাউন শব্দটি স্বাভাবিকভাবে কুঠার, পাত্র, বালতি, পানির পাত্রের মতো বস্তুগুলোকে বোঝাত। এ বস্তুগুলো যেহেতু ঘর-বাড়িতে ব্যবহার্য সাধারণ বস্তু, তাই বর্তমানেও মাউন শব্দটি অনায়াসে ঘর-বাড়িতে ব্যবহার্য সাধারণ বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমন আজকাল খাবার রাখার জন্য তেপায়ার ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার বসার জন্য সাধারণভাবে চেয়ার ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই কোনো প্রতিবেশীর যদি এমন সব বস্তুর কোনোটির দরকার পড়ে, তবে সে প্রতিবেশীকে তা দেওয়া কর্তব্য। এমনিভাবে যদি কেউ বিপদে পড়ে, তাহলে বিপদ থেকে উদ্ধার করার মতো বস্তু তার কাছে থাকলে তাকে তা সরবরাহ করা কর্তব্য। যেমন কেউ হঠাৎ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য গাড়ির প্রয়োজন। তখন প্রতিবেশীর দায়িত্ব হলো তার গাড়িটি ব্যবহার করতে দেওয়া।

এ ক্ষেত্রে কারও গড়িমসি করা, কার্পণ্য করতে চাওয়া, দিতে না চাওয়া, সে যেন চাইতে না পারে, সে জন্য তার সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা—এসবই হলো মাউন দিতে অস্বীকার করার এক একটি রূপ।

ইসলামের এ বিধানটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদের মাঝে পরিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা। তাদের মাঝে সাহায্য-সহযোগিতা ও ভালোবাসার একটি বন্ধন তৈরি করা। যে ব্যক্তি মাউনসংক্রান্ত কোনো বস্তু অপরকে ব্যবহার করতে দেয়, সে তার প্রতি অনুগ্রহ বা দয়া করে না; বরং তা দেওয়াই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। যদি সে তা না দেয়, তবে গুনাহগার হবে। আল্লাহ এ কাজকে আবশ্যক করে দিয়েছেন এবং এ কাজ পরিত্যাগকারীকে শাস্তির ক্ষেত্রে নামাজে রিয়াকারীদের সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের গূঢ়তত্ত্ব

এটি ইসলামের একটি মহান বিধান। এ কাজটি করার জন্য আদেশ করার কারণ হলো, যেন উত্তম ও সত্যের প্রসার হয় এবং মন্দ ও মিথ্যার দমন হয়।

সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি এ উম্মাহ আদিষ্ট। উম্মাহর ওপর এটি এক মহান আমানত। এ দায়িত্ব আদায়ের ভার প্রত্যেক মুসলিমের, চাই সে পুরুষ হোক বা নারী, শাসক হোক বা শাসিত, ধনী হোক বা গরিব। প্রত্যেক মুসলিমই তার আশপাশের লোকদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার জন্য আদিষ্ট। যেন এ ধরা থেকে অন্যায়-অবিচার, অসৎ ও মন্দ কর্ম দূরীভূত হয় এবং তদস্থলে ন্যায় ও ইনসাফ, সৎ ও উত্তম কর্মের প্রসার হয়।

উম্মাহ যদি এ গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব দায়িত্ব আদায়ে ঢিলেমি করে, তারা যদি নিস্তেজ হয়ে থাকে, এ দায়িত্ব আদায়ে উদাসীনতা দেখায়; তবে সর্বত্র বিপদ প্রকট হয়ে উঠবে, মন্দ সব জায়গায় গেড়ে বসবে, ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ফলে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, মানুষ ব্যাপকভাবে গোমরাহ হতে থাকবে। কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন স্থান থেকে এ বাস্তবতাটা বুঝে আসে।

ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে, যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম।'[৬৫৮]

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তারা পরস্পরের সহযোগী। তারা পরস্পরকে সৎ কাজের আদেশ করে উত্তমতার মাঝে জীবনযাপন করে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে নিজেদের মন্দ থেকে রক্ষা করে।

৬৫৮. সুরা আলি ইমরান : ১০৪

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

'আর ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা সৎ কাজের আদেশ করে দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশের অনুসরণ করে। এদেরই ওপর আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।'[৬৫৯]

বনি ইসরাইল আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের পথ থেকে সরে যাওয়ার কারণে তাদের নিন্দা করে আল্লাহ বলেন :

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ - كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

'বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কাফির, তাদের দাউদ ও মরিয়ম-তনয় ইসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা নিজেরা করত। তারা যা করত, তা অবশ্যই মন্দ ছিল।'[৬৬০]

যদি এ কাজে শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তবে শক্তি প্রয়োগ করে মন্দ থেকে নিষেধ করতে হবে। যদি এমনটা করা সম্ভব না হয়, তবে উত্তম নসিহত, হৃদয়গ্রাহী কথা দ্বারা নিষেধ করার চেষ্টা করবে, সৎ কাজে আদেশ করার চেষ্টা করবে। যদি কথা বলা সম্ভব না হয় বা কথা বলতে অক্ষম হয়, তবে

৬৫৯. সুরা আত-তাওবা : ৭১
৬৬০. সুরা আল-মায়িদা : ৭৮-৭৯

কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করতে হবে এবং গোপনে এ ওয়াজিব আদায়ের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে।

আবু সাইদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

'তোমাদের কেউ মন্দ কর্ম দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে কথা দিয়ে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে অন্তর দিয়ে; আর এটা হচ্ছে ইমানের সর্বনিম্ন স্তর।'[৬৬১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এ কাজে শিথিলতা করা থেকে সাবধান করেছেন। কেননা, এ কাজে শিথিলতা করার অর্থ হলো আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির উপযুক্ত হওয়া।

হুজাইফা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

'যার হাতে আমার প্রাণ, সে পবিত্র সত্তার শপথ! তোমরা অবশ্য অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করো, অসৎ কাজে নিষেধ করো। যদি তা না করো তবে অচিরেই আল্লাহ তোমাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করবেন, তারপর তোমরা দুআ করবে, কিন্তু তোমাদের দুআ গৃহীত হবে না।'[৬৬২]

৬৬১. সহিহ মুসলিম : ১/৬৯, হা. নং. : ৪৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৬৬২. সুনানুত তিরমিজি : ৪/৩৮, হা. নং ২১৬৯ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

দ্বিধাহীন চিত্তে জালিম শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

'জালিম বাদশাহর সামনে ন্যায় কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।'[৬৬৩]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো :

أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟، قَالَ : كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

'কোন জিহাদ সর্বোত্তম। তিনি উত্তরে বললেন, জালিম বাদশাহর সামনে সত্য উচ্চারণ করা।'[৬৬৪]

সদাচরণ ও নসিহতের স্বরূপ

البر (আল-বির) শব্দটি উত্তম ও সদাচরণের প্রতিটি ধরনকে শামিল করে।

ইসলামের এ সদাচরণ নীতিটি ব্যাপকভাবে সে সকল কাজ ও কথাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যে কাজ ও কথা সমাজে উত্তমতা, সৌভাগ্য ও সন্তুষ্টির প্রসারণ ঘটায়। নামাজ, রোজা, জাকাত, জিহাদ, পিতা-মাতার আনুগত্য থেকে এর শুরু। এর সর্বনিম্ন সীমা ধরা যায় উত্তম কথা অথবা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে কথা বলা পর্যন্ত। এটি একটি মৌলিক কাজ। এটি একটি মহান দায়িত্ব। সদাচরণের বিভিন্ন ধরন ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে, এগুলোকে মানুষের মাঝে বাস্তবায়ন করেছে; যেন পৃথিবী হয় নিরাপদ ও শান্তিময়।

সদাচরণের কিছু নমুনা ও মৌলিক কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসেও সদাচারণের প্রতি উৎসাহিত করে অনেক নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

৬৬৩. সুনানু আবি দাউদ : ৪/১২৪, হা. নং ৪৩৪৪ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

৬৬৪. সুনানুন নাসায়ি : ৭/১৬১, হা. নং ৪২০৯ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং বড় সৎ কাজ হলো এই যে, ইমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং নবি-রাসুলগণের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত আদায় করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী; তারাই হলো সত্যবাদী, আর তারাই পরহেজগার।'[৬৬৫]

সদাচরণের এ নীতিমালাটি ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ করে। কেননা, এটি সামাজিক জীবনের জন্য একটি অভূতপূর্ব নীতিমালা। এমন নীতিমালা অন্য কোনো আদর্শ বা মতবাদে না কখনো দেখা গেছে আর না কখনো দেখা যাবে।

সদাচরণের একটি ধরন হলো, এতিম ও বিধবাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। ইসলামে এমন দায়িত্ববাহীদের অনুপম মর্যাদা দান করা হয়েছে। আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وأَحْسَبُهُ قَالَ أَوْ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَ كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ

৬৬৫. সুরা আল-বাকারা : ১৭৭

'বিধবা ও মিসকিনদের সাহায্যকারী হলো আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের মতো। আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, মনে পড়ছে, এরপর তিনি বলেছেন, অথবা রাত্রিভর নামাজ আদায়কারীর মতো, যে তা একাধারে আদায় করতে থাকে এবং রোজাদারের মতো, যে সর্বদা রোজা রাখতে থাকে।'[৬৬৬]

সফওয়ান বিন সুলাইম ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ

'বিধবা ও মিসকিনদের সাহায্যকারী হলো আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের মতো অথবা তার মতো, যে দিনে রোজা পালন করে এবং রাতে নামাজ আদায় করতে থাকে।'[৬৬৭]

ইসলামের সদাচরণ নীতি মানুষের মাঝে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকলের মাঝে স্থাপিত হয় হৃদ্যতার সম্পর্ক। সকলে হয়ে ওঠে পরস্পরের সহযোগী। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। আবু মুসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قِيْلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ : يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ، قَالَ : قِيْلَ لَه : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ : يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ، قِيْلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ : يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

'সকল মুসলিমের ওপর সদকা দেওয়া আবশ্যক। বলা হলো, যদি তার কাছে দেওয়ার মতো কিছু না থাকে? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে হাত দ্বারা কাজ করবে, এতে তার নিজের উপকার করবে এবং সদকা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, বলা হলো, যদি সে সক্ষম না হয় তাহলে?

৬৬৬. সহিহুল বুখারি : ৮/৯, হা. নং ৬০০৭ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৬৬৭. সহিহুল বুখারি : ৮/৯, হা. নং ৬০০৬ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

তিনি বললেন, সে সৎ অথবা উত্তম কাজের আদেশ করবে। বলা হলো, যদি সে এটিও করতে না পারে? তিনি বললেন, তবে অকল্যাণ থেকে অন্যকে বিরত রাখবে। কেননা, এটিও একটি সদকা।'[৬৬৮]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُه عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَه عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

'মানুষের প্রতিটি অঙ্গের ওপর সদকা ওয়াজিব। সূর্য ওঠে এমন প্রতিটি দিনে দুজনের মাঝে ন্যায়বিচার করে দেওয়া সদকা। কোনো লোককে নিজের বাহনে উঠিয়ে নেওয়া বা তার মালামাল নিজের বাহনে উঠিয়ে তাকে সাহায্য করা সদকা। উত্তম কথা বলা সদকা। নামাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিটি কদমে রয়েছে সদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো সদকা।'[৬৬৯]

আবু জার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

'কোনো সৎ কাজকে তুমি কখনো তুচ্ছ মনে কোরো না; যদিও তা নিজ ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাই হোক না কেন।'[৬৭০]

আদি বিন হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى

৬৬৮. সহিহুল বুখারি : ২/১১৫, হা. নং ১৪৪৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৬৬৯. সহিহুল বুখারি : ৪/৫৬, হা. নং ২৯৮৯ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৬৭০. সহিহ মুসলিম : ৪/২০২৬, হা. নং ২৬২৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

'তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই তার রব কথা বলবেন। উভয়ের মাঝে কোনো দোভাষীর প্রয়োজন হবে না। বান্দা ডানে তাকাবে, তখন কেবল অগ্রে পাঠানো আমলগুলোকেই দেখবে; বামে তাকাবে তখন অগ্রে প্রেরণ করা আমলগুলোই দেখবে। বান্দা সামনে তাকাবে, তখন সামনে কেবল জাহান্নাম দেখতে পাবে। তাই তোমরা একটি খেজুরের অংশ দান করে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো।'[৬৭১]

সদুপদেশ প্রদান

نصيحة (নসিহত) শব্দের অর্থ হলো ইখলাস, সততা ও কাজে সুপরামর্শ দেওয়া। এ পন্থাটি মানুষের মাঝে কল্যাণ প্রসারণের একটি মাধ্যম। এর ফলে মানুষের মাঝে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। তাদের মাঝে বৃদ্ধি পাবে কল্যাণ ও সৎ কাজ। সমাজ থেকে বিদায় নেবে অকল্যাণ ও মন্দ কাজ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুষের কল্যাণ কামনা করার জন্য আহ্বান করেছেন। তিনি বলেন :

الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا : لِمَنْ؟ قَالَ : لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ

'দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসুল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ ও মুসলিম সাধারণের জন্য।'[৬৭২]

মুমিন তার অপর মুমিন ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে। তার দুর্বলতা অথবা দোষগুলোকে প্রতিহত করে। যেন সে মুমিন ভাই সংশোধিত ও পবিত্র হতে পারে। উপদেশ প্রদানকারী মুসলিম অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ।

৬৭১. সহিহ মুসলিম : ৯/১৪৮, হা. নং ৭৫১২ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৬৭২. সহিহ মুসলিম : ১/৭৪, হা. নং ৫৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

কেননা, সে নিজের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের মাঝে কোনো খারাপ কিছু দর্পিত হতে দেখলে সে ভাইকে সতর্ক করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ

'মুমিন মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ।'[৬৭৩]

এক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য সমভাবে কল্যাণ কামনা করবে। নিজের জন্য যেমন কল্যাণ কামনা করবে, তেমনই অপর ভাইয়ের জন্যও কল্যাণ কামনা করবে। যদি এমন না হয়ে শুধু নিজের কল্যাণ কামনা করে, অথবা সমভাবে অন্য ভাইয়ের কল্যাণ কামনা না করে—সে ব্যক্তি আর সঠিক পথের ওপর থাকল না।

আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে অপর ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'[৬৭৪]

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর বিধান

الإماطة (আল-ইমাতাহ) শব্দের অর্থ কোনো কিছুকে সরানো ও দূর করা।[৬৭৫] এখানে الإماطة (আল-ইমাতাহ) শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু উঠিয়ে ফেলা এবং তা দূর করা। যেমন কাঁটা, হাড়, পাথর, কাঁচ, সীসার মতো কষ্টকর বিভিন্ন বস্তু মানুষের হাঁটার পথ থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে ফেলা।

৬৭৩. সুনানু আবি দাউদ : ৪/২৮০, হা. নং ৪৯১৮ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।
৬৭৪. সহিহুল বুখারি : ১/১২, হা. নং ১৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৬৭৫. মুখতারুস সিহাহ : ৩০১ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত)

পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো যদিও হালকা ও সহজ একটি কাজ। কিন্তু শরিয়তে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ আমলকারীকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। এ কাজের মাঝে রয়েছে মানবসেবা ও মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর পদক্ষেপ। আদর্শ মুসলিম হওয়ার জন্য এ আমলটি বিশেষ একটি নির্দেশক। এটি একজন মুসলিমের শান যে, সে মানুষের উপকার ও কল্যাণের দায়িত্ব আদায় করছে।

আমরা একটু চিন্তা করি, একজন মুসলিম রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তার সামনে একটি কষ্টদায়ক বস্তু পড়ল। এ বস্তু দ্বারা অন্য মানুষ কষ্ট পেতে পারে। সে এ বস্তু সরানোর জন্য এগিয়ে না আসার অর্থ হচ্ছে, হয় সে উদাসীন ও অসতর্ক অথবা সে অহংকারী।

সুন্নাতে নববিতে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর বিশেষ পুরস্কারের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

'ইমানের সত্তর বা ষাটটিরও অধিক শাখা রয়েছে। তার মাঝে সবচেয়ে উত্তম হলো তাওহিদের কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা। এবং সর্বনিম্ন হলো, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর লজ্জা ইমানের একটি শাখা।'[৬৭৬]

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

৬৭৬. সহিহু মুসলিম : ১/৬৩, হা. নং ৩৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

'একদা এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখল। সে ডালটি দূরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কৃত করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন।'[৬৭৭]

সহিহ মুসলিমের অপর এক রিওয়ায়াতে এসেছে :

مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ : وَاللهِ لَأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ

'এক ব্যক্তি পথচলার সময় একটি ডালের পাশ দিয়ে গমন করল। সে তখন বলল, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এটি সরিয়ে মুসলিমদের কষ্ট দেওয়া থেকে প্রতিহত করব। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো।'[৬৭৮]

আবু জার ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا، الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا، النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ

'আমার কাছে আমার উম্মতের ভলো-মন্দ আমল পেশ করা হলো। সেখানে আমি উত্তম আমলগুলো পেলাম। এ আমলগুলোর মধ্যে একটি হলো, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর নিকৃষ্ট আমলের মধ্যে একটি পেলাম, মসজিদে নাক ঝাড়া, যা পরিষ্কার করা হয় না।'[৬৭৯]

আবু বারাজা আসলামি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম :

৬৭৭. সহিহুল বুখারি : ১/১৩২, হা. নং ৬৫২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৬৭৮. সহিহ মুসলিম : ৪/২০২১, হা. নং ১৯১৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৬৭৯. সহিহ মুসলিম : ১/৩৯০, হা. নং ৫৫৩ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَدْرِي، لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَى بَعْدَكَ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا أَنَا نَسِيتُ ذَلِكَ، وَأَمِرَّ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

'হে আল্লাহর রাসুল, আমি জানি না, মনে হচ্ছে আপনি বিদায় নেবেন, আর আমি আপনার পরে থেকে যাব। তাই আমাকে কিছু উপকারী কথা বলুন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এমনটি করো, এমনটি করো। আর আমি সে সকল কথা ভুলে গিয়েছি। (একটি কথা মনে আছে যে,) আর তুমি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরাও।'[৬৮০]

আবু বারাজা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম :

يَا نَبِيَّ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ : اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

'হে আল্লাহর নবি, আমাকে উপকারী কিছু শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, তুমি মুসলিমদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরাও।'[৬৮১]

মানুষের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো সহজ ও হালকা একটি কাজ। তবুও ইসলামে রয়েছে এর অনেক মর্যাদা। ইসলাম এ কাজের প্রতি এতটা উৎসাহিত করে থাকলে বড় বড় মন্দ কাজকে অপসারণের ক্ষেত্রে ইসলামের কেমন গুরুত্ব থাকবে, তা সহজেই অনুমেয়। যেসব মন্দ কাজ সমাজে বিরাট প্রভাব ফেলে, সেসব কাজ প্রতিহত করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ—তা বলাই বাহুল্য। আবার যে সকল উত্তম কাজ মানুষকে কল্যাণ ও আল্লাহর আনুগত্যের দিকে নিয়ে যাবে, সে সকল কাজ তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে—তাও বলার দরকার পড়ে না।

---

৬৮০. সহিহ মুসলিম : ৪/২০২২, হা. নং ২৬১৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৬৮১. সহিহ মুসলিম : ২৬১৮, হা. নং ৪/২০২১ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

প্রাককথন

ইসলামের বিধিবিধান সুবিস্তৃত। মানবজীবনের প্রতিটি দিককে কেন্দ্র করেই এ সকল বিধি-বিধানের অবতারণা। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়কসহ যেকোনো বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে ইসলামে। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে পরিপূর্ণ ধর্ম হিসাবে মনোনীত করেছেন। সর্বযুগ ও সর্বস্থানের যেকোনো সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে ইসলামে। ইসলামের মৌলিক দিকগুলোর মাঝে ইসলামি অর্থায়নব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। অর্থনীতি নিয়ে তো অর্থনীতিবিদদের গবেষণার অন্ত নেই; বিশেষত বর্তমান যুগে। কিন্তু ইসলাম যে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রদান করেছে, তা যদি এ সকল অর্থনীতিবিদ অনুসরণ করতেন, তবে তারা বুঝতে পারতেন যে, ইসলামি অর্থনীতি কত সহজ, সুষম ও চমকপ্রদ।

আমাদের এবারের আলোচনার বিষয় ইসলামি অর্থনীতি। এই বিষয়ে সুষম আলোচনা করার প্রয়াস আছে। উল্লেখ্য, ইসলাম যেহেতু একটি সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত জীবনব্যবস্থার নাম, সেহেতু এর বিধানগুলোও অত্যন্ত গোছালো ও চমকপ্রদ। সেই চকমপ্রদ বিধানগুলোরই একটি হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতি। এটি পরিপূর্ণ, সুষম ও মিতচারী একটি বিধান, যা মানব হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ইসলামি আকিদার সাথে সম্পৃক্ত। তাই এ নিয়ে মানুষের দাম্ভিকতা, বাড়াবাড়ি করা বা ঝগড়া-বিবাদ বাধানোর কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এখানে তাদের কোনো হস্তক্ষেপ নেই।

এ অধ্যায়ে আমরা ওই সব পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব; যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করে একজন মুসলিম উপার্জন করতে পারে ও আর্থিকভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে। ইসলামে অর্থায়নব্যবস্থার যেসব সুন্দর নিয়মাবলি রয়েছে, সেগুলো নিয়েই এ অধ্যায়ে কিছুটা আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

সকল কিছুর মালিকানা আল্লাহর

এই পৃথিবী ও তাতে অবস্থিত সকল সৃষ্টি, সম্পত্তি ও ধনভান্ডারের একচ্ছত্র অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ তাআলা। এ মৌলিক বাস্তবতা ইসলামি আকিদা বিশ্বাসের অংশ। এ বিশ্বাস প্রত্যেক মুসলমানের মস্তিষ্কে প্রোথিত। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾

'যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু জমিনে আছে, সবই আল্লাহর মালিকানাভুক্ত।'[৬৮২]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ ﴾

'বলুন, হে আল্লাহ, তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নাও।'[৬৮৩]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

'নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'[৬৮৪]

আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বজগৎ মানুষকে দিয়েছেন, যেন তারা এর সঠিক ব্যবহার করে। এ বিরাট ধনভান্ডার ও নিয়ামতরাজি থেকে উপকার অর্জন

৬৮২. সুরা আল-বাকারা : ২৮৪
৬৮৩. সুরা আলি ইমরান : ২৬
৬৮৪. সুরা আল-মায়িদা : ১২০

করে। এতেই রয়েছে মানুষের সৌভাগ্য ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনযাপনের উপকরণ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾

'তোমরা কি দেখো না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?'[৬৮৫]

তিনি আরও বলেন :

﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴾

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন।'[৬৮৬]

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ ﴾

'তুমি কি দেখো না যে, তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, আল্লাহ তাআলা তা তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।'[৬৮৭]

একটি মৌলিক সত্য ও বাস্তবতা হলো, এই পৃথিবী ও তার মধ্যকার সকল সৃষ্টির সমুদয় মালিকানা আল্লাহর। জগতের সকল সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ তাআলা। আর মানুষ তাঁর নিয়োজিত কর্মচারী মাত্র। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় মানুষ তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾

৬৮৫. সুরা লুকমান : ২০
৬৮৬. সুরা আল-জাসিয়া : ১৩
৬৮৭. সুরা আল-হজ : ৬৫

'আর তিনি তোমাদের যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় করো।'[৬৮৮]

ইমাম ইবনে কাসির ﵀ বলেন :

'অর্থাৎ তোমাদের কাছে যে সম্পত্তি আছে, তা তোমরা খরচ করতে পারো; তবে মনে রাখবে, এটা তোমাদের নিকট ধারস্বরূপ। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে এই সব সম্পদ ছিল। আজ তা তোমাদের কাছে। তাদের কাছেও ধার হিসাবে ছিল এবং তোমাদের কাছেও ধার হিসাবেই দেওয়া হয়েছে।'[৬৮৯]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সকল কিছুর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তাআলার। আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় তাতে মানুষের হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে। নির্দেশিত পন্থায় ব্যয় করলে প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাআলাই তাকে আবার উত্তম বিনিময় দান করবেন।

ইমাম কুরতুবি ﵀ বর্ণনা করেন :

'তোমাদের হস্তগত সম্পদগুলো প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নয়; বরং তোমরা তাঁর নিয়োজিত উকিল বৈ বেশি কিছু নও। সুতরাং পরবর্তী প্রজন্মের হস্তগত হওয়ার আগেই তোমরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করো এবং কল্যাণকর কাজে তা ব্যয় করো।'[৬৯০]

দুনিয়াতে মানুষ প্রতিনিধিত্ব করার কাজেই নিয়োজিত। সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন উকিলতুল্য। প্রত্যেককে এর দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছে, যেন সে এই সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে তা থেকে উপকার লাভ করতে পারে। মানুষ রূপকভাবে এই সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করেছে, বাস্তবিকভাবে নয়। মানুষের নিকট আল্লাহর দেওয়া এই সম্পদগুলো শুধুই আমানত। তার দায়িত্ব হলো তা রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং শরিয়তসম্মত পন্থায় তা খরচ করা।

---

৬৮৮. সুরা আল-হাদিদ : ৭

৬৮৯. তাফসির ইবনি কাসির : ৮/৪৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৬৯০. তাফসিরুল কুরতুবি : ১৭/২৩৮ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়া, কায়রো)

যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

'আর তাদের ধন-সম্পদে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।'[৬৯১]

অতএব বোঝা গেল, সম্পদ মানুষের অধীনে থাকার কারণে মানুষ সম্পদের মালিক হয়ে যায়নি; বরং এ সম্পদ তার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাই তো তিনি বলেছেন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের অংশ তাদের ফিরিয়ে দিতে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾

'আল্লাহ তোমাদের যে অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদের দান করো।'[৬৯২]

মানুষ যতটুকু সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা রাখে, আল্লাহ তাদের ঠিক ততটুকু সম্পদের মালিক বানান এবং উক্ত সম্পদ থেকে দান করার নির্দেশ দেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾

'বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। কিন্তু যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদ হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যতটুকু সামর্থ্য দেন, তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ কষ্টের পর দেবেন স্বস্তি।'[৬৯৩]

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, আন্তরিক প্রচেষ্টা, ব্যয় করার মানসিকতা ও আমলের ভিন্নতার কারণে কিছু মানুষ রিজিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। সম্পদের

---

৬৯১. সুরা আল-জারিয়াত : ১৯

৬৯২. সুরা আন-নুর : ৩৩

৬৯৩. সুরা আত-তালাক : ৭

মালিকানায় তাদের প্রত্যেকের সমান অধিকার থাকলেও কিছু কিছু মানুষ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অসহায়-দরিদ্রদের দান করতে কার্পণ্য করে, এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ তাআলা নিন্দা প্রকাশ করে বলেন :

﴿ وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾

'আল্লাহ তাআলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীন দাস-দাসীদের স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করে?'[৬৯৪]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, কারও জন্য কখনোই এমন চিন্তা করা বৈধ হবে না যে, মানুষ সম্পদের মালিক। কেউ যদি এমন কিছু ভেবে থাকে, তাহলে সে ভুলের মধ্যে রয়েছে। বরং মানুষ হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদের ক্ষেত্রে আমানতদার মাত্র।

কিছু আয়াতে মানুষের সম্পদের মালিক হওয়ার কথা উল্লেখ থাকায় তা থেকে এমনটি বোঝার সুযোগ নেই যে, সে-ই এ সম্পদের প্রকৃত মালিক। বরং সেই আয়াতগুলোর ভাষ্যও এমনই যে, মানুষ প্রাপ্ত সম্পদ থেকে উপকার গ্রহণের অধিকার রাখে মাত্র। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না।'[৬৯৫]

﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾

'অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের প্রাণের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হবে।'[৬৯৬]

---

৬৯৪. সুরা আন-নাহল : ৭১
৬৯৫. সুরা আল-বাকারা : ১৮৮
৬৯৬. সুরা আলি ইমরান : ১৮৬

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾

'আপনি তাদের সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করুন। যাতে এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র ও বরকতময় করতে পারেন।'[৬৯৭]

শাইখ আব্দুল কাদির আওদা বলেন :

কিছু আয়াতে মানুষকে সম্পদের মালিক বলা হয়েছে। মূলত এখানে সম্পদের প্রকৃত মালিক বুঝানো হয়নি; বরং যেহেতু তারা এসব মালের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, তাই তাদের রূপক অর্থে মালের মালিক বলা হয়েছে। নতুবা এর প্রকৃত মালিক তো আল্লাহই।'[৬৯৮]

সারকথা হলো, এ ধরার সকল কিছুর একচ্ছত্র ও একমাত্র অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ তাআলা। ধন-সম্পদ হলো এই মহাবিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আর মানুষ হচ্ছে এই অংশবিশেষের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় তা থেকে উপকার গ্রহণকারী।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾

'তিনিই জমিন থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদের বসতি দান করেছেন।'[৬৯৯]

আল্লামা ইবনে কাসির ﷺ বলেন :

'তিনি তোমাদের এই পৃথিবীর মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পৃথিবী আবাদকারী বানিয়েছেন। যেন তোমরা এ বিশ্ব আবাদ করো এবং তা থেকে উপার্জন ও উপকার ভোগ করতে পারো।'[৭০০]

---

৬৯৭. সুরা আত-তাওবা : ১০৩
৬৯৮. আল-মালু ওয়াল হুকুম ফিল ইসলাম : পৃ. নং ৪৩ (আল-মুখতারুল ইসলামি, কায়রো)
৬৯৯. সুরা হুদ : ৬১
৭০০. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/২৮৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা মানুষকে জমিনে প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন, যেন মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল কল্যাণ নিয়ে আসে। কল্যাণ বলতে দুনিয়া ও আখিরাতের সব ধরনের উত্তম বিষয়কে বোঝায়।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾

'আর (স্মরণ করো,) তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি।'[৭০১]

মালিকানার পরিচয়

الملكية (আল-মিলকিয়্যাতু) শব্দটি মাসদারে সনায়ি (صناعي), যা مِلْك (মিলকুন) শব্দ হতে নির্গত।

পরিভাষায় الملكية বা মালিকানা হলো সম্পদের ওপর শরিয়তপ্রণেতা-প্রদত্ত এমন একটি ক্ষমতা, যার কারণে তার প্রদত্ত সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি পাওয়া যায়।'[৭০২]

এটি এমন এক যোগ্যতা, যা বিধানদাতার পক্ষ থেকে তার প্রাপককে দান করা হয়। যে যোগ্যতাবলে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহে শরিয়া-বর্ণিত পন্থায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার অর্জিত হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞায় আরও বলা হয়, 'সম্পদের মধ্যে মালিক ব্যতীত অন্য কারও হস্তক্ষেপের শরয়ি অধিকার সিদ্ধ না থাকাকে মালিকানা বলে। অর্থাৎ মালিকের জন্য নিজ সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে কোনোরূপ বাধা না থাকা, কিন্তু অন্যদের জন্য এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকা।'[৭০৩]

---

৭০১. সুরা আল-বাকারা : ৩০
৭০২. ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম : ৬/২৪৮ (দারুল ফিকর, বৈরুত)
৭০৩. আল-মাদখাল ইলা নাজরিইয়্যাতিল ইলতিজামিল আম্মাহ ফিল ফিকহিল ইসলামি : ৩/৩৩ উস্তাজ মুস্তাফা জারকা রচিত

একমাত্র মালিক ব্যতীত অন্য কারও হস্তক্ষেপের অনুমতি না থাকা। হস্তক্ষেপের অধিকার একমাত্র মালিকের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং মালিকের জন্যও নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে। এ নিষেধাজ্ঞা যোগ্যতাগত কারণে হতে পারে। যেমন মালিক স্বল্পবয়স্ক এবং বুঝসম্পন্ন না হলে স্বীয় সম্পদে হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে না। আবার সম্পদে অন্য কারও অংশীদার হওয়ার কারণেও নিষেধাজ্ঞা হতে পারে। যেমন যৌথ-সম্পদ ও বন্ধকের সম্পদ। এ দুধরনের সম্পদে অন্যের হক জড়িত থাকে।

ফিকহের কিতাবসমূহে আরও কিছু সংজ্ঞা বর্ণিত আছে, যেগুলোর সারমর্ম প্রায় কাছাকাছি।

মালিকানার প্রকারভেদ

ক্ষেত্র, ব্যাপ্তি ও গুণ হিসাবে মালিকানা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

ভোগের বিবেচনায় মালিকানা দুপ্রকার

ক. মালিকানাধীন সম্পদ, যা ভোগ করা যায় না

অর্থাৎ কোনো বস্তুর মালিক হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে উপকার গ্রহণ করতে না পারা। উদাহরণত ওয়াকফ ও অসিয়তের সম্পদ। ওয়াকফকারী ওয়াকফকৃত বস্তুর মালিক হওয়া সত্ত্বেও তা ভোগ করতে পারে না। অথচ একই জিনিস থেকে যাকে ওয়াকফ করা হয়েছে, সে ভোগ করতে পারছে। অসিয়তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অসিয়তকারী ব্যক্তি মূল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তা ভোগ করতে পারে না। অথচ যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে, সে উক্ত অসিয়তকৃত সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করে থাকে। যেমন কোনো জিনিসকে কারও জীবিত থাকা পর্যন্ত ভোগ করার অসিয়ত করা। অতএব যখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তখন তা তার ওয়ারিসদের নিকট হস্তান্তরিত করতে হবে। এই পদ্ধতিতে পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হয় না। তাই এটাকে অসম্পূর্ণ মালিকানাও বলা যায়।

খ. মালিকানাহীন সম্পদ, যা ভোগ করা যায়

মালিকানা অন্যের হওয়া সত্ত্বেও তা ভোগ করার অধিকার থাকা। যেমন ভাড়ায় গ্রহণকৃত বস্তু। ভাড়ায় নেওয়া জিনিসে অন্যের মালিকানা থাকা সত্ত্বেও তা ভোগ করা যায়।

এই উভয় পদ্ধতিতেই মালিকানা অসম্পূর্ণ। প্রথমটিতে পণ্যের মালিক হয়েও ভোগ করার মালিক না হওয়া এবং দ্বিতীয়টিতে ভোগ করতে পারলেও পণ্যের মালিক না হওয়া।

ব্যাপ্তির বিবেচনায় মালিকানা দুপ্রকার

ক. নির্দিষ্ট মালিকানা

নির্দিষ্ট মালিকানা হলো, কোনো পণ্য এক বা একাধিক মালিকের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া। যেমন : বসবাসের বাড়ি, যাতায়াতের গাড়ি ও এ জাতীয় অন্যান্য সম্পদ, যা এক বা একাধিক মালিকের জন্য নির্ধারিত।

খ. ব্যাপক মালিকানা

ব্যাপক মালিকানা হলো, যা সর্বসাধারণের জন্য অথবা নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত। যেমন : সাগর-নদী, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি। সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলে এগুলো স্থাপিত হয় এবং সমগ্র জাতি বা তার বড় একটি অংশ এ ধরনের জনহিতকর বস্তুর মালিক হয়ে থাকে।

গুণের বিবেচনায় মালিকানা দুপ্রকার

ক. স্বতন্ত্র মালিকানা

স্বতন্ত্র মালিকানা হলো, সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণের মালিক হওয়া। কেউ স্বতন্ত্রভাবে কোনো বস্তুর মালিক হওয়া। যেমন কোনো ব্যক্তি এককভাবে একটি বাড়ি বা ভূমির মালিক হওয়া।

খ. যৌথ মালিকানা

যৌথ মালিকানা হলো, অনির্দিষ্টভাবে সম্পদের কোনো একটি অংশে মালিকানা থাকা। যেমন যৌথ কারবারের মধ্যে একাধিক মালিকের সম্পৃক্ততা থাকে। কারও অংশ নির্দিষ্ট করে পৃথক করা থাকে না; বরং এতে সকলের অংশ একত্রে থাকে। তাই এমন সম্পত্তির প্রত্যেক অংশে একাধিক শরিকের কারও না কারও মালিকানা যুক্ত থাকে।

ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ব্যক্তিগত মালিকানার আগ্রহ মানুষের সত্তাগত, সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত একটি চাহিদা। এ চাহিদা কৃত্রিম কোনো পরিস্থিতি থেকে সৃষ্ট কোনো অনুভূতি নয়। অনেক অজ্ঞ-মূর্খ এরকমই ভেবে থাকে। আবার এটি মনের কোনো সাময়িক কল্পনাও নয়, যা শাসকদের কঠিন আইনের চাপে দূরীভূত হয়ে যাবে; বরং এটি এমন এক বাস্তবতা, যা মানুষের মস্তিষ্কের সাথে মিশে আছে অথবা মানুষের হৃদয়-গভীরে প্রোথিত। এটি এমন এক প্রবল আকর্ষণ, যার মাধ্যমে একজন লোক বিরতিহীনভাবে কল্যাণকর বিষয় অর্জন করতে চায়। কেবল তাই নয়। বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় চাহিদা। এ চাহিদা অবশ্যপূরণীয়। নচেৎ মানুষ মারাত্মক সংকট ও বিপদে নিপতিত হবে। এই মৌলিক ও সৃষ্টিগত চাহিদার বিবরণ পবিত্র কুরআনে কারিমেও বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴾

'মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তানসন্ততি, রাশিকৃত সোনা-রুপা, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী।'[৭০৪]

---

৭০৪. সুরা আলি ইমরান : ১৪

এ আলোচনা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারে মানুষের সৃষ্টিগত আকর্ষণ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য জানা গেল। এটিই হলো ইসলামের অবস্থান। যুগের পর যুগ ধরে ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম হলো, ইসলামের প্রতিটি বিধানই মানুষের স্বভাব উপযোগী, যা মানুষের সব ধরনের মৌলিক চাহিদাকে অনুমোদন দেয় সুচারুরূপে। ব্যক্তি-মালিকানার বৈধতা দানের পাশাপাশি ইসলামি শরিয়া কিছু শর্ত আরোপ করেছে এবং সেগুলোর অন্যথা করা থেকে সতর্ক করে দিয়েছে। এ বিষয়টি অবৈধ পন্থায় মালিক হওয়ার আলোচনায় আসবে।

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে ভীতি প্রদর্শন, সতর্কবার্তা, আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে ইসলামে ব্যক্তি-মালিকানার গুরুত্ব দেওয়ার কথাটি বুঝে আসে। ব্যক্তি-মালিকানা রক্ষায় ইসলাম অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কেউ যদি ব্যক্তি-মালিকানার সম্পদ চুরি করে এবং তা শরিয়ার দৃষ্টিতে অপরাধ হয়, তাহলে তার হাত কাটার মতো কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে ইসলামে। একইভাবে মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির ওপর অপহরণ, লুণ্ঠন, ডাকাতি ও প্রতারণার মতো অবৈধ হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ইসলাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এমন অপরাধে চুরির চেয়েও কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। ইসলামের এমন বিধান থেকে ব্যক্তি মালিকানার প্রতি ইসলামের গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি বোঝা যায়। ইসলাম যেমন সম্পদ ভোগ করার অধিকার দিয়েছে, তেমনই তা রক্ষা করার জন্যও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মানুষের জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু হরণ করা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না।'[৭০৫]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

৭০৫. সুরা আল-বাকারা : ১৮৮

'প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানে অন্যায় হস্তক্ষেপ হারাম।'[৭০৬]

বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা হচ্ছে, ব্যক্তি-মালিকানা হৃদয়ে দান করার মানসিকতা তৈরি করে। এটি উদারতা ও উদ্দীপনা জাগানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে এবং একাগ্রতায় স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে দান-দক্ষিণা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর সম্পদের মালিকের যথার্থভাবে ব্যয় করার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনের কারণে সমাজে নেতিবাচক ও বিপদজনক পরিণতি ঘটে। অন্যদিকে ব্যক্তি-মালিকানা স্বীকৃত না থাকলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় না, উল্টো উপার্জন ও উৎপাদন কমে আসে, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

নিজ অধিকারের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হওয়া

ফিকহে ইসলামি থেকে উলামায়ে কিরামের গবেষণালব্ধ মাসআলাসমূহের মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। অন্য মাসআলাগুলোর তুলনায় এটি বৈশিষ্ট্যগতভাবে আলাদা। উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। বিভিন্ন মানবরচিত সংবিধানও স্বেচ্ছাচারিতার ভাবটি গ্রহণ করেছে, এমন সংবিধানের মতে মানুষ স্বীয় ভোগের জন্য সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু ইসলামের নীতি হলো, মানুষ তার বৈধ অধিকারের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার স্বাধীনতা আছে, যদি না কোনো ক্ষতি আপতিত হয়। কিন্তু ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়—এমন পথে খরচ করার অধিকার নেই। কেননা, ক্ষতি যেমনই হোক না কেন, তা থেকে সংযত থাকতে হবে। ক্ষতি হয়ে গেলে দ্রুত তার সমাধান করতে হবে।

নিজ অধিকারের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা না করার মাসআলাটি শরিয়ার একটি মূলনীতির ওপর আধারিত। মূলনীতিটি হলো, 'কোনো মুসলিমের ক্ষতি না করা এবং ক্ষতি হয়ে গেলে তা দূর করা।' এই মূলনীতির উৎস হচ্ছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [ইসলামে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও ক্ষতি করার কোনো অবকাশ নেই।] হাদিসটি ছোট হলেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ

৭০৬. সহিহ মুসলিম : ৪/১৯৮৬, হা. নং ২৫৬৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

এবং তা থেকে অনেক ফিকহি মাসআলা-মাসায়িল উৎসারিত হয়। এগুলো একটি উদ্দেশ্যের দিকেই ইঙ্গিত করে যে, কোনো ধরনের ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতি হয়ে গেলে তা দূর করতে হবে। এমনকি যদি ক্ষতি থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় না থাকে, তবে ক্ষতির পরিমাণকে হালকা করতে হবে। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ নিজের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে অন্য কারও ক্ষতি হয়েই যায়, তাহলে এর সমাধান ব্যাপক আলোচনার দাবি রাখে।

যদি কেউ নিজের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে অন্য কারও এমন ক্ষতি করে ফেলে এবং বিষয়টি যদি তুচ্ছ ও সামান্য হয়, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। আর যদি ক্ষতিটা ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তির উচিত হলো তার অধিকার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [ইসলামে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও ক্ষতি করার কোনো অবকাশ নেই।][৭০৭]

এমনিভাবে যদি কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার সময় অন্যের ক্ষতি হবে—এমন পথ অবলম্বন করে, তাহলে তার উচিত হলো নিজের অধিকারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা। যতক্ষণ ক্ষতিকর হস্তক্ষেপের বিকল্প কোনো পথ না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ নিজের অধিকারে হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই।

যদি এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যদ্দরুন তাকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে, তাহলে দেখতে হবে—এতে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম ক্ষতি হয় কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে। সাধারণত এ অবস্থায় দুধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

ক. খাস—যা শুধু সম্পদের মালিকের সাথে সম্পৃক্ত।

খ. আম—যা একটি জাতি বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত।

এমন পরিস্থিতিতে তুলনামূলক কম ক্ষতির দিকটাকেই গ্রহণ করতে হয়। অতএব, এ ক্ষেত্রে শরিয়ার মূলনীতি অনুযায়ী মালিকের উচিত হলো, আম

৭০৭. মুসনাদু আহমাদ : ৫/৫৫, হা. নং ২৮৬৫ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

তথা একটি গোষ্ঠীর ক্ষতিকে এড়িয়ে যাওয়া এবং খাস অধিকারটি বিসর্জন দেওয়া। শরিয়ার মূলনীতিটি হলো :

إِذَا ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا، وَيَدْفَعُ أَعْظَمَ الضَّرَرَيْنِ بِأَهْوَنِ الضَّرَرَيْنِ.

'যখন দুটি সমস্যা একসাথে দেখা দেবে, তখন দুটির মধ্য হতে অপেক্ষাকৃত সহজটাকে গ্রহণ করবে এবং এ ক্ষেত্রে দু'ক্ষতির মধ্যে সহজটাকে নিয়ে কঠিনটাকে বর্জন করা হবে।'[৭০৮]

অপরদিকে মালিকানাধীন সম্পদ ব্যবহারের সময় অন্যের সাথে সম্পৃক্ত আরও একটি ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। এখানে দুটি মত রয়েছে। যথা :

১. মালিকের দালিলিক ও প্রামাণিক শক্তি থাকার কারণে তার জন্য সম্পদে হস্তক্ষেপের অনুমতি আছে।

২. উভয় অবস্থাকে তুলনা করে একটিকে গ্রহণ করা।

প্রথমটি হলো, সম্পদের মালিককে হস্তক্ষেপ থেকে বাধা দেওয়া। দ্বিতীয়টি হলো, অন্যের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও হস্তক্ষেপের অনুমতি দেওয়া। অতএব, যদি বাধা দিলে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে তাকে হস্তক্ষেপের অনুমতি দিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি তুলনামূলকভাবে অন্যের ক্ষতিটা বেশি হয়, তাহলে তাকে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখা আবশ্যক। কেননা, শরিয়ার উসুল হলো, তুলনামূলক বেশি ক্ষতিকে প্রতিহত করার জন্য কম ক্ষতিকে গ্রহণ করা।

এ বিষয়ে আল্লামা শাতিবি ﷺ-এর কিতাবুল মুআফাকাতের বর্ণনা হলো :

অনুমোদিত পন্থায় উপকার অর্জন বা ক্ষতি প্রতিহত করা হয়ে থাকে দুভাবে।

এক. অন্য কারও ক্ষতি না হওয়া।

দুই. অন্য কারও ক্ষতি হওয়া। এটি আবার দুপ্রকার :

৭০৮. শরহুস সিয়ারিল কাবির : ৫/৪৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

ক. উপকার অর্জনকারী বা ক্ষতি দূরকারী ইচ্ছাকৃতভাবে কারও ক্ষতি করা।

খ. ইচ্ছাকৃতভাবে কারও ক্ষতি না করা। প্রথমটি আবার দুপ্রকার।

১. ক্ষতিটা ব্যাপক হওয়া।

২. খাস বা নির্দিষ্ট কারও ক্ষতি হওয়া।

সর্বোপরি, নিজ মালিকানাধীন সম্পদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপের ব্যাপারে এ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শরিয়ত সম্পদের মালিকের ওপর সম্পদের অন্যায় ব্যবহার নিষেধ করে দিয়েছে। কেননা, এর ফলে অন্যের ক্ষতি হয়ে থাকে। তা ছাড়া ইসলামও এর সমর্থন দেয় না যে, মানুষ নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলবে। এ ধরনের কার্যকলাপ স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্যের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে, যা মানুষের মাঝে দাম্ভিক মনোভাব সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান হলো, হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে ইসলামের বর্ণিত সুশৃঙ্খল স্বাধীনতা পেয়ে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। কেননা, শরিয়া কর্তৃক নির্ধারিত স্বাধীনতার মাঝে অন্যের অধিকার বা কোনো ধরনের স্বার্থ খর্ব হয় না। যদি কারও স্বার্থহানি হয়ে যায়, তাহলে শরিয়ার নীতি হলো তা দূর করা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংগত কাজ ও অবাধ্যতা করতে বারণ করেন।'[৭০৯]

ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, কারও জন্য এমনটি করা উচিত নয় যে, প্রতিবেশীর ক্ষতি করে নিজের মালিকানাধীন সম্পদ ব্যাবহার করবে। যেমন নিজের এমন জায়গায় গোসলখানা নির্মাণ করা—যেখানে প্রতিবেশীর ক্ষতি হয়, আতর বাজারের মাঝখানে ধোপার দোকান তৈরি করা, প্রতিবেশীর পুকুরের

৭০৯. সুরা আন-নাহল : ৯০

পাশে পুকুর খনন করা, যা অন্যের পুকুরের পানি টেনে নেয় ইত্যাদি। অন্যের ক্ষতিসাধন করতে নিষেধ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ

'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের ক্ষতি করে, আল্লাহ তার ক্ষতি করেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাকে কষ্টে নিপতিত করেন।'[৭১০]

অর্থাৎ কোনো মুসলিমের ক্ষতি করলে বা কষ্ট দিলে, সে উল্টো ওই ক্ষতি ও কষ্টে নিপতিত হবে।

সামুরা বিন জুনদুব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ : وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ، قَالَ : فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى، قَالَ : فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيهِ فَأَبَى، فَقَالَ : أَنْتَ مُضَارٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ : اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ

'এক আনসারি সাহাবির দেয়াল ঘেঁষে তাঁর খেজুর গাছের একটি ডাল ছিল। আর আনসারি সাহাবির সাথে তার পরিবার-পরিজন থাকত। ফলে সামুরা ﵁ তাঁর খেজুর গাছের কাছে গেলে ওই সাহাবি কষ্ট পেত। তাই তিনি সামুরা ﵁-কে খেজুর গাছটি তার কাছে বিক্রি করে দিতে বললেন। তিনি এতে রাজি না হওয়ায় তার কাছে হস্তান্তর করে দিতে বললেন। তাতেও তিনি রাজি না হওয়ায়

৭১০. সুনানুত তিরমিজি : ৩/৩৯৬, হা. নং ১৯৪০ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

আনসারি সাহাবি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে বিষয়টি অবগত করলেন। সব শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নিজেও সামুরা ﷺ-কে গাছটি বিক্রি করতে বললেন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে গাছটি হস্তান্তর করতে বললেন। এতেও তিনি রাজি হলেন না। অবশেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ (তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য) বললেন, তুমি তাকে গাছটি দিয়ে দাও। তোমাকে এই এই পুরস্কার দেওয়া হবে। তবুও তাকে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তো ক্ষতিকারী। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আনসারি সাহাবিকে বললেন, তুমি গিয়ে তার খেজুর গাছটি উপড়ে ফেলো।'[৭১১]

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন :

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ؟ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ : أَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ : أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ : اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}

'এক ব্যক্তি জুবাইর ﷺ-এর সাথে প্রস্তরময় ভূমিতে একটি পানির নালা নিয়ে বিতর্ক করল। তা থেকে তারা সকলে পানি ব্যবহার করত। আনসারি সাহাবি বললেন, জুবাইর, পানি যেতে দাও। কিন্তু

---

৭১১. সুনানু আবি দাউদ : ৩/৩১৫, হা. নং ৩৬৩৬ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

জুবাইর ﷺ অস্বীকার করলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, জুবাইর, তুমি আগে তোমার জমি সিঞ্চিত করো। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর কাছে যেতে দাও। এমন সিদ্ধান্তে আনসারি সাহাবি রাগ করে বললেন, তিনি আপনার ফুফাতো ভাই হওয়াতে এমন সিদ্ধান্ত? অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক মলিন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি তোমার জমি সিঞ্চিত করে পানি আটকে রাখো। যেন তা দেয়ালের কাছে চলে যায়। অতঃপর জুবাইর ﷺ বললেন, আমি জানি, এ ব্যাপারেই এ আয়াতটি নাজিল হয়েছে : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [অতএব তোমার পালনকর্তার কসম, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। (সুরা আন-নিসা : ৬৫)]'[৭১২]

আরও বর্ণিত আছে যে, জাহহাক ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামা একটি নালা নিয়ে মতানৈক্য করেছিলেন। জাহহাক চাচ্ছিলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামার জমির দিকে তা প্রবাহিত করতে। কিন্তু তিনি বারণ করলেন এবং আমিরুল মুমিনিন উমর ﷺ-এর দরবারে নালিশ করলেন। সব শুনে তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তোমার পেটের ওপর দিয়ে হলেও তা সেখান দিয়ে প্রবাহিত হবে।'[৭১৩]

এই দলিলগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, অন্যের ক্ষতি করে বা কষ্ট দিয়ে নিজের সম্পদ ব্যবহার করা বৈধ নয়।

---

৭১২. সহিহুল বুখারি : ৩/১১১, হা. নং ২৩৫৯ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৭১৩. মুআত্তা মুহাম্মাদ : পৃ. নং ২৯৬, হা. নং ৮৩৬ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

মালিকানা অর্জনের মাধ্যম

সম্পদের মালিকানা অর্জনের মাধ্যম দুধরনের। এক. বৈধ মাধ্যম। ইসলাম যে সকল পদ্ধতির অনুমোদন দেয় এবং যে সকল পন্থায় উপার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। দুই. অবৈধ মাধ্যম। যে সকল পদ্ধতিকে ইসলাম অগ্রহণযোগ্য ও হারাম ঘোষণা করেছে। এই পন্থায় উপার্জনের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

ইসলাম অনুমোদিত বৈধ পন্থাগুলোর অনেক প্রকার রয়েছে। আমরা এখানে সামগ্রিকভাবে দশটি প্রকার নিয়ে আলোচনা করব।

এক. ব্যবসা

আভিধানিক অর্থে التجارة (আত-তিজারা) হলো المعاوضة বা বিনিময় করা। ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রত্যেকেই একে অপরকে কোনো কিছুর বিনিময়ে আদান-প্রদানকে المعاوضة (আল-মুআওয়াজা) বলে। ক্রেতার পক্ষ থেকে প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্য দেয়। ব্যবসার ভিত্তি হচ্ছে উপার্জন ও লাভের আশায় বিনিময় বা আদান-প্রদানের চুক্তি। তবে এ ক্ষেত্রে সততা ও পারস্পরিক সন্তুষ্টি থাকা আবশ্যক। পরস্পরের হালাল সম্পদকে বৃদ্ধি করার একটি বৈধ প্রক্রিয়া হলো ব্যবসা। এর ফলে মানুষ উত্তমভাবে হালাল রিজিক উপার্জন করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।'[৭১৪]

৭১৪. সুরা আন-নিসা : ২৯

মুফাসসিরিনে কিরাম বলেন, ব্যবসার ক্ষেত্রে এই আয়াতটি গভীর তাৎপর্যের দাবিদার। এই আয়াতের মধ্যে ব্যবসার বৈধ লেনদেনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং সকল অবৈধ পদ্ধতিকে বাতিল করা হয়েছে। যেমন : সুদ, মদ বা শুকর বিক্রি, প্রতারণা ইত্যাদি। এমনিভাবে উল্লিখিত আয়াত থেকে এমন প্রত্যেক জায়িজ চুক্তিও বাদ পড়েছে, যাতে কোনো বিনিময় নেই। যেমন : ঋণ, সদকা, উপহার ইত্যাদি।[৭১৫]

আয়াতে বলা হচ্ছে, عن تراض منكم অর্থাৎ পরস্পরের সম্মতিক্রমে। এ থেকে বুঝা যায়, ব্যবসার মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকতে হবে। সন্তুষ্টি ছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো লেনদেন করা হলে উক্ত লেনদেন সহিহ হবে না।

ব্যবসায়ীদের অধিক পরিমাণে কসম খাওয়া

পণ্য বিক্রির জন্য অতিরিক্ত কসম খাওয়ার ফলে ব্যবসায়ী সেসব পাপীর অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা দুনিয়ার বিনিময়ে তাদের আখিরাত বিক্রি করে দেয় এবং ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস ও আখিরাত ধ্বংস করে দেয়।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ

'কবিরা গুনাহগুলো হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।'[৭১৬]

ব্যবসায়ীর শপথ সত্য হলেও বিক্রেতার জন্য এমন শপথ করা মাকরুহ। আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

৭১৫. তাফসিরুল কুরতুবি : ৫/১৫২ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)
৭১৬. সহিহুল বুখারি : ৮/১৩৭, হা. নং. : ৬৬৭৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للكسب

'কসম পণ্যকে তো চালিয়ে দেয়, কিন্তু উপার্জনকে ধ্বংস করে দেয়।'[৭১৭]

আবু কাতাদা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন :

اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

'তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিক কসম করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, তা পণ্যকে চালিয়ে দেয়। অতঃপর তা ধ্বংস করে দেয়।'[৭১৮]

আবু জার ؓ থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ

'আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির মানুষের সাথে কথা বলবেন না। তারা হলো : এমন দয়াবান, যে খোঁটা ছাড়া কোনো কিছু দান করে না; মিথ্যা কসম করে পণ্য বিক্রেতা; কাপড় হেঁচড়িয়ে হাঁটা ব্যক্তি।'[৭১৯]

হাকিম বিন হিজাম ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

'পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য লেনদেন করা-না করার অবকাশ রয়েছে। সুতরাং যদি তারা সত্য বলে

৭১৭. সুনানুন নাসায়ি : ৭/২৪৬, হা. নং ৪৪৬১ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

৭১৮. সহিহ মুসলিম : ৩/১২২৮, হা. নং. : ১৬০৭ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

৭১৯. সহিহ মুসলিম : ১৪/১০২, হা. নং ১০৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

এবং যেকোনো সমস্যা থাকলে তা খুলে বলে, তাহলে তাদের বিক্রিতে বরকত হবে। আর যদি দোষ গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের বিক্রির বরকত বিনষ্ট হয়ে যাবে।'[৭২০]

নেককার ব্যবসায়ীদের উন্নত মর্যাদা

সৎ ব্যবসায়ীগণের জন্য রয়েছে অতি মূল্যবান পুরস্কার। কিয়ামতের দিন সত্যবাদী ও নেককার ব্যবসায়ীর সুউচ্চ মর্যাদা ও সুমহান প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে শরিয়তে। যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

'বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবি, সিদ্দিক ও শহিদদের সাথে থাকবে।'[৭২১]

দুই. বর্গাচাষ

বর্গাচাষ মুআমালারই একটি প্রকার। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হালাল উপার্জন এবং উত্তম রিজিকের আশায় অন্যের কাছে চাষের জন্য জমি হস্তান্তর করা। المزارعة (আল-মুজারাআ) হলো, জমির মালিক কাউকে শ্রম ও অর্থ দিয়ে চাষাবাদ করার জন্য এই শর্তে জমি হস্তান্তর করা যে, তাদের উভয়ের জন্য জমিতে উৎপাদিত ফসলে একটি নির্দিষ্ট অংশ থাকবে। যেমন অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ইত্যাদি করে। কিন্তু তাদের কারও অংশে নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ উল্লেখ থাকতে পারবে না। যেমন জমির মালিক বলল, আমি তোমাকে আমার এই জমি এই শর্তে চাষ করতে দেবো যে, তুমি আমাকে এত টন, এত মন বা এত কেজি উৎপাদিত ফসল দেবে, তাহলে এমন বক্তব্যে ঝুঁকি থাকার কারণে চুক্তি বাতিল বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু হতে পারে, সে বছর জমি থেকে একজনের শর্তানুপাতেই ফসল আসল, তাহলে সে ক্ষেত্রে একজন পুরোটাই ভোগ করল আর

৭২০. সহিহ মুসলিম : ৩/১১৬৪, হা. নং ১৫৩২ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

৭২১. সুনানুত তিরমিজি : ২/৫০৬, হা. নং ১২০৯ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

অন্যজন একেবারেই ফাঁকিতে পড়ল। এমন অসুবিধা যেন সৃষ্টি না হয়, সে জন্য ইসলাম নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করার কথা বলে না; বরং নির্দিষ্ট অংশের কথা বলে। যেমন দুজনেই অর্ধেক অর্ধেক করে ফসল নেওয়ার শর্তে বর্গাচুক্তি করল। তাহলে জমির ফসল যতটুকুই উৎপন্ন হোক না কেন, তাতে উভয়ের অংশ থাকা নিশ্চিত হয়। এতে কাউকে এককভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না।

তাই যার জমি আছে, কিন্তু সময়ের সংকীর্ণতা বা অভিজ্ঞতা না থাকা অথবা চাষাবাদ করতে অক্ষমতার কারণে সে চাষ করতে পারে না, তার উচিত হবে অভিজ্ঞ কাউকে জমি চাষ করতে দেওয়া।

জমহুর উলামায়ে কিরাম তথা ইমাম মালিক ﵀, ইমাম সুফইয়ান সাওরি ﵀, ইমাম আওজায়ি ﵀, ইমাম আবু সাওর ﵀, ইমাম ইসহাক ﵀, ইমাম আহমাদ ﵀ এবং ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর প্রধান দুই শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফ ﵀ ও ইমাম মুহাম্মাদ ﵀-এর মতামত হলো, 'অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ইত্যাদির চুক্তিতে المزارعة (বর্গাচাষ) বৈধ।' ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর মতে শুধু খেজুর ও আঙুর গাছে বর্গাচুক্তি জায়িজ। আর অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রে তার থেকে দুটি মত পাওয়া যায়। আর ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর মতে কোনো গাছেই বর্গাচুক্তি জায়িজ নেই।[৭২২]

জমহুর উলামায়ে কিরাম দলিল দিয়ে থাকেন জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يَمْنَحْهَا، أَوْ يَذَرْهَا

'যার জমি আছে সে যেন তাতে চাষাবাদ করে কিংবা কাউকে চাষ করতে দেয়; অন্যথায় যেন তা খালি ফেলে রাখে।'[৭২৩]

৭২২. আল-মুগনি, ইবনু কুদামা : ৫/২৯১ (মাকতাবাতুল কাহিরা, মিশর)

৭২৩. সুনানুন নাসায়ি : ৭/৩৫, হা. নং ৩৮৭১ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ বর্গাচাষকে হারাম ঘোষণা করেননি; বরং তিনি পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখানোর আদেশ দিয়েছেন।'[৭২৪]

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵁ বর্ণনা করেন যে, 'যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ খায়বার বিজয় করলেন, তখন ইহুদিরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবদার করল, তিনি যেন তাদের এই শর্তে সেখানকার জমিগুলো দান করেন যে, তারা অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে জমিতে কাজ করবে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, আমি যতদিন ইচ্ছা করি, ততদিন তোমাদের এ চুক্তিতে অনুমতি দিচ্ছি।'[৭২৫]

উল্লিখিত দলিলগুলো দ্বারা জমহুর উলামায়ে কিরামের মতানুযায়ী উৎপাদিত ফসলে নির্দিষ্ট অংশের শর্তে বর্গায় চাষাবাদ করার বৈধতা প্রমাণ হয়। অনুরূপ الغرم بالغنم [মুনাফা ভোগের সাথে ব্যয়ভার সম্পৃক্ত][৭২৬] মূলনীতি অনুসারে জমির বীজ, বুনন, দেখাশোনা ইত্যাদি যেহেতু বার্গাচাষীই বহন করে, বিধায় তার লাভও সে ভোগ করতে পারবে। অতএব, বর্গাচুক্তির শর্তানুসারে উৎপাদিত ফসলের একাংশ তার জন্য অবশ্যই জায়িজ হবে। এমনিভাবে আরেকটি ফিকহি মূলনীতি হলো : الخراج بالضمان [মুনাফা ভোগ ঝুঁকি ও দায়বহনের সাথে সম্পৃক্ত।][৭২৭] সুতরাং ফসল হওয়া না হওয়ার দায়ভার যেহেতু বর্গাচাষীই নিয়েছে, তাই শর্তানুপাতে উক্ত জমির ফসলের একাংশের মালিক হওয়ার চুক্তি করা সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক ও শরিয়াসম্মত।'

৭২৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩/৬১, হা. নং ১৩৮৫ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

৭২৫. সহিহুল বুখারি : ৩/১০৭, হা. নং ২৩৩৮ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৭২৬. কাওয়ায়িদুল ফিকহ : পৃ. নং ৯৪, কায়েদা নং ১৯৫ (সাদাফ পাবলিকেশন, করাচি)

৭২৭. সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৮৪, হা. নং ৩৫০৮ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

তিন. অর্ডার বা নির্মাণচুক্তি

الاستصناع (আল-ইসতিসনা') হলো দুব্যক্তির সম্পাদিত এমন চুক্তি, যাদের একজন নির্মাণকারী এবং অপরজন নির্মিত বস্তু দ্বারা উপকার গ্রহণকারী। অর্থাৎ দুজনের মাঝে নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে প্রস্তুতকারক উপকার গ্রহণকারীকে এই চুক্তিতে কোনো জিনিস তৈরি করে দেবে যে, প্রস্তুতকৃত বস্তু হস্তান্তর করার পর সে প্রস্তুতকারীকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করবে। উদাহরণত আলমারি, তোষক, খাট, টেবিল, চেয়ার, পরিধেয় বস্ত্র অথবা ব্যবহারের জন্য যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়া।

নির্মাণ চুক্তির পদ্ধতি হলো, কোনো নির্মাণকারীকে পণ্যের ধরন, আকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলা যে, আমাকে এই পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে এ পণ্যটি তৈরি করে দাও। নির্মাণকারী এই প্রস্তাবে সম্মত হলে তবেই তা الاستصناع (আল-ইসতিসনা') বা নির্মাণচুক্তি বলে বিবেচিত হবে।[৭২৮]

যদিও কিয়াসের ভিত্তিতে الاستصناع (আল-ইসতিসনা') বা নির্মাণচুক্তি জায়িজ নেই। যেহেতু এখানে একটি অস্তিত্বহীন পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ অস্তিত্বহীন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। হাদিসে এসেছে :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

'তোমার কাছে যা নেই, তা বিক্রি করো না।'[৭২৯]

তবে استحسان [সূক্ষ্ম কিয়াস] এর বিবেচনায় এটা জায়িজ।[৭৩০] ইমাম আবু হানিফা ﵀, ইমাম মালিক ﵀ ও ইমাম আহমাদ ﵀ এটাকে জায়িজই বলেছেন। আর এটাই গ্রহণযোগ্য মতামত। কেননা, একটু গভীরভাবে দেখলে স্পষ্ট হয় যে, এটা মূলত অস্তিত্বহীন কোনো পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়

৭২৮. বাদায়িউস সানায়ি : ৫/২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

৭২৯. সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৮৩, হা. নং ৩৫০৩ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

৭৩০. বাদায়িউস সানায়ি : ৫/২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

নয়; বরং পণ্যের কাঠামো তৈরি করে দেওয়ার একটি চুক্তি মাত্র। এতে পণ্যটির মূল উপাদান সব বিদ্যমানই থাকে, কিন্তু তার বিশেষ কাঙ্ক্ষিত ধরনটি না থাকায় নির্মাণকারীকে তার চাহিদামতো ধরনে বানিয়ে দিতে বলে। সুতরাং এটাকে অস্তিত্বহীন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বলাটা সঠিক নয়।

এ নির্মাণচুক্তি আবশ্যকীয় কোনো চুক্তি কি না—এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য আছে। পূর্ববর্তী অনেক ফকিহ এটাকে ঐচ্ছিক চুক্তি বলে অভিহিত করেছেন। তাই চুক্তি হয়ে গেলেও দুজনের যেকোনো একজন চাইলেই কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে তা ভঙ্গ করে দিতে পারবে। এমনিভাবে নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার পরও ক্রেতার সামনে পণ্য উপস্থিত করার পর خيار الرؤية বা দেখার অধিকারের ভিত্তিতে চুক্তিটি ভঙ্গ করার অধিকার থাকে। চাইলে সে তা গ্রহণ করবে, অন্যথায় তা ভঙ্গ করে দেবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ﵀ বলেন, 'এটা আবশ্যকীয় একটি চুক্তি। কেননা, এতে চুক্তি ভঙ্গের অনুমতি দিলে নির্মাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এতে এ লেনদেনে নির্মাতারা আগ্রহ হারাবে। তাই দেখতে হবে, নির্মাতা ক্রেতার শর্তানুযায়ী পণ্যটি তৈরি করেছে কিনা। যদি তার শর্তানুসারে তৈরি করে থাকে, তাহলে পণ্য নিতে বাধ্য করা হবে। এখানে তাকে কোনো অবকাশ দেওয়া যাবে না।'[৭৩১]

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ বিজ্ঞ মুফতিগণ ইমাম আবু ইউসুফ ﵀-এর মতানুসারে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। কেননা, এখন কোনো কোনো নির্মাণচুক্তিতে মিলিয়ন, বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়। যেমন ধরুন, আপনি কোনো একটি জাহাজ কোম্পানির সাথে বিশাল বাণিজ্যিক এক জাহাজ তৈরি করে দেওয়ার জন্য চুক্তি করলেন। এরপর তারা এর পেছনে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কয়েক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে আপনার চাহিদানুপাতে একটি জাহাজ তৈরি করে দিল। এরপর যখন আপনাকে মূল্য পরিশোধ করে জাহাজটি নেওয়ার জন্য বলা হলো, তখন আপনি তাদের জানিয়ে দিলেন যে, আপনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। আপনি জাহাজটি এখন নিতে আর ইচ্ছুক নন। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, এতে কোম্পানি কী ক্ষতির মুখে পড়বে! এ জন্যই বর্তমান সময়ে ফতোয়া এটাই যে, পণ্য

৭৩১. বাদায়িউস সানায়ি : ৫/৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

যদি গ্রাহকের শর্তানুসারে বানানো হয়ে থাকে, তাহলে তাকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে পণ্যটি নিতেই হবে।

সারকথা হলো, চুক্তির সময় গ্রাহকের প্রদত্ত শর্তানুসারে পণ্যটি তৈরি করা হলে উভয়ের মাঝে চুক্তিটি বহাল থাকবে এবং সে নির্ধারিত মূল্যে পণ্যটি নিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু যদি নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী নির্মিত না হয়, তখন সে চাইলে তা গ্রহণ করবে, না হয় বাতিল করে দেবে।

চার. যৌথব্যবসা

الشركة (আশ-শিরকাত) এর আভিধানিক অর্থ দুই বা ততোধিক লোকের অংশীদারত্ব।[৭৩২]

পরিভাষায় الشركة হলো, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পদকে লাভের আশায় বিনিয়োগ করা।'[৭৩৩] কুরআন, সুন্নাহ, ইজমাতে এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾

'তবে তারা এক-তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে।'[৭৩৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾

'শরিকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি অবিচার করে থাকে। তবে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী তারা এমনটি করে না। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প।'[৭৩৫]

আয়াতে الْخُلَطَاءِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো شُرَكَاءُ তথা শরিকরা।

---

৭৩২. লিসানুল আরব : ১০/৪৪৮ (দারু সাদির, বৈরুত)
৭৩৩. আল-জাওহারাতুন নাইয়ারা : ১/২৮৫ (আল-মাতবাআতুল খাইরিয়্যা)
৭৩৪. সুরা আন-নিসা : ১২
৭৩৫. সুরা আস-সদ : ২৪

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি দুই অংশীদারের তৃতীয়জন হিসাবে থাকি, যতক্ষণ না একজন অপরজনের সাথে খিয়ানত করে। আর যখন খিয়ানত করে বসে, তখন আমি তাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে যাই।'[৭৩৬]

আবু হাইয়ান তাইমি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا

'যতক্ষণ না একজন তার অপর সঙ্গীর সাথে খিয়ানত করে, ততক্ষণ দুজন অংশীদারের ওপর আল্লাহর রহমতের হাত থাকে। আর যখন কেউ কারও সাথে খিয়ানত করে বসে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর থেকে তাঁর রহমতের হাত উঠিয়ে নেন।'[৭৩৭]

আবুল মিনহাল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বারা বিন আজিব ﷺ ও জাইদ বিন আরকাম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় আমরা দুজন মিলে ব্যবসা করতাম। তাই আমরা সম্পদের হস্তক্ষেপের বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন :

ان كان يدا بيد فلا بأس و كان نسيئة مؤجلة فلا يصلح

'নগদে হলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বাকিতে হলে বৈধ হবে না।'[৭৩৮]

---

৭৩৬. সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৫৬, হা. নং ৩৩৮৩ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।
৭৩৭. সুনানু দারাকুতনি : ৩/৪৪২-৪৪৩, হা. নং ২৯৩৪ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) হাদিসটি মুরসাল সহিহ।
৭৩৮. সহিহুল বুখারি : ৩/৫৫, হা. নং ২০৬০ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

ইজমাতেও এমন ব্যবসার সমর্থন রয়েছে। উলামায়ে কিরাম যৌথব্যবসা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে তারা এর কিছু পদ্ধতি বৈধ বা অবৈধ হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। তাদের মতে الشركة (আশ-শিরকাত) দুপ্রকার।

ক. মালিকানায় অংশীদারত্ব

এটি আবার দুপ্রকার।

১. উভয় শরিকের কর্ম দ্বারা যেই মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। যেমন : দুজনে একত্রে কোনো জিনিস ক্রয় করল। এমতাবস্থায় তারা উভয়েই এই জিনিসের মধ্যে অংশীদার।

২. কর্ম ছাড়াই যৌথ মালিকানা। যেমন মিরাসের সম্পত্তি। এতে কারও কোনো কর্ম সম্পাদন ছাড়াই সকল ওয়ারিসের অংশীদারত্ব রয়েছে।[৭৩৯]

খ. চুক্তিতে অংশীদারত্ব

যেমন, লাভের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে কোনো পণ্যের মধ্যে হস্তক্ষেপের চুক্তি সম্পাদিত হওয়া। এটি আবার পাঁচ প্রকার। যথা :

১. شركة الابدان -দৈহিক অংশীদারত্ব

এই প্রকারকে شركة الاعمال বা কাজের মাধ্যমে অংশীদারত্বও বলে। এর স্বরূপ হলো, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বয়ং তারা নিজেরাই উপার্জন করার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। উদাহরণত কাঠমিস্ত্রী, কারিগর, কামার অথবা দর্জিরা নিজেদের কাজ অংশীদারত্বের সাথে করা। এমনিভাবে যদি মূলধনহীন কয়েকজন শিকারি বা কুলি তাদের নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারত্বের সাথে লাভ ভাগাভাগি করে নেওয়ার শর্তে কাজ করে, তাহলে সেটাও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৭৪০]

ইমাম আবু হানিফা ﵀, ইমাম মালিক ﵀ ও ইমাম আহমাদ ﵀ এই পদ্ধতিকে জায়িজ বলে অভিমত দিয়েছেন। তাদের দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর

৭৩৯. বাদায়িউস সানায়ি : ৬/৫৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)
৭৪০. বাদায়িউস সানায়ি : ৬/৫৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

জমানায় এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। তাদের নিকট এ পদ্ধতিতে অছন্দনীয় কিছু ছিল না।

সাধারণত এ চুক্তিতে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে সকলের সমান লাভের শর্ত করা হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো কাজ অথবা পরিশ্রমের ওপর ভিত্তি করে কমবেশি করেও লাভ বণ্টিত হয়ে থাকে। ফলে অংশীদারদের মাঝে যে যতটুকু কাজ করেছে, সে ততটুকু পাবে। কেউ বেশি করলে লাভ থেকে বেশি নিতে পারবে।

২. شركة العنان - সমঅংশীদারত্ব

شركة العنان (শিরকাতুল ইনান) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুজনই নিজেদের মালের মাঝে অংশীদার থাকবে এবং লাভও তাদের মাঝে বন্টিত হবে; এই শর্তে যে, তারা উভয়ে কর্মচারী দ্বারা কাজ করাবে। ইজমার ভিত্তিতে এই পদ্ধতিটি বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে মাজহাবের ভিন্নতাভেদে কিছু শর্ত রয়েছে। যথা :

ক. ব্যবসার মূলধন মুদ্রা জাতীয় হওয়া, যেমন : টাকা, রুপি, ডলার, দিনার, দিরহাম ইত্যাদি। আর দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে যৌথব্যবসা বৈধ নয়।[৭৪১] হানাফি ও হাম্বলিদের মত এমনই। এক বর্ণনানুসারে শাফিয়িদের মতও এমনই। ইবনে মুনজির ﵀ ও আবু সাওর ﵀ তাদের মত গ্রহণ করেছেন। আর দ্রব্যসামগ্রী বলতে দিনার ও দিরহাম এ দুধরনের মুদ্রা ব্যতীত অন্য সকল সামগ্রীকে বোঝায়।[৭৪২]

শুধু দিনার-দিরহাম বা এ জাতীয় মুদ্রা দ্বারাই شركة العنان (শিরকাতুল ইনান বা সমঅংশীদারত্ব) বৈধ হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, দিনার-দিরহাম বা মুদ্রা ছাড়া অন্য যেকোনো দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টনের সময় অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে ওই সামগ্রীর মূল্যটি মূলধন হিসাবে বিবেচিত হয়, সামগ্রীটি নয়। অথচ সেই মূল্যই (মূলধন) অজানা। অতঃপর ধারণার ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এর ফলে লভ্যাংশ অস্পষ্ট হওয়ার দরুন বণ্টনের সময় ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু দিনার

৭৪১. বাদায়িউস সানায়ি : ৬/৫৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)
৭৪২. মুখতারুস সিহাহ : ২০৫ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত)

ও দিরহাম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এমন ক্ষতিকর সম্ভাবনা মোটেই থাকে না। কারণ, সেখানে মূলধন স্পষ্ট থাকে বিধায় লভ্যাংশটাও স্পষ্ট থাকে।

অন্যদিকে মালিকিদের মতে, মুদ্রা ও পণ্যসামগ্রী উভয়টি দ্বারা যৌথ কারবার করা যায়। এ ক্ষেত্রে মূল্যকে মূলধন হিসাবে বিবেচনা করা হবে। তাদের মতে, شركة العنان (শিরকাতুল ইনান বা সমঅংশীদারত্ব) হলো, উভয়পক্ষ নিজেদের সম্পদ নিয়ে আসবে, তারপর তা একত্র করবে অথবা দুজনেই তাদের অর্থ একটি সিন্দুকে রাখবে, অতঃপর একত্রে সেখান থেকে মূলধন দিয়ে ব্যবসা করবে এবং কেউ কারও অনুমতি ছাড়া ওই অর্থের মধ্যে হস্তক্ষেপ করবে না।[৭৪৩]

খ. যৌথব্যবসায় মূলধন জানা থাকতে হবে। সুতরাং অস্পষ্ট বা আন্দাজ করা সম্পদের ওপর ভিত্তি করে যৌথব্যবসা বৈধ নয়। কেননা, মূলধনের পরিমাণে অস্পষ্টতার কারণে লভ্যাংশের মধ্যেও অস্পষ্টতা সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৈধ হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, লাভের হার জানা থাকা। এ শর্তটি ইমাম শাফিয়ি ও আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ ব্যক্ত করেছেন।

তবে ইমাম আবু হানিফা ﵀ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, শিরকত সহিহ হওয়ার জন্য চুক্তির সময় মূলধনের পরিমাণ জানা থাকা শর্ত নয়। কারণ, মূলধনের মধ্যে অস্পষ্টতা চুক্তি সম্পাদন করতে কোনো বাধা দেয় না। আর চুক্তিকালে মূলধনের অস্পষ্টতা ঝগড়ার কারণ হয় না। কেননা, স্বাভাবিকভাবে এর পরিমাণটা জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মুদ্রার পরিমাণ এমনিতেই অনুমেয় হয়ে যায়। তাই বণ্টনের সময় লভ্যাংশের পরিমাণে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।[৭৪৪]

গ. যৌথ ব্যবসায় মূলধন সামনে উপস্থিত থাকতে হবে। কারও ঋণের টাকায়, বা বাকিতে চুক্তি করলে তা সহিহ হবে না। কেননা, যৌথ ব্যবসার উদ্দেশ্যই হলো লাভবান হওয়া। আর টাকা নগদ উপস্থিত থাকলেই কেবল এই সুযোগ অর্জন করা যায়, বাকি বা অনুপস্থিত থাকলে এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। হানাফি ও হাম্বলি মাজহাবের বক্তব্য এমনই।[৭৪৫]

---

৭৪৩. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ৪/৩৫-৩৬ (দারুল হাদিস, কায়রো)
৭৪৪. বাদায়িউস সানায়ি : ৬/৬৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৭৪৫. বাদায়িউস সানায়ি : ৬/৬০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

ঘ. ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর মতে, উভয়ের মূলধন এক জাতীয় হতে হবে। যৌথব্যবসায় দুপক্ষের মূলধন ভিন্ন জাতীয় বা ভিন্ন গুণের হলে চুক্তি বৈধ হবে না। এমনকি যদি একজনের সম্পদ দিনার আর অপরজনের সম্পদ দিরহাম হয়, তবুও বৈধ নয়। কারণ, শেয়ার তথা শিরকত ব্যবসা বৈধ হওয়ার জন্য উভয়ের সম্পদ একত্র করতে হয়। আর দুজনের সম্পদ একজাতীয় ও একই বৈশিষ্ট্যের হলেই কেবল একত্র করা সম্ভব।[৭৪৬]

এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা ﵀ ও আহমাদ বিন হাম্বল ﵀-এর মতে যৌথব্যবসা বৈধ হওয়ার জন্য সম্পদ এক জাতীয় হওয়া শর্ত নয়। কেননা, যৌথ ব্যবসায় وكالة (ওকালাত) তথা প্রতিনিধিত্ব করা করা জায়িজ। সুতরাং যেই সম্পদের মধ্যে وكالة (ওকালাত) জায়িজ, তাতে যৌথ ব্যবসাও জায়িজ। আর যেহেতু উভয়পক্ষের সম্পদ একসাথে করার পূর্ব পর্যন্ত وكالة (ওকালাত) বৈধ, সেহেতু ভিন্ন জাতীয় সম্পদের মধ্যেও যৌথ ব্যবসা বৈধ। এর ওপর ভিত্তি করে একটি কথা বলা হয় যে, একপক্ষ দিনার এবং অপরপক্ষ দিরহাম দিলেও ব্যবসা জায়িজ হবে।[৭৪৭]

ঙ. যৌথব্যবসায় অন্যজনের সম্পদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে হলে তার অনুমতি নিতে হবে। এটি যৌথব্যবসার অন্যতম শর্ত। যদি দুজন দুজনকে অনুমতি দিয়ে রাখে, তাহলে উভয়ের হস্তক্ষেপ করা বৈধ। আর যদি একজন অনুমতি দেয়, অপরজন না দেয়, তাহলে অনুমতি না পাওয়া ব্যক্তি শুধু তার অংশেই হস্তক্ষেপ করবে। যদি কোনো একপক্ষ অপরপক্ষকে পুরোপুরি ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দিয়ে রাখে, তাহলে তার জন্য পুরোপুরিভাবে হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে। আর যদি পণ্যের ধরন ও প্রকার অথবা স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়, তাহলে তাকে সেই পরিধিতেই ব্যবসা করতে হবে। কেননা, তারা প্রত্যেকেই একে অপরের উকিলের মতো। সুতরাং একজন অপরজনকে যতটুকুর উকিল বানায়, সে ঠিক ততটুকুরই অধিকার রাখে।[৭৪৮]

---

৭৪৬. আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব : ১৪/৬৬ (দারুল ফিকর, বৈরুত)
৭৪৭. বাদায়িউস সানায়ি : ৬/৬০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৭৪৮. আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব : ১৪/৭০ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৩. شركة الوجوه - মর্যাদায় অংশীদারত্ব

এই পদ্ধতিকে شركة الوجوه (শিরতাকুল উজুহ) এ জন্য বলা হয় যে, উভয় শরিক তাদের মর্যাদার দ্বারা ক্রয়কৃত জিনিসের মধ্যে অংশীদার থাকে। আর وجه ও جاه শব্দ দুটি সমার্থক। যেমন যখন কেউ সম্মানিত হয়, তখন বলা হয়, فلان وجيه অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি সম্মানিত।

আল্লাহ তাআলা মুসা ﷺ-এর ব্যাপারে বলেন :

وَكَانَ عِندَ اللهِ وَجِيهًا

'তিনি আল্লাহর কাছে ছিলেন মর্যাদাবান।'[৭৪৯]

পরিভাষায় شركة الوجوه (শিরতাকুল উজুহ) বলা হয়, 'উভয়পক্ষের মূলধন না থাকা সত্ত্বেও তারা সম্মানের বিনিময়ে যা ক্রয় করেছে, তার লভ্যাংশে উভয়েই অংশীদার হওয়া।'[৭৫০]

মালিকি ও শাফিয়ি মাজহাব মতে, شركة الوجوه (শিরতাকুল উজুহ) বাতিল একটি চুক্তি। কিন্তু হানাফি ও হাম্বলিদের নিকট এটা জায়িজ।[৭৫১]

৪. شركة المفاوضة সমান অংশীদারত্ব :

المفاوضة (আল-মুফাওজা) এর আভিধানিক অর্থ المساواة বা সমতা। অর্থাৎ সমান স্তর বা সমমর্যাদার একটি দল, যারা একে অপরের সাথে মিলিত, মিশ্রিত ও জড়িত। তাদের মধ্যে কেউই মূল নয় অথবা প্রত্যেকে ভিন্ন ধরনের, কিংবা প্রত্যেকেই একে অন্যের সাথে মিশ্রিত। সর্বোপরি, المفاوضة (আল-মুফাওজা) হলো সর্ববিষয়ে অংশীদারত্ব।[৭৫২]

এই পদ্ধতির শেয়ার ব্যবসাকে المفاوضة (আল-মুফাওজা) বলা হয় এ জন্য যে, এখানে মূলধন, লভ্যাংশ এবং সর্ববিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার সকলের

---

৭৪৯. সুরা আল-আহজাব : ৬৯

৭৫০. বিদায়াতুল মুবতাদি : পৃ. নং ১২৮ (মাকতাবাতু ওয়া মাতবাআতু মুহাম্মাদ আলি সাবাহ, কায়রো)

৭৫১. ফাতহুল কাদির : ৬/১৮৯-১৯০ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৭৫২. আল-কামুসুল মুহিত : পৃ. নং ৬৫১ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

জন্য সমান থাকে। কেউ বলে থাকেন যে, المفاوضة (আল-মুফাওজা) শব্দটি تفويض (তাফবিজ বা সমর্পণ) থেকে নির্গত। কেননা, প্রত্যেক অংশীদারই তার উপস্থিতি-অনুপস্থিতি—সর্বাবস্থায় অন্য শরিককে তার সম্পদে হস্তক্ষেপের অনুমতি দিয়ে রাখে।[৭৫৩]

المفاوضة এর ধরন হলো, দুই বা ততোধিক অংশীদার প্রত্যেকেই অপরের সম্পদের মধ্যে হস্তক্ষেপ এবং ঋণের ব্যাপারে সমান অধিকারপ্রাপ্ত। ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তারা প্রত্যেকে পরস্পরের পক্ষ থেকে উকিলের মতো দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে। এই পদ্ধতিটি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অর্থাৎ প্রত্যেক শরিক অন্য শরিককে ব্যবসার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে হস্তক্ষেপের অনুমতি দিয়ে থাকে। তা ছাড়া المفاوضة অর্থ হচ্ছে المساواة বা সমান। সুতরাং শব্দের অর্থেরও দাবি যে, যেসব বিষয়ে যৌথব্যবসা হতে পারে, সেসব বিষয়ে তারা উভয়ে পরিপূর্ণরূপে সমান অধিকারী।[৭৫৪]

ইমাম শাফিয়ি ﷺ ও ইমাম আহমাদ ﷺ-এর মতে এমন ব্যবসা বাতিল। শরিয়তে এর কোনো বর্ণনা নেই। এই ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

'আল্লাহর কিতাবে নেই, এমন সকল শর্ত বাতিল বলে বিবেচিত হবে।'[৭৫৫]

এ ধরনের ব্যবসায়িক পদ্ধতি কুরআনে কারিমে নেই। তাই এটি বাতিল। তাদের আরেকটি দলিল হলো, এই পদ্ধতির ভিত্তি দুটি জায়িজ বিষয়ের ওপর। আর তা হলো, ওকালাত ও কাফালাত। আর এই দুটির প্রত্যেকটিই পৃথক পৃথকভাবে বৈধ ছিল, একত্রে নয়। অথচ উভয় অংশীদার একই ব্যবসায় উভয়টিকে একত্র করেছে। তাই এখন তা আর বৈধ থাকছে না। কিন্তু এখানে জায়িজ হওয়ার মতটিই অধিক শক্তিশালী। কেননা, লেনদেনের

---

৭৫৩. বাদায়িউস সানায়ি : ৬/৫৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

৭৫৪. ফাতহুল কাদির : ৬/১৫৬ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৭৫৫. মুসনাদু আহমাদ : ৪২/৫১৬, হা. নং ২৫৭৮৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

সকল পদ্ধতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল না। তাই বলে পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত সকল ব্যবসায়িক পদ্ধতিকে কেউ বাতিল বলে না। এখানে মূল দেখার বিষয় হলো, নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিটি শরিয়তের কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক কিনা। যদি সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তা দেখতে যত ভালো পদ্ধতিই মনে হোক না কেন, সেটা বাতিল লেনদেন বলে বিবেচিত হবে। আর এরকম সাংঘর্ষিক না হলে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং এ শিরকতে যেহেতু শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু পাওয়া যায় না, তাই এটাকে নাজায়িজ বলার কোনো কারণ নেই।

المفاوضة শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ :

কিছু শর্তের ভিত্তিতে المفاوضة বা সমান অংশীদারত্বে যৌথব্যবসা বৈধ। যথা :

ক. লাভের হার/পরিমাণ স্পষ্ট থাকা। অস্পষ্ট থাকলে المفاوضة নামক অংশীদারত্ব ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, ব্যবসার উদ্দেশ্যই হলো লাভ। আর লাভের ওপরই চুক্তি হয়ে থাকে। তাই লাভের অস্পষ্টতা এ পদ্ধতির যৌথব্যবসাকে বিনষ্ট করে দেয়।

খ. লাভের পরিমাণ মূলধনের সর্বত্র বিস্তৃত থাকতে হবে। কোনো একটি অংশের সাথে নির্দিষ্ট করা হলে চলবে না। তাই যদি ব্যবসার লভ্যাংশের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, যেমন লাভ হতে দশ দিনার বা একশ দিনার পাবে, তাহলে এই শিরকত শুদ্ধ হবে না। কেননা, এমন নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে শিরকত বাতিল হয়ে যায়। কারও লভ্যাংশের পরিমাণ নির্ধরিত থাকলে তো উক্ত লাভের মধ্যে উভয়ের অংশীদারত্ব সাব্যস্ত হয় না।

গ. মূলধন সামনে উপস্থিত থাকতে হবে। অনুপস্থিত বা ধার হিসাবে অন্যের কাছে থাকা কোনো সম্পদ হলে চলবে না। কেননা, শেয়ার ব্যবসার উদ্দেশ্যই হলো লাভ। আর তা অর্জিত হয় সম্পদের মধ্যে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। কিন্তু ধার বা অনুপস্থিত সম্পদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। তাই এ ক্ষেত্রে যেহেতু উদ্দেশ্য তথা লাভ হাসিল হয় না, সেহেতু মূলধন সামনে উপস্থিত থাকতে হবে।

ঘ. প্রত্যেক অংশীদারের জন্য وكالة (প্রতিনিধিত্ব) এবং كفالة (দায়িত্ব) এর অধিকার থাকতে হবে। যদি উভয়ে স্বাধীন ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হয়, তবে এটা সম্ভব হবে। আর যৌথ কারবারে এটি আবশ্যকীয় একটি বিষয়। وكالة (প্রতিনিধিত্ব) এর মর্মার্থ হলো, তাদের প্রত্যেকেই তার অপর অংশীদারের পক্ষ থেকে যৌথ সম্পদে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে উকিল হবে। তারা একজন অন্যজনকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে রাখবে এবং তাদের উভয়ের যেকোনো কাজ গ্রহণ করা হবে। কারণ, যৌথ ব্যবসার চাহিদা এমনই। আর উকিল তো হলো, তার অংশীদারের অনুমতিক্রমে হস্তক্ষেপকারী। সুতরাং এখানে ওকালতির অধিকার থাকা শর্ত। এমনিভাবে কাফালাত বা দায়িত্ব গ্রহণও مفاوضة চুক্তির চাহিদা। কেননা, ব্যবসার মধ্যে তাদের একজনের জন্য যা কিছু সাব্যস্ত হয়, তা অপরজনের জন্যও সাব্যস্ত হয়। আর তাদের প্রত্যেকেই অপর অংশীদারের ওপর যা সাব্যস্ত হয়েছে, তাতে তার পক্ষ থেকে কফিল বা জিম্মাদারের মতো হবে। অতএব, এই ব্যবসায় كفالة (দায়িত্ব)-এর অধিকার থাকতে হবে।

ঙ. مفاوضة সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, মূলধনের পরিমাণ সমান হওয়া। অতএব যদি উভয়ের সম্পদ সমান না হয়ে কমবেশ হয়, তাহলে এটা আর مفاوضة হবে না। কেননা, مفاوضة-এর মানেই হচ্ছে مساواة বা সমান হওয়া।

চ. المفاوضة এর মধ্যে লাভের অংশ সমান হওয়া। যদি তারা কমবেশি করে লাভ গ্রহণের শর্ত করে, তাহলে সমান না হওয়ার কারণে তা المفاوضة হবে না।

ছ. المفاوضة-এর মধ্যে ব্যাপকতা থাকা। সব ধরনের ব্যবসাকে المفاوضة-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার অবকাশ থাকতে হবে। কোনো অংশীদার অপর অংশীদার ছাড়া তাদের যৌথ ব্যবসার ধরন নির্ধারণ করতে পারবে না। কেননা, এমনটি করলে المفاوضة বাতিল হয়ে যায়। এর ওপর ভিত্তি করে বলা হয়, মুসলিম ও জিম্মির মাঝে المفاوضة জায়িজ হবে না। কারণ, জিম্মি ব্যক্তি এমন ব্যবসার সাথে المفاوضة করে ফেলবে, যা মুসলিম

ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। যেমন, মদ, শুকর বেচাকেনা ইত্যাদির ব্যবসা করা। ফলে ব্যবসার মধ্যে তাদের মাঝে আর সমতা রক্ষা হয় না। এমন মত পেশ করেছেন ইমাম আবু হানিফা ﵀ ও ইমাম মুহাম্মাদ ﵀। আর ওকালাত ও কাফালতের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান হওয়ার বিবেচনায় ইমাম আবু ইউসুফ ﵀-এর মতে তা বৈধ।

জ. المفاوضة শব্দটি মুখে উচ্চারণ করা। ইমাম আবু হানিফা ﵀, ইমাম আবু ইউসুফ ﵀ ও ইমাম মুহাম্মাদ ﵀ থেকে বর্ণিত আছে যে, المفاوضة শব্দ উচ্চারণ করা ব্যতীত المفاوضة ব্যবসা বৈধ হবে না। কারণ, المفاوضة এর কিছু শর্ত আছে। যেগুলো তা উচ্চারণ করা ছাড়া বুঝে আসে না। তাই বুঝে আসার জন্য তা উচ্চারণ করতে হবে। অথবা বোঝার মতো সমার্থক অন্য কোনো বক্তব্য দিতে হবে। কেননা, এখানে মূল হচ্ছে বুঝে আসা, নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা মুখ্য নয়।[৭৫৬]

৫. شركة المساهمة - অংশীদারত্বের চুক্তিতে ব্যবসা

যৌথব্যবসার প্রকারগুলোর মধ্যে এটিও একটি প্রকার। মুসলমানদের একটি গোষ্ঠী যেকোনো এক ধরনের ব্যবসায়িক প্রকল্পে নির্দিষ্ট অর্থ জোগান দেবে এ শর্তে যে, সেখানে প্রত্যেক অংশীদারের জন্য একটি অংশ নির্ধারিত থাকবে। আর প্রত্যেকের অংশ নির্ধারিত হবে তার বিনিয়োগকৃত সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী। এই প্রকারের শেয়ার ব্যবসা মুদারিবের ওপর নির্ভরশীল। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সক্ষম ব্যক্তিকে মালিকগণ অর্থের যোগান দেবে। এই পদ্ধতির ব্যবসা বৈধ; যদি চুক্তির রুকন তথা ইজাব ও কবুল, شركة المساهمة (শিরকাতুল মুসাহামা) সহিহ হওয়ার শর্তসমূহ এবং চুক্তি সম্পন্নকারী উভয়পক্ষ পাওয়া যায়। চুক্তি সম্পন্নকারী পক্ষদ্বয় হলো :

এক. শেয়ার হোল্ডার তথা সম্পদের অংশীদার।

দুই. যৌথব্যবসা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান।

এ ক্ষেত্রে ব্যবসা নিয়ে কথা বলবে ব্যবসা-পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। এর কারণ, شركة المساهمة নামক এ যৌথব্যবসা একটি সংস্থার মতো, যে

৭৫৬. বাদায়িউস সানায়ি : ৬/৬১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) ফাতহুল কাদির : ৬/১৫৮-১৬৩ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

সংস্থা তার পরিচালনাধীন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে। যেমন : বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, পাবলিক লাইব্রেরি, প্রকাশনা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর ন্যায়। সুতরাং কারও সাথে ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনের সময় উপস্থিত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক অংশীদারই থাকতে হবে, এমন চিন্তা করা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বরং এ ক্ষেত্রে সংগত নিয়ম হলো, সকল অংশীদারের পক্ষ থেকে নিয়োজিত উকিল হিসাবে প্রতিষ্ঠান-প্রধান অথবা তাদের চুক্তি সম্পাদনকারী বিভাগ চুক্তি সম্পাদন করবে। যৌথব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান পরিচালক হচ্ছে উকিল এবং সকল অংশীদার হচ্ছে মুআক্কিল বা উকিল নিয়োগকারী।

এ ক্ষেত্রে এই ব্যবসায় কারও অংশ বেশি হওয়ার কারণে স্বেচ্ছাচারী হয়ে প্রতিষ্ঠানের ওপর কেউ সীমালঙ্ঘন করতে পারবে না; যেমনটি পুঁজিবাদি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। আর পুঁজিবাদের মধ্যে যার সম্পদ বা অংশ বেশি থাকে, সে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার চাবিকাঠি হস্তগত করে নেয়। এমন আচরণ অন্যায়, স্বেচ্ছাচারিতা ও জুলুম। এ বিষয়ে সঠিকতর পদ্ধতি হলো, অভিজ্ঞ ও যৌথ ব্যবসা সম্পর্কে জ্ঞাত যেকোনো একজন ব্যক্তির নিকট পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা। আর কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে নিরপেক্ষ বাছাইয়ের মাধ্যমে এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা সম্ভব, যে যৌথ কারবারের কলাকৌশল, আর্থিক ও সার্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবে। এই পদ্ধতিই হচ্ছে মূলধনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা থেকে বেঁচে থাকার উপায়।

অনেক সময় বলা হয়ে থাকে, দ্বিতীয় পক্ষকে না দেখে কীভাবে তার সাথে চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে? এর জবাব হলো, চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য উভয়পক্ষ উপস্থিত থাকা এবং ইজাব-কবুল সরাসরি-সামনাসামনি মুখে উচ্চারণ করা শর্ত নয়। চুক্তির মজলিসে ইজাব-কবুল হলেই চুক্তি পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এ সময় দুজন পরস্পরকে না দেখলেও চলবে। কেননা স্থান-কাল ভেদে চুক্তির ধরন নির্ধারিত হয়।

যেমন, দূরত্বের কারণে প্রস্তাবদাতার পক্ষ থেকে গ্রাহকের নিকট পত্র প্রেরণের মাধ্যমেও চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের বক্তব্য হলো, পত্র মারফত চুক্তি করা সরাসরি কথা বলার

মতোই। এমনিভাবে হাজার মাইল দূরে থেকেও মোবাইলে কথা বলার মাধ্যমে দুজনের মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে। এমন পদ্ধতির বৈধতা মুসলমানদের সুবিধার জন্যই দেওয়া হয়েছে।

সারকথা হলো, যৌথব্যবসার সব ধরনের শর্ত পাওয়া গেলে এমন পদ্ধতিতে চুক্তি করা জায়িজ। তবে সতর্ক থাকতে হবে, সবার মধ্যে যার অংশ বা অর্থ অন্যদের চেয়ে বেশি, সে যেন প্রতিষ্ঠানের ওপর জেঁকে না বসে এবং ব্যবসার সাথে যেন কোনো সুদি কারবার যুক্ত না করে।

পাঁচ. شركة المضاربة - মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসা

المضاربة (আল-মুদারাবা) শব্দটি اَلضَّرْبُ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো, ভ্রমণ করা, সফর করা।[৭৫৭]

এ পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, 'দুপক্ষের কোনো এক পক্ষের সম্পদ এবং অপরপক্ষের শ্রমে যৌথ কারবার করাই মুদারাবা।'[৭৫৮]

বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, এখানে দুটি পক্ষ থাকে। একজন মূলধনের মালিক আর অন্যজন ব্যবসায়ী বা শ্রমদাতা। মূলধনের মালিক অর্থ ও সামগ্রী জোগান করে দেবে এবং শ্রমদাতা ব্যবসায়ী নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে তার সম্পদ নিয়ে ব্যবসা করবে। আর লাভের মধ্যে তাদের উভয়ের জন্য পার্সেন্টাকারে যেমন এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক এরকম নির্দিষ্ট হারে একটি অংশ থাকবে। এটিকেই মুদারাবা বলে। মুদারাবার বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

কুরআন থেকে দলিল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ ﴾

'কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ-বিদেশে যাবে।'[৭৫৯]

৭৫৭. লিসানুল আরব : ১/৫৪৪ (দারু সাদির, বৈরুত)
৭৫৮. হিদায়া : ৩/২০০ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৭৫৯. সুরা আল-মুজ্জাম্মিল : ২০

হাদিস থেকে দলিল

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন নবুয়ত পেলেন, তখন মানুষ المضاربة চুক্তিতে ব্যবসা করত। তিনি কাউকে নিষেধ করেননি। এ দ্বারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মৌন সম্মতি বোঝা যায়। আর এটি হাদিসের একটি প্রকারও বটে। কোনো বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ জেনেও নীরব থাকলে তা থেকে বৈধতা প্রমাণিত হয়।

ইজমা থেকে দলিল

কতক সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা এতিমের সম্পদ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মুদারাবা চুক্তিতে তা অন্যকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, উমর رضي الله عنه, উসমান رضي الله عنه, আলি رضي الله عنه, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه, আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه, উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা رضي الله عنها প্রমুখ। সাহাবায়ুগের এমন কোনো সাহাবি পাওয়া যায়নি, যিনি এ বিষয়টি অস্বীকার করেছেন বা এটিকে অবৈধ বলেছেন। আর এটি একটি স্বীকৃত ইজমা, যাকে পরিভাষায় ইজমায়ে সুকুতি বলা হয়।

মুদারাবার রুকন হলো, ইজাব ও কবুল। তা হতে হবে স্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে। আর চুক্তির বক্তব্যটা হবে এমন যে, মূলধনের মালিক মুদারিবকে বলবে, 'আমি তোমাকে এই সম্পদ দিলাম। তুমি তা দিয়ে ব্যবসা করবে। আর লাভ আমাদের দুজনের জন্য সমান সমান কিংবা এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ ইত্যাদি ভাগে বণ্টন হবে।' অতঃপর মুদারিব ব্যক্তি বলবে, 'আমি তা গ্রহণ করলাম।'[৭৬০]

শরিয়াসম্মত হালাল উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম এটি। এর ভিত্তি হলো শ্রম ব্যয় করা এবং বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে বেচাকেনা করার চেষ্টা করা। উপার্জনের প্রতি উৎসাহী করার জন্য ইসলামের সাথে এ বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও তাতে মুদারিবের জন্য অনেক কষ্ট ও সফরের ঝুঁকি রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ﴾

৭৬০. বাদায়িউস সানায়ি : ৬/৭৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

'তোমরা পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রিজিক হতে আহার করো।'[৭৬১]

﴿ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾

'তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো।'[৭৬২]

ছয়. চাকরি

বর্তমান সময়ে জীবিকা অর্জনের জন্য চাকরি একটি বিশেষ মাধ্যম। এর বিশেষ একটি সামাজিক অবস্থানও রয়েছে। একজন চাকরিজীবী প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতার বিনিময়ে ধারাবাহিকভাবে যে শ্রম ব্যয় করে, তাই চাকরি। যেমন কেউ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন; চাই তা মাদরাসা শিক্ষা হোক বা জেনারেল শিক্ষা হোক।

চাকরি এমন একটি দায়িত্ব, যেখানে একজন চাকরিজীবীর ওপর তার মানসিক ও দৈহিক যথেষ্ট শ্রম দিতে হয়। তার শ্রম যেন সার্থক হয়, দায়িত্ব পালন যেন যথাযথ হয় এবং কোনো ধরনের ত্রুটি বা কমতি যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। মাস শেষে বা চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ে বেতন পাওয়া পর্যন্ত একজন চাকরিজীবীকে তার ওপর অর্পিত কাজের আমানত নিয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। তাকে অবশ্যই উত্তমভাবে ও পরিপূর্ণরূপে দায়িত্ব পালন করতে হয়। অন্যথায় অবস্থাটা এমন দাঁড়াবে যে, সে প্রতারণা, আমানতের খিয়ানত ও মানুষের অধিকারে শিথিলতা করে মাস শেষে অবৈধভাবে বেতন গ্রহণ করছে।

মূলকথা হচ্ছে, চাকরি হালাল উপার্জনের একটি বৈধ পদ্ধতি, যা চাকরিজীবীর জন্য আরাম আয়েশে সুন্দর জীবনযাপন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে থাকে। তবে শর্ত হলো, চাকরিজীবীকে অবশ্যই তার যথাসাধ্য শ্রম ব্যয় করতে হবে এবং কোনো ধরনের প্রতারণা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করতে পারবে না। যদি কোনোভাবে এমনটি ঘটে যায়, তাহলে তার বেতন গ্রহণ হারাম হবে।

৭৬১. সুরা আল-মুলক : ১৫
৭৬২. সুরা আল-জুমআ : ১০

সাত. মিরাসি সম্পত্তি

হালাল সম্পদ অর্জনের সবচেয়ে নিরেট ও বিশুদ্ধ মাধ্যম হলো, মিরাসি বা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। নিজের পিতা, মাতা, বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান বা অন্য আত্মীয়দের মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে শরিয়ত নির্ধারিত যে অংশে মালিকানা সাব্যস্ত হয়, সেটাই মূলত মিরাসি সম্পত্তি। ইসলামি শরিয়তে মিরাসি সম্পত্তির ব্যাপারে খুবই সতর্ক, সূক্ষ্ম, ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়সংগত ও চমকপ্রদ বণ্টননীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিধান ওয়ারিসদের ক্ষেত্রে যেমন উপযোগী, তেমনই মানুষের ফিতরি বা সৃষ্টিগত চাহিদার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের এমন সূক্ষ্ম বণ্টননীতি পরিবারের সদস্যদের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের যথাযথ হকপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে।

উত্তরাধিকার সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যদি কেউ তার সম্পদ ও উত্তরাধিকারী রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে শরিয়ার নীতি হলো :

* পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে। কারণ, একজন পুরুষের ওপর পরিবারের সকল ধরনের খরচ নির্ভর করে। উদাহরণত ভরণপোষণ, ওষুধ-পত্র, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি সকল খরচ পুরুষকেই বহন করতে হয়। অপরদিকে এসব জিনিসের কোনোটি নারীদের দায়িত্ব নয়; বরং এ দৃষ্টিকোণ থেকে নারী হচ্ছে সচ্ছল এবং তার অভিভাবক বা স্বামী হচ্ছে অসচ্ছল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন যে, পুরুষের জন্য দুজন নারীর অংশ রয়েছে।'[৭৬৩]

৭৬৩. সুরা আন-নিসা : ১১

* এমনিভাবে কেউ যদি একটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যায় বা একাধিক কন্যা রেখে মারা যায় এবং তার কোনো ছেলে না থাকে, তাহলে এক মেয়ের জন্য সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেক। আর মেয়ে দুই বা ততোধিক হলে তারা সবাই মিলে সমুদয় সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾

'অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুয়ের অধিক, তবে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের তিন ভাগের দুভাগ এবং যদি একজন হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক।'[৭৬৪]

* যদি কেউ ছেলে বা মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে তার পিতা-মাতা জীবিত থাকলে প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ করে পাবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ছেলে-মেয়ে না থাকে, তাহলে তার সম্পদ আসাবা হিসাবে পিতা-মাতাই পাবে। মাতা পাবে এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। শর্ত হলো, মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক ভাই থাকতে পারবে না। যদি তার একাধিক ভাই থাকে, তাহলে তাদের মা তার নির্ধারিত এক-ষষ্ঠাংশ পাওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ পাওয়া থেকে মাহজুব তথা বঞ্চিত হবে। তিনি শুধু এক ষষ্ঠাংশেরই মালিক হবেন, বাকি অংশ আসাবা হিসাবে পিতা পেয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টনের আগে তার কৃত অসিয়ত পূরণ করতে হবে এবং তার ঋণ আদায় করতে হবে। তারপর সম্পদ বণ্টন করা হবে। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত এই বণ্টননীতির ব্যতিক্রম করার কারও সুযোগ নেই। এই পদ্ধতিতে মিরাসের সম্পদ বণ্টন করা ফরজ। কেউ যেন তার পিতা বা সন্তানসন্ততির পক্ষাবলম্বন করে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ না করে।

মিরাসের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা :

﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

৭৬৪. সুরা আন-নিসা : ১১

السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

'মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃত ব্যক্তির কৃত অসিয়ত পূরণ কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা জানো না। এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[৭৬৫]

যদি কোনো মহিলা তার স্বামী ও সম্পদ রেখে মারা যায় এবং তার কোনো ছেলে-মেয়ে না থাকে, তাহলে তার স্বামী অর্ধেক পাবে। আর যদি তার কোনো সন্তান থাকে, তাহলে তার স্বামী এক-চতুর্থাংশ পাবে। তবে তার আগে অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

যদি পুরুষ তার স্ত্রী রেখে মারা যায় এবং তার কোনো সন্তান না থাকে, তাহলে তার স্ত্রী এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তার সন্তান থাকে, তাহলে তার স্ত্রী এক-অষ্টমাংশ পাবে। তার পূর্বে ব্যক্তির অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

৭৬৫. সুরা আন-নিসা : ১১

'আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা; যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে ওই সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তোমাদের হবে, যা তারা ছেড়ে যায়; তারা যে অসিয়ত করে যায় তা পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্য এক-চতুর্থাংশ হবে ওই সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে ওই সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যে অসিয়ত করে যাও, তা পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর।'[৭৬৬]

* আর মৃত ব্যক্তির যদি পিতা-মাতা ও সন্তানসন্ততি না থাকে। কিন্তু তার একজন ভাই অথবা বোন থাকে, তাহলে তারা প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি একাধিক ভাই-বোন থাকে, তাহলে তারা সকলে মিলে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে। তবে তার আগে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত ও ঋণ আদায় করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

'আর যদি কোনো পুরুষ বা নারীকে নিঃসন্তানভাবে উত্তরাধিকার করতে হয় এবং তার এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক-তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে মৃত ব্যক্তির কৃত অসিয়ত বা তার ঋণ পরিশোধের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহপ্রদত্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।'[৭৬৭]

৭৬৬. সুরা আন-নিসা : ১২
৭৬৭. সুরা আন-নিসা : ১২

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআনে মৃত ব্যক্তির সম্পদের বণ্টনপদ্ধতি ছয়টি। যথা : نصف (অর্ধেক), ربع (এক-চতুর্থাংশ), ثمن (এক-অষ্টমাংশ), ثلثان (দুই-তৃতীয়াংশ), ثلث (এক-তৃতীয়াংশ) এবং سدس (এক-ষষ্ঠাংশ)। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি ন্যায়সংগত ও যথোপযুক্ত বণ্টননীতি। এ বণ্টননীতির অন্যথা করা কখনোই বৈধ নয়। এটি আল্লাহপ্রদত্ত ইনসাফপূর্ণ একটি বিধান। এর বদৌলতে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার পরিপূর্ণরূপে পাবে।

পবিত্র কুরআনে মিরাসের সম্পদ বণ্টননীতি বর্ণনার পাশাপাশি অসিয়ত পূরণের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুকালে নিজ সম্পদের কিছু অংশ কাউকে দেওয়ার কথা বলাকে অসিয়ত বলে। এর মাধ্যমে অসিয়তকারী ব্যক্তি অনেক সাওয়াবের অধিকারী হয়। অসিয়তের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه বর্ণনা করেন :

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ

'কোনো মুসলমান যদি তার নিজের হক্বের কিছু অংশ অসিয়ত করে যায়, তাহলে দু'রাত অতিবাহিত হতে না হতেই আল্লাহ তাআলার নিকট তা লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।'[৭৬৮]

অসিয়ত পূরণের জন্য শর্ত হলো, অসিয়ত যেন সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অধিক না হয়। অধিক হলে এক তৃতীয়াংশের মাধ্যমে অসিয়ত পূর্ণ করা হবে, অবশিষ্ট অংশ ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টিত হবে।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ، قَالَ: لَا،

৭৬৮. মুসনাদু আহমাদ : ৯/৩৬৫, হা. নং ৫৫১২ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

قُلْتُ : الثُّلُثُ، قَالَ : فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ،

'মক্কায় নবিজি ﷺ আমাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে আসলেন। তিনি চাইতেন না, যে ভূমি থেকে হিজরত করেছে, সে ভূমিতে কারও মৃত্যু হোক। তিনি আমার কাছে এসে বললেন, আল্লাহ ইবনে আফরার ওপর রহম করুন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি কি আমার পুরো সম্পদ দান করার অসিয়ত করব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? এবার বললেন, হ্যাঁ। তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমার পরিবার মানুষের কাছে হাত পাতবে—তাদের এমন অবস্থায় রেখে যাওয়ার চাইতে তাদের স্বাবলম্বী অবস্থায় রেখে যাওয়া তোমার জন্য উত্তম।'[৭৬৯]

ওয়ারিসদের মধ্য থেকে কারও জন্য অসিয়ত করা জায়িজ নয়। কেননা, এর ফলে বাকি ওয়ারিসদের মাঝে শত্রুতা ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। দুনিয়ার কোনো লালসায় পড়ে প্রবৃত্তির চাহিদায় স্বজনপ্রীতি করে ওয়ারিসদের মাঝে যেন অসন্তুষ্টি ছড়ানো না হয়।

আবু উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক প্রাপককে তার অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিসের জন্য কোনো অসিয়ত নেই।'[৭৭০]

তবে যদি ওয়ারিশগণ দয়াবশত তাদের কারও জন্য অসিয়ত করার অনুমতি দেয়, তাহলে সেটা বৈধ। ইবনে আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

৭৬৯. সহিহুল বুখারি : ৪/৩, হা. নং ২৭৪২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৭৭০. সুনানু আবি দাউদ : ৩/১১৪, হা. নং ২৮৭০ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

'ওয়ারিসের কোনো অসিয়ত নেই, তবে যদি সকল ওয়ারিস অনুমোদন দেয় তাহলে ভিন্ন কথা।'[৭৭১]

এই হলো অসিয়তের বর্ণনা। এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির পাপমোচন, গুনাহমুক্তি, পরকালের উত্তম পাথেয় এবং আমলনামায় সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। অসিয়তের বড় একটি দিক হলো, এর মাধ্যমে সে কার্পণ্যের নোংরামি থেকে পবিত্র হতে পারে।

আট. উপঢৌকন ও দান

الهبة (আল-হিবা) হলো দু'ব্যক্তির মাঝে শরিয়াসম্মত কোনো উপকারী বস্তু প্রদানের চুক্তি। যে বস্তু একজন অপরজনকে কোনো বিনিময় ছাড়া দিয়ে থাকে। ফলে যাকে দান করা হয়েছে, সে দানকৃত বস্তুর মালিক হয়ে যায়। হিবা উপার্জনের শরিয়াসম্মত একটি পন্থা। যার মাধ্যমে আত্মা পবিত্র হয়, পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয় এবং মানুষের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়।

হিবা করলে তা আবশ্যক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফিয়ি ﷺ এর মতে, হিবা করলে তা আবশ্যক হয়ে যায়; ফেরত নেওয়ার বৈধতা রহিত হয়ে যায়। যাকে দান করা হয়েছে, তার কাছে ওই জিনিস আর চাওয়া যাবে না। তবে শুধু পিতার বিষয়টি ব্যতিক্রম। সুতরাং পিতা নিজ সন্তানকে কোনো কিছু দেওয়ার পর তা ফেরত নিতে পারবে। আর ইমাম আবু হানিফা ﷺ এর মতে, সাধারণভাবে হিবা আবশ্যক হয় না। দাতা কোনো কিছু দান করার পর পুনরায় তা ফিরিয়ে নিতে পারবে। যাকে দান করা হয়েছে, তার কাছে উক্ত জিনিস চাইতে পারবে।[৭৭২]

৭৭১. মুসনাদুশ শামিয়্যিন : ৩/৩২৫-৩২৬, হা. নং ২৪১০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।
৭৭২. বাদায়িউস সানায়ি : ৬/১২৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

অবশ্য বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তা আর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে না। যেমন আত্মীয়স্বজনকে হিবা করলে, অনুরূপ হিবাকৃত বস্তু আর বিদ্যমান না থাকলে কিংবা থাকলেও তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে থাকলে, তখন আর তা ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকে না।[৭৭৩]

নয়. ভাড়া দেওয়া

الاجارة (আল-ইজারাহ) বা ভাড়া হলো ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতার মধ্যে ভাড়ায় গৃহীত বস্তু থেকে উপকার গ্রহণের বিনিময়ে উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা। যেমন : থাকার ঘর, পরিবহনের গাড়ি অথবা কোনো পশু প্রভৃতির মাধ্যমে উপকার গ্রহণ করা। উপার্জনের জন্য اجارة (ইজারাহ) একটি হালাল মাধ্যম। এর মাধ্যমে ভাড়া দানকারী ব্যক্তি হালালভাবে উপার্জনের সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন উপকার গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

ভাড়া থেকে উপার্জন হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তা বৈধ খাতে হতে হবে। অবৈধ খাত থেকে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে না। পাশাপাশি ভাড়ার সময় ভাড়ার পরিমাণ, মেয়াদ ও শর্ত ইত্যাদি সব স্পষ্ট করে নেওয়া জরুরি, অন্যথায় তা ফাসিদ বলে বিবেচিত হবে।

দশ. স্বাধীন পেশা

বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে বৈধ উপার্জনের জন্য মানুষ করে থাকে, এমন পেশাকে স্বাধীন পেশা বলা হয়। যেমন : কামার, কাঠমিস্ত্রি, নাপিত, কসাইসহ বিভিন্ন পেশার লোক, যারা নিজের স্বাধীনমতো কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। ইসলামে শ্রমের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। শ্রম ও কর্মের প্রতি ইসলাম খুবই উৎসাহ প্রদান করেছে। যেন মানুষ বৈধ উপার্জন ও মানসম্মতভাবে জীবনযাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনেও এ ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মানুষকে নামাজ আদায় করার পরপরই রিজিক অন্বেষণের জন্য বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া বা কঠোর পরিশ্রম ছাড়া জীবিকা অন্বেষণ সম্ভব নয়।

---

৭৭৩. বাদায়িউস সানায়ি : ৬/১৩২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾

'অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো।'[৭৭৪]

আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

'অন্যের কাছে হাত পাতলে হয়তো সে দেবে বা ফিরিয়ে দেবে। এ হাত পাতার চেয়ে পিঠের ওপর লাকড়ির বোঝা বহন করা উত্তম।'[৭৭৫]

আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا

'জাকারিয়া ؑ কাঠমিস্ত্রি ছিলেন।'[৭৭৬]

মিকদাদ বিন মাদিকারাব ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

'তোমাদের কেউ নিজ হাতের উপার্জন করা খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কখনো ভক্ষণ করেনি। আর আল্লাহর নবি দাউদ ؑ তাঁর নিজ হাতের উপার্জন থেকে ভক্ষণ করতেন।'[৭৭৭]

---

৭৭৪. সুরা আল-জুমআ : ১০
৭৭৫. সহিহুল বুখারি : ৩/৫৭, হা. নং ২০৭৪ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৭৭৬. সহিহ মুসলিম : ৪/১৮৪৭, হা. নং ২৩৭৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৭৭৭. সহিহুল বুখারি : ৩/৫৭, হা. নং ২০৭২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

পরিশ্রম ও পারিশ্রমিকের মাঝে সমতা

শ্রমের ব্যাপারে ইসলামের বিধান হচ্ছে, শ্রমিকের শ্রম এবং বিনিময়ে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক ন্যায্য হতে হবে। এটিই ন্যায়সংগত নীতি। আর যদি শ্রম নিয়ে তাকে সে পরিমাণ ন্যায্য পারিশ্রমিক দেওয়া না হয়, তাহলে তা শ্রমিকের ওপর অন্যায় ও অবিচার হবে। এমন অবিচার ইসলামে হারাম। ইসলাম শ্রমিকদের প্রতি গুরুত্ব দিতে জোর দিয়েছে। ইসলাম গুরুত্বারোপ করে, যেন শ্রমিকদের তাদের সঠিক প্রাপ্যের চেয়ে কিছু বেশি দেওয়া হয় এবং তারাও যেন তাদের ন্যায্য পাওনা গ্রহণ করে।

তা ছাড়া শ্রমিককে কখনো এমনভাবে খাটানো মালিকের জন্য উচিত নয় যে, শ্রমিক তার সর্বোচ্চ কষ্ট, চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করবে এবং বিনিময়ে তাকে অনেক অল্প ও অতি নগণ্য পারিশ্রমিক পরিশোধ করবে। ইসলাম এমন কর্মকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। ইসলাম কখনো এমনটি মেনে নেয় না। এরকম ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যাচারীদের প্রতি তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে। এ ধরনের অত্যাচারীরা রাশি রাশি সম্পদ জমা করার জন্য এবং লোলুপ পুঁজিবাদীদের ন্যায় দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে। অথচ তাদের আশপাশের মানুষগুলো থাকে বঞ্চিত ও অধিকারহারা।

এমন ভয়ংকর অপরাধ থেকে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেন :

﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾

'আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ, রাসুল, তাঁর নিকটাত্মীয়, এতিম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।'[৭৭৮]

৭৭৮. সুরা আল-হাশর : ৭

মূলকথা হচ্ছে, সমাজের ধনী মানুষদের কাছে যেন সম্পদ জমা হয়ে না থাকে। এতে করে এক শ্রেণির মানুষ সুবিধা ভোগ করতে থাকবে আর বাকিরা সুবিধা বঞ্চিত হতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যেই সম্পদের উত্তরাধিকার করেছেন, সেই সম্পদ একচেটিয়াভাবে ধনীরা দখল করে রাখতে পারবে না। সম্পদকে ঘুরে ফিরে একশ্রেণির মানুষের কাছে সীমাবদ্ধ করে রাখা ইসলামে জায়িজ নেই; বরং ইসলাম এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনের এই নসগুলোর আলোকে একজন বিচারকের উচিত, এমন পদ্ধতি চালু করা, যার মাধ্যমে একজন শ্রমিক যথোপযুক্ত ও ন্যায্য পারিশ্রমিক পায়। অথবা তাদের শ্রমানুপাতে তাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দেবে। যেমন : অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে ধনীদের নিকট সম্পদ জমা হয়ে থাকবে না। প্রত্যেকে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে।

'শ্রম ও পারিশ্রমিকের মাঝে সমতা' এই শিরোনামের আলোচনায় আমাদের সামনে একটি মাসআলা স্পষ্ট হয়। তা হলো القيمة الفائضة বা উদ্বৃত্ত মূল্য। এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছে মার্ক্স ও তার সহযোগীরা। এরপর তার অনুসারীরাও তার অনুসরণ করেছে। তারা ভাবল যে, শ্রমিককে তার পরিশ্রমের তুলনায় অল্প পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। এমন চিন্তা করলে শ্রম ও পারিশ্রমিকের মাঝে একটি ব্যবধান তৈরি হয়। এটাকেই উদ্বৃত্ত মূল্য বলে। সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী বিভিন্ন দেশে এর প্রচলন রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এটিকে অগ্রগতির মাধ্যম মনে করে। পুঁজিবাদি সমাজে একে ক্ষতির কারণ বলে। পুঁজিবাদি রাষ্ট্রে ধনী ব্যক্তিরাই উদ্বৃত্ত মূল্যের অধিকার দখল করে রাখে। আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তা দখল করে কর্তৃত্বকারী শাসকগোষ্ঠী। এরা এ অর্থকে শ্রমিক ও জনগণের অকল্যাণে, রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য ব্যয় করে। যেমন জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য প্রতিরক্ষা খাতে, গোয়েন্দা খাতে, গণমাধ্যম খাতে এবং মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়িক চুক্তির মধ্যে খরচ করে থাকে। এভাবে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক থেকে উদ্বৃত্ত কষ্টের টাকা নানা অকল্যাণ ও অন্যায় কাজে ব্যয় হয়। এরা তুচ্ছ মূল্যে নিজেদের জাতি ও দেশের আত্মমর্যাদাকে বিক্রি করে দেয়।

উপার্জনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা স্বাভাবিক

সকল মানুষের উপার্জনের সক্ষমতা একরকম নয়। সর্বদাই উপার্জনের মধ্যে একজনের সাথে অন্য জনের ভিন্নতা থাকে। এটি মানুষের স্বভাবজাত বাস্তবতা। সমাজের মানুষের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক বৈপরীত্য রয়েছে। অন্য কারও সাথে সম্পূর্ণ মিলযুক্ত এমন কোনো মানুষ পাওয়া যায় না; বরং প্রত্যেক মানুষই জ্ঞান-বুদ্ধি, মন-মানসিকতা, শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এভাবেই সে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে। মানুষের মাঝে পারস্পরিক সক্ষমতা-অক্ষমতা, যোগ্যতা-অযোগ্যতা হিসাবে বৈপরীত্য রয়েছে। যেমন : বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা, দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা, ধৈর্য ও ধারণ ক্ষমতা। কেউ খুব বেশি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ; আবার কেউ বুদ্ধিহীন, অলস ও অক্ষম। এমনিভাবে কেউ দৃঢ় প্রত্যয়ী, সংকল্পবদ্ধ ও অটল বিশ্বাসী; আবার কেউ সংকল্পহীন, দুর্বল ও ভীরু। কেউ শক্তিশালী, কর্মঠ ও উদ্যমী; আবার কেউ শক্তিহীন, অকর্মা ও আরামপ্রিয়। মানুষের মাঝে এমন স্বভাবজাত বৈপরীত্যের কারণে প্রত্যেকের আয়-উপার্জনের মধ্যেও বৈপরীত্য দেখা দেবে, ব্যাপারটি একেবারেই স্বাভাবিক। তাই যতদিন মানুষের কর্মের পরিধি ও পরিমাণে ব্যবধান থাকবে, ততদিন তাদের আয়-উপার্জনের মধ্যেও ব্যবধান থাকবে। আর এটি জানা কথা যে, মানুষের কর্মের পরিধি ও ধরনে অনেক ভিন্নতা বিদ্যমান, যা খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। মূলত এ কারণেই সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত স্তরগুলোর অস্তিত্ব দেখা যায়। পবিত্র কুরআনের ভাষ্য থেকে এমনই বুঝে আসে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴾

'আল্লাহ তাআলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।'[৭৭৯]

﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

৭৭৯. সুরা আন-নাহল : ৭১

'আর তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদের প্রদত্ত বিষয়ে পরীক্ষা করেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'[৭৮০]

অতএব বোঝা গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের শ্রমের মাঝে বৈপরীত্য থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পারিশ্রমিকের মাঝেও কমবেশ হবে। তাই একজন বিচক্ষণ, জ্ঞানী এবং একজন নির্বোধ, অলসের প্রাপ্য কখনো এক হতে পারে না। কর্মঠ, দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং অলস, অক্ষমের প্রাপ্য সমান হবে না। এদের শ্রম যেহেতু সমান নয়, সেহেতু তাদের পারিশ্রমিকও সমান নয়। তাই তাদের পারিশ্রমিক সমান হওয়াটা গর্হিত ও অন্যায় কাজ। সুস্থ বিবেক পারিশ্রমিক সমান হওয়ার ব্যাপারটি কখনোই মেনে নেবে না।

ইসলামের বিধান হলো, মানুষের কর্ম অনুযায়ী তার পারিশ্রমিক হবে। আর এটিও ইসলামের বিধান যে, প্রত্যেক শ্রমিককে তাদের কর্ম অনুপাতে সমান সুযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ সুবিধাটি পরিকল্পিত এবং সকলের জন্য সহজ ও সমান হতে হবে। তাহলে কিছু মানুষকে সুবিধা বঞ্চিত করে কিছু মানুষকে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের সুযোগ থাকবে না। এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটলে তা হবে অন্যায়-অত্যাচার এবং একপক্ষকে সুবিধা বঞ্চিত করে অন্যপক্ষের পক্ষপাতিত্ব করা। যার ফলে পরস্পরের মাঝে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি হবে, উৎপাদনশক্তি সংকুচিত হয়ে যাবে, মানুষের আত্মিক বন্ধনে বিভক্তি সৃষ্টি হবে এবং অন্যায় ও অবহেলার দরুন তারা বিষণ্ণ থাকবে।

৭৮০. সুরা আল-আনআম : ১৬৫

মালিকানা অর্জনের অবৈধ পন্থাসমূহ

হারাম মাধ্যমে উপার্জন করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। অবৈধ পন্থায় সম্পদের মালিক হওয়ার ব্যাপারে ইসলাম সতর্ক করেছে এবং এমন পন্থা অবলম্বনকারীদের জন্য দুনিয়াতে ও আখিরাতে শাস্তির ধমক রয়েছে। হারাম পন্থায় উপার্জনকারী যেন আগুনই ভক্ষণ করে এবং তার জাহান্নামের পাথেয় জোগায়। তা ছাড়া এসব অবৈধ পন্থা আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার কারণ। তাই হারাম পথে উপার্জনকারীদের অতি দ্রুত তাওবা করে মানুষের সম্পদ শরিয়াসম্মত পন্থায় তাদের ফেরত দেওয়া উচিত। এমন কিছু অবৈধ উপার্জনের মাধ্যম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. সুদ

সুদ একটি ধ্বংসাত্মক ও জঘন্য অপরাধ। নিকৃষ্ট পাপাচার। ইসলাম যে সকল কবিরা গুনাহকে অত্যন্ত জঘন্য ও অপছন্দনীয় বলে, সেগুলোর শীর্ষে রয়েছে সুদ। একমাত্র অবাধ্য, পাপিষ্ঠ ও আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিই সুদের সাথে জড়িত হতে পারে। সুদগ্রহীতা যেন আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে কারিমে এমন লোকদের কঠিন পরিণতি বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

'যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ওই ব্যক্তি, যাকে শয়তান তার স্পর্শের দ্বারা মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ হলো, তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদ নেওয়ার মতোই! অথচ আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।'[৭৮১]

৭৮১. সুরা আল-বাকারা : ২৭৫

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। সুদ নামক পাপাচারিতা থেকে তাদের সর্তক করেছেন। যেন তারা এমন জঘন্য অপরাধ থেকে নিজেদের অতি দ্রুত মুক্ত করে নিতে পারে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো; যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাকো।'[৭৮২]

সুদ ভক্ষণকারীদের আল্লাহ তাআলা এমন বিধ্বংসী যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন, যা থেকে তারা রেহাই পাবে না; যতক্ষণ না তারা তাওবা করে এবং মূলধনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করে সত্য ও হকের দিকে ফিরে আসে। না হয় আল্লাহ তাদের দুনিয়াতে শাস্তি দেবেন এবং পরকালে কঠিন আজাব দিয়ে ধ্বংস করবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

'অতঃপর যদি তোমরা (সুদ)পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।'[৭৮৩]

জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

৭৮২. সুরা আল-বাকারা : ২৭৮

৭৮৩. সুরা আল-বাকারা : ২৭৯

'রাসুলুল্লাহ ﷺ সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে তারা সকলেই সমান।'[৭৮৪]

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَرْبَعَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا : مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ

'চার শ্রেণির মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ না করানো এবং তাঁর নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করতে না দেওয়া আল্লাহ তাআলার অধিকার। মাদকাসক্ত, সুদগ্রহীতা, অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ ভক্ষণকারী ও পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।'[৭৮৫]

সুদের পরিচয় ও প্রকারভেদ

الربا (আর-রিবা) এর শাব্দিক অর্থ হলো, বৃদ্ধি পাওয়া।[৭৮৬]

পরিভাষায় الربا দুধরনের :

১. ربا الفضل - বৃদ্ধিমূলক সুদ

বিক্রির সময় একই জাতীয় জিনিসে বেশি গ্রহণ করা। যেমন এক দিনারের বিনিময়ে দুই দিনার, এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম, এক টাকার বিনিময়ে দুই টাকা, এক কেজির বিনিময়ে দুই কেজি। এমন লেনদেন করা হারাম।

আবু সাইদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ والتمر بالتمر وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فمن زاد أو استزاد فقد أربي الآخذ و المعطي فيه سواء

৭৮৪. সহিহু মুসলিম : ৩/১২১৯, হা. নং ১৫৯৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

৭৮৫. মুসতাদরাকুল হাকিম : ২/৪৩, হা. নং ২৬০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

৭৮৬. আল-মিসবাহুল মুনির : পৃ. নং ২১৭ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

'সোনার বিনিময়ে সোনা, রুপার বিনিময়ে রুপা, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ—সব এক বরাবর ও নগদে হতে হবে। সুতরাং যে বেশি দেবে বা চাইবে, সে সুদে জড়িয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে সমান অপরাধী।'[৭৮৭]

২. ربا النسيئة او النساء - বিলম্বমূলক সুদ

ভিন্ন জাতীয় জিনিস বাকি বিক্রি করে অতিরিক্ত গ্রহণ করা। তবে ভিন্ন জাতীয় জিনিসের মধ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ করা জায়িজ আছে। শর্ত হচ্ছে তা বাকিতে হতে পারবে না, নগদে হতে হবে।

উবাদা বিন সামিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ والتمر بالتمر وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

'সোনার বিনিময়ে সোনা, রুপার বিনিময়ে রুপা, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ—পরিমাণে সমান ও নগদে বিক্রি হবে। তবে যদি এগুলো ভিন্ন জাতীয় হয়, তখন নগদে হওয়ার শর্তে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে (কমবেশ করে) বিক্রি করো।'[৭৮৮]

এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। মতানৈক্যের স্বরূপটি হলো, শুধু হাদিসে উল্লেখিত এই ছয়টি জিনিসের মধ্যেই অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম নাকি এই ছয়টিসহ সকল কিছুর ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য?

৭৮৭. সহিহু মুসলিম : ৩/১২১১, হা. নং ১৫৮৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

৭৮৮. সহিহু মুসলিম : ৩/১২১১, হা. নং ১৫৮৭ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

আহলে জাওয়াহিরের মতে, সুদি লেনদেন শুধু এই ছয় প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ছয় প্রকারের বাইরে অন্যান্য সকল বস্তুতে কমবেশ করে লেনদেন করা যাবে।[৭৮৯]

কিন্তু জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, হাদিসের মধ্যে যদিও ছয়টি বস্তুর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এতে শুধু এ ছয়টিই উদ্দেশ্য নয়; বরং এ থেকে ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। সুতরাং এই ছয় জিনিস ছাড়া আরও অন্যান্য বস্তুতেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। অতএব, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পণ্য ও মূল্য এক জাতীয় জিনিস হলে তাতে কমবেশ করে বা বাকিতে লেনদেন করা হারাম বলে বিবেচিত হবে।[৭৯০]

মূলকথা হচ্ছে, সুদ ইসলাম কর্তৃক ঘোষিত সেসব কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো থেকে ইসলাম কঠিনভাবে নিষেধ ও সতর্ক করেছে। এটি সম্পদ উপার্জনের একটি অবৈধ মাধ্যম। লোভী ও জালিম প্রকৃতির মানুষের এমন অবৈধ উপার্জন আল্লাহ তাআলার নিকট ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয়।

সুদখোর ও পুঁজিবাদীরা একটি ভ্রান্ত আপত্তি করে থাকে। তারা সুদি কারবারকে অপরাধ মনে করে না। মনে করে, সুদ হলো ক্রয়-বিক্রয়ের একটি প্রক্রিয়া। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যেমন টাকার বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা হয়, এখানেও মালের বিনিময়ে মালের আদান-প্রদান করা হয়। এমনিভাবে যদি অতিরিক্ত নেওয়ার চুক্তিতে বাকিতে মালের বিনিময়ে মাল বিক্রি করা হয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং তা লাভের একটি মাধ্যম মাত্র—যেমনটি প্রচলিত বেচাকেনার মধ্যে হয়ে থাকে। এমনিভাবে সুদের ওপর ঋণ দেওয়াকে তারা এমন মনে করে যে, ঋণদাতা ঋণ দেওয়ার কারণে তার যে আর্থিক ক্ষতি হয়, ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করাটা তার সেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ। সুদি কারবারকে নির্দোষ বা নিরপরাধ মনে করা ইসলাম সমর্থন করে না। এটি তাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা। যা দুধরনের :

প্রথমত, সুদের ভিত্তিমূল হলো অত্যাচার ও ঋণগ্রহীতার ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ। সুদদাতা ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদের ঋণের বিনিময়ে ঋণগ্রহীতার

---

৭৮৯. আল-মুহাল্লা, ইবনু হাজাম : ৭/৪০৩ (দারুল ফিকর, বৈরুত)
৭৯০. বাদায়িউস সানায়ি : ৫/১৮৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ নিয়ে থাকে। এদিকে ঋণী ব্যক্তির অবস্থা যেমনই হোক না কেন; চাই সে ক্ষতির মধ্যে থাকুক অথবা লাভ-ক্ষতির মাঝামাঝি থাকুক, তাকে এ অর্থ অবশ্যই দিতে হবে। অথচ ইসলাম সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে লেনদেনের মধ্যে লাভ-ক্ষতিকে মূল্যায়ন করে। হাদিস থেকে উৎসারিত একটি নীতি হলো, الخراج بالضمان [ঝুঁকির ভিত্তিতেই মুনাফা ভোগ]। সুতরাং বোঝা গেল, চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়েরই যেহেতু লাভ-ক্ষতিতে সমান ঝুঁকি, বিধায় এখন যদি শুধু একজন লাভের দাবিদার হয় এবং অপরজন লাভ-ক্ষতি উভয়টির জিম্মাদার হয়, তাহলে তা হবে স্পষ্ট জুলুম ও অসামঞ্জস্যশীল একটি বিষয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ হলো স্বার্থপরতা। ঋণগ্রহীতা ও বিপদগ্রস্তের কাছ থেকে কলঙ্কজনক ও অন্যায় সুবিধাভোগ। এতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার লেশমাত্র নেই। অথচ ইসলাম মানুষকে পারস্পরিক ভালোবাসা, নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দান ও সাহায্য-সহযোগিতার দিকে আহ্বান করে। কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়াই বিপদগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে। এ ভিত্তিতেই ইসলাম মানুষকে প্রয়োজনের সময় ঋণদানের প্রতি উৎসাহিত করেছে। আবার তার বিনিময়ে কোনো অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ থেকে বারণ করেছে। কেননা, ইসলাম মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের নির্দেশ দেয়। আর মুসলিমরা এমনই হয়।

প্রকৃত মুসলিম তো তারা, যারা ইসলামের বিধানুযায়ী জীবনকে সাজিয়ে নিয়েছে। যারা পারস্পরিক ঐক্য ও বন্ধুত্ব রক্ষায় অটল। তারা শুধু লেনদেন নয়; বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ বজায় রেখে চলে। যেখানে কোনো অহংকার ও আমিত্ববোধ নেই।

এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদিস হচ্ছে :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের একটি জাগতিক বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা তার কিয়ামতের বিপদগুলো থেকে একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে কোনো অভাবী ব্যক্তির অভাব দূর করবে, আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়া ও আখিরাতের অভাব দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষগুলো গোপন করবেন। আর বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য করে, ততক্ষণ আল্লাহ তাআলাও তাকে সাহায্য করেন।'[৭৯১]

২. মজুতদারি ও গুদামজাতকরণ

অধিক লাভে বিক্রি করার আশায় পণ্য মজুদ রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করাকে الاحتكار বা গুদামজাত বলে।[৭৯২]

এটি একটি ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট উপার্জনের পন্থা, যা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্য হতে কিছু লোভী প্রকৃতির মানুষ করে থাকে। তাদের অন্তরে ভালোবাসা ও মমত্ববোধ বলতে কিছু নেই। মমতা যেন পরিপূর্ণভাবে তাদের অন্তর থেকে বেরিয়ে গেছে। ইসলাম যে সকল অপরাধ থেকে সতর্ক করেছে, সেগুলোর অন্যতম হলো মজুতদারি। কেউ এমন জঘন্য কাজে লিপ্ত হলে, তার জন্য অভিশাপ ও শাস্তি অবধারিত।

উমাইর ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

'যে ব্যক্তি গুদামজাত করল, সে একজন পাপী।'[৭৯৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে :

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

'একমাত্র পাপীরাই গুদামজাত করে রাখে।'[৭৯৪]

---

৭৯১. সহিহ মুসলিম : ৪/২০৭৪, হা. নং ২৬৯৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৭৯২. আল-কামুসুল মুহিত : পৃ. নং ৩৭৮ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)
৭৯৩. সহিহ মুসলিম : ৩/১২২৭, হা. নং ১৬০৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৭৯৪. সহিহ মুসলিম : ৩/১২২৮, হা. নং ১৬০৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

ইবনে মাজাহর অন্য এক বর্ণনায় আছে :

مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلَاسِ

'যে মুসলমানদের খাদ্য জমা করে রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দারিদ্র্য ও কুষ্ঠরোগের মাধ্যমে শাস্তি দেবেন।'[৭৯৫]

ইবনে উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ

'যে ব্যক্তি চল্লিশদিন পর্যন্ত খাদ্য গুদামজাত করে রাখে, সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত, আল্লাহও তার জিম্মাদারি থেকে মুক্ত।'[৭৯৬]

৩. জুয়া ও বাজি ধরা

অবৈধ উপার্জনের আরও একটি মাধ্যম হলো জুয়া খেলা ও বাজি ধরা। الميسر (আল-মাইসির) এর শাব্দিক অর্থ হলো القداح বা যজ্ঞকাঠি, যা দ্বারা তৎকালে আরবরা বাজি ধরে জুয়া খেলত। যজ্ঞকাঠি নিক্ষেপকারী এবং জুয়াড়িকে বলা হতো ياسرون (যে কাঠি নিক্ষেপ করে)। আবার এর বিপরীতে اليامن (আল-ইয়ামিন) শব্দটিও ব্যবহৃত হতো। এ শব্দটি اليمين (আল-ইয়ামীন) থেকে নির্গত।[৭৯৭]

القمار (আল-কিমার) শব্দটি قمر (কমার) থেকে উদ্ভূত। قمر (কমার) অর্থ চাঁদ। চাঁদের রূপ বাড়ে ও কমে। কখনো বড় হয়, কখনো ছোট হয়, আবার কখনো বিলীন হয়ে যায়। জুয়ার অবস্থাও ঠিক এরূপ। কখনো লাভ হয়, কখনো লস হয় আর কখনো একবারে নিঃস্ব হয়ে যায়।

---

৭৯৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২/৭২৯, হা. নং ২১৫৫ (দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরবিয়্যা, কায়রো) - হাদিসটি জইফ।
৭৯৬. মুসনাদু আহমাদ : ৮/৪৮২, হা. নং ৪৮৮০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।
৭৯৭. তাজুল আরুস : ১৪/৪৬১-৪৬৩ (দারুল হিদায়া, বারিদা)

শরিয়তের পরিভাষায় এমন সকল প্রকার কার্যকলাপ, যার ভেতর হার-জিতের আশঙ্কা আছে, যার একপক্ষ সম্পূর্ণ হেরে যাবে ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অপরপক্ষের সম্পূর্ণ জিত ও লাভ হবে—এমন কর্মকে القمار বা জুয়া বলে। এটাকে الميسر বলা হয়। শব্দটির একটি অর্থ হলো সহজ। قمار কে ميسر এ জন্য বলা হয়ে থাকে, যেহেতু এটা সহজ ও বিনা মেহনতের ফসল।

জুয়া উপার্জনের নিকৃষ্ট পন্থা। যারা এমন পন্থা অবলম্বন করে, তারা মূলত তাদের পেটে আগুন ভর্তি করে। এমন লোকদের সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ হয় অবৈধ পন্থায়। এমন নিকৃষ্ট পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾

'হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তোমরা কি এখনো নিবৃত্ত হবে না?'[৭৯৮]

জুয়া ও বাজি ধরার বস্তুসমূহ দিয়ে খেলাধুলা করা হাদিসে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এরই একটি প্রকার হলো, পাশা খেলা। আবু মুসা আশআরি ﵁ থেকে ইমাম আবু দাউদ ﵀ বর্ণনা করেন :

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

৭৯৮. সুরা আল-মায়িদা : ৯০-৯১

'যে পাশা খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করল।'[৭৯৯]

বুরাইদা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

'যে পাশা দ্বারা খেলল, তার হাত যেন শুকরের গোশত ও রক্তে চুবে গেল।'[৮০০]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি ﵀ বলেন :

'জুয়া একেবারেই হারাম ও বাতিল। এটির প্রচলনে একটি সমাজের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক—উভয় দিকই একেবারে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। এরই মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রে প্রসার লাভ করে। মোটকথা, জুয়া যত প্রকারের আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর যত প্রকার উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব—সবগুলো হারাম।'

৪. ঘুষ

رشوة (রিশওয়াত) শব্দটা একবচন। বহুবচনে رُشًا। বলা হয় : ارتشى সে ঘুষ গ্রহণ করেছে বা ঘুষ চেয়েছে।[৮০১]

এটিও উপার্জনের নোংরা একটি পদ্ধতি। সমাজের নিকৃষ্ট ও পাপিষ্ঠ শ্রেণিরাই কেবল এ পথ অবলম্বন করে থাকে। এরকম পাপিষ্ঠদের মধ্যে অনুভূতি ও আল্লাহভীতি লোপ পেয়ে যায়। এরা দুনিয়ার সস্তা জীবনকে উপভোগ করে। এরা দুঃখী-দরিদ্র ও বিপদগ্রস্ত মানুষের সম্পদ হাতিয়ে নেয়। মূলত তারা টাকা-পয়সা নয়; বরং আগুনের কিছু জলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

৭৯৯. মুসনাদু আহমাদ : ৩২/২৮৭, হা. নং ১৯৫২১ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।
৮০০. সহিহু মুসলিম : ৪/১৭৭০, হা. নং ২২৬০ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৮০১. মুখতারুস সিহাহ : পৃ. নং ১২৩ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনেশুনে অবৈধ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।'[৮০২]

ঘুষগ্রহীতা ও ঘুষদাতা উভয়েই নিন্দিত। আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

'রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘুষগ্রহীতা ও ঘুষদাতাকে অভিশাপ দিয়েছেন।'[৮০৩]

৫. সম্পদ মজুদ করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

'আর যারা সোনা ও রুপা জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ দিন।'[৮০৪]

ইসলামে যদিও সম্পদ মজুদ করা থেকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু কেউ মজুদ করলে তা এমনিতে হারাম কিছু হবে না। সম্পদ মজুদ করা দু'অবস্থায় হারাম। এক. জাকাত না দিয়ে সম্পদ মজুদ করা। দুই. মুসলমানদের দারিদ্র্য ও কঠিন মুহূর্তে সম্পদ জমা করা।[৮০৫]

---

৮০২. সুরা আল-বাকারা : ১৮৮

৮০৩. সুনানু আবি দাউদ : ৩/৩০০, হা. নং ৩৫৮০ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

৮০৪. সুরা আত-তাওবা : ৩৪

৮০৫. তাফসিরুল কুরতুবি : ৮/১২৫ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)

বিভিন্ন বাতিল চুক্তি

আমরা এখানে ইসলামে নিষিদ্ধ কিছু বাতিল চুক্তি উল্লেখ করব। এসব চুক্তি ও লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এগুলোর মধ্যে অপবিত্রতা, অন্যায়, অবিচার, অন্যের ক্ষতি, ধোঁকা রয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং সমাজে অরাজকতা তৈরি হয়।

১. মদ, মৃত জন্তু, শুকর ও মূর্তি বিক্রি করা। এগুলো বেচাকেনার চুক্তি করলে তা সহিহ হবে না। কারণ, শরিয়ার দৃষ্টিতে এগুলো মূল্যমান জিনিস নয়। অর্থাৎ ইসলামে এদের কোনো আর্থিক মূল্যই নেই।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কা বিজয়ের বছর বলতে শুনেছেন :

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ : لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ،

'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ মদ, মৃত জন্তু, শুকর ও মূর্তি বিক্রি হারাম করেছেন। এ কথা বলার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, মৃত জন্তুর চর্বির ব্যাপারে আপনার কী মতামত? চর্বি দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেওয়া হয়, চামড়াতে মাখা হয় এবং মানুষ প্রদীপ জ্বালায়। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, সেটাও হারাম। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বললেন, আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের ধ্বংস করুন! যখন তিনি তাদের ওপর মৃত জন্তুর চর্বি হারাম করলেন, তখন তারা সেটা প্রসাধনী হিসাবে ব্যবহার করত। অতঃপর তা বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করত।'[৮০৬]

---

৮০৬. সহিহুল বুখারি : ৩/৮৪, হা. নং ২২৩৬ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

২. অন্যের বিক্রির ওপর বিক্রি করা। সুতরাং একজনের বিক্রি করার সময় অন্যজন এসে ক্রেতার কাছে নিজের পণ্য বিক্রির জন্য প্রস্তাব দেওয়া জায়িজ নয়। ক্রেতা তার থেকে পূর্ণভাবে ফিরে আসলে, তবেই তাকে নিজের পণ্য বিক্রির প্রস্তাব দেওয়া যাবে। এটা খুবই নিন্দনীয় আচরণ। কেবল অভদ্র ও পাপিষ্ঠরাই এমনটা করে থাকে। ইসলাম এমন উপার্জন পদ্ধতিকে নিষেধ করেছে।

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

'কেউ যেন তার ভাইয়ের বিক্রির ওপর বিক্রি না করে এবং অনুমতি ছাড়া অন্য ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর নিজের বিবাহের প্রস্তাব না দেয়।'[৮০৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে :

لَا يَسِمِ الْمُسْلِمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

'কোনো মুসলিম যেন তার ভাইয়ের দামের ওপর দরাদরি না করে।'[৮০৮]

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতারণামূলক দরদাম করা থেকে নিষেধ করেছেন।'[৮০৯]

এ ধরনের বিক্রির মধ্যে ঠকবাজি, অন্যের ক্ষতি এবং ধোঁকার নিয়ত থাকার কারণে ইসলাম এগুলোকে হারাম করেছে।

---

৮০৭. সহিহ মুসলিম : ২৫/১০৩২, হা. নং ১৪১২ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৮০৮. সহিহ মুসলিম : ২/১০৩৩, হা. নং ১৪১৩ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৮০৯. সহিহুল বুখারি : ৯/২৪, হা. নং ৬৯৬৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৩. কোনো পণ্যের দাম ন্যায্য মূল্যের চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণ করা। এটা কখনো বিক্রয় হিসাবে স্বীকৃত নয়; বরং এটা বিক্রির মাধ্যমে অন্যকে ধোঁকা দেওয়া।

الغرر (আল-গরার) শব্দের অর্থ হচ্ছে, الخطر(আল-খতর) অর্থাৎ বিপদ ও ঝুঁকি।[৮১০] আর الخطر শব্দের অর্থ হচ্ছে, الاشراف علي الهلاك অর্থাৎ ধ্বংসের নিকটবর্তী হওয়া।[৮১১]

আর ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির মধ্যে ধোঁকার মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পরের ক্ষতি ডেকে আনে। কেননা, শেষ পর্যন্ত এসব কারণে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে রেশারেশি ও ঝগড়া বাধে, যদ্দরুন উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ ধোঁকামূলক ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।'[৮১২]

৪. মাছ পানিতে রেখে ধরার আগেই বিক্রি করে দেওয়া। এটা হচ্ছে মালিকানাহীন ও হস্তান্তরযোগ্য নয়, এমন জিনিস বিক্রি করা। এভাবে মাছ বিক্রি করা হারাম ও নিষিদ্ধ। এটাও মূলত ধোঁকারই একটি প্রকার।

ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ

'তোমরা পানিতে রেখে মাছ বিক্রি করো না। কেননা, এটা ধোঁকা।'[৮১৩]

---

৮১০. আল-মিসবাহুল মুনির : ২/৪৪৪ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৮১১. মুখতারুস সিহাহ : পৃ. নং ৯৩ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)
৮১২. সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৫৪, হা. নং ৩৩৭৬ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।
৮১৩. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৪/৪৫২, হা. নং ২২০৫০ (মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ) - হাদিসটি সহিহ।

৫. আকাশে ওড়া পাখি বিক্রি করা হারাম। এভাবে কেউ যদি তার শিকারি পাখি হাত থেকে ছেড়ে দেয়, তাহলে তা ফিরে আসার আগ পর্যন্ত বিক্রির চুক্তি করা যাবে না। কেননা, পাখি শিকার করা বা হাতে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত হস্তান্তরযোগ্য থাকে না। ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[৮১৪]

৬. ওলানে রেখে দুধ বিক্রি করা হারাম। কেননা, বিক্রিত পণ্যের ব্যাপারে অস্পষ্টতা রয়েছে। ওলানে দুধ আছে কি নেই, সেই ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দুজনের মাঝে ঝগড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই এমন লেনদেন থেকে ইসলাম নিষেধ করেছে।

৭. ছাগলের গায়ের পশম বিক্রি করা হারাম। এ ক্ষেত্রেও পণ্যের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। তা ছাড়া পশুর গায়ে পশম থাকা পশুর বৈশিষ্ট্য। আর পশম যেহেতু ভেতর থেকে সৃষ্ট, সেহেতু তা অন্যান্য জিনিসের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়।[৮১৫]

৮. ملاقيح ومضامين (মাজামিন ও মালাকিহ) অর্থাৎ উটনীর গর্ভ ও উটের বোঝা বিক্রি করা। مضامين (মাজামিন) হচ্ছে উটনীর গর্ভের বাচ্চা বিক্রি করা। আর ملاقيح (মালাকিহ) উটের পিঠে যা আছে তা বিক্রি করা। এ দুই লেনদেনে পণ্য অস্পষ্ট থাকায় এর ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ।

ইবনে শিহাব জুহরি ﷺ থেকে মুরসাল বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : الْمَلَاقِيحُ : مَا فِي بُطُونِ النُّوقِ وَالْمَضَامِينُ : مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ : وَلَدُ وَلَدِ النَّاقَةِ

৮১৪. আল-হিদায়া : ৩/৪৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত) নাইলুল আওতার : ৫/১৭৫ (দারুল হাদিস, কায়রো)

৮১৫. আল-হিদায়া : ৩/৪৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

'রাসুলুল্লাহ ﷺ উটনীর গর্ভ, উটের বোঝা ও গর্ভের গর্ভ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে শিহাব জুহরি ﷺ বলেন, ملاقيح (মালাকিহ) হলো উটনীর গর্ভে যা থাকে। আর مضامين (মাজামিন) হলো উটের পিঠে যা থাকে। আর গর্ভের গর্ভ হলো উটনীর বাচ্চার বাচ্চা।'[৮১৬]

সাইদ বিন মুসাইয়িব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ. وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ. فَالْمَضَامِينُ : مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ

'প্রাণীর ক্ষেত্রে কোনো সুদ নেই। তবে প্রাণীর তিনটি লেনদেনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এক. উটনীর গর্ভের বাচ্চা। দুই. উটের পিঠের দ্রব্যসামগ্রী। তিন. উটনীর গর্ভের বাচ্চার বাচ্চা।'[৮১৭]

৯. بيع الحصاة (বাইয়ুল হাসাত)

بيع الحصاة (বাইয়ুল হাসাত) হলো, একটি পাথর নিয়ে বিক্রেতা কাউকে এই কথা বলা যে, এই পাথর যতগুলো কাপড়ের ওপর পড়বে, সেগুলো আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম—এ কথা বলে পাথর নিক্ষেপ করা। অথবা এ কথা বলা যে, এই জমি থেকে নিক্ষেপ করে পাথর যতটুকু যায়, ততটুকু জমি বিক্রি করলাম।

بيع الحصاة (বাইয়ুল হাসাত) নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

৮১৬. আস-সুন্নাহ, মারুজি : পৃ. নং ৬১, হা. নং ২০৯ (মুআসসাসাতুল কুতুবলিস সাকাফিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি মুরসাল সহিহ।

৮১৭. মুয়াত্তা মালিক : ৪/৯৪৬, হা. নং ২৪১১ (মুআসসাসাতু জাইদ বিন সুলতান, আবুধাবি) হাদিসটি সহিহ।

'রাসুলুল্লাহ ﷺ পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে এবং ধোঁকাবাজির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।'[৮১৮]

১০. بيع المنابذة و بيع الملامسة : (বাইয়ুল মুনাবাজা ও বাইয়ুল মুলামাসা)

এ দুটি লেনদেন নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে আবু সাইদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ : لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ মুনাবাজা থেকে নিষেধ করেছেন। মুনাবাজা হলো, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতা কাপড়টি উল্টানো-পাল্টানো বা দেখে নেওয়ার আগেই বিক্রেতা কর্তৃক তা ক্রেতার দিকে নিক্ষেপ করা। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ মুলামাসা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা থেকে নিষেধ করেছেন। মুলামাসা হলো, কাপড়টি না দেখে স্পর্শ করা।'[৮১৯]

ইমাম আবু দাউদ رحمه الله বলেন, المنابذة (আল-মুনাবাজা) হলো, বিক্রেতা কাউকে এ কথা বলা যে, আমি যখন তোমার গায়ের দিকে এই কাপড়টি নিক্ষেপ করব, তখন লেনদেন সম্পন্ন ও আবশ্যক হয়ে যাবে। আর الملامسة (আল-মুলামাসা) হলো, পণ্য খুলে ভালোভাবে না দেখে হাতে স্পর্শ করা। অর্থাৎ ক্রেতা তা স্পর্শ করা মাত্রই লেনদেন আবশ্যক হয়ে যাবে।[৮২০]

১১. কেউ যদি এমন কোনো জিনিস বিক্রি করে, যা তার কাছে নেই, তাহলে সেটাও ফাসিদ বা বাতিল বিক্রয় বলে গণ্য হবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে পণ্য হস্তান্তরযোগ্য নয়। তা ছাড়া এর মাধ্যমে ঝগড়া বিবাদ ও পারস্পরিক অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়ে থাকে। অথচ ব্যবসার মূল হচ্ছে পরস্পরের সন্তুষ্টি।

---

৮১৮. সহিহ মুসলিম : ৩/১১৫৩, হা. নং ১৫১৩ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

৮১৯. সহিহুল বুখারি : ৩/৭০, হা. নং ২১৪৪ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৮২০. সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৫৫, হা. নং ৩৩৭৮ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

'তোমার কাছে যা নেই, তা বিক্রি করো না।'[৮২১]

১২. কেউ যদি ক্রেতার নিকট দোষ গোপন করে, তাকে ধোঁকা দেয়, এমন বেচাকেনাও বৈধ নয়। যেকোনো ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকার পন্থায় আয়-উপার্জন করা হারাম। এমন পদ্ধতিতে উপার্জন করে ওই ব্যক্তি জাহান্নামের পথই কেবল সুগম করে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

'যে প্রতারণা করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[৮২২]

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

'রাসুলুল্লাহ ﷺ সবজির একটি স্তূপের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি সেটার ভিতরে তাঁর হাত প্রবেশ করালেন। তাঁর হাতে আদ্রতা লেগে গেলে তিনি বললেন, হে স্তূপের মালিক, এটা কী? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, এটাতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এগুলো

---

৮২১. সুনানুন নাসায়ি : ৭/২৮৯, হা. নং ৪৬১৩ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

৮২২. সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৭২, হা. নং ৩৪৫২ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

স্তূপের ওপর রাখতে পারোনি, যেন লোকেরা তা দেখে ক্রয় করে? যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[৮২৩]

এখানে বাতিল ও অবৈধ লেনদেনের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। এসব মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করলে তাতে কোনো বরকত ও লাভ নেই। দুনিয়াতেও ক্ষতি আখিরাতেও ক্ষতি। এ ছাড়াও আরও অনেক অবৈধ উপার্জনের পন্থা আছে, যা মানুষ অহরহ করে যাচ্ছে। যেমন : চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, মহিলাদের সন্তুষ্টি ছাড়াই তাদের মোহর ভক্ষণ, শ্রমিকের পারিশ্রমিক ভক্ষণ, লোভে হোক বা শত্রুতাবশত—ভয় দেখিয়ে কারও সম্পদ লুণ্ঠন করা, দাপট দেখিয়ে উপার্জন করা ইত্যাদি। এমন আরও বহু অবৈধ পন্থা আছে, যেগুলোর মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয় না এবং ইসলামও সেগুলো সমর্থন করে না। এগুলো অবৈধ, অনৈতিক ও অনৈসলামিক। এগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তি অভিশপ্ত।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি নিজে তিন শ্রেণির মানুষের প্রতিপক্ষ হব। এক. যে আমাকে ওয়াদা দিয়ে তার বিপরীত করে। দুই. যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে। তিন. যে ব্যক্তি কোনো কর্মচারী নিয়ে তার কাছ থেকে পরিপূর্ণ শ্রম নিয়েও পারিশ্রমিক দেয় না।'[৮২৪]

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فانه يُطَوَّقُهُ يوم القيامة مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

---

৮২৩. সহিহ মুসলিম : ১/৯৯, হা. নং ১০২ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৮২৪. সহিহুল বুখারি : ৩/৮২ , হা. নং ২২২৭ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জুলুম করে দখল করবে, কিয়ামতের দিন সাত পৃথিবী পরিমাণ জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।'[৮২৫]

ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উৎস

ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উৎস অনেক ও বিভিন্ন ধরনের। আর ইসলামি রাষ্ট্রের সব ধরনের আয় মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়। এখানে আমরা ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের দশটি উৎস বর্ণনা করব। যথা :

১. الزكاة - জাকাত

২. الخراج - খারাজ

৩. العشور- ওশর

৪. الفيء- ফাই

৫. خمس الغنائم- গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ

৬. الجزية- জিজিয়া

৭.. معادن الأرض - খনিজ পদার্থ

৮. الثروة المائية- পানি সম্পদ

৯. الضريبة- কর

১০. الأموال مجهولة الحساب - হিসাববিহীন সম্পদ

---

৮২৫. সহিহুল বুখারি : ৪/১০৪, হা. নং ৩১৯৮ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

ক. الزكاة - জাকাত

জাকাতের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্র হওয়া।[৮২৬]

পরিভাষায়, নিসাব পরিমাণ সম্পদে শরিয়া কর্তৃক নির্দিষ্ট অংশকে জাকাত বলে।

জাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান; বরং তা দ্বীনে ইসলামের একটি ভিত্তি। ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

'পাঁচটি জিনিসের ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল, নামাজ কায়িম করা, জাকাত দেওয়া, রমজানের রোজা রাখা ও হজ করা।[৮২৭]

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে জাকাত সম্পর্কে অসংখ্য নস বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

'আর নামাজ কায়েম করো, জাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।'[৮২৮]

তিনি জাকাত আদায়কারীদের প্রশংসা করে বলেন :

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾

৮২৬. আল-মুজামুল অসিত : ১/৩৯৬ (দারুদ দাওয়াহ, ইসকানদারিয়া)
৮২৭. সহিহুল বুখারি : ১/১১, হা. নং ৮ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৮২৮. সুরা আল-বাকারা : ৪৩

'আল্লাহ যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করা আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন কিছু লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।'[৮২৯]

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ মুআজ ﷺ-কে ইয়ামানে প্রেরণ করার সময় এই কথা বলেছেন :

أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

'আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর জাকাত ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে নিয়ে গরিবদের মাঝে বণ্টন করা হবে।'[৮৩০]

মানুষের মাঝে সামাজিক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন বৃদ্ধির একটি ন্যায়সংগত মাধ্যম হলো জাকাত। এটি ইসলামি আকিদার একটি সুন্দরতম দিক, যা মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে এবং অপর ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তা ছাড়া সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এটি একটি কার্যকর প্রক্রিয়াও বটে। অনেকে এটিকে দরিদ্রদের ওপর অনুগ্রহ মনে করে। অথচ জাকাত কোনো অনুগ্রহ নয়; বরং তা দেওয়া তাদের ওপর ওয়াজিব এবং আল্লাহর দেওয়া আমানত, যা না দিলে তাদের জিম্মায় তা অনাদায়ী থেকে যায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾

'আর যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত আছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের অধিকার।'[৮৩১]

৮২৯. সুরা আন-নুর : ৩৬-৩৭
৮৩০. সহিহুল বুখারি : ২/১০৪, হা. নং ১৩৯৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৮৩১. সুরা আল-মাআরিজ : ২৪

জাকাত আদায়ের একটি সুফল হচ্ছে, তা ধনীদের অন্তরকে কৃপণতা, অহমিকা, হিংসা-বিদ্বেষ ও স্বজনপ্রীতি থেকে পবিত্র রাখে। জাকাতের দ্বারা দাতা ও গ্রহীতার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

জাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ

জাকাত ফরজ হওয়ার চারটি শর্ত রয়েছে :

১. মুসলিম হওয়া।

২. স্বাধীন হওয়া।

৩. নিসাবের মালিক হওয়া।

৪. এক চান্দ্র বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

জাকাত ফরজ হওয়ার প্রথম শর্ত হলো, মুসলিম হতে হবে। জাকাতের সাথে অমুসলিমদের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা, জাকাত হলো একটি ইবাদত, যা শুধু আল্লাহর খাঁটি দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যারা তাওহিদ ও রিসালত অস্বীকার করে তাদের নিকট থেকে জাকাত নেওয়ার না কোনো প্রয়োজন আছে, আর না কোনো অবকাশ আছে।

জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো, তাকে স্বাধীন হতে হবে। কেননা, দাস-দাসীরা তো কোনো সম্পদের মালিকই হয় না। অথচ জাকাতের ভিত্তিমূলই হলো অর্থসম্পদ। দাস যত অর্থই উপার্জন করুক না কেন, তা সব তার মনিবের। তাই তার ওপর ভিন্নভাবে কোনো জাকাত আবশ্যক হবে না।

জাকাত ফরজ হওয়ার তৃতীয় শর্ত হলো, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। অর্থাৎ যেকোনো সম্পদের মালিক হলেই জাকাত ফরজ হয়ে যায় না; বরং শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি পরিমাণের মালিক হলে তবেই জাকাত আবশ্যক হবে। নিসাবের বিশদ আলোচনা শীঘ্রই আসছে।

জাকাত ফরজ হওয়ার চতুর্থ শর্ত হলো, সেই সম্পদের ওপর এক চান্দ্র বছর অতিবাহিত হবে। এর আগ পর্যন্ত তার জন্য জাকাত আদায় করা

ফরজ নয়। তবে ফসল ও ফল-ফলাদির ওশরের জন্য এক বছর হওয়ার কোনো শর্ত নেই। এ ক্ষেত্রে বরং যেদিন ফসল বা ফল কাটা হবে, সেদিনই তার ওশর আদায় আবশ্যক হয়ে যাবে।

জাকাতের নিসাব

মালিকাধীন সম্পদের মধ্য থেকে নিজ প্রয়োজন বাদে অতিরিক্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে তবেই জাকাত আবশ্যক হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ বলতে শরিয়তে তিন ধরনের সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করে। এক. সোনা-রুপা বা নগদ অর্থ। দুই. ব্যবসায়িক সম্পদ। তিন. গবাদি পশু। প্রত্যেক প্রকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শর্ত ও বিধান রয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

সোনা-রুপা ও অর্থের জাকাত

কারও কাছে যদি বিশ দিনার পরিমাণ সোনা থাকে, তাহলে এক দিনারের অর্ধেক জাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ। আর রুপার ক্ষেত্রে নিসাব হলো দুইশ দিরহাম। কারও কাছে দুইশ দিরহাম থাকলে, তাকে পাঁচ দিরহাম জাকাত দিতে হবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ... وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

'যদি কারও দুইশ দিরহাম থাকে এবং এর ওপর এক বছর অতিক্রম হয়, তাহলে তাতে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। আর সোনার ক্ষেত্রে তার ওপর কোনো কিছু দেওয়া আবশ্যক নয়, তবে যখন তোমার বিশ দিনার হয়ে তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হবে, তখন তাতে এক দিনারের অর্ধেক জাকাত দিতে হবে। আর সম্পদ যদি এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে এই হিসাব অনুযায়ী

জাকাত দিতে হবে। এক বছর অতিবাহিত হওয়া ছাড়া সম্পদের কোনো জাকাত দেওয়া লাগে না।'[৮৩২]

উল্লেখ্য যে, দুইশ দিরহাম বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৫৯৫ গ্রাম বা সাড়ে বায়ান্নো ভরি রুপা হয়। আর বিশ দিনারে হয় প্রায় ৮৫ গ্রাম বা সাড়ে সাত ভরি সোনা।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সোনা ও রুপা, এই দুধরনের মুদ্রার মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে যেসব মুদ্রা চালু আছে, তা সব সোনা-রুপার হিসাবে পরিমাপ করতে হবে। সুতরাং প্রচলিত মুদ্রা যদি সোনা বা রুপার কোনো একটির নিসাবের সমপরিমাণ মূল্যের হয়, তাহলে তাতে এক-চল্লিশাংশ হিসাবে জাকাত আবশ্যক হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের টাকা-পয়সাগুলো সোনা-রুপার স্থলাভিষিক্ত হবে।

বর্তমানের প্রচলিত মুদ্রার মূল্য সোনা বা রুপার যেকোনো একটি নিসাবের সমমূল্যের পরিমাণ হলেই জাকাত আবশ্যক হয়ে যাবে। উভয়টির মধ্যে যেটি আগে মিলবে, সেটির সাথে মূল্য হিসাব করবে। বর্তমান সময়ে যেহেতু সাড়ে বায়ান্নো ভরি রুপার চেয়ে সাড়ে সাত ভরি সোনার দাম বেশি, তাই মুদ্রার হিসাব রুপার নিসাবের সাথে করতে হবে, সোনার সাথে নয়। সুতরাং কারও কাছে যদি সাড়ে বায়ান্নো ভরি রুপার বাজারমূল্য পরিমাণ নগদ ক্যাশ থাকে, তাহলে বলা হবে, তার ওপর জাকাত আবশ্যক হয়ে গেছে।

ব্যবসার জাকাত

ব্যবসায়িক সম্পদের ওপর জাকাত দিতে হয়। অর্থাৎ যেসব পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সেগুলোর জাকাত দিতে হবে। তবে শর্ত হলো, এক বছর পূর্ণ হতে হবে এবং নিসাব পরিমাণ হতে হবে। ব্যবসা যদি সোনার হয়ে থাকে, তাহলে সোনার নিসাব তথা সাড়ে সাত ভরি পরিমাণ সোনা থাকলে জাকাত আবশ্যক হবে, এর কম থাকলে নয়। আর যদি রুপার ব্যবসা হয়, তাহলে রুপার নিসাব তথা সাড়ে বায়ান্নো ভরি রুপা থাকলে জাকাত

৮৩২. সুনানু আবি দাউদ : ২/১০০-১০১, হা. নং ১৫৭৩ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

আবশ্যক হবে, এর কম থাকলে নয়। আর ব্যবসায়িক পণ্য যদি সোনা-রুপা ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী হয়, তাহলে সেগুলো মূল্য হিসাব করে সোনা বা রুপার মধ্যে কোনো একটি নিসাবের মূল্যের সমপরিমাণ হলে তার জাকাত দিতে হবে, অন্যথায় নয়। আর পূর্বে গত হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে রুপার নিসাবের মূল্য হিসাব করবে, সোনার নিসাবের মূল্যের নয়। সুতরাং সোনা-রুপা ছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য যদি সাড়ে বায়ান্নো ভরি রুপার সমমূল্যের হয়, তাহলেই তার ওপর জাকাত আবশ্যক হয়ে যাবে।

ব্যবসার সম্পদ স্থাবর, অস্থাবর যে ধরনেরই হোক না কেন, তাতে গরিব ও অসহায়দের একটি অংশ নির্ধারিত হয়ে যায়। সামুরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিক্রির জন্য রাখা পণ্যের জাকাত দেওয়ার নির্দেশ দিতেন।'[৮৩৩]

নিসাব পরিপূর্ণ হওয়ার সময়

বছরের শুরু ও শেষ সময় নিসাব পূর্ণ থাকলেই যথেষ্ট। বছরের মাঝামাঝি সময়ে নিসাব অসম্পূর্ণ থাকলে সমস্যা নেই। মোটকথা, নিসাবের মালিক হওয়ার দিন থেকে বছরের শেষদিন পর্যন্ত সারাবছর নিসাব পূর্ণ থাকা আবশ্যক নয়। বছরের মাঝ দিয়ে লস বা বিভিন্ন কারণে নিসাব কমে গেলেও বছরের শেষ দিন যদি আবার নিসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে শেষদিন যে পরিমাণ অর্থ বা পণ্য হাতে থাকবে, সে পরিমাণেরই জাকাত দিতে হবে। তা বছরের শুরু সময়ের অর্থ বা পণ্যের চেয়ে কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে আবার সমান সমানও হতে পারে।

৮৩৩. সুনানু আবি দাউদ : ২/৯৫, হা. নং ১৫৬২ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

গবাদি পশু দ্বারা এখানে শুধু তিন ধরনের পশু উদ্দেশ্য। যথা : উট, গরু ও ছাগল। এ তিন ধরনের পশু ছাড়া অন্য কোনো পশুর ওপর কোনো জাকাত নেই। হ্যাঁ, যদি সেগুলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে কেনা হয়, তাহলে সেগুলোর ওপর ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে জাকাত আসবে। সেগুলোর জন্য গবাদি পশুর নিসাব বা শর্ত প্রযোজ্য নয়।

গবাদি পশুর জাকাত আবশ্যক হওয়ার জন্য আলাদা শর্ত, আলাদা নিসাব। শর্ত হলো পশু সায়িমা হতে হবে। সায়িমা না হলে যত পশুই থাকুক না কেন, তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। শরিয়তের পরিভাষায় যেসব পশু বছরের অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে ঘুরে ঘুরে ঘাস খায়, বছরের বেশিরভাগ সময় যার আলাদা করে খাওয়ার খরচ বহন করতে হয় না, তাকে সায়িমা পশু বলে। সাধারণত সায়িমা পশু দুধ খাওয়ার জন্য এবং তাদের বাচ্চা হওয়ার জন্য পালা হয়। সুতরাং যেসব পশুকে বছরের অধিকাংশ সময় নিজের খরচে ঘাস-পানি খাওয়াতে হয় কিংবা সেগুলোকে কাজকর্ম ও বহনের জন্য খাটানো হয়, সেগুলোর ওপর জাকাত আসবে না।[৮৩৪]

আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ

'যে পশুকে কাজে-কর্মে খাটানো হয়, তাতে কোনো কিছু অর্থাৎ দেওয়া লাগবে না।'[৮৩৫]

আর গবাদি পশুর নিসাবও অনেকটা ভিন্ন। উটের জন্য এক নিসাব, গরুর জন্য এক নিসাব এবং ছাগলের জন্য এক নিসাব। আমরা প্রত্যেকটি নিসাবকে ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করছি।

৮৩৪. আল-জাওহারাতুন নাইয়ারা : ১/২১২ (আল মাতবাআতুল খাইরিয়্যা)
৮৩৫. সুনানু আবি দাউদ : ২/১০০, হা. নং ১৫৭২ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

উটের নিসাব

উটের জন্য সর্বনিম্ন নিসাব হলো পাঁচটি সায়িমা উট। এর কমে কারও উট থাকলে তার ওপর জাকাত আবশ্যক হবে না। সুতরাং যদি উট পাঁচটি থেকে নয়টি পর্যন্ত হয়, তাহলে তাতে একটি ছাগল জাকাত হিসাবে দিতে হবে। যদি দশটি থেকে চৌদ্দটি পর্যন্ত হয়, তাহলে তাতে দুটি ছাগল দিতে হবে। যদি পনেরোটি থেকে উনিশটি পর্যন্ত হয়, তাহলে তাতে তিনটি ছাগল দিতে হবে। আর যদি বিশটি থেকে চব্বিশটি পর্যন্ত হয়, তাহলে তাতে চারটি ছাগল দিতে হবে। আর যদি উট পঁচিশটি হয়ে যায়, তাহলে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত তাতে একটি বিনতে মাখাজ (এক বছর শেষ করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উটের মাদি বাচ্চা) দিতে হবে। এরপর ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি বিনতে লাবুন (দুবছর শেষ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উটের মাদি বাচ্চা) দিতে হবে। এরপর ছেচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত একটি হিক্কা (তিন বছর শেষ করে চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উটের বাচ্চা) দিতে হবে। এরপর একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জাজাআ (চার বছর শেষ করে পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উটের বাচ্চা) দিতে হবে। এরপর ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত দুটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। এরপর একানব্বই থেকে একশ বিশ পর্যন্ত দুটি হিক্কা দিতে হবে। বিস্তারিত ফিকহের কিতাবে দ্রষ্টব্য।[৮৩৬]

এ ব্যাপারে আবু বকর ﷺ থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার কিয়দাংশ উল্লেখ করা হলো। তিনি পত্রে লিখেছেন :

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ، فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ

৮৩৬. বাদায়িউস সানায়ি : ২/২৬-২৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ،

'এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মুসলিমদের ওপর ধার্যকৃত জাকাতের নিসাব, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর ফরজ করেছেন। অতএব, যে মুসলমানের কাছ থেকে জাকাতের জন্য তা চাওয়া হবে, সে যেন তা দান করে। যদি কারও কাছে অতিরিক্ত চাওয়া হয়, তাহলে সে যেন নিসাবের অতিরিক্ত দান না করে। যদি কারও চব্বিশটি পর্যন্ত উট থাকে তাহলে সে প্রতি পাঁচটিতে একটি করে ছাগল দেবে। আর যদি পঁচিশটি উট হয়, তাহলে পঁয়ত্রিশটি পর্যন্ত উটের জন্য একটি বিনতে মাখাজ (এক বছর শেষ করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উটের মাদি বাচ্চা) দেবে। আর যদি বিনতে মাখাজ না থাকে, তাহলে ইবনে লাবুন (দুবছর শেষ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উটের নর বাচ্চা) দেবে। ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত উটের জন্য একটি বিনতে লাবুন (দুবছর শেষ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উটের মাদি বাচ্চা) দেবে। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত হলে আরোহণের উপযোগী একটি হিক্কা (তিন বছর শেষ করে চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উটের বাচ্চা) দেবে। উটের সংখ্যা একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত হলে একটি জাজাআ (চার বছর শেষ করে পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উটের বাচ্চা) দেবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হলে দুটি বিনতে লাবুন দেবে। উটের সংখ্যা একানব্বই থেকে একশ বিশ পর্যন্ত হলে আরোহণের উপযোগী দুটি হিক্কা দেবে।

এরপর উটের সংখ্যা একশ বিশ অতিক্রম করলে প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হিক্কা দেবে।'[৮৩৭]

গরুর নিসাব

সর্বনিম্ন ত্রিশটি সায়িমা গরু থাকলে জাকাত দিতে হবে। যদি কারও ত্রিশটির কম গরু থাকে, তাহলে তার ওপর কোনো জাকাত আসবে না। সুতরাং ত্রিশটি থেকে উনচল্লিশটি সায়িমা গরু থাকলে তাতে একটি তাবি বা একটি তাবিয়া (এক বছর বয়সের গরুর নর বা মাদি বাছুর) দিতে হবে। আর যদি চল্লিশটি হয়, তাহলে তাতে একটি মুসিন্না (দুবছর বয়সের নর বা মাদি বাছুর) দিতে হবে। এরপর উনষাটটি পর্যন্ত অতিরিক্ত আর অন্য কিছু দিতে হবে না। ষাটটি হলে তাতে দুটি তাবি দিতে হবে। সত্তরটি হলে একটি তাবি ও একটি মুসিন্না দিতে হবে। এভাবে প্রত্যেক দশে জাকাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

মুআজ বিন জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

'যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁকে প্রতি ত্রিশটি গরু থেকে একটি তাবি বা একটি তাবিয়া তথা এক বছর বয়সের বাছুর বা বকনা এবং প্রতি চল্লিশটি গরু থেকে একটি মুসিন্না তথা দুবছর বয়সের বাছুর গ্রহণ করতে বলেছেন।'[৮৩৮]

ছাগলের নিসাব :

সর্বনিম্ন চল্লিশটি ছাগল থাকলে জাকাত ওয়াজিব হয়। এর কমে ছাগলের ওপর কোনো জাকাত নেই। সুতরাং চল্লিশ থেকে একশ বিশ পর্যন্ত একটি

৮৩৭. সুনানু আবি দাউদ : ২/৯৬-৯৭, হা. নং ১৫৬৭ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

৮৩৮. সুনানুন নাসায়ি : ৫/২৬, হা. নং ২৪৫২ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

ছাগল দিতে হবে। একশ একুশ থেকে দুইশ পর্যন্ত দুটি ছাগল দিতে হবে। দুইশ এক থেকে তিনশ পর্যন্ত তিনটি ছাগল দিতে হবে। এর পরে প্রত্যেক একশর মধ্যে একটি করে ছাগল দিতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ

'যদি সায়িমা ছাগল চল্লিশ থেকে একশ বিশ পর্যন্ত হয়, তাহলে তাতে একটি ছাগল জাকাত হিসাবে দিতে হবে। এরপর ছাগল একশ একুশ থেকে দুইশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে তাতে দুটি ছাগল জাকাত দিতে। এরপর ছাগল দুইশর বেশি হলে তিনশটি পর্যন্ত তিনটি ছাগল জাকাত দিতে হবে। আর তিনশর পর প্রত্যেক একশ ছাগলের মধ্যে একটি করে ছাগল জাকাত দিতে হবে।'[৮৩৯]

ফসল ও ফলফলাদির জাকাত

জমিনে উৎপাদিত যে সকল ফসল মানুষ প্রতিনিয়ত ভক্ষণ করে বা গুদামজাত করে রাখে, সেগুলোতে জাকাত তথা ওশর দেওয়া ওয়াজিব। চাই তা গম, খেজুর, জব, ফলফলাদি অথবা এ জাতীয় অন্য কিছু হোক।

সালিম বিন আব্দুল্লাহ ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي وَالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

৮৩৯. সুনানু আবি দাউদ : ২/৯৭, হা. নং ১৫৬৭ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

'যেসব জমি বৃষ্টির পানি, খাল-বিল ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়েছে কিংবা যে জমিতে সেঁচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাতে ওশর তথা দশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। আর যেসব জমি উট বা বালতি দ্বারা বা যান্ত্রিক উপায়ে সেচপ্রাপ্ত হয়, সেগুলোতে ওশরের অর্ধেক তথা উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে।'[৮৪০]

উল্লিখিত হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, যেসব জমি নদী, বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় এবং তাতে তেমন কোনো আর্থিক বা শারীরিক কষ্টের প্রয়োজন হয় না, সে সকল জমির জাকাত হলো দশ ভাগের এক ভাগ। আর যে সকল জমিতে মালিকের শ্রম দিতে হয় এবং সিঞ্চনের জন্য তার অর্থ খরচ হয়, সেগুলোতে বিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে।

ফসল ও ফলের নিসাব

১. আবু হানিফা ؒ-এর মতে, ফসলের জাকাতের জন্য কোনো বিশেষ নিসাবের প্রয়োজন নেই। উৎপাদিত ফসল ও ফল কম হোক বা বেশি, তার জাকাত তথা ওশর দিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।'[৮৪১]

এ আয়াতে জাকাত ও ওশরের কথা বলা হয়েছে। আয়াতের মধ্যে مِمَّا أَخْرَجْنَا [যা আমি উৎপন্ন করেছি] কথাটি ব্যাপক। এতে কোনো পরিমাণ

৮৪০. সুনানুন নাসায়ি : ৫/৪১, হা. নং ২৪৮৮ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

৮৪১. সুরা আল-বাকারা : ২৬৭

উল্লেখ নেই। তাই কম হোক বা বেশি—সর্বাবস্থায় ফসলের ওশর আদায় করতে হবে। অনুরূপ পূর্বোল্লিখিত হাদিসেও কোনো পরিমাণ উল্লেখ করা ছাড়া ওশর আদায়ের কথা এসেছে।

২. জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, ফসলের জাকাতের জন্য তা নিসাব পরিমাণ হতে হবে। আর নিসাব হলো পাঁচ অসাক।[৮৪২]

আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

'পাঁচ অসাকের কমে হলে কোনো জাকাত (ওশর) নেই।'[৮৪৩]

অসাকের পরিমাণ :

এক অসাকে হয় ষাট সা'। সুতরাং পাঁচ অসাকে হবে তিনশ সা'। এক সা' সমান তিন কেজি একশ পঁচাশি গ্রাম হলে, তিনশ সা' হবে—তেইশ মন সাড়ে পঁয়ত্রিশ কেজি। এই পরিমাণ শস্য বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হলে দশ ভাগের এক ভাগ জাকাত ফরজ। আর নিজে কষ্ট-পরিশ্রম ব্যয় করে ও পানি সেচ দিয়ে উৎপাদন করলে বিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত ফরজ।

জাকাত আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি

ইসলামি রাষ্ট্র জাকাত আদায়ের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি গিয়ে নিসাবের মালিকদের কাছ থেকে জাকাত আদায় করবে, চাই তা স্বেচ্ছায় হোক কিংবা জোর করে হোক। এ প্রসঙ্গে হাদিসের ভাষ্য অত্যন্ত কঠোর।

বাহাজ বিন হাকিম ﷺ তার পিতা সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

৮৪২. আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব : ৫/৪৫৮ (দারুল ফিকর, বৈরুত)
৮৪৩. সহিহুল বুখারি : ২/১০৭, হা. নং ১৪০৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا - فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিদানের আশায় তা স্বেচ্ছায় দেবে, তার জন্য প্রতিদান রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করবে, আমি তার সম্পদের ভালো অংশ নিয়ে নেব; আমাদের প্রভুর অধিকারসমূহের একটি অধিকার হিসাবে। এ থেকে সামান্য পরিমাণও মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের জন্য হালাল নয়।'[৮৪৪]

হাদিসে বর্ণিত وَشَطْرَ مَالِهِ শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে এদ্বারা সম্পদের একটি অংশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জাকাত দিতে অস্বীকার করায় জরিমানাস্বরূপ তার থেকে কিছু সম্পদ নেওয়া হবে। কারও মতে এর ব্যাখ্যা হলো, তার জাকাতযোগ্য সম্পদকে দুভাগে ভাগ করা হবে। তারপর সদকা উত্তোলনকারী তা থেকে উত্তম ভাগটি বেছে নিয়ে আসবে। এটি জাকাত দিতে অস্বীকার করার কারণে শাস্তি। আর কারও মতে এ বিধানটি ইসলামের শুরু যুগে ছিল, পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।[৮৪৫]

জাকাতের খাতসমূহ

জাকাতের অর্থ যাকে তাকে দিলে হবে না; বরং এর জন্য শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কিছু খাত আছে। এ নির্দিষ্ট খাতগুলো ছাড়া অন্য কোথাও জাকাতের অর্থ দান করলে জাকাত আদায় হবে না। এ খাত মোট আটটি শ্রেণিতে বিভক্ত।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

৮৪৪. সুনানু আবি দাউদ : ২/১০১, হা. নং. : ১৫৭৫ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া, হালব) - হাদিসটি হাসান।
৮৪৫. আওনুল মাবুদ : ৪/৩১৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'জাকাত কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথের মুজাহিদদের জন্য ও মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।'[৮৪৬]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একজন লোক এসে সদকা চাইলে তিনি বললেন :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জাকাতের ব্যাপারে নবি বা অন্য কারও ভাগ-বন্টনেই সন্তুষ্ট নন; বরং তিনি নিজেই একে মোট আটটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং তুমি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকো, তবে আমি তোমাকে জাকাত দেবো।'[৮৪৭]

* জাকাতের আটটি খাত সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. ফকির

ফকির হলো, যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই। আমাদের দেশীয় পরিভাষায় ফকির বলতে যাদের বুঝানো হয়ে থাকে, শরিয়তের পরিভাষা তার চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। শরিয়তের পরিভাষায় নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে তাকে ফকির বলা হয়। আর দেশীয় পরিভাষায় সাধারণত ভিক্ষুকদের ফকির বলে মনে করা হয়। অথচ অনেক ফকির এমনও আছে, যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লক্ষাধিক টাকা জমা আছে। এসব লোক দেশীয় পরিভাষায়

৮৪৬. সুরা আত-তাওবা : ৬০

৮৪৭. সুনানু আবি দাউদ :২/১১৭, হা. নং. : ১৬৩০(আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

ফকির হলেও শরিয়তের পরিভাষায় ফকির নয়। তাই এদের জাকাত দিলে জাকাত আদায় হবে না। জাকাত দেওয়ার আগে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে, সে প্রকৃত অর্থে শরিয়তের পরিভাষায় ফকিরের অন্তর্ভুক্ত কিনা। অন্যথায় জাকাত আদায় অশুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে।

২. মিসকিন

মিসকিন ফকিরের মতোই নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। ফকির মানুষের নিকট ভিক্ষা ও সাহায্য চায়, কিন্তু মিসকিন বেচারা কষ্টে থাকলেও আত্মমর্যাদাবোধের কারণে মানুষের নিকট হাত পাতে না। এ জন্য তুলনামূলকভাবে ফকিরদের চেয়ে মিসকিনরা অধিক কষ্ট ভোগ করে থাকে। অবশ্য মর্যাদার দিক থেকে ফকিরের চেয়ে মিসকিনের অবস্থান অনেক উন্নত। জাকাত দেওয়ার সময় ফকিরদের তুলনায় মিসকিনদের খুঁজে খুঁজে জাকাত দেওয়াটা বেশি উত্তম। কারণ, এরা কারও কাছে জাকাতের অর্থ চায় না; অথচ তারা কষ্টে দিনাতিপাত করে।

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ. قَالُوا، فَمَا الْمِسْكِينُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

'মিসকিন সে নয়, যে মানুষের নিকট ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা চায়, যাকে এক বা দু'লোকমা খাবার কিংবা একটি বা দুটি খেজুর দিয়ে দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাহলে মিসকিন কে? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, মিসকিন হলো, যে অর্জনের উপায় করতে পারে না, তাদের দারিদ্র্য বুঝতেও দেয় না, যদ্দরুন তাদের কিছু সদকা করা হবে। এরা মানুষের নিকট কিছু চায়ও না।'[৮৪৮]

৮৪৮. সহিহ মুসলিম : ২/৭১৯, হা. নং ১০৩৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

দেওয়ার পরিমাণ ও ধরন :

আলিমদের মতে তাদের সে পরিমাণ দেওয়া হবে, যাতে তার ও তার পরিবারের এক বছরের ভরণপোষণ হয়। যেহেতু জাকাত ফরজ হওয়ার একটি শর্ত হলো এক বছর ঘুরে আসা। তাই ফকির ও মিসকিনদের দেওয়ার পরিমাণও এক বছরের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। আমরা চাইলে, তাদের খাবার ও কাপড় ক্রয় করে দিতে পারি বা অর্থ দিয়ে দিতে পারি, যেন তারা তাদের প্রয়োজনমতো কিনে নিতে পারে। অথবা যদি তারা উত্তম কারিগর হয়ে থাকে, তবে তাদের যন্ত্রাদি কিনে দিতে পারি, যা দিয়ে তারা প্রয়োজনীয় বস্তু বানিয়ে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

ইমাম আবু হানিফা ﷺ-এর মতে তাদের এত বেশি দেওয়া যাবে না, যদ্দরুন তাদের ওপরই জাকাত ফরজ হয়ে যায়। অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদের চেয়ে কম দিতে পারবে। এর বেশি দিলেও জাকাত আদায় হবে, তাবে তা মাকরুহ বলে গণ্য হবে।

৩. জাকাতের কর্মচারী

এ খাতের আওতায় পড়বেন জাকাত উত্তোলনকারী, জাকাত বণ্টনকারী, এ কাজে নিয়োজিত লেখক ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ। সংগতভাবেই তারা তাদের এ কাজের জন্য প্রাপ্য। তবে তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটাত্মীয় ও বংশীয় কেউ হতে পারবে না। যেহেতু তাদের জন্য জাকাতের বস্তু গ্রহণ হারাম। তাই তাদের কেউ এ খাতের অন্তর্ভুক্ত হলেও জাকাত থেকে কোনো অংশ পাবে না।[৮৪৯]

পরিমাণ ও ধরন :

'তাদের নিজ কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। তারা ধনী হলেও এ সম্পদ খেতে পারবে। কেননা, তাদেরকে তাদের কাজের জন্য দেওয়া হচ্ছে, দারিদ্র্যের জন্য নয়। আর যদি কর্মচারীদের কেউ ফকির বা মিসকিন হয়ে থাকে, তবে তাদের এক বছরের ভরণপোষণ দেওয়া উচিত। কেননা, তার

৮৪৯. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/১৪৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

মাঝে দুটি গুণই একত্রিত হয়েছে। প্রথমত, সে জাকাতের কর্মচারী আর দ্বিতীয়ত, তার মাঝে দারিদ্র্য রয়েছে। এখন তার উভয় বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে এ পরিমাণ জাকাত দিয়ে দেবে। উদাহরণত সে কর্মচারী হিসাবে পেত দুহাজার টাকা। আর তার সারা বছরের ভরণপোষণ বাবদ ব্যয় হয় দশ হাজার টাকা। এমতাবস্থায় তাকে আট হাজার টাকা তার দারিদ্র্যের জন্য এবং দুহাজার টাকা তার বেতন বাবদ দেবে।'[৮৫০]

৪. ইসলামের প্রতি অনুরাগী অমুসলিম

ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য লোকদের জাকাতের অংশ থেকে প্রদান করা যাবে। হতে পারে এমন কাফির, যার ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়, অথবা দুর্বল ইমানদার, যাকে অর্থ-সম্পদ দিলে তার ইমান শক্তিশালী হবে, অথবা এমন দুষ্ট লোক, যাকে দিলে মুসলিমদের অনিষ্ট করা থেকে সে বিরত থাকবে, কিংবা এমন কোনো শ্রেণি, যাকে আকৃষ্ট করলে মুসলিমদের উপকার হবে।

বর্তমানে এ খাতের অস্তিত্ব আছে কিনা?

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে সফওয়ান বিন উমাইয়া ﷺ-কে এভাবে দেওয়া হয়েছিল। হুনাইনের সময় তাকে গনিমতের অংশ দেওয়া হয় এবং তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পরে এ খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় হবে কিনা, এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে।

প্রথম মতে, এ খাতে জাকাতের সম্পদ ব্যয় করা হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও তার ধারক-বাহকদের সম্মানিত করেছেন, তাদের ক্ষমতা দিয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং ইসলামের এখন আর কারও মনোতুষ্ট করা প্রয়োজন নেই। এ মতের প্রবক্তারা বলেন, ইসলাম যেহেতু সর্বদা বিজয়ী থাকবে, বিধায় তাদের জাকাত দেওয়ার অর্থ ইসলামের মুখাপেক্ষিতা স্বীকার করে নেওয়া। যেমন একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

৮৫০. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি উসাইমিন : ১৮/৩৩২ (দারুল ওয়াতন)

الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى

'ইসলাম উঁচু ও বিজয়ী থাকবে, সে কখনো নীচু ও পরাজিত হবে না।'[৮৫১]

দ্বিতীয় মতে, এ খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। কেননা, মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পরও রাসুলুল্লাহ ﷺ এ খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় করেছেন। আর এটি এমন বিষয়, যা কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করার কোনো মানে হয় না। এর প্রয়োজন বিভিন্ন সময় হতে পারে। তাই মুসলিমদের খলিফা যদি কোনো অমুসলিমের মাঝে কল্যাণের ছায়া দেখতে পায়, যদি তাকে অর্থ দেওয়ার দ্বারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা যায়, তাহলে এর অনুমতি আছে।'[৮৫২]

পরিমাণ ও ধরন :

এ খাতের সম্পদ কি শুধু কোনো সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় নেতাকে দেওয়া শর্ত নাকি সাধারণ লোকদেরও দেওয়া যাবে? এ প্রশ্ন আসার কারণ হলো, যে নেতার আনুগত্য করা হয় তাকে দেওয়া ও তাকে আকৃষ্ট করার মাঝে ব্যাপক কল্যাণ হয়ে থাকে। অন্যদিকে কোনো নব মুসলিমকে আকৃষ্ট করার জন্য ব্যয় করা হলে তার ইমান শক্তিশালী হবে।

এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে, তবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতটি হলো, সাধারণ কোনো ব্যক্তির ইমানকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে দিলেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা, কুরআনে ব্যবহৃত وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ শব্দটি ব্যাপক। এতে নেতা আর সাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। যদি কোনো ফকিরের পার্থিব প্রয়োজনের কারণে তাকে জাকাতের সম্পদ দেওয়া যায়, তবে তো একজনের ইমানকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ, শরীরকে আহার জোগানোর চেয়েও ইমান শক্তিশালী করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

---

৮৫১. আল-আহাদিসুল মুখতারা : ৮/২৪০, হা. নং ২৯১ (দারু খাজির, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

৮৫২. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/১৪৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

এ চার প্রকার মানুষকে জাকাতের অংশ দেওয়া হবে تمليك (তামলিক) তথা মালিক বানিয়ে দেওয়ার ভিত্তিতে। তাদের সে সম্পদের পূর্ণ মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়। উপযুক্ত কাউকে জাকাত দেওয়ার পর যদি অন্য কোনো মাধ্যমে তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় কিংবা কোনোভাবে সে ধনী হয়ে যায়, তাহলে এদ্দরুন তাদের জাকাতের অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে না। কারণ, বৈধভাবে জাকাত গ্রহণের মাধ্যমে সে এ অর্থগুলোর পূর্ণ মালিক হয়ে গেছে। তাই পরবর্তী সময়ে তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটলে এতে তার মালিকানা বিনষ্ট হয়ে যাবে না।

উদাহরণত একজন ফকিরকে তার এক বছরের ভরণপোষণ বাবদ দশ হাজার টাকা দেওয়া হলো। তারপর আল্লাহর রহমতে সে বছরের মাঝামাঝি সময়েই সচ্ছল হয়ে গেল অথবা কোনো নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পর ওয়ারিস হিসাবে কিছু পেয়ে অথবা বড় অঙ্কের কোনো উপহার পেয়ে সে আর জাকাতের মালের প্রতি নির্ভরশীল থাকল না; অথচ এখনো তার নিকট জাকাতের মালের কিছু টাকা রয়ে গেল। সুতরাং এমন কিছু হলেও তাকে আর সে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে না। কারণ, তাকে এর পরিপূর্ণ মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৮৫৩]

৫. গোলাম আজাদকরণ

গোলাম আজাদকরণের তিনটি সুরত পাওয়া যায়।

ক. মুকাতিব গোলাম : যে নিজেকে আপন মনিবের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেওয়ার চুক্তি করেছে, তাকে মুকাতিব গোলাম বলে। এ ধরনের গোলামকে জাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য করা যাবে।

খ. সাধারণ গোলাম : যে গোলাম মনিবের সাথে স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ নয়। জাকাতের সম্পদ দিয়ে এরকম গোলামকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেওয়া যাবে।

---

৮৫৩. মাজমু ফাতাওয়া ইবনি উসাইমিন : ১৮/৩৩৩-৩৩৪ (দারুল ওয়াতন)

গ. মুসলিম বন্দী : কাফিরদের হাতে বন্দী কোনো মুসলিমকে আজাদকরণে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। এমনিভাবে যদি কোনো মুসলিমকে অপহরণ করা হয়, তখন অপহরণকারী মুসলিম হোক বা কাফির—সর্বাবস্থায় জাকাতের মাল দ্বারা উক্ত অপহৃত মুসলিমকে মুক্ত করা হবে। এখানে জাকাতের খাত থেকে অর্থ ব্যয়ের কারণ হলো, অপহৃত মুসলিমকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা। অপহরণকারী মুসলিম কি কাফির তা বিবেচ্য নয়।

পরিমাণ ও ধরন :

গোলাম আজাদের জন্য তাকে পরিমিত অর্থ দেওয়া যাবে। তবে একদিনে জাকাতের নিসাব পরিমাণ অর্থ না দেওয়া; বরং একাধিক দিনে ভাগ ভাগ করে তার হাতে অর্থ পৌঁছানো উচিত। অর্থ সরাসরি গোলামের হাতেও দেওয়া যায়, অনুরূপ তার মনিবের হাতেও দেওয়া যায়। যার কাছে দিলে মুক্তি বেশি তাড়াতাড়ি হবে, তার হাতে দেওয়াই উত্তম।

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি

উলামায়ে কিরাম একে দুভাবে ভাগে ভাগ করেছেন। এক. মীমাংসাকারী। দুই. ঋণী।

ক. মীমাংসাকারী : দুটি মুসলিম দল বা ব্যক্তি বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। তারপর যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী একজন ব্যক্তি এগিয়ে এসে অর্থ প্রদানের কথা বলে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিল। তখন আমরা এ মীমাংসাকারীকে জাকাতের অর্থের টাকা দিতে পারব। যেন তিনি এ অর্থ মীমাংসার অর্থ হিসাবে তাদের প্রদান করেন, তার নিজের জন্য নয়। মীমাংসাকারী ধনী হলেও এ ঋণের জন্য তাকে জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে। কারণ, তাকে অর্থ দেওয়া হচ্ছে মুসলিমদের দুটি দল বা ব্যক্তির বিবাদ মিটানো এবং শত্রুতার অবসান ঘটানোর জন্য।

খ. ঋণকারী : যে নিজের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ঋণ করেছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে মানুষ ঋণগ্রস্ত হলে তাকে জাকাত দেওয়া যাবে। তাকে

জাকাত দেওয়ার কারণ হলো, তার এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে, সে ঋণ পরিশোধ করার সক্ষমতা রাখে না।

পরিমাণ ও ধরন :

ঋণের পরিমাণ মতো তাকে জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে। আরেকটি বিষয় খেয়াল করতে হবে যে, এখানে ঋণ বলতে শুধু মীমাংসার জন্য কৃত ঋণ বা নিজ জরুরত পূরণের জন্য কৃত ঋণ উদ্দেশ্য। এ ছাড়া যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ঋণ করা হয়, যেমনটি বর্তমান সময়ের অনেক শিল্পপতিরা করে থাকে, তাদের ঋণ পরিশোধের জন্য জাকাত দেওয়া যাবে না। কারণ, তা তার প্রয়োজনীয় ঋণ নয়; বরং ধনাঢ্যের রাস্তায় উন্নত হওয়ার ঋণ, তাই তাকে জাকাত দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

এখন বিষয় হলো, আমরা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হাতে জাকাতের সম্পদ দেবো নাকি ঋণদাতার নিকট দেবো? এর উত্তরে বলা যায়, বিষয়টি ঋণগ্রস্তের স্বভাব-চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। যদি সে তার ঋণ আদায় করতে সচেষ্ট হয়ে থাকে এবং তার ওপর এমন আস্থা রাখা যায় যে, তাকে জাকাত দিলে সে নিজেই ঋণ পরিশোধ করবে, তবে তার হাতে জাকাতের অর্থ দিতে হবে। কারণ, এতে করে বিষয়টি তার জন্য অধিক গোপনীয় হবে এবং মানুষের সামনে তার হেয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিটি বিপরীত স্বভাবের হয়। অর্থাৎ অপচয়কারী ও সম্পদ বিনষ্টকারী হয়। যদি আমরা তাকে জাকাত দিয়েও থাকি, সে বাজারে গিয়ে প্রয়োজন ছাড়াই বিলাসিতা করার জন্য কিছু কিনে নিয়ে আসবে এবং নিজের ঋণ পরিশোধ করবে না, তাহলে আমরা অর্থটা তার হাতে দেবো না; বরং সরাসরি ঋণদাতার কাছে গিয়ে তার পক্ষ থেকে আমরা ঋণ পরিশোধ করে দেবো। এতে যেমন ঋণগ্রস্তও ঋণের বোঝা থেকে বাঁচল, তেমনই ঋণদাতাও নিজের অর্থ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেল।

৭. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা

এখানে আয়াতে فِي سَبِيلِ اللهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত মুজাহিদগণ, অন্য কোনো দল উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা বলতে অন্যান্য কল্যাণের পথকে উদ্দেশ্য করা যাবে না। তার কারণ হলো, যদি ব্যাপকভাবে সব কল্যাণের রাস্তাই এখানে উদ্দেশ্য হতো, তবে إِنَّمَا দ্বারা এ বিশেষ আট শ্রেণিকে সীমাবদ্ধ করার কোনো মানেই হয় না। তাই এ খাতের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত যোদ্ধাদের জন্য ব্যয় করতে হবে, যারা কালিমার পতাকাকে বুলন্দ করার জন্য লড়ে যাচ্ছেন। এখন আসুন, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ কী—তা জেনে নিই। এ বিষয়ে হাদিসে বর্ণিত হচ্ছে :

سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ : يُقَاتِلُ حَمِيَّةً ، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ জাতীয়তার জন্য, কেউ বীরত্বের জন্য কিংবা কেউ সম্মান অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে—এদের মধ্যে কে 'ফি সাবিলিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত? রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, যে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে, সেই আল্লাহর রাস্তায় আছে।'[৮৫৪]

সুতরাং দেশ রক্ষা, সম্মান অর্জন ও বীরত্বের জন্য লড়াইকারী মুজাহিদ নয়। এমন ব্যক্তিদের জাকাতের অর্থ হতে কোনো কিছুই দেওয়া যাবে না। অনুরূপ মাদরাসা, দ্বীনি কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা দলকেও জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, জাকাতের উপযুক্ত কোনো ফকির-মিসকিনকে জাকাতের অর্থ দেওয়ার পর সে যদি স্বেচ্ছায় কোনো প্রতিষ্ঠানকে দিতে চায়, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। মোটকথা, যুদ্ধরত মুজাহিদরা ছাড়া অন্য কল্যাণকর কাজে জড়িত ব্যক্তিরা জাকাতের এ খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই সরাসরি অন্যসব দল বা প্রতিষ্ঠানকে জাকাত দেওয়ার সুযোগ নেই, যেমনিভাবে মুজাহিদ দলকে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

---

৮৫৪. সহিহ মুসলিম : ৩/১৫১৩, হা. নং ১৯০৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

পরিমাণ ও ধরন :

মুজাহিদগণ যে সকল বস্তুর প্রয়োজনবোধ করেন, তাদের তা কিনে দেওয়া যেতে পারে। তা পরিমাণে যত বেশিই হোক না কেন। যেমন তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও রসদ কিনে দেওয়া যেতে পারে, যা দ্বারা তারা যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। আর যদি তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে ধারণা না থাকে, তাহলে তাদের হাতে জাকাতের অর্থ তুলে দিতে হবে। মোটকথা, তাদের সুবিধানুযায়ী দিতে হবে। যদি কিনে দেওয়ার মধ্যে বেশি লাভ থাকে, তাহলে কিনে দেবে, অন্যথায় তাদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেবে।

৮. মুসাফির

এমন মুসাফিরকেও এ অর্থ দেওয়া যাবে, সফররত অবস্থায় যার রসদ ফুরিয়ে গেছে, যদিও সে নিজ শহরে ধনী। তাকে এ কথা বলা যাবে না যে, সে এখন ঋণ করে নিক, পরে তা পরিশোধ করে দেবে। কিন্তু যদি সে নিজ থেকেই ঋণ করার ইচ্ছা করে এবং জাকাত থেকে কোনো কিছু নিতে না চায়, তবে নিতান্তই তা তার নিজের ইচ্ছা। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো শহরে সফর করতে চায়, অথচ তার সাথে সফর করার মতো তেমন টাকা-পয়সা না থাকে, তাকে সফরের জন্য খরচ দেওয়া যাবে।[৮৫৫]

পরিমাণ ও ধরন :

প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ নিজ শহরে ধনী ব্যক্তিকে তার অবস্থানস্থলে ফেরার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া যাবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জাকাতের মাল থেকে যাওয়া-আসা উভয়টার খরচ দেওয়া যাবে।

এখানে উল্লেখ করে দেওয়া দরকার যে, উল্লিখিত শ্রেণিগুলোকে জাকাত প্রদান করা কোনো সম্পদশালী বা অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির বদান্যতা, উদারতা বা দয়া-দাক্ষিণ্য নয়; বরং জাকাত এ সকল লোকের শরয়ি অধিকার। আর এ অধিকার সম্পদশালীদের দায়িত্বে রয়েছে মাত্র। তারা এর মালিক নয় যে, এর কারণে অনুগ্রহের কথা ভাববে।

---

৮৫৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/১৪৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

দুই. খারাজ

الخراج (আল-খারাজ) আভিধানিক অর্থে জমিনে উৎপাদিত ফসল।[৮৫৬]

পরিভাষায়, ما وضع على رقاب الارض من حقوق تؤدي عنها অর্থাৎ জমির ওপর যে নির্ধারিত প্রাপ্য ধার্য করা হয়, তাকে খারাজ বলা হয়।[৮৫৭]

খারাজের ভূমি মূলত জিহাদের মাধ্যমে দখলকৃত বা সন্ধির কারণে অমুসলিমদের হাত থেকে মুসলিমদের হাতে আসা ভূমি। এ ক্ষেত্রে ভূমিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত, যে ভূমি, সম্পূর্ণভাবে মুসলিমগণ আবাদ করেছেন। এ ধরণের ভূমি ওশরি হবে, খারাজি নয়। অর্থাৎ যে ভূমি কোনো মুসলিম আবাদ করেছে, তা তার মালিকানায় থাকবে। হাদিসের ভাষ্য হলো :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

'মালিকানাহীন কোনো অনাবাদি জমি যে মুসলিম আবাদ করল, তা তার মালিকানায়।'[৮৫৮]

দ্বিতীয়ত, যে ভূমির আবাদকারী অমুসলিম। এরপর সে ইসলাম কবুল করল। তাহলে সে-ই উক্ত জমির ব্যাপারে অধিক হকদার এবং সে-ই তার মালিক হবে। যেমন মদিনা, তায়েফ, ইয়ামান, বাহরাইন। এ ধরনের ভূমি শাফিয়ি মাজহাবে ওশরি ভূমি হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ﷺ-এর মতে রাষ্ট্রপ্রধান এ বিষয়ে অনুমতিপ্রাপ্ত যে, তিনি ওশরি ও খারাজির মধ্য হতে যেটার মাঝে মুসলিমদের অধিক কল্যাণ মনে করবেন, সে অনুসারেই ফয়সালা করবেন। সুতরাং যদি সে সকল ভূমি ওশরি ভূমির অন্তর্ভুক্ত করলে মুসলিমদের কল্যাণ অধিক হয়, তবে তাই করবে। আর ওশরি না রেখে যদি খারাজি ভূমির অন্তর্ভুক্ত করা হলে অধিক কল্যাণকর হয়, তবে তা খারাজি ভূমির অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা দেবে।

---

৮৫৬. আল-মুজামুল অসিত : পৃ. নং ২২৪ (দারুদ দাওয়াহ, ইসকানদারিয়া)
৮৫৭. আত-তারিফাত, জুরজানি : পৃ. নং ৯৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৮৫৮. সুনানু আবি দাউদ : ৩/১৭৮, হা. নং ৩০৭৩ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

তৃতীয়ত, মুসলিমগণ কাফিরদের থেকে যুদ্ধ করে যে ভূমি দখল করেছে, তা মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে না দেওয়া হলে সে সকল ভূমি মুসলমানদের সাধারণ মালিকানায় চলে যায়। যেমন ইরাক, মিসর, শাম ও এগুলোর আশপাশের অঞ্চলসমূহ, এমনিভাবে পারস্যের অনেক এলাকা।

এ ধরনের ভূমি তার পূর্বের মালিকদের মালিকানা থেকে বের হয়ে গেলেও জমিগুলো তাদের অধীনেই থাকবে, যেন তারা তাতে কর্মচারী ও চাষাবাদকারী হিসাবে কাজ করতে পারে। তারপর এসব জমিকে খারাজি ভূমির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রথমবার খারাজ ধার্য করা হয় উমর ফারুক ﷺ-এর সাথে উসমান ﷺ ও আলি ﷺ এবং অন্য একদল সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর, যাদের মধ্যে আছেন বিলাল ﷺ, জুবাইর ﷺ, আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ ও প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম। তাঁরা বলেছিলেন যে, যুদ্ধে বিজিত ভূমি পাঁচ ভাগ করা হবে। এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া হবে যোদ্ধাদের। আর বাকি সব হবে ইসলামি রাষ্ট্রের। কিন্তু উমর ﷺ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি থেকে বললেন, এ বিরাট ভূমি যোদ্ধাদের মাঝে ভাগ করে দিলে সম্পদকে সীমাবদ্ধকরণ হবে এবং তা কিছু মানুষের মাঝে পুঞ্জীভূত হয়ে যাবে। আগত প্রজন্ম এ থেকে বঞ্চিত হবে। সীমান্ত রক্ষায়, সীমান্তরক্ষীদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রে এ অর্থের প্রয়োজন পড়বে। শহর আবাদকরণ ও অবকাঠামো নির্মাণে, যেমন : পথ, সেতু, পুল, মসজিদ নির্মাণসহ বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য এ অর্থের প্রয়োজন পড়বে।

অতঃপর বিরোধিতাকারীদের সাথে উমর ﷺ-এর দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি কিতাবুল্লাহ থেকে নির্দেশনা বুঝতে পারেন, যেখানে বিজিত অঞ্চলে আগামী প্রজন্মের অংশের কথা সাব্যস্ত হয়েছে। সে সকল আয়াত হলো :

﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

'আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসুলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রাসুল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।'

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾

'এই ধন-সম্পদ হিজরতকারী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রাসুলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।'

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

'যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে। মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদের অগ্রাধিকার দান করে। আর যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

'আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং আমাদের পূর্বে ঈমান আনয়নকারী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং ইমানদারদের

বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।'[৮৫৯]

আল্লাহ তাআলার এ বাণীর কারণে আগামী প্রজন্মের জন্য এসব গনিমতের মাঝে অধিকার থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। উমর ﷺ এ আয়াতের আলোচনায় বলেন, এ আয়াতটি সকল মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, ফলে এতে সকল মুসলমানের হক রয়েছে।'[৮৬০] তারপর উমর ﷺ এ ধরনের ভূমিগুলোকে পূর্বের মালিকদের হাতে রেখে দেন, যেন তারা এতে কর্মচারী ও চাষাবাদকারী হিসাবে থাকে।

এটিই জমহুর আহলে ইলমের মত। তবে ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন, বিজিত ভূমি মালে গনিমতের অংশ। তা যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করা হবে। আয়াত অনুসারে তাকে পাঁচ ভাগ করতে হবে। যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে তা ছেড়ে দেয়, তবে তা সকল মুসলমানের কল্যাণে ব্যয় হবে।

ইমাম আবু হানিফা ﷺ-এর মতে, এ বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের স্বাধীনতা রয়েছে। তিনি মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর বলে যা মনে করবেন, সে অনুপাতেই ফয়সালা করবেন। যদি ভূমি বণ্টনের মাঝে কল্যাণ দেখেন, তবে তা-ই হবে। আর যদি তাতে কল্যাণ মনে না করেন, তবে পূর্বের মালিকদের হাতে রেখে তা খারাজি ভূমির অন্তর্ভুক্ত করবেন।

চতুর্থত, মুশরিকদের হাতে থাকা ভূমি সন্ধির মাধ্যমে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসলে এ ধরনের ভূমির হুকুম আগের প্রকারের ন্যায়। অর্থাৎ এসব জমি খারাজি হিসাবে বিবেচিত হবে। তারা জিজিয়া দেওয়ার সাথে সাথে এগুলোর খারাজও দেবে।

খারাজের ভূমিগুলো তাদের পূর্বের মালিকদের হাতেই থাকবে। এ ভূমিগুলোর প্রকৃত মালিক হবে ইসলামি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপক্ষ থেকে এসব ভূমির খারাজ উত্তোলন করা হবে। এর মাঝে সকল মুসলিমের হক থাকবে; চাই তারা সে ভূমি দখলকারী মুজাহিদ হোক বা তাদের পরে আগত মুসলিম প্রজন্ম হোক।

---

৮৫৯. সুরা আল-হাশর : ৭-১০
৮৬০. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/১০২-১০৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

রাষ্ট্রপ্রধানকে খারাজের পরিমাণ নির্দিষ্টকরণের বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তাকে দেখতে হবে জমিন উত্তমমানের নাকি নিম্নমানের? যে শস্য বা ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে, তার বিভিন্ন ধরন ও বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে দাম কী রকম হতে পারে? তেমনিভাবে জমিতে সেচ দেওয়ার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা, যে জমিতে কষ্ট করে পানি দিতে হয় আর যে জমিতে বৃষ্টির পানি বা এরকম কিছু দ্বারা ফসল হয়, উভয়ের খারাজ সমমানের নয়।[৮৬১]

তিন. ওশর

ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সীমান্ত পার হওয়া ব্যবসায়ীদের থেকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ আদায় করে থাকেন, তাকে ওশর বলা হয়। তা কখনো পণ্যের দশ ভাগের একভাগ, কখনো বিশ ভাগের একভাগ এবং কখনো চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। উমর ﵁-এর সিদ্ধান্ত থেকে এরকমই প্রমাণিত।

ইমাম আবু হানিফা ﵀ বলেন, দারুল ইসলাম থেকে মুসলিম ব্যবসায়ী দারুল হারবে গেলে যদি তারা শুল্ক নেয় তাহলে তাদের দেশ থেকে কোনো ব্যবসায়ী আমাদের দেশে এলে আমরাও তাদের থেকে ওশর বা শুল্ক নেব।[৮৬২]

একবার আবু মুসা আশআরি ﵁ তাঁর নিকট লিখে পাঠালেন, আমাদের মুসলিম ব্যবসায়ী ভাইয়েরা যখন দারুল হারবে যায়, তখন তারা মালের এক-দশমাংশ শুল্ক হিসাবে নিয়ে নেয়। উত্তরে উমর ﵁ লিখে পাঠান, তারা যেরকম মুসলিম ব্যবসায়ীদের থেকে নিয়ে থাকে আপনিও তাদের কাছ থেকে সেরূপ (এক-দশমাংশ) নিন। জিম্মিদের থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ আর মুসলিমদের থেকে (জাকাত হিসাবে) চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম নিন। আর দুইশ দিরহামের (তথা সাড়ে বায়ান্নো ভরি রুপার) নিচে কোনো জাকাত নেই।[৮৬৩]

৮৬১. আল-আহকামুস সুলতানিয়া : পৃ. নং ২৩০ (দারুল হাদিস, কায়রো)
৮৬২. আওনুল মাবুদ : ৮/২০৮ (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত)
৮৬৩. আল-খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ : পৃ. নং ১৪৮-১৪৯ (আল-মাকতাবুল আজহারিয়া)

এ মাসআলাতে আনাস বিন মালিক ﵁ উমর ﵁-এর ইজতিহাদ সম্পর্কে লিখেন, মুসলিমদের থেকে (জাকাত হিসাবে) প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম, জিম্মিদের থেকে প্রতি বিশ দিরহামে এক দিরহাম, আর যারা জিম্মি নয় এমন কাফির থেকে প্রতি দশ দিরহামে এক দিরহাম নেওয়া হবে।[৮৬৪]

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে :

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ

'ওশর ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ওপর ধার্যকৃত। মুসলিমদের ওপর ওশর প্রযোজ্য নয়।'[৮৬৫]

ইমাম কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ওশর আদায়কারী ব্যবসায়ীদের সীমান্ত পার হওয়ার সময় এ ওশর উত্তোলন করবে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বছরে একবারের বেশি উত্তোলন করবে না। বর্ণিত আছে যে, একবার এক বৃদ্ধ খ্রিষ্টান থেকে একই বছর দুবার ওশর নেওয়া হয়। তখন খ্রিষ্টানটি উমর বিন খাত্তাব ﵁-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার কর্মচারী আমার কাছ থেকে বছরে দুবার ওশর নিয়েছে।' উমর ﵁ বললেন, 'তার এমন করা উচিত হয়নি; বরং তা বছরে একবারই দিতে হয়।' সে বলল, 'আমি এক খ্রিষ্টানবৃদ্ধ।' উমর ﵁ বললেন, 'আমি একনিষ্ঠ বৃদ্ধ। এ ব্যাপারে আমি লিখে দিয়েছি।'

একজন ব্যবসায়ী যখন ওশর উত্তোলনকারীর নিকট দিয়ে একই সম্পদ বা মাল নিয়ে কয়েকবার গমন করে, তাতে দ্বিতীয়বার ওশর উত্তোলন করা লাগে না। কিন্তু যদি সে ব্যবসায়ী অন্য মাল নিয়ে আসা-যাওয়া করে, আগেরবার যার ওশর আদায় করা হয়নি, তবে এতেও ওশর আদায় করতে হবে।[৮৬৬]

এটি হলো ওই মুসলিমের মতো, যে ওশর উত্তোলনকারীর নিকট দিয়ে গমন করার সময় তার থেকে জাকাত আদায় করে নেওয়া হয়। তারপর সে

৮৬৪. আল-আমওয়াল, আবু উবাইদা : পৃ. নং ৬৪০ (দারুল ফিকর, বৈরুত)
৮৬৫. সুনানু আবি দাউদ : ৩/১৬৯, হা. নং ৩০৪৬ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।
৮৬৬. আল-আমওয়াল, আবু উবাইদা : পৃ. নং ৬৪৬ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

একই বছর দ্বিতীয়বার অন্য মাল নিয়ে সেখান দিয়ে গমন করে, যে মালের জাকাত আদায় করা হয়নি, তবে তার থেকে জাকাত নিয়ে নেওয়া হবে, দুটি গমনাগমন একই বছরে হলেও।

চার. ফাই

الفيء (আল-ফাইয়ু) এর অর্থ হলো, এমন ছায়া, যা সূর্যের কিরণকে দূর করে দেয়। এটি ফিরে আসা অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা الفيئة (আল-ফাইয়াতু) থেকে নির্গত। এমনিভাবে এটি গনিমত ও খারাজ অর্থেও ব্যবহৃত।[৮৬৭]

শরিয়তের পরিভাষায় ফাই বলা হয়, যে সম্পদ দ্বীনের শত্রুদের সাথে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা ব্যতীতই তাদের উচ্ছেদ বা তাদের ওপর জিজিয়া আরোপের মাধ্যমে আল্লাহ দান করেন।[৮৬৮]

এ সম্পদ রাসুলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের জন্য। জাকাতের সম্পদে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো অংশ ছিল না। তাঁর জীবদ্দশায় ফাইয়ের অর্থ থেকে তিনি নিজের ও তাঁর পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতেন। ফাইয়ের অর্থ থেকে যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকত, তা মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় হতো। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

'আল্লাহ ইহুদিদের কাছ থেকে রাসুলকে যে ফাই দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি। আল্লাহ তো তাঁর রাসুলদের যার ওপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব দান করেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[৮৬৯]

---

৮৬৭. আল-কামুসুল মুহিত : পৃ. নং ৪৮ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)
৮৬৮. আত-তারিফাত, জুরজানি : পৃ. নং ১৭০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৮৬৯. সুরা আল-হাশর : ৬

أَوْجَفَ এর অর্থ হলো, দ্রুত গতিতে চলা। এর দ্বারা কষ্ট, পরিশ্রম করা, দ্রুত গতিতে চলা, শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার প্রবণতা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। رِكَاب তথা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উটে আরোহণ করে। এ নসের মাঝে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, মুসলিমগণ ঘোড়া বা উটে আরোহী হয়ে বনু নাজিরের ইহুদিদের সাথে কিতাল ও তাদের ধাবিত করা ছাড়াই যে সম্পদ পেয়েছিলেন, সে সম্পদ হলো ফাই।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা সে সকল সম্পদের ক্ষেত্রে সর্বকালে ও সর্বস্থানে এ হুকুম আরোপিত হওয়ার ব্যাপারে বলেন :

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

'আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসুলের, রাসুলের স্বজনদের, এতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের; যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মধ্যেই ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়। রাসুল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।'[৮৭০]

সুতরাং বলা যায়, যুদ্ধ ও লড়াই ব্যতীত কাফিরদের থেকে পাওয়া সম্পদকে ফাই বলা হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সকল মুসলমানের জন্য তা বৈধ। তা মুসলিমদের বিপদাপদে ও তাদের কল্যাণে ব্যয় হবে। যেমন : ফকির, মিসকিন, এতিম ও মুসাফিরদের সাহায্যে এবং রাস্তা, সেতু, বাঁধ, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণে ব্যয় করা হবে।[৮৭১]

---

৮৭০. সুরা আল-হাশর : ৭
৮৭১. তাফসিরুল কুরতুবি : ৮/১১ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)

পাঁচ. গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ

শরিয়তের পরিভাষায় মুসলমানগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় লাভ করে যে সম্পদ হস্তগত করে তাকে গনিমত বলে। এটি ফাইয়ের বিপরীত। কেননা, ফাই হলো মুসলিমদের সাথে সন্ধি করে যা দেওয়া হয় এবং যা ঘোড়া বা উট ও যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করা ব্যতীতই অর্জিত হয়।

যুদ্ধের ময়দানে গনিমতের মালকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের অধিকার বানিয়ে দিয়েছেন। গনিমত মুসলিমদের জন্য হালাল। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

'সুতরাং গনিমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ, তা থেকে ভক্ষণ করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।'[৮৭২]

বণ্টন পদ্ধতি

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾

'আর জেনে রাখো যে, বস্তুসামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনিমত হিসাবে পাবে, তার এক-পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, রাসুলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়দের জন্য এবং এতিম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য।'[৮৭৩]

মুসলিমগণ যে গনিমত লাভ করে, তা পাঁচ ভাগ করে চার-পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের দেওয়া হবে। এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে। কিন্তু বাকি এক পঞ্চমাংশের বণ্টন নিয়ে ফুকাহা ও উলামায়ে কিরামের মাঝে ইখতিলাফ

৮৭২. সুরা আল-আনফাল : ৬৯
৮৭৩. সুরা আল-আনফাল : ৪১

রয়েছে। আয়াতানুসারে গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের অথবা তা রাষ্ট্রের কোষাগারের সাথে সংশ্লিষ্ট; যেন তা ব্যাপক কল্যাণে ব্যয় অথবা তা অভাবীদের দেওয়া হয়। উল্লিখিত আয়াতের ওপর ভিত্তি করে এক-পঞ্চমাংশ ভাগ করা হয়। উলামায়ে কিরাম এক-পঞ্চমাংশের মাঝে কে কত অংশ পাবে, তা নিয়ে মতভেদ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা ؒ-এর মতে এক-পঞ্চমাংশকে এতিম, মিসকিন ও মুসাফির এ তিনটি অংশে ভাগ করে দেওয়া হবে। কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর নিকটাত্মীয়দের অংশ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের মাধ্যমে বাদ পড়ে গেছে। হানাফিগণ বলেন, এক-পঞ্চমাংশের বণ্টন সেতু সংস্কার, মসজিদ নির্মাণ, কাজি ও সৈনিকদের বেতন থেকে শুরু করতে হবে।[৮৭৪]

ইমাম মালিক ؒ-এর মতে এক-পঞ্চমাংশের বিধান ফাইয়ের মতোই। তা সকল মুসলমানের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। এটি মুসলিমদের কল্যাণের কোন কোন খাতে ব্যয় করা হবে, তা মুসলিম শাসকের ইজতিহাদ ও দূরদৃষ্টির ওপর ন্যস্ত। খুলাফায়ে রাশিদা এরকমই বলতেন এবং এর ওপরই আমল করতেন।[৮৭৫]

ইমাম শাফিয়ি ؒ-এর মতে, এক-পঞ্চমাংশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হবে। এক ভাগ হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। আর বাকি চার ভাগ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য। অতঃপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অংশ মুসলিমদের কল্যাণেই ব্যয় করা হবে।

উমর বিন আনবাসা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি উটের লোম তুলে নিয়ে বললেন :

وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ

৮৭৪. তাফসিরুল কুরতুবি : ৮/১১ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)
৮৭৫. প্রাগুক্ত

'এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত তোমাদের গনিমত থেকে আমার জন্য এ লোম পরিমাণও হারাম। আর এক-পঞ্চমাংশ তোমাদের কল্যাণেই ব্যয় হবে।'[৮৭৬]

ছয়. জিজিয়া

আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানরা দারুল ইসলামে বসবাস করার সুবাদে ইসলামি রাষ্ট্রকে প্রতি বছর যে অর্থ দিয়ে থাকে তাকে জিজিয়া বলে। جزية (জিজিয়া) শব্দটি جزاء (জাজা) থেকে এসেছে। جزاء অর্থ বিনিময়। যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আহলে কিতাবদের নিরাপত্তা দানের বিনিময়ে এটি নেওয়া হয়, তাই এটিকে জিজিয়া বলে।[৮৭৭]

জিজিয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

'যে সমস্ত আহলে কিতাব আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ইমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন—তা হারাম মানে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো; যতক্ষণ না তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় করজোড়ে জিজিয়া প্রদান করে।'[৮৭৮]

এ আয়াতের মাধ্যমে মুমিনদের ওপর সকল কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ করা হয়েছে। তারা যে রকমই হোক না কেন। আহলে কিতাব ব্যতীত অন্যান্য মুশরিক বা নাস্তিকের ক্ষেত্রে বিধান হলো, তারা ইসলাম কবুল করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া

৮৭৬. সুনানু আবি দাউদ : ৩/৮২, হা. নং ২৭৫৫ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

৮৭৭. তাজুল আরুস : ৩৭/৫৩ (দারুল হিদায়া, বারিদা)

৮৭৮. সুরা আত-তাওবা : ২৯

তাদের বিকল্প কোনো পথ নেই। আর আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে হলে তাকে দুটি পন্থার যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে :

১. ইসলাম কবুল করা।

২. জিজিয়া প্রদান করা।

আয়াত বিশ্লেষণ :

عَنْ يَدٍ এর ব্যাখ্যা হলো, তারা ধনী ও সচ্ছল হলে জিজিয়া দেবে। কেউ কেউ বলেন, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, আহলে কিতাবরা এ কথা জেনে নেবে যে, তারা মুসলিমদের অধীন এবং তাদের ওপর মুসলিমদের জিজিয়া ধার্য করার ক্ষমতা রয়েছে।[৮৭৯]

صَاغِرُونَ এর ব্যাখ্যা হলো, আহলে কিতাবদের অবস্থা এমন যে, তারা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত এবং তারা ইসলামি শাসনের বশীভূত।

অন্যভাবে বলতে গেলে, আয়াতের মধ্যে তাদের লাঞ্ছিত বা অপদস্থ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের ওপর মুসলিমদের বিজয়ী হওয়ার কারণে মুসলিম শাসকের প্রতি তাদের নতি স্বীকার ও তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য।[৮৮০]

জিজিয়ার পরিমাণ

আহলে কিতাবদের ওপর জিজিয়া কী পরিমাণ হবে, এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে।

ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর মতে সর্বনিম্ন জিজিয়া বছরে এক দিনার অথবা তার সমপরিমাণ কাপড়। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ সুন্নাত দ্বারা দলিল প্রদান করেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইয়ামানবাসীদের থেকে প্রতি বছর এক দিনার করে জিজিয়া নিতেন অথবা 'মাআফিরি' নামক ইয়ামানি কাপড় নিতেন।[৮৮১]

৮৭৯. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা : পৃ. নং ২২৩ (দারুল হাদিস, কায়রো)

৮৮০. প্রাগুক্ত

৮৮১. আল-মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব : ১৯/৩৯১ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

ইমাম আহমাদ ﷺ-এর মতে জিজিয়ার সর্বোচ্চ পরিমাণটি ইজতিহাদমূলক। আর সে ইজতিহাদ ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর ন্যস্ত। রাষ্ট্রপ্রধান যার জন্য যতটুকু উপযোগী মনে করবেন, তার জন্য ঠিক ততটুকু জিজিয়া নির্ধারণ করবেন।[৮৮২]

ইমাম মালিক ﷺ-এর মতে জিজিয়ার ওয়াজিব পরিমাণ হলো, উমর বিন খাত্তাব ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণটি। আর তা হলো, চার দিনার অথবা চল্লিশ দিরহাম।[৮৮৩]

ইমাম আবু হানিফা ﷺ-এর মতে জিজিয়ার ক্ষেত্রে আহলে কিতাবগণ তিনটি স্তরে বিভক্ত। অর্থাৎ উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত।

উচ্চবিত্ত : এদের জিজিয়ার পরিমাণ হলো, আটচল্লিশ দিরহাম বা চার দিনার।

মধ্যবিত্ত : পূর্বের শ্রেণির অর্ধেক তথা চব্বিশ দিরহাম বা দুই দিনার।

নিম্নবিত্ত : তাদের জিজিয়া মধ্যবিত্তের অর্ধেক তথা বারো দিরহাম বা এক দিনার।

সুতরাং ধনী আহলে কিতাবদের থেকে আটচল্লিশ দিরহামের বেশি, মধ্যবিত্তদের থেকে চব্বিশ দিরহামের বেশি এবং নিম্নবিত্তদের নিকট থেকে বারো দিরহামের বেশি নেওয়া যাবে না।[৮৮৪]

কাদের ওপর জিজিয়া দেওয়া বাধ্যতামূলক

জিজিয়া শুধু স্বাধীন বিবেকসম্পন্ন সাবালক পুরুষদের ওপরই ওয়াজিব; নারী, শিশু, পাগল ও দাসের ওপর কোনো জিজিয়ার বিধান নেই। কেননা, নারী, শিশু, পাগল ও দাসদের কোনো স্বতন্ত্রতা নেই; বরং তারা সকল বিষয়ে কর্তা পুরুষদের অনুগামী।[৮৮৫]

৮৮২. আল-মুগনি, ইবনু কুদামা : ৯/৩৩৪ (মাকতাবাতুল কাহিরা, মিশর)
৮৮৩. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ২/১৬৬ (দারুল হাদিস, কায়রো)
৮৮৪. আল-মাবসুত, সারাখসি : ১০/৭৮ (দারুল মারিফা, বৈরুত)
৮৮৫. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা : পৃ. নং ২২৩ (দারুল হাদিস, কায়রো)

আহলে কিতাবের ওপর ধার্যকৃত জিজিয়া তুলনামূলকভাবে মুসলিমদের থেকে গ্রহণকৃত জাকাত থেকেও কম। কেননা, মুসলিমদের জাকাত দিতে হয় সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, ওশর দিতে হয় উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ বা বিশ ভাগের এক ভাগ। যেখানে আহলে কিতাবদের জনপ্রতি বাৎসরিক কর বারো থেকে আটচল্লিশ দিরহাম মাত্র। তা ছাড়া জাকাত পুরুষ হোক বা মহিলা, সাবালক হোক বা নাবালক, নিসাবের মালিক হলে সবার ওপর তা ফরজ। পক্ষান্তরে আহলে কিতাবদের নারী ও শিশুদের ওপর কোনো জিজিয়া কর নেই।

সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলমানদের মতোই সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার বিনিময়ে অমুসলিমদের জন্য জিজিয়া প্রদান সার্বিক বিবেচনায় অনেক সাধারণ ও সহজ একটি বিষয়। এতে বরং ইসলামের উদারনীতিই প্রকাশ পায়। তাই জিজিয়াকে যারা অমুসলিমদের ওপর জুলুম মনে করে, তারা হয় ইসলামের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা ইসলামের প্রতি অন্যায়ভাবে বিদ্বেষ পোষণকারী।

সাত. খনিজ পদার্থ

معدن (মা'দিন) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, প্রত্যেক বস্তুর মূল ও কেন্দ্রীয় স্থান কিংবা এমন স্থান, যেখান থেকে সোনা, হীরা জাতীয় বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু উত্তোলন করা হয়।[৮৮৬]

খনিজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা ভূমধ্যে যে সকল উপকারী ও মূল্যবান ধাতু সৃষ্টি করেছেন সেসব সম্পদ। যা ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবনযাপনে সুখানুভূতি আনয়ন করে। যেমন : তামা, সীসা, লোহা, ফসফেট, সোনা, রুপা, ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু।

নিঃসন্দেহে এ সকল দ্রব্য রাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী। তাই এগুলোর প্রতি যথেষ্ট যত্ন, গবেষণা ও গুরুত্ব দিতে হবে। ভূ-অভ্যন্তরের এ সকল গোপনীয় মূল্যবান খনিজ পদার্থ আবিষ্কারের জ্ঞানের সে বিশেষ শাখার ওপর লক্ষ করতে হবে।

৮৮৬. আল-মুজামুল অসিত : ২/৫৮৮ (দারুদ দাওয়াহ, ইসকানদারিয়া)

এ সকল খনিজের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾

'হে ইমানদারগণ, তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।'[৮৮৭]

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ ﴾

'তুমি কি দেখো না, ভূপৃষ্ঠে যা আছে, সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন?'[৮৮৮]

﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴾

'আর নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তা আল্লাহ তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন।'[৮৮৯]

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক জমিন থেকে উৎপাদিত বরকতময় প্রত্যেক জিনিসের প্রতি এ সকল আয়াত ব্যাপকভাবে ইঙ্গিত করে; চাই তা গোপন হোক বা প্রকাশ্য। যেন তা মানুষের উপার্জন, কল্যাণ ও সঞ্জীবনীর উৎস হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে পুরো পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ মানুষের জন্য কল্যাণকর। চাই তা পানি হোক কিংবা ফসল হোক বা ভূগর্ভে লুকায়িত মূল্যবান খনিজ পদার্থ হোক। বর্তমানে মানুষ ও বিভিন্ন জাতির মাঝে এ খনিজ পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করছে।

৮৮৭. সুরা আল-বাকারা : ২৬৭
৮৮৮. সুরা আল-হজ : ৬৫
৮৮৯. সুরা আল-জাসিয়া : ১৩

খনিজের প্রকারভেদ

ইমাম মাওয়ারদি ﷺ খনিজ পদার্থকে দুভাগে ভাগ করেছেন।

প্রকাশ্য খনিজ পদার্থ : যা প্রকাশ্যে দেখা যায় ও সহজলভ্য। যেমন : লবণ, খনিজ তেল, আলকাতরা, সুরমা ইত্যাদি। এ ধরনের খনিজ যে-ই পাক না কেন, কারও জন্য একা ভোগ করা জায়িজ হবে না; বরং তাতে সকল মানুষের অধিকার রয়েছে।

অপ্রকাশ্য খনিজ পদার্থ : যা কষ্ট, পরিশ্রম ব্যতীত পাওয়া যায় না। যেমন : সোনা, রুপা, লোহা, তামা। এ ধরনের খনিজের হুকুম সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে :

প্রথম মত : প্রথম প্রকারের মতো এটিও গুটিকতক মানুষ ভোগ করতে পারবে না; বরং তাতে দেশের সকলের অধিকার রয়েছে।

দ্বিতীয় মত : যারা এ ধরনের খনিজ পদার্থ পাবে, তাদের জন্য একাকী ভোগ করা জায়িজ হবে।[৮৯০]

ইসলামি রাষ্ট্র এমন খাদিম নয় যে, শুধু মানুষের পরিচালনা করবে; বরং ইসলামি রাষ্ট্র এটিও দেখবে যে, মানুষ যেন সুন্দর ও উত্তমভাবে জীবনযাপন করতে পারে। খনিজ সম্পদ যেন কিছু ব্যক্তি, সংগঠন, কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে সীমাবদ্ধ না হয়ে যায়, ইসলামি রাষ্ট্র তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। এ বিষয়ে অন্যতম দলিল হলো, আবু খিদাশ ﷺ-এর হাদিস। তিনি জনৈক মুহাজির সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ

'তিনটি জিনিসে সকল মুসলিমের অধিকার সমান। যথা : ঘাস, পানি ও আগুন।'[৮৯১]

৮৯০. আল-আহকামুস সুলতানিয়া : ২৯৪-২৯৫ (দারুল হাদিস, কায়রো)
৮৯১. সুনানু আবি দাউদ : ৩/২৭৮, হা. নং ৩৪৭৭ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

পূর্ববতী আলিমগণ এ আগুনের অর্থ তিনভাবে বুঝেছেন।

এক. আলো জ্বালানো।

দুই. মালিকানাহীন গাছ, যা থেকে মানুষ কাঠ সংগ্রহ করে।

তিন. এমন পাথর যা আগুন জ্বালায়। যখন একটি পাথরের সাথে অপরটিকে ঘষা হয়, তখন তা থেকে আগুন প্রকাশ পায়।[৮৯২]

যদি পূর্বের জমানার উলামায়ে কিরাম পাথরকে আগুনের ব্যাপক অর্থগুলোর মাঝে আনতে পারেন, তাহলে আশা করা যায়, যদি তারা এ সময়টা পেতেন, তবে খনিজ তেল সম্পর্কেও এমনটিই বলতেন। আর এ খনিজ তেলের সুব্যবহারের ফলে উম্মাহর মাঝে মৌলিক একটি প্রভাব পড়ত। উম্মাহর অর্থনৈতিক অবস্থার আরও উন্নতি ঘটত। আর এ সকল ব্যবস্থাপনা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্বে হওয়ায় তা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে হতো।

খনিজ-সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় হলো রিকাজ

الركاز (আর-রিকাজ) শব্দটি الركز (আর-রিকজু) থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো, পোঁতা বা স্থাপন করা। ইমাম আবু হানিফা ﷺ ও ইমাম সুফইয়ান সাওরি ﷺ-এর মতে খনিজ সম্পদকেই রিকাজ বলা হয়। আর ইমাম শাফিয়ি ﷺ ও ইমাম মালিক ﷺ-এর মতে জাহিলিয়াতের সময় অনুর্বর জমিনে মানুষ কর্তৃক পুঁতে রাখা সম্পদকে রিকাজ বলে। যে এরকম কোনো সম্পদ পাবে, তার এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রকে দেবে, যেন তা জাকাতের খাতে ব্যয় হয়।[৮৯৩]

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْقَلِيبُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

‘চতুষ্পদ জন্তুর আঘাতের ব্যাপারে মালিক দায়মুক্ত, কূপ খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক দায়মুক্ত, খনি খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক দায়মুক্ত আর রিকাজে (অর্থাৎ পুঁতে রাখা সম্পদে) এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া আবশ্যক।’[৮৯৪]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، قِيلَ : وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : الذَّهَبُ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ

‘রিকাজে এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, রিকাজ কী? উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে সম্পদ আল্লাহ তাআলা জমিনের মাঝে সেদিন সৃষ্টি করেছেন, যেদিন এ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন।’[৮৯৫]

এ বর্ণনা থেকে ইমাম আবু হানিফা ﷺ-এর মতের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় যে, রিকাজ খনিজ পদার্থকেই বলে।

আট. পানি সম্পদ

পানি সম্পদের আওতায় সাগরের বিভিন্ন প্রকার বস্তু অন্তর্ভুক্ত। যেমন : মাছ, মুক্তা, আম্বর, মণি-মাণিক্য এবং এরকম আরও অনেক বস্তু, যা মানুষের কাজে আসে এবং মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। সামুদ্রিক সম্পদের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

কেউ বলেন, সাগরে থাকা এসব সম্পদ যে পাবে, তাতে তার অধিকার সাব্যস্ত হবে। তাকে এর ওপর কোনো কিছু আদায় করতে হবে না। সুতরাং যে সাগর থেকে কোনো কিছু অর্জন করল, তা তারই বলে বিবেচিত।

কেউ কেউ বলেন, সমুদ্র থেকে অর্জিত সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। এটি স্থলের খনির মতো একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আর এটি কিয়াসের ভিত্তিতে প্রদত্ত মাসআলা।

---

৮৯২. নাইলুল আওতার : ৫/৩৬৬ (দারুল হাদিস, কায়রো)
৮৯৩. নাইলুল আওতার : ৪/১৭৬ (দারুল হাদিস, কায়রো)

৮৯৪. সহিহুল বুখারি : ২/১৩০, হা. নং ১৪৯৯ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৮৯৫. মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার : ৬/১৬৪, হা. নং ৮৩৬১ (জামিআতুদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যা, করাচি) - হাদিসটি জইফ।

আবার কেউ বলেন, সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদের এক-দশমাংশ ওয়াজিব হবে। এ মতটি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর প্রতি সমন্ধকৃত। ইয়ালা বিন উমাইয়া رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, আমার নিকট উমর رضي الله عنه লিখলেন যে, 'তুমি সাগরের মূল্যবান সম্পদ ও আম্বরে এক-দশমাংশ আদায় করবে।' তবে এর সনদ দুর্বল এবং এখানে এক-দশমাংশ আদায়ের ব্যাপারে কিয়াস বা ভিন্ন কোনো দলিলও নেই। তাই এ মতটিকে কেউ গ্রহণ করেননি।

চতুর্থ আরেকটি মতে, যদি এরকম সম্পদ দুইশ দিরহাম মূল্যমানের হয়, তবে জাকাত থেকে যে রকম নেওয়া হয়, সমুদ্র থেকে আহরিত বস্তুর ক্ষেত্রেও সেরূপ নেওয়া হবে। দুইশ দেরহাম হলো জাকাতের নিসাব। এ মতটি উমর বিন আব্দুল আজিজ رحمه الله-এর প্রতি সমন্ধকৃত। তিনি ওমানে তাঁর কর্মচারীর নিকট একটি পত্রে লিখেন যে, মাছের দাম যতক্ষণ না দুইশ দিরহামে পৌঁছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু যেন না নেওয়া হয়। এ মতটিও কারও নিকট আমলযোগ্য নয়।[৮৯৬]

এ সকল মত পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, সাগর ও নদী থেকে উপার্জিত সম্পদে সাধারণভাবে সকল মুসলমানের অধিকার রয়েছে। তাই যখন কেউ এরকম পানি সম্পদের খনি থেকে কোনো কিছু পাবে, সে বাইতুল মালে তার ন্যায্য অংশ পৌঁছে দেবে। ইসলামি রাষ্ট্র শরিয়তের আলোকে মুসলিমদের কল্যাণে এ বিষয়ে সঠিক নিয়ম তৈরি করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। পানি সম্পদের ক্ষেত্রে খলিফা এ চারটি মত থেকে যে মতটি মুসলিমদের কল্যাণে উৎকৃষ্ট মনে করবে, রাষ্ট্রে সে নিয়মই কার্যকর বলে ঘোষণা করবে। এ চারটি মতের মধ্যে অবশ্য প্রথম দুটি মতই প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত দুটি মতানুসারে কেউ আমল করে না।

নয়. প্রয়োজনীয় কর

ইসলামি রাষ্ট্র যেকোনো জরুরি অবস্থায় মুসলিমদের সামর্থ্যের ভিত্তিতে তাদের ওপর বিভিন্ন কর আরোপ করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত। যখন

৮৯৬. আল-আমওয়াল, আবু উবাইদা : ৪৩২-৪৩৬ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

মুসলিমদের ওপর এমন কঠিন ও সংকটপূর্ণ অবস্থা আপতিত হয়, যার ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের বাইতুল মাল শূন্য হয়ে পড়ে, তখন রাষ্ট্র ধনী ও সচ্ছলদের ওপর নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করবে। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সচ্ছলতা অনুযায়ী কর আদায় করবে। আকস্মিক ও জরুরি অবস্থায় ধনীদের থেকে এ কর আদায় মুসলিম শাসকের জন্য বৈধ। যেমন মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হলো অথবা অনাবৃষ্টি দেখা দেওয়ায় জমি অনুর্বর হয়ে গেল, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ল, তাহলে এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সামর্থ্যবানদের ওপর প্রয়োজনীয় কর আরোপ করা যাবে।

এ বিষয়ে উমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه-এর একটি বাণী রয়েছে। তিনি বলেন :

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَأَخَذْتُ فُضُولَ الْأَغْنِيَاءِ، فَقَسَمْتُهَا فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

'যদি অতীত অবস্থার মতো কোনো পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আসে, তবে আমি ধনীদের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে গ্রহণ করব এবং তা গরিব মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেবো।'[৮৯৭]

এ হাদিসটির ব্যাখ্যা হলো, যখন রাষ্ট্রে অভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং দারিদ্র্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তখন ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য এ অনুমোদন এসে যায় যে, ধনী ও সম্পদের মালিকদের থেকে প্রয়োজন মোতাবেক সম্পদ গ্রহণ করে অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করবে।

এ ব্যাপারে শাইখ মুহাম্মাদ আবু জাহরা বলেন :

'যখন বাইতুল মাল খালি হয়ে যায় অথবা মুজাহিদদের প্রয়োজন দেখা দেয়, কিন্তু বাইতুল মালে তার সংস্থানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় বাইতুল মালে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আসা পর্যন্ত ধনীদের ওপর খলিফা কর আরোপ করতে পারেন। এরকম কর আরোপ ফসল কাটার সময় করা উচিত, যেন শুধু ধনীরাই এ ক্ষেত্রে বিশেষায়িত

৮৯৭. আল মুহাল্লা, ইবনু হাজাম : ৪/২৮৩ (দারুল ফিকর, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

হয়ে না পড়ে। কারণ, যদি শুধু তাদের ওপরই কর আরোপ করা হয়, তবে তাদের মধ্যে এক প্রকার ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে। সর্বোপরি যদি ন্যায়পরায়ণ খলিফা এমন না করেন, তাহলে তার দাপট ও প্রভাবে আঁচ লাগতে পারে এবং ইসলামি রাষ্ট্র ফিতনার শিকার ও লোভীদের ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফকিহদের আরেকটি মতে এ কর আরোপের বদলে খলিফা ধনীদের নিকট ঋণ দেওয়ার আহ্বান জানাবে। তদুত্তরে আল্লামা শাতিবি ﵀ বলেন, 'এমন সংকটের সময় ঋণ চাওয়ার মানে হলো, যেন এমন আশা করে বসে থাকা যে, বাইতুল মালে কিছু আসবে। অতঃপর যখন অপেক্ষার প্রহর খতম হবে, তখন দেখা যাবে বাইতুল মালে এ পরিমাণ অর্থ ঢুকেছে, যা বাইতুল মালকে মোটেও সচ্ছল করে না। তাই এমন বিপদের সময় কর আরোপ করাই আবশ্যক।'[৮৯৮]

দশ. সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ

ইসলামে ন্যায়পরায়ণতা, বিচক্ষণতা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রকে নাগরিকদের ওপর এ প্রশ্ন তোলার অধিকার দেয় যে, তোমার এসব সম্পদের উৎস কী? কোথা থেকে তুমি এ সম্পদ পেয়েছ?। এর ভিত্তি হলো, ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থানকারী নাগরিকদের সম্পদ অর্জনের পন্থার ওপর সন্দেহকরণ। এ মূলনীতি মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা ও সম্পদের ওপর তাদের লোভকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেন কারও কাছ থেকে সম্পদ বিনা কারণে উধাও হয়ে না যায়, অথবা কোনো সীমালঙ্ঘনকারী ও খিয়ানতকারী খেয়ে না ফেলে।

এ মূলনীতিটি উমর ﵁-এর খিলাফতের সময় স্পষ্টরূপে দেখা যায়। তিনি বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও বড় বড় কর্মচারীদের হস্তগত সম্পদের মধ্যে যেগুলোর প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হতো, সেগুলোর হিসাব নিতেন। তারপর সে সম্পদকে ভাগ করে ফেলতেন, ফলে তাদের হাতে এক ভাগ থাকত। অতঃপর সে শেষ ভাগটিও বাইতুল মালে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি কেড়ে নিতেন। যখন সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে কোনো প্রকাশ্য মাধ্যম না দেখা যেত এবং উপার্জন সম্পর্কে সন্দেহ হতো, তখনই কেবল এমন করা হতো।

৮৯৮. মালিক ﵀, হায়াতুহু ওয়া আসরুহু : ৩৯৯-৪০০, শাইখ আবু জাহরা কর্তৃক রচিত।

এ মূলনীতির কারণে খলিফা মুসলিম জনসাধারণের সম্পদ নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন এবং তাদের সম্পদ রক্ষা করতে পারবেন। অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় কোনো কর্মচারী ক্ষমতার দাপটে কারও সম্পদ হাতানোর সুযোগ ঠেকানো সম্ভব হবে। মুসলিম শাসক এ মূলনীতির আলোকে বিভিন্ন প্রদেশ, অঞ্চল ও শহরে নিযুক্ত গভর্নরদের হিসাব নিতে সক্ষম হবেন। তেমনিভাবে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া ধনী লোকদের সম্পদের হিসাব নিতে পারবেন, যার ব্যাপারে এমন সন্দেহ হবে যে, তার সম্পদ অবৈধ কোনো পন্থায় অর্জিত হয়েছে।[৮৯৯]

সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ

সম্পদ যেন নষ্ট না হয়, বিনা কারণে তা উধাও না হয়ে যায়, সে জন্য ইসলাম নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ আমানতের একটি প্রকার, যা সম্পদশালীরা বহন করে এবং তা উপকারী পন্থায় খরচ করে থাকে। আর সম্পদের ক্ষেত্রে অপচয়, বিনা কারণে খরচ করা হারাম ও খিয়ানত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ : أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটিকে অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না। তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরবে, বিচ্ছিন্ন হবে না। আর তিনি তোমাদের জন্য যে তিনটি কাজ অপছন্দ করেন, তা হলো—তর্ক-বিতর্ক করা, অধিক প্রশ্ন করাও সম্পদ বিনষ্ট করা।'[৯০০]

৮৯৯. প্রাগুক্ত

৯০০. সহিহ মুসলিম : ৩/১৩৪০, হা. নং ১৭১৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইসলাম পুরুষদের জন্য সোনা দিয়ে সাজসজ্জা করা নিষিদ্ধ করেছে। আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

'আল্লাহর নবি ﷺ রেশমের একটি কাপড় ডান হাতে নিলেন এবং সোনার একটি টুকরা বাম হাতে নিলেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয় এ দুটি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের ওপর হারাম।'[৯০১]

মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের উপস্থিতিতে মুআবিয়া ﷺ বললেন :

أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ

'আপনারা কি জানেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, নিশ্চয় এ ব্যাপারটি এরকমই। মুআবিয়া ﷺ বললেন, তিনি কিছু ছোট টুকরো ব্যতীত সোনা পরতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা উত্তর করলেন, আল্লাহ সাক্ষী, নিশ্চয়ই।'[৯০২]

ছোট টুকরো বলতে দাঁত, নাক, আঙুল ইত্যাদি অঙ্গে প্রয়োজনবশত সোনা ব্যবহার উদ্দেশ্য। আর সর্বসম্মতিক্রমে প্রলেপ আকারে সোনা ব্যবহার করা জায়িজ; তা এমনভাবে যে, আগুনে পোড়ালে খাঁটি সোনার কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না—যেন এতে সোনা ছিলই না।

৯০১. সুনানুন নাসায়ি : ৮/১৬০, হা. নং ৫১৪৪ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।
৯০২. সুনানুন নাসায়ি : ৮/১৬১, হা. নং ৫১৫২ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

সোনা-রুপা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

সোনা হলো মূল্য নির্ধারণের পরিমাপক। যেহেতু সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার করা সম্পদ বিনষ্টকরণ ও অপচয়ের মধ্যে পড়ে, তাই ইসলাম সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার করাকে নিষিদ্ধ করেছে।

উম্মে সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

'যে ব্যক্তি রুপার পাত্র দিয়ে পান করবে, তার পেটের ভেতর জাহান্নামের আগুন গর্জন করবে।'[৯০৩]

অন্য একটি রিওয়ায়াতে এসেছে :

﴿ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ ﴾

'যে ব্যক্তি সোনা অথবা রুপার পাত্রে পান করবে, সে গড়গড় করে নিজের উদরে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করাবে।'[৯০৪]

পরিধানে ও পানাহারে সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্ভবত এটি যে, এটি হলো অনেক বস্তুর মূল্যের মূল উৎস বা দাম নির্ধারণের পরিমাপক। তেমনিভাবে এ কথাও সকলে জ্ঞাত যে, এটি একটি জাতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিমাপক। খাওয়ার পাত্রে সোনা-রুপার ব্যবহার ও সৌন্দর্য বর্ধনে সোনা-রুপার আধিক্যের কারণে উম্মাহর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

৯০৩. মুসনাদু আহমাদ : ৪৪/২২৭, হা. নং ২৬৬১১ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।
৯০৪. সহিহু মুসলিম : ৩/১৬৩৫, হা. নং ২০৬৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

অপচয় করা

সম্পদ বিনষ্ট করার আরেকটি রূপ হলো অপচয় করা। আরবি اسراف (ইসরাফ) এর অর্থ হলো, সীমাতিরিক্ত করা; চাই তা সম্পদের ক্ষেত্রে হোক বা কথার ক্ষেত্রে হোক বা অন্য কিছুতে হোক।[৯০৫]

এ অর্থে সম্পদ বিনষ্টকরণ ও কল্যাণ ধ্বংসকরণের অপর নাম অপচয়। অপচয়ের কারণে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতায় জর্জরিত হতে হয়। এ কারণে ইসলাম অপচয় করা থেকে অত্যন্ত কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। একজন মুসলিমকে অপচয় ও অমিতব্যয়ীদের খারাপ পরিণতির শিকার হওয়া থেকে সাবধান করেছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে পরিমিত হতে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

'খাও এবং পান করো, কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।'[৯০৬]

আল্লাহ তাআলা দুটি ঘৃণিত কর্ম থেকে সাবধান করে পরিমিত বোধের প্রতি আহ্বান করে ইরশাদ করেন :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾

'আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।'[৯০৭]

অপচয় ও দম্ভ ভরে ব্যয় করা থেকে নিষেধ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ

৯০৫. আল-মুজামুল অসিত : ১/৪২৭ (দারুদ দাওয়াহ, ইসকানদারিয়া)
৯০৬. সুরা আল-আরাফ : ৩১
৯০৭. সুরা আল-ফুরকান : ৬৭

'তোমরা অপচয় ও দম্ভ না করে খাও, পান করো, পরিধান করো এবং দান করো।'[৯০৮]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, তোমরা যা ইচ্ছে খাও, যা ইচ্ছে পরিধান করো। তবে অপচয় করা ও দম্ভভরে ব্যয় করা গুনাহ।[৯০৯]

অপচয়ের একটি অর্থ হলো, হারাম কাজে ব্যয় করা। এতিম সন্তানরা বড় হয়ে গেলে আর তাদের সম্পদ ভক্ষণ করা যাবে না, এ ভয় করে এতিমদের সম্পদ খেতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ﴾

'আর এতিমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পারো, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করো। এতিমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না।'[৯১০]

এমনিভাবে সম্পদ বিনষ্ট করার আরেকটি সুরত হলো, যারা সম্পদ ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারবে না; বরং তা নিষ্প্রয়োজনে বিনষ্ট করবে, বিনা কারণে খরচ করবে; এমন বোকাদের হাতে সম্পদ সমর্পণ করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন :

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

৯০৮. সুনানুন নাসায়ি : ৫/৭৯, হা. নং ২৫৫৯ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব) - হাদিসটি হাসান।
৯০৯. সহিহুল বুখারি : ৭/১৪০, باب قول الله تعالى : {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৯১০. সুরা আন-নিসা : ৬

'আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না; বরং তা থেকে তাদের খাওয়াও, পরাও এবং তাদের উত্তম বাণী শোনাও।' ৯১১

সুতরাং বোকা-গবেটদের নিকট সম্পদ দেওয়া উচিত নয়। উক্ত আয়াতটি এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে, যারা গুরুত্বহীনভাবে ও অবিবেচনায় খরচ করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের লঘুচিত্ততার কারণে বোকা সাব্যস্ত করা হয়। অনুরূপ এ আয়াতটি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করে, যারা কম বয়সের কারণে বুদ্ধি করে ব্যয় করতে পারে না। এভাবে সে সকল গাফিলও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা বেচাকেনার ক্ষেত্রে স্রেফ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়, যে কারণে তারা ভোগবাদীদের ধোঁকার শিকার হয়। কম বয়সের ছেলেরাও সরলতা ও স্বল্প জ্ঞানের কারণে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পতিত হয়।

বর্ণিত এ সকল পন্থা অর্থনীতি সংরক্ষণের বিভিন্ন রূপ। যেন উম্মাহ সমৃদ্ধ হয়। উম্মাহর দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা কেটে যায়। সমাজে কল্যাণ ও সম্মানযোগ্য জীবন নিশ্চিত হয়। মানুষের কল্যাণ ও শান্তি আনয়নের জন্য এবং অকল্যাণ ও অভাব দূর করার জন্য এগুলো যথেষ্ট।

এ সমস্ত পন্থা যদি একজন শাসক সুন্দররূপে পালন করে এবং মানুষজন তার অনুসরণ করে, তবে একটি উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। যার অধীনে মুসলিমগণ শান্তি, নিরাপত্তা ও সুখী জীবন লাভ করবে। তাদের সকল সংকীর্ণতা ও অভাব কেটে যাবে। আমিত্ববোধ, সুবিধাবাদ ও স্বার্থান্বেষণ দূর হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামি অর্থনীতির যে আলোচনা আমরা এখানে উপস্থাপন করলাম, তা ইসলামি অর্থনীতির চিন্তাধারা, নিয়মনীতি ও কাঠামোর প্রকৃত রূপের তুলনায় সামান্য একটি খণ্ড চিত্র। এ বিষয়ে এখানে আমাদের জন্য বিস্তারিত আলোচনার অবকাশও নেই। কেননা, তা অনেক পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অনেক সময়সাধ্য কাজ। আর এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

৯১১. সুরা আন-নিসা : ৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন মতবাদ ও তার আগ্রাসন

প্রাক্কথন

হক-বাতিলের লড়াই চিরন্তন। ইসলামের সাথে বিভিন্ন কাফির গোষ্ঠীর বিশ্বাসগত, বিধানগত, নীতিগত দিক থেকে প্রবল যুদ্ধ চলে আসছে মানব ইতিহাসের সূচনাকাল থেকেই। মানবতার কল্যাণ, সুবিমল আলোকধারা, শান্তির ফোয়ারা বহনকারী ইসলামের সাথে বিভিন্ন গোঁড়া, বিদ্বেষপরায়ণ ও কাফিরগোষ্ঠীর সাথে সর্বদাই এ সংঘাত চলে আসছে। এ এক তীব্র চলমান সংঘাত, যা কখনো থেমে যাবার নয়।

উত্তম যুক্তি ও বুদ্ধি, উন্নত চরিত্র ও শালীনতার প্রতি অবজ্ঞাকারী এসব কট্টরবাদী কাফিরগোষ্ঠীর সাথে ইসলামের সংঘাত চিরকালের জন্য অবধারিত। কেননা, তাদের কর্মপন্থা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর ভিত্তি করে নয়; বরং তাদের কার্যক্রম বিকৃতি ও অসত্যের ওপর দণ্ডায়মান। নিজেদের মজ্জাগত মন্দ স্বভাব ও উন্মাদনাপূর্ণ কট্টরপন্থা এক সত্য ও সুন্দর ধর্মের বিপক্ষে তাদের সর্বদা উসকানি দিয়েই চলছে।

ইসলামের এ যুদ্ধ সর্বদা চলমান ছিল, আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে। অনেক মানুষ আছে, যাদের একমাত্র কামনা-বাসনা হলো, দুনিয়ার বুকে ফাসাদ ছড়ানো এবং অসত্যকে শক্তপোক্ত করা। যতদিন এ পৃথিবীতে মানবরূপী এমন শয়তানগোষ্ঠী অবস্থান করবে, ততদিন এ লড়াই চলমান থাকবে। ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িত এসব ভ্রান্তধর্ম ও জীবনব্যবস্থার ফেরিওয়ালা কুফরিব্যবস্থার সংখ্যা একেবারে কম নয়। শুধু আমাদের বাংলাদেশের হিসাব করলেই এর সংখ্যা সহস্র ছাড়িয়ে যাবে। সব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে গেলেও বিশাল কলেবরের আলাদা একটি গ্রন্থ হয়ে যাবে। তাই আমরা এ অধ্যায়ে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভয়ানক ও প্রভাব বিস্তারকারী প্রসিদ্ধ কিছু মতবাদ নিয়ে আলোচান করব। শেষে ক্রুসেড ও উপনিবেশবাদ নিয়ে যৎসামান্য আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

পূজনবাদ

প্রত্যেক এমন কর্ম, যাতে আল্লাহর সাথে অন্য কোনো বস্তু বা অন্য কোনো সত্তাকে অংশীদার করা হয়, অথবা আল্লাহ তাআলা ব্যতিরেকে অন্য কারও ইবাদত করা হয়, এমন কর্মকে পূজা বলে।

পূজার বিভিন্ন ধরন ও রকমভেদ আছে। একেকবার একেকরূপে একে দেখা যায়। যেমন কিছু মানুষ রাতের পূজা করে, কেউ দিনের পূজা করে, কেউ চাঁদ, তারা, নদী, পাহাড়, সাগর, মূর্তি ইত্যাদির মতো পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিসের পূজা করে। কিছু মানুষ তো রাজা-বাদশাহকে নিজের মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করে। উদাহরণত মিশর জাতি ফিরাউন বাদশাহকে, আরেক জাতি নমরুদকে, আর কতক মানুষ গাছপালা কিংবা পাথরকে প্রভুরূপে গ্রহণ করে তাদের পূজা করত। এ সকল বস্তু বা সত্তার প্রতি তারা ছিল পূর্ণ আনুগত্যশীল।

পূজা বলতে সাধারণত মূর্তিপূজা মনে করা হয় এবং ধারণা করা হয় এটাই শুধু শিরক। এটা করলেই কেবল পূজা হয়। অথচ পূজার রকমভেদে এমনও রূপ আছে, যা বর্তমানকালে মানুষের নিকট স্পষ্ট নয়। এমনই কয়েক প্রকার সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. জাতীয়তাবাদ

দেশ, ভাষা, বংশ, ভৌগোলিক সীমারেখা প্রভৃতির ভিত্তিতে জাতীয়তা দাঁড় করিয়ে শুধু এর জন্যই জান-জীবন কুরবান করা এবং এর জন্যই লড়াই করার নাম জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের অনেক শ্রেণি রয়েছে। আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করছি।

ক. দেশপ্রেম

ইসলাম হলো মানুষের স্বভাবধর্ম। কারও স্বভাবে দেশপ্রেম থাকা কোনো সমস্যার নয়। কেননা, যে ব্যক্তিই সুস্থ-স্বাভাবিক হবে, তার ভেতরে দেশের জন্য স্বভাবগতভাবেই প্রেম-ভালোবাসা থাকবেই। যখন দেশ থেকে দূরে

কোথাও সে যায়, তখন তার মন দেশের জন্য কাঁদবেই। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে মদিনায় তাঁর সাহাবি ও পরিবারের মাঝে ছিলেন। তা সত্ত্বেও নিজ জন্মভূমির জন্য তাঁর মনের টান ও ভালোবাসা মুছে যায়নি। একবার জনৈক মুহাজির সাহাবি মক্কাসংক্রান্ত একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতায় মক্কার আলোচনা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে।

এ ছাড়াও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিজ জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার টান বোঝা যায় হাদিসের আরেকটি বর্ণনায়। মক্কার অত্যাচারী কাফিরদের কারণে যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে বের হয়ে এলেন। হিজরত করে ইয়াসরিব অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছিলেন। বিদায় বেলায় তিনি প্রিয় শহর মক্কার প্রতি সম্বোধন করে বললেন :

وَاللهِ إِنَّكِ، لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ، وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَا خَرَجْتُ

'আল্লাহর শপথ! তুমিই হলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ভূমি। আমার নিকট আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আল্লাহর শপথ! যদি আমাকে বের করে দেওয়া না হতো, তবে আমি কখনো তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হতাম না।'[৯১২]

দেশের প্রতি ভালোবাসা স্বভাবজাত অনুভূতি, যা মানুষের হৃদয়ে তৎপ্রতি টান সৃষ্টি করে। কিন্তু দেশাত্মবোধ থেকে উৎসারিত মূল্যবোধ যখন দ্বীনের স্থান দখল করে নেয়, তখন ইসলাম এমন দেশপ্রেমকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া গণ্য করে। এটি আল্লাহর নির্ধারিত নীতির ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নামান্তর। যদি বিষয়টি এরকমই হয়ে থাকে, তবে ইসলামি শরিয়া আপনাকে বলবে—থামো, এ দেশপ্রেম নয়; বরং এ হলো দেশপূজা।

৯১২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২/১০৩৭, হা. নং ৩১০৮ (দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা) - হাদিসটি সহিহ।

মূলত দেশপ্রেম কোনো নীতি নয়, কোনো দর্শন বা কোনো জীবনব্যবস্থা নয়; বরং তা একটা অনুভূতি মাত্র, যা অন্তর থেকে নির্গত হয়, যার ভিত্তি হলো স্বভাবজাত ভালোবাসা। আর ভালোবাসা এমন এক আবেগ, যার ওপর ভিত্তি করে দেশপ্রেম কোনো জীবনব্যবস্থা বা আদর্শ হতে পারে না।

যদি দেশপ্রেমকে কোনো আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার কেউ ইচ্ছাও করে, তবে তা কীভাবে আকিদা, সভ্যতা, মানহাজ; সর্বোপরি একটি জীবনব্যবস্থা হবে? কীভাবে জীবনের প্রতিটি স্তরের সকল সমস্যার সমাধান করবে? কীভাবে আত্মিক ও শারীরিক সমস্যার সমাধান দেবে? কীভাবে পরিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাধান পেশ করবে? কীভাবে মুআমালার বিষয়াবলি, যথা : বেচাকেনা, ঋণ দেওয়া-নেওয়াসহ বিভিন্ন অধিকার সুনিশ্চিত করবে? কীভাবে দণ্ডবিধি, যথা : হদ, কিসাস, তাজিরের ব্যাখ্যা করবে? কীভাবে ব্যক্তিক বিষয়াবলি, যথা : বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, উত্তরাধিকার আইনের সমাধান করবে? কীভাবে বিচার ও শাসনবিষয়ক, যথা : বাইআত, আনুগত্য, শুরা, যুদ্ধ, বিচার, সাক্ষ্য, শপথসহ মানুষের জীবনের নানা দিকের নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা দেবে? মূলত দেশাত্মবোধের মাঝে এর কোনো সমাধান নেই। কেননা, তা শুধু কিছু আবেগ ও ভালোবাসার নাম, কোনো আদর্শের নাম নয়।

নিঃসন্দেহে একজন প্রকৃত মুসলিম তার দেশকে অন্যদের চাইতে উন্নতভাবে দেখে, দেশের সেবা করে এবং দেশের প্রতিরক্ষা করে। কিন্তু কোনো মুসলিমের জন্য মোটেও উচিত নয় যে, দেশপ্রেমকে ইসলামের মর্যাদায় সমুন্নত করা। কেননা, দেশপ্রেম না কোনো আদর্শ হতে পারে আর না হতে পারে কোনো জীবনব্যবস্থা। অন্যদিকে ইসলাম হলো মহান প্রভুর দানকৃত এমন একটি নির্দেশিকা, যা সকল যুগের, সকল স্থানের, সকল মানুষের জন্য একমাত্র আদর্শ ও জীবনব্যবস্থা।

তাই দেশাত্মবোধ থেকে উৎসারিত কোনো মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকা, তা ধরে রাখা এবং ইসলামের স্থানে তাকে সমাসীন করাকে আমরা দেশপূজা ব্যতীত অন্য কোনো নাম দিতে পারি না। একজন মুসলিমের কাছে দেশের আগে ইমান, দেশপ্রেমের পূর্বে ইসলামের স্বার্থ অগ্রগণ্য। ইসলামের সাথে

সাংঘর্ষিক না হলে স্বভাবজাত দেশপ্রেমে ইসলামের কোনো বাধা নেই। কিন্তু যদি কোথাও ইসলামের স্বার্থের সাথে দেশের স্বার্থের সংঘাত হয়, তাহলে একজন মুমিন অবশ্যই ইসলামের স্বার্থকে অগ্রগণ্য রাখবে, দেশের স্বার্থকে পিছে রাখবে। মোটকথা, নিজ জন্মভূমি বা দেশের প্রতি টান-ভালোবাসা সত্তাগতভাবে জায়িজ, কিন্তু যখন তা শরিয়তের গণ্ডির বাইরে চলে যাবে, ইসলামের সাথে কোথাও সাংঘর্ষিক হবে, তখন জন্মভূমি বা দেশকে প্রাধান্য দিলে তা আর দেশপ্রেম বলে বিবেচিত হয় না; বরং তার নাম হয়ে যায় দেশপূজা। আমাদের দেশের অনেক মুসলিম এ দেশপ্রেমের নামে মূলত দেশপূজা করে যাচ্ছে; অথচ তাদের এ বিষয়ে কোনো উপলব্ধিও নেই।

খ. ভাষাপ্রীতি

ভাষাপ্রীতিকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে না। যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্মভূমির প্রতি স্বভাবজাত ভালোবাসা থাকে, দেশের প্রতি থাকে আলাদা এক ধরনের টান। তেমনই ভাষা হলো বিভিন্ন সমাজের মাঝে জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত একটি বিষয়। এটি মানুষের অভ্যাসের সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন সমাজে যার রূপ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এ ভাষা তাদের মনের অনুভূতি প্রকাশের একটি মাধ্যম। তাই নিজ মাতৃভাষার প্রতি টান থাকাটা কিছুতেই দোষণীয় কিছু নয়।

এ ক্ষেত্রে আরবি ভাষা কিছুটা ভিন্ন। কারণ, আরবি ভাষা সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ একটি ভাষা। ইসলাম আরবি ভাষা শিখতে, এ ভাষার শব্দাবলি আয়ত্তে আনতে ও এর মিষ্টতা অনুভব করতে উৎসাহিত করে। কেননা, আরবি ভাষা কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার মাধ্যম। সম্মানিত এ কিতাবের মর্যাদা, গুরুত্ব ও আলৌকিকত্ব বোঝার সরাসরি পথ। তা ছাড়া আরবি ভাষা মুসলমানদের ভালোবাসার ভাষা ও ধর্মীয় একটি প্রতীক।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন :

فإنَّ اللسان العربي شعار الإسلام و أهله

'নিশ্চয়ই আরবি ভাষা হলো ইসলাম ও মুসলমানদের ঐতিহ্য।'[৯১৩]

৯১৩. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম : ১/৫১৯ (দারু আলামিল কুতুব, বৈরুত)।

তবে কোনো ভাষার প্রেম যদি মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরায়, ইসলামের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে—সর্বোপরি ভাষার জন্য রক্তপাত হয়, তাহলে তা ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। নিজ ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা সবারই আছে, কিন্তু কারও ওপর নিজের ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া বা ভাষার জন্য স্বশস্ত্র যুদ্ধে নেমে পড়া সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি। ইসলামি শরিয়ত এমন ভাষাপ্রেমকে কখনো সমর্থন করে না।

২. রক্তসম্পর্ক ও বংশপরম্পরা

মর্যাদার মাপকাঠিতে ইসলামে রক্তসম্পর্ক, বংশপরম্পরা ইত্যাদির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। ইসলাম এগুলোর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপও করে না; বরং ইসলাম মানুষকে পরিমাপ করে ইমান, তাকওয়া ও ইলমের মানদণ্ড দ্বারা। কেননা, যে ব্যক্তি মুমিন-মুত্তাকি-আলিম হবে, সে অন্যদের থেকে উত্তম ও সম্মানিত হবে। তার শান-শওকত, বংশমর্যাদা, অঢেল সম্পদ থাকুক বা না থাকুক; মুসলিম হিসাবে সে সম্মানিত। তাকে পরিমাপ করা হবে একমাত্র ইমান, তাকওয়া ও ইলমের মানদণ্ডে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং যাদের জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন। আল্লাহ খবর রাখেন, যা কিছু তোমরা করো।'[৯১৪]

ইসলামে রক্তসম্পর্ক, বংশ ইত্যাদির বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই। যেমন জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵁-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের দিন আমাদের উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা প্রদান করেন :

৯১৪. সুরা আল-মুজাদালা : ১১

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

'হে লোকসকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রভু একজন এবং তোমাদের পিতা একজন। সাবধান! অনারবের ওপর কোনো আরবের মর্যাদা নেই এবং আরবের ওপর কোনো অনারবের মর্যাদা নেই। অনুরূপ কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের ফজিলত নেই এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ফজিলত নেই। মর্যাদার মাপকাঠি হলো, একমাত্র তাকওয়া।'[৯১৫]

আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

'যে আমলে কমতি করল, আখিরাতে বংশমর্যাদা তাকে কোনো উপকার করবে না।'[৯১৬]

জাতীয়তাবাদ মানুষকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি ও জাতির মাঝে আবদ্ধ করে ফেলে। অন্যদিকে ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে শামিল করে নেয়, যার মাঝে সকল সমাজ ও জাতি একত্রিত থাকে। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ইসলামের অধীনে এক ও অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। জাতীয়তাবাদ মানুষকে একটি ভূমি, একটি বর্ণ, একটি ইতিহাসের মাঝে আবদ্ধ করে ফেলে। অপরদিকে ইসলাম মানুষকে সমগ্র পৃথিবী, প্রত্যেকটি বর্ণ ও বিস্তৃত ইতিহাসের অধিকারী করে। কোনো ধরনের ভেদাভেদ ব্যতিরেকে সকলকে এক উম্মাহর অধীন করে।

৯১৫. মুসনাদু আহমাদ : ৩৮/৪৭৪, হা. নং ২৩৪৮৯ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

৯১৬. মুসনাদু আহমাদ : ১২/৩৯৩, হা. নং ৭৪২৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾

'আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।'[৯১৭]

ইসলামের সাথে জাতীয়তা ব্যাপকভাবে সাংঘর্ষিক। জাতীয়তা নিয়ে পড়ে থাকা অত্যন্ত জঘন্য বিষয়। ইসলামে এটি মূর্তিপূজার সমান অপরাধ। জাতীয়তাকে লালন করার অর্থ হলো আল্লাহকে ছেড়ে জাতি, ভাষা ও বংশকে পূজা করা।

কওমচেতনা বা গোত্রভিত্তিক জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হলো আবেগের ওপর, যা আমরা দেশাত্মবোধ সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। এটি শুধুই আবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা পূর্ণাঙ্গ কোনো জীবনব্যবস্থা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এটা এমন কোনো আকিদা-বিশ্বাস বা দর্শন হতে পারে না, যা মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য সত্যিকারভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি প্রণয়ন করবে। মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরের সুচারু সমাধান দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি স্তর, প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি জিজ্ঞাসার স্পষ্ট সমাধান করে দিয়েছে।

ইসলামের সাথে জাতীয়তার আরেকটি বিরোধপূর্ণ স্থান বুঝার জন্য আমরা আরব চেতনাকে উদাহরণ হিসাবে নিতে পারি। আরবরা অনারব কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, কোনো মুসলিমের প্রতি এ কারণে এতটুকু গুরুত্ব দেয় না যে, সে মুসলিম। আরব-চেতনাধারীদের বিশ্বাস হলো, সে আরব নয়, তাই সে সম্মানের উপযুক্ত নয়। তাদের নিকট মানদণ্ড হলো, আরব হওয়া। তাদের নিকট কোনো অনারব মুসলিমের মর্যাদা নেই। সে-ও তাদের নিকট বিদেশী ও অপরিচিত। কিন্তু এ ভাব ও ধরন ইসলামের চোখে চরম ন্যাক্কারজনক। কেননা, ইসলাম এটা দেখে না যে, কে আরব আর কে অনারব; বরং এখানে মর্যাদা পরিমাপের একমাত্র ভিত্তি হলো তাকওয়া।

৯১৭. সুরা সাবা : ২৮

ইসলামের বিধান তো হলো, মুসলিমগণ ভাষা, বর্ণ, বংশ, জাতি, দেশ নির্বিশেষে সকলেই এক ও অভিন্ন। ইসলামি আকিদা সকলের মাঝে ভালোবাসা স্থাপনকারী। তারা একটি উম্মাহ, একটি জাতি। যেখানে আরব, অনারব, কুর্দি, হিন্দুস্তানি, বাংলাদেশি, তুর্কি, হাবশি সকলে এক সমান, এক মর্যাদার। যেমন আম্মার আরাবি ﵁, সুহাইব রুমি ﵁, বিলাল হাবশি ﵁, সালমান ফারসি ﵁, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি কুর্দি ﵀ প্রমুখ। তাঁরা ছিলেন মুসলিমদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্তর্গত। যদিও তাঁদের বংশ ভিন্ন ছিল এবং তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন জাতির।

মুসলিমদের মাঝে যারা ইলমের ময়দানে অকুণ্ঠ খিদমত পেশ করেছেন, তাদের অধিকাংশই আরব ছিলেন না। উদাহরণত ইমামুল মুফাসসিরিন মুহাম্মাদ বিন জারির তাবারি ﵀ আরব ছিলেন না। ইমামুল মুহাদ্দিসিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারি ﵀ আরব ছিলেন না। ইমামুল ফুকাহা আবু হানিফা নুমান ﵀ আরব ছিলেন না।

এরকম হাজারো উদাহরণ আছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ইসলামি আকিদা, ইসলামি শরিয়ত ও ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে নিজেদের জীবনে একমাত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ইসলামের কারণেই শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, আরব বা অনারব হওয়ার ভিত্তিতে নয়। এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, আরব হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের কোনো মানদণ্ড নয়; বরং অনারব হয়েও ইলমের আকাশে, কিতালের ময়দানে তাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন।

জাতীয়তাবাদ দেশাত্মবোধের রক্ষাকবচ। উভয়টির উৎপত্তিস্থল হলো আবেগ। এগুলো মানবজীবনের সকল জিজ্ঞাসার সমাধান ও সকল স্তরের করণীয়বিশিষ্ট কোনো আদর্শ বা জীবনব্যবস্থা নয়। ইসলামের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এগুলোকে আপন করে নেওয়াই হলো, এগুলোর পূজা করা, যা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে জাতীয়তাপূজা ও দেশপূজা গ্রহণ করার নামান্তর।

৩. হিন্দুধর্ম

এটা ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহৎ একটি গোষ্ঠীর ধর্ম। এটা এমন এক ধর্ম, যা পূজা-অর্চনা ও তার বিভিন্ন রূপকে একত্রিত করেছে। যে ধর্মে যে কেউ যে কোনো খারাপ কাজই করুক, ধোঁকাবাজি করুক অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করুক, সে কৃতকর্মের ফলভোগ থেকে মুক্ত। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার, পৌরাণিক কল্পকাহিনী ও বিভিন্ন কুধারণার জপমালা।[৯১৮]

হিন্দু ধর্মে এ পূজা করার আধিক্য অনেক বেশি। ভারতে পূজনের এমন অনেক রূপেরই দেখা পাওয়া যায়, যা কল্পনারও বাইরে। তারা পাহাড়, নদী, তারা-নক্ষত্র, যুদ্ধের সরঞ্জাম, নর-নারীর যৌনসংক্রান্ত বিভিন্ন বস্তুকে পূজা দেয়। তারা বিভিন্ন রকমের পশুকে পূজা করে। তন্মধ্যে তাদের নিকট অধিক সম্মানিত হলো গরু। বর্তমানে এটি এমন এক পবিত্র বস্তুর নাম হয়ে গেছে যে, কোনো রকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাকে ছোঁয়া যাবে না অথবা জবাই কিংবা অন্য কিছু করার দ্বারা তাকে কোনো প্রকারের কষ্ট দেওয়া যাবে না।[৯১৯]

হিন্দু জাতি প্রতিবেশী মুসলিমদের প্রতি সব সময় শত্রুতা পোষণ করে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত তারা সে শত্রুতা জিইয়ে রাখে। ব্যষ্টিক, সামাজিক, রীতিগতভাবে প্রতিটি স্তরে তারা মুসলিমদের ঘৃণা করে। মুসলিমরা এ সকল পূজক হিন্দুদের হাতে চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। তারা মুসলিমদের নানা ধরনের কষ্ট ও শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে। তারা লাখ লাখ মুসলিম হত্যা করেছে। অগণিত মুসলিম ললনাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট করেছে। সে হিংস্রতা ও বর্বরতার ভাষা কী হতে পারে, যা ভারতের মজলুম মুসলিমদের ওপর চলছে!?

---

৯১৮. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল : ৩/৯৫ (মুআসসাসাতুল হালবি)
৯১৯. মা-জা খসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন : পৃ. নং ৪৯ (মাকতাবাতুল ইমান, মানসুরা, মিশর)

মুসলিমদের গরু জবাই ও তা ভক্ষণের কারণে হিন্দুরা তাদের গৃহীত প্রভু গরুর অসম্মান ও মর্যাদাহানি মনে করায় তাদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। যদিও ভারতই হলো গরুর গোশত রপ্তানিতে বিশ্বতালিকায় প্রথম স্থান অর্জনকারী। তবুও যখন মুসলিমরা গরু জবাই করে, তখন তাদের মনের ভক্তি জেগে ওঠে! নিজেরা নিজেদের দেবতাকে কেটে টুকরো টুকরো করে বহির্বিশ্বে ঠিকই রপ্তানি করতে পারে। কিন্তু মুসলিমরা বাজার থেকে গোশত কিনেও খেতে পারবে না। এটা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।

যদিও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিমদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার বিষয়টি পূর্ণ হয়েছিল, তবুও হিন্দুরা তাদের হিংসা ও শত্রুতা ছাড়ল না। এমনকি পরবর্তীকালে বিষয়টি রক্তক্ষয়ী ও ভয়ংকর যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াল। একদিকে গোঁড়া-কট্টর-পূজক হিন্দুশ্রেণি অন্যদিকে পাকিস্তানের ধৈর্যশীল মুসলিম জাতি—যারা অনেক আগ থেকে হিন্দুদের শত্রুতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। শিকার হয়ে আসছে এমন হত্যাযজ্ঞের, যার সাথে তুলনা হতে পারে রক্তক্ষয়ী ক্রুসেডের, বা তাতারিদের হিংস্র হত্যাকর্মের। এখনও কাশ্মীরে মুসলিমরা মূর্তিপূজক হিন্দুদের শত্রুতার মুখে প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও হত্যার শিকার হচ্ছে।

মুসলিমদের প্রতি এ শত্রুতার ফলে ভারত পাকিস্তানের ওপর সে জুলমপূর্ণ যুদ্ধকে চাপিয়ে দেয়, যার মাধ্যমে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় এবং পাকিস্তান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি পশ্চিম পাকিস্তান ও অপরটি পূর্ব পাকিস্তান। যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের নাম পাল্টে রাখা হলো বাংলাদেশ। এ যেন কাফিরদের Divide & Rule মূলনীতির আরেকটি নমুনা। কাফিররা অনেক আগ থেকেই মুসলিমদের বিভক্ত করে তাদের শোষণ করার জন্য এ মূলনীতি প্রয়োগ করে আসছে। ভারতের এ কর্ম ছাড়াও তাদের আরও অনেক ষড়যন্ত্রই রয়েছে আড়ালে। এ যুদ্ধে তাদের সহযোগী হিসাবে ছিল কমিউনিস্ট রাষ্ট্র রাশিয়া, যে রাষ্ট্র মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য তার সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করেছিল।

ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা কী?

ছোট্ট একটি প্রশ্ন, কিন্তু তার জবাব অনেক দীর্ঘ। ইংরেজিতে একে Secularism, আরবিতে علماني এবং বাংলায় 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' বলা হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা কী বা কাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের বেশি কষ্ট করতে হবে না। কারণ, 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' মতবাদের জন্মস্থান পাশ্চাত্যের দেশসমূহের লিখিত অভিধানগুলো আমাদের সে অর্থ অনুসন্ধানের কষ্টকে লাঘব করে দিয়েছে অনেকটাই। ইংরেজি অভিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' শব্দের নিম্নরূপ অর্থ এসেছে :

১. পার্থিববাদী অথবা বস্তুবাদী।

২. ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক নয় এমন।

৩. দুনিয়াবিরাগী নয়, সংসারবিরাগী নয়।[৯২০]

একই অভিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় এসেছে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এমন একটি দর্শন, যা চরিত্র, নীতি, নৈতিকতা ও শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুশাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে ধর্মহীনতার ওপর গড়ে উঠবে।

Encyclopædia Britannica-তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি সামাজিক আন্দোলন, যার লক্ষ্য হলো, মানুষদের আখিরাত থেকে ফিরিয়ে এনে দুনিয়ামুখী করা।

---

৯২০. দুনিয়াবিমুখিতা বা সংসারবিরাগিতা খ্রিষ্টানদের নিকট একটি ইবাদত, যা তাদেরই আবিষ্কৃত একটি পন্থা। সুতরাং যখন তারা বলে, 'সে সংসারবিরাগী নয়'-এর দ্বারা বোঝাতে চায় যে, সে ইবাদতকারী নয়। এটি প্রথম ও দ্বিতীয় সংজ্ঞার কাছাকাছি। যেমন মুসলিমরা মনে করে যে, সংসারবিরাগিতা হলো বিদআত, এ ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের মত ভিন্ন। তারা এটাকে বিদআত মনে করে না; বরং তারা এটাকে মনে করে সত্যিকার দ্বীন। তাই যখন তাদের কেউ বলবে যে, 'অমুক লোক সংসারবিরাগী নয়' তখন সে এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নেয়নি যে, সে বিদআত করে না; বরং তার উদ্দেশ্য থাকে, লোকটি ইবাদতের ধারে কাছেও নেই।

Encyclopædia Britannica-তে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনার অধীনে الإلحاد তথা নাস্তিকতার আলোচনা এসেছে। তাতে নাস্তিকতাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে :

১. তাত্ত্বিক নাস্তিকতা (إلحاد نظري)

২. ব্যবহারিক নাস্তিকতা (إلحاد عملي)

এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যবহারিক নাস্তিকতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৯২১]

উক্ত বর্ণনা দুটি বিষয়কে স্পষ্ট করে :

প্রথমত, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি কুফরি মতবাদ, যার লক্ষ্য হলো, দুনিয়াকে দ্বীনি প্রভাব থেকে মুক্ত করা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল কাজ হচ্ছে, পার্থিব জগতের সকল বিষয়কে দ্বীনি বিধি-নিষেধ থেকে দূরে রেখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও চারিত্রিকসহ সকল ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয়ত, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন কতক কুচক্রী মানুষদেরকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলার জন্য বলে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্দেশ্য হলো, 'পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ওপর উৎসাহিত করা ও তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা'। এ দাবির অসারতা উল্লিখিত অর্থ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে, যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' এর উৎপত্তি স্থল থেকে, যে পরিবেশে তার উৎপত্তি ও বেড়ে উঠা হয়েছে—তার থেকে।

তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে যদি বলা হয়, এটি হলো ধর্মহীনতা, তাহলেই কেবল তার প্রকৃত অর্থ ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রকাশ পাবে।[৯২২]

---

৯২১. নাস্তিকতার ওপর ইংরেজি অভিধান ও বিশ্বকোষের যে বিশ্লেষণ আমরা উল্লেখ করলাম, তা ড. মুহাম্মাদ জাইন আল-হাদি রচিত نشأة العلمانية বা 'সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

৯২২. মুহাম্মাদ বিন শাকির শরিফ কৃত আল-আলমানিয়্যাতু ও সামারাতুহাল খাবিসা : পৃষ্ঠা নং ৪-৫

ধর্মনিরপেক্ষতার রূপসমূহ

ধর্মনিরপেক্ষতার দুটি রূপ রয়েছে, যার একটি অপরটি থেকে নিকৃষ্টতর।[৯২৩]

প্রথম রূপ : সরাসরি নাস্তিকতা

এ প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বীনকে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখ্যান করে। সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক ও রূপদাতা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এসংক্রান্ত কোনো কিছুকে এ ব্যবস্থা স্বীকার করে না; বরং যারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ইমানের দাওয়াত দেয়, তাদের বিরুদ্ধে তারা শত্রুতা রাখে এবং যুদ্ধ করে। তাদের কুফরি চিহ্নিত করা সকল মুসলিমের পক্ষে সহজ।

আলহামদুলিল্লাহ, তাদের বিষয়টি মুসলিমদের নিকট স্পষ্ট। যে ব্যক্তি দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, সে ব্যতীত অন্য কেউ তাদের দিকে ধাবিত হয় না। এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতা সাধারণ মুসলিমদের জন্য কম বিপজ্জনক। কারণ, তারা সাধারণ মানুষকে সহসা ধোঁকায় ফেলতে সক্ষম হয় না, তবে দ্বীনের বিরুদ্ধে দ্রোহ, মুমিনদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া অথবা জেলে বন্দী করা কিংবা নির্যাতন ও হত্যা করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারাও কম ক্ষতিকর নয়।

দ্বিতীয় রূপ : পরোক্ষ নাস্তিকতা

এ প্রকার নাস্তিকতা প্রকাশ্যে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তাত্ত্বিকভাবে তার ওপর ইমান আনে, তবে দুনিয়ার কোনো বিষয়ে দ্বীনের কর্তৃত্ব মানে না। তাদের নিকট দ্বীন হলো নির্জীব এক বস্তুর নাম। তাদের আহ্বান পার্থিব সকল বিষয়কে দ্বীন থেকে পৃথক করা। সাধারণ মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেওয়া ও বিপথগামী করার ক্ষেত্রে এ প্রকার নাস্তিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা অধিক বিপজ্জনক। কারণ, তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না বা তার দ্বীনের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করে না, তাই তাদের কুফরির প্রকৃত অবস্থা অনেক মুসলিমের

৯২৩. ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরাসরি নাস্তিকতা ও পরোক্ষ নাস্তিকতা দুভাগে বিভক্ত করা হলেও উভয়টির একই বিধান। অর্থাৎ উভয় প্রকারই কুফরি।

নিকট অস্পষ্ট থাকে। দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও পর্যাপ্ত ইলমের অভাবে তারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে কুফরি বলে মনে করে না। মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিমই তাদের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জানে না।

অনেকের নিকট দ্বীনের সাথে পরোক্ষ নাস্তিকতার সাংঘর্ষিকতা স্পষ্ট নয়। কারণ, তাদের নিকট দ্বীনের রূপ হচ্ছে কয়েকটি ইবাদতের নাম। এদিকে পরোক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতা যেহেতু মসজিদে নামাজ আদায়, রমজানের রোজা রাখা, বাৎসরিক জাকাত দেওয়া ও বাইতুল্লাহ শরিফে হজ করাকে নিষেধ করে না, তাই তারা ধারণা করে নিয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কিন্তু যারা দ্বীনের সঠিক বুঝ রাখেন, তারা জানেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বীনের সাথে কতটা সাংঘর্ষিক। যে মতবাদ মানুষের জীবনের সব শাখায় আল্লাহর শরিয়তকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে, তার চেয়ে স্পষ্ট ও কঠিন ইসলামবিরোধী কোনো মতবাদ আছে কি? হায়, যদি তারা তা বুঝত!

এ প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী সংগঠনগুলো দ্বীন ও দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও নিশ্চিন্ত থাকে। কেননা, তারা জানে যে, কেউ তাদের কাফির ও দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত বলবে না। কারণ, তারা প্রথম প্রকারের ন্যায় নাস্তিকতাকে প্রকাশ করেনি। তাদের কাফির না বলা মুসলিমদের মূর্খতার প্রমাণ। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের ও সকল মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং এসব সংস্থা ও সংগঠনকে প্রতিরোধ করার ও সকল বাতিলকে নস্যাৎ করার তাওফিক দান করেন। আমিন!

সারকথা

নিঃসন্দেহে উভয় প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতাই সুস্পষ্ট কুফরি। যদি কেউ উল্লেখিত কোনো প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতাকে মনেপ্রাণে মেনে নেয়, তবে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

ইসলামই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট বিধান রয়েছে; চাই তা আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক, সামাজিক বা যেকোনো শাখা হোক। ইসলাম কখনো কোনো মতবাদকে তার বিধানে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না। ইসলামের প্রমাণিত কোনো বিষয় যে প্রত্যাখ্যান করল, সে কাফির ও পথভ্রষ্ট; যদিও তা পরিমাণে সামান্যই হোক না কেন।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের মাঝে ইমান ভঙ্গের অনেক কারণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে, তারা বিশ্বাস করে যে, নবিজি ﷺ-এর আদর্শ থেকে অন্য কারও আদর্শ উত্তম, তাঁর ফয়সালার চেয়ে অন্য কারও ফয়সালা উত্তম। আর এটি যে ইমান ভঙ্গের কারণ, তাতে কারও মতানৈক্য নেই।

ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীদের শ্রেণিভাগ

ইসলামি বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ মতালম্বীরা সংখ্যায় অগণিত। তাদের অনেকে লেখক, সাহিত্যিক বা সাংবাদিক, কেউ ইসলামি চিন্তাবিদ, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে অবস্থান করছে। তাদের বিরাট একটি অংশ বিভিন্ন মিডিয়া ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নানাভাবে কর্মরত ও কর্তৃত্বকারী। এ ছাড়া অন্যান্য পেশায়ও তাদের সংখ্যা কম নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবতা

ধর্মনিরপেক্ষতা এমন একটি পরিভাষা, যা দ্বীনকে দুনিয়া থেকে পরিপূর্ণ পৃথক করাকে বুঝিয়ে থাকে। বস্তুবাদের সাথে আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাকে বোঝায়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একপ্রকার নাস্তিকতার অর্থ ও সংজ্ঞার সমার্থক।[৯২৪]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো এমন এক মতবাদ, যার অধীনে সকল ধর্ম ও জড়বাদী আদর্শ স্থান পায়। যে জড়বাদ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা থেকে

৯২৪. ড. আলি জারিশাহ কৃত আসালিবুল গাজওয়ায়িল ফিকরি : পৃ. নং ৫৯, উস্তাজ মুহাম্মাদ কুতুব কৃত মাজাহিবু ফিকরিয়্যাতিম মুআসিরা : পৃ. নং ৪৪৫

সম্পূর্ণরূপে খালি। তাই বলতে গেলে এখানে সকল ধর্ম ও আদর্শ; চাই তা বাতিল হোক বা সঠিক হোক—সকলের সমঅধিকার রয়েছে। ফলে এখানে কুফর ও নাস্তিকতার সকল প্রকার, যেমন : ম্যাসনারি, অস্তিত্ববাদী, জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও পূজনবাদের সকল প্রকার, তা চাই পাথ রপূজা, গোত্রপ্রীতি, বর্ণবাদ যাই হোক—সকল প্রকার কুফর এখানে সমান। এগুলোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

যে মৌলিক বিষয়টির ওপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠিত, তা হলো ধর্ম ও জীবনের মধ্যকার সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করা। যেন ধর্মের সাথে বাস্তব জীবনের সামান্য পরিমাণও সম্পর্ক না থাকে। জীবনের প্রতিটি দিক—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক; মোটকথা জীবনের সকল দিকের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এটাই ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা।

ধর্মনিরপেক্ষতার রূপটি এমন নয় যে, জীবনের সাথে ধর্মের কিছু হলেও সম্পর্ক থাকবে অথবা ধর্মের কিছু নিয়ম-রীতি হলেও মানুষের বাস্তবিক জীবনে প্রতিফলিত হবে। কিন্তু মানুষ সহজে এ ব্যাপারটি বুঝতে পারে না। কারণ, মানবরচিত সংবিধান এ বাস্তবতাকে গোপন রাখে।

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র যে অবস্থার মাঝে বিরাজ করছে, তা হলো কুফরি ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থা। যেখানে ধর্মকে এক ঘরে করে রাখা হয়। ধর্মের যাবতীয় অনুষঙ্গ নিয়ে এবং জমিনের সাথে আসমানি সম্পর্ককে বিচ্ছিরি রকমের উপহাস করা হয়।

ধর্মের এ নিক্ষেপণ এবং ধর্মের প্রতি এরূপ উপহাসকরণ একরকম প্রকাশ্যই চলছে, যা বিভিন্ন কুফরি ও নাস্তিক্যবাদী রাষ্ট্রের মিডিয়াগুলো ফলাও করে প্রচার করেছে। যেমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ও তার শীর্ণকায় আবর্জনাতুল্য অনুসারী রাষ্ট্রগুলো অথবা স্বল্পসংখ্যক লোকবলবিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সে অনুসারী দলগুলো, যারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতার প্রতি আহ্বান করে, বা বাস্তব জীবন থেকে ধর্মকে পৃথক করে দেয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষতিকর দিকগুলো

পৃথিবীতে আল্লাহর অবাধ্য, নির্লজ্জ, ঔদ্ধত্য মানব শয়তানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য শয়তানদের একটার নাম হলো কামাল আতাতুর্ক। যে ব্যক্তি তুরস্কের মসনদে বসে, নাস্তিকতাপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মতো একটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ পাপের দিকে আহ্বান করেছিল। সে ইসলামি খিলাফতকে বাতিল ঘোষণা ও আরবদের ভ্রাতৃত্বকে ছিন্ন করেছিল এবং পুঁজিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর হলো, যখন কিছু আরব নেতা এ ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে নিজেদের স্বর উঁচু করল। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টানরা যেন একই সাথে এর অধীনে বসবাস করে!

নিশ্চয়ই এ আহ্বান ক্ষতির শেষ সীমায় নিয়ে ফেলেছে। এটি তো ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতিকর। কেননা, যদি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে আরব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যবিধান করা হয়, তবে ইহুদি বা নাসারাদের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং ক্ষতি হবে ইসলামের, অতঃপর মুসলিমদের।

ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি, ভাবধারাকে তাদের কিছু বাতিল গ্রন্থের সাথে সম্পর্কিত করে, যার মধ্যে বিকৃতি ও সংমিশ্রণের বেষ্টন রয়েছে। যেমন : তাওরাত, তালমুদ, মাশনা। প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত হবেন যে, এগুলো তার বাস্তবিকতা হারিয়ে ফেলেছে। কারণ, ইহুদিদের বিকৃতিকরণ ও সীমালঙ্ঘনের ফলে এ সকল গ্রন্থে মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে, এমন কোনো কথা বা জ্ঞান আর অবশিষ্ট নেই।

স্পষ্টত তাদের দ্বীনদারি থেকে বিচ্যুতির ফলে যেকোনো শাসক বা ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের অধীনে জীবনযাপন করলেও তাদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। কারণ, তাদের হারানোর মতো তো কিছুই নেই। চাই তা যে সময় বা যে স্থানেই হোক না কেন। আপনি কি লক্ষ করেছেন যে, কমিউনিজম আন্দোলনের প্রতি সর্বাপেক্ষা আহ্বানকারী হলো ইহুদিরা? এর প্রথম চিন্তাবিদ কার্ল মার্ক্স ছিল ইহুদি। ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবকে বেগবানকারী লেনিন ছিল অধিকাংশের মতে এক ইহুদি। এ বিপ্লব

প্রতিষ্ঠার সময় ও পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম কাউন্সিলের বেশির ভাগ সদস্য ছিল ইহুদি। আরব বিশ্বে কমিউনিজম পার্টিগুলোর প্রতিষ্ঠারা ইহুদি। এভাবে অন্যান্য অঞ্চলের কমিউনিজম কর্তাদের সকলে বা অধিকাংশই ছিল ইহুদি। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবায়নে ইহুদিদের কোনো ক্ষতি নেই; বরং এতে তারাই অধিক লাভবান হবে। তারাই এ ধর্মনিরপেক্ষতার আবহাওয়ায় অধিক সম্মানিত, অধিক লাভবান ও সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

অন্যদিকে খ্রিষ্টানরাও ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে, এ ধরনের রাষ্ট্রে বসবাসের কারণে তাদের দ্বীনদারি বা মূল্যবোধের কোনো কিছু হারাবে না। তাদের সামান্য পরিমাণও ক্ষতি হবে না। কারণ স্পষ্ট যে, খ্রিষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠার কিছু পর থেকে এর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এটি কিছু আচারের সমষ্টিরূপ বৈ কিছু নয়। এর মাঝে আধ্যাত্মিক কোনো আলোর বিকিরণ নেই, যা আত্মা ও মনে ভালো প্রভাব ফেলতে পারে। এ মতবাদের সাথে বাস্তবিক প্রয়োগের কোনোই মিল নেই। কেননা, খ্রিষ্টবাদ কোনো নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে না। এটা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি জীবনবিধান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। খ্রিষ্টবাদ শুধু গির্জার কিছু আচারের সাথেই সম্পৃক্ত। তাই কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বা অন্য কোনো মতবাদের অধীনে বসবাসে তাদের কোনো সমস্যা নেই। এ ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থাকা না থাকা উভয়টিই তাদের জন্য সমান।

অপরপক্ষে, ইসলাম ও মুসলিমগণ ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। যার মানে হলো, ইসলামের কর্তৃত্ব, শাসন ও তত্ত্বাবধান মানবতার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক ও প্রতিটি সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। আর এ সত্য সকল গবেষক ও জ্ঞানবান মাত্রই জানেন।

এটি একটি স্পষ্ট বাস্তবতা যে, ইসলাম মানবজীবনের দীর্ঘ সময়ের প্রতিটি অবস্থার নিয়মনীতি বর্ণনা করেছে। এমনকি মানুষ যখন জন্ম নেয়নি, এখনও সে ভ্রূণ অবস্থায় মায়ের পেটে, তখনও তার জন্য নিয়মনীতি ও গুরুত্বের কথা ইসলাম বর্ণনা করেছে।

যদি আমরা ধরে নিই যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাহলে ইসলাম তার প্রতিটি অনুষঙ্গে গুটিয়ে যাওয়া ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার শিকার হবে। যার সারকথা হলো, ইসলামের অস্তগমন ও পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণ। কেননা, ইসলামের স্থানে এসে যাবে নাস্তিকতাপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, যা খ্রিষ্টবাদ বা পূজনবান কিংবা ইহুদিবাদের মতো প্রভৃতি মতবাদের জন্য ক্ষতিকারক না হলেও মুসলিমগণ এতে নিঃসন্দেহে বিপদে পড়বে। যখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চালু হবে, তখন একমাত্র মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রতি তাদের সম্পর্কের অর্থই হবে—দ্বীন থেকে বিচ্যুতি, চিন্তা, বিশ্বাস ও আচারের মধ্যে আপসকামিতা।

যখন মুসলিমগণ দ্বীনের খুঁটি ও প্রতিরক্ষা থেকে চিন্তাগত, বিশ্বাসগত, চরিত্রগতভাবে বিচ্যুত হবে, তখন তাদের আর কীই-বা বাকি থাকবে? যখন তারা এসব থেকে বিচ্যুত হবে, তখন তারা কুৎসিত বিকৃত প্রেতাত্মায় পরিণত হবে। তারা সে অপরিচিত বহিরাগত মানুষের ন্যায় হয়ে পড়বে, যাদের প্রতিরোধ শক্তি, দৃঢ় বলবান বৈশিষ্ট্য উবে গেছে।

পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদের জীবন দর্শন হলো জড়বাদী বা বস্তুবাদী। এ মতবাদে এই পার্থিব জীবন ইবাদতের স্থান নয়; বরং পুরোপুরি ভোগের বস্তু বলে পরিগণিত। ভোগের পরিমাণও বল্গাবিহীন ও অপরিমিত। এর বাস্তবতা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি। ভোগের সামগ্রী অর্জনের জন্য, লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ ও ন্যায়-অন্যায়ের বাছবিচার করা হয় না। জীবনটা কয়েক দিনের, তাই এ অল্প সময়ে যত বেশি ভোগ করা যায়, যত বেশি অর্থ আয় করা যায়, সেই প্রতিযোগিতাই এখানে তীব্র। জড়বাদী এ সভ্যতায় যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দেখা যাচ্ছে, পরিবারে যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হচ্ছে, যৌনজীবনের যে ভয়ংকর কদর্যরূপ দেখা যাচ্ছে; তা জাহিলি যুগের আরব সমাজের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পুঁজিবাদের উদ্ভব

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে সে সমাজে সামন্তবাদ[৯২৫] প্রথা চালু ছিল। এ প্রথার বিরুদ্ধে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব ঘটে। এতে কৃষকশ্রেণির ওপর অত্যাচার কিছুটা কমে আসলেও কোনো সুরাহা হয়নি। এ সময়ে ইউরোপে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হলে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার সুযোগ হয়। তখন জমিদাররা ব্যাপকহারে কল-কারখানায় বিনিয়োগ করতে থাকে। হস্তশিল্পে তৈরি হওয়া জিনিস তখন থেকে মেশিনে তৈরি হতে থাকে। কুটিরশিল্পের মালিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। কৃষক, শ্রমিক ও এ ধরনের কুটির শিল্পের মালিকগণ কল-কারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়। পুঁজিপতিরা এ শ্রমিকদের স্বল্পই বেতন দিত। ফলে শ্রমিকদের বিরাট সংখ্যার বিপরীতে স্বল্পসংখ্যক বুর্জোয়া শ্রেণি ধনের মালিক হতে লাগল, যার কারণে ধন-বৈষম্য ক্রমেই প্রকট হতে থাকল ।

---

৯২৫. এ ব্যবস্থায় রাজা তার অধীন সামন্ত জমিদারদেরকে জমি ভাগ করে দিত। সামন্ত জমিদাররা সে জমিকে নিম্ন ভূস্বামীদের নিকট বন্টন করে দিলে নিম্ন ভূস্বামীরা তা কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে দিত। কৃষক মূলত চাষ করত, তবে জমি বা ফসলে তাদের কোনো অধিকার থাকত না। তাদের হাড়ভাঙা খাটুনিতে উৎপাদিত ফসলের নগন্য পরিমাণই তারা ভোগ করতে পারত।

পুঁজিবাদের প্রকৃত রূপ

পুঁজিবাদ এমন একটি ব্যবস্থা, যা সম্পদ উৎপাদন ও উপার্জনের বিভিন্ন পন্থা প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এ থেকে বুঝা যায় যে, পুঁজিবাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সম্পদ। এটি এমন এক সংগঠন, যাতে পণ্য সম্পর্ক থাকে মুখ্য, ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। পরিবার ক্রমাগত ক্ষুদ্র নিঃসঙ্গ পর্যায়ে নিছক বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার জায়গায় পরিণত হয়। রাষ্ট্র এখানে শাসন ও শোষণে হাত পাকিয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের দালালিতে গিয়ে ঠেকে।

এ থেকে বুঝে আসে যে, পুঁজিবাদ এমন ব্যবস্থার নাম, যাতে সম্পদই হলো সকল সমস্যার সমাধান ও যৌক্তিকতার ভিত্তি। এটি সকল পরিমাপকের উর্ধ্বে, চাই তা ধর্মীয় বা প্রচলিত নিয়ম হোক, কিংবা মূল্যবোধ ও চারিত্রিক দিক হোক। তাই রাজনৈতিক সমস্যা, ব্যষ্টিক ও সামাজিক আচার-আচরণসহ সকল দিক ও গুরুত্ব বিবেচনায় কল্যাণের পরিমাপক হলো সম্পদ। ফলে প্রমাণ উপস্থাপন বা দাবি পেশ করার জন্য কারও কাছে চারিত্রিক, দ্বীনি বা আসমানি শিক্ষার কোনো মূল্য থাকে না।

পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি

জড়বাদী বলতে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উদ্দেশ্য। যার মূলমন্ত্র হলো, খাও, দাও ফূর্তি করো। দুনিয়া ভোগের জায়গা, তাই এখানে ভোগ করতে থাকো। আখিরাত বলতে কোনো জগৎ নেই! তাই দুনিয়াতেই সব উপভোগ করে নাও!

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন

এ ব্যবস্থায় সরকার একজন ব্যক্তিকে যতটুকু সুযোগ দেয়, ব্যক্তি ততটুকু ধর্ম পালনেরই কেবল সুযোগ পেয়ে থাকে। পুঁজিবাদে সব ধর্মই সহাবস্থান করে একই সাথে। কর্মক্ষেত্রে অসুবিধার কারণ না হয়ে, পুঁজিবাদী উৎপাদন চক্রের কোনো রকম বিঘ্নতা না ঘটিয়ে বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপের কোনো

আশঙ্কা সৃষ্টি না করে ব্যক্তি তার নিজ ঘরের কোণে অথবা ইবাদতখানায় ঘুপটি মেরে ধর্ম পালন করতে পারে।

অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা

এখানে ব্যক্তি নিজের অর্থসম্পদ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করতে পারে। একজনের নিজের খেয়াল-খুশিমতো যেকোনো কিছুই করার স্বাধীনতা রয়েছে। তার এই স্বাধীনতার সামনে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে কেবল তারই তৈরি আইন, স্বেচ্ছাচারী শাসক ও ক্ষেত্রবিশেষে সার্বিক শক্তির। ভোগের ক্ষেত্রে উন্মত্ত-উন্মাদ হয়ে পড়লেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। সে নিজে নিবৃত্ত না হলে তাকে নিবৃত্ত করার সাহস কারও নেই। পৃথিবীর বুকে লক্ষ লক্ষ মানবসন্তান ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যাক, কিন্তু তার টেবিলে খাবারের পসরা থাকা চাই। এমনিভাবে বিনিয়োগ, বণ্টন, উৎপাদন, পারিবারিক জীবনসহ সর্বত্রই তার এই স্বাধীনতা স্বীকৃত ও ব্যবহৃত।

অবাধ অর্থনীতি

উৎপাদকদের মধ্যে উৎপাদনের নতুন নতুন কলাকৌশল, অধিক মুনাফা, কম খরচে উৎপাদন ও কম মূল্যে ভোক্তাদের কাছে দ্রব্য সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকে সব সময়। বেশি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদকশ্রেণি শ্রমিকদের ওপর চালায় নির্মম শোষণ, তাদের বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়, কম পারিশ্রমিক প্রদান করা এবং কম টাকায় বেশি শ্রম আদায়ের চেষ্টা করা হয়। পুঁজিবাদ অর্থ উপার্জনের জন্য হারাম-হালালের কোনো তোয়াক্কা করে না।

ব্যক্তির নিরঙ্কুশ মালিকানা

এই অর্থব্যবস্থায় দেশের সম্পদের অধিকাংশই সমাজের পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। সমাজের আয়-ব্যয়ে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ধনীরা আরও ধনী হতে থাকে এবং দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হতে থাকে।

গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন

এ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে ধরা হয় শাসনের নিয়ম হিসাবে। তবে মূলত ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতেই কুক্ষিগত থেকে যায়। বেচারা গরিব মানুষের সামনে গণতন্ত্রের মুলো ঝুলে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনো বিশেষ উন্নতি হয় না।

পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুঁজিপতিরা যখন নিজ দেশে বাজার পায় না, তখন তারা অন্য দেশের বাজারের দিকে হাত বাড়ায়। ধীরে ধীরে সেখানে কারখানা বানায়। পণ্য উৎপাদন করে। একসময় সে দেশের অর্থরাশি কুক্ষিগত করে। সে দেশের সম্পদ নিজ দেশে নিয়ে আসে। এমনকি অনেক সময় সে দেশের ওপরই কবজা প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

সংক্ষেপে পুঁজিবাদের বর্তমান চরিত্র

১. একক পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ।

২. অর্থনৈতিক বৈষম্যের চরম অবস্থা। ১৯৯৬ সালের রিপোর্ট মতে ধনী-দরিদ্রের জীবনযাপনের ব্যয়সূচক বিগত দুই দশকে ১০ : ১ হতে ৭০ : ১ এ উন্নীত হয়েছে।

৩. বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ছলে বিশ্বকে শোষণের কৌশল গ্রহণ।

৪. যুগপৎ চরম দারিদ্র্য ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের নিত্যকার দৃশ্য।

৫. স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পুঁজিবাদী জীবনাদর্শের স্লো পয়জনিং।

৬. এনজিও কালচার পত্তনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শোষণের বিস্তৃতি।

৭. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মোড়লগিরি গ্রহণ।

৮. ইসলামের মোকাবেলায় সমাজতন্ত্রের সাথে অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ।[৯২৬]

৯২৬. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান কৃত, ইসলামি অর্থনীতি : পৃ. ২৯১ (দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, রাজশাহী- ৪র্থ সংস্করণ ২০০৫)

পুঁজিবাদের ফলাফল

এ মতবাদে দান-দক্ষিণা, লজ্জা-ভদ্রতা, প্রতিবেশী ও মেহমানের আপ্যায়ন, দুর্বলের ওপর দয়া, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করার মতো দ্বীনি বা মানবিক মূল্যবোধ থাকার ধারণা পর্যন্ত করা দুষ্কর। পুঁজিবাদে ধর্মের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। তবে এতটুকু ছাড় দেওয়া হয় যে, চরম হীনতার সাথে ধর্ম পালন করা যায়। ধর্ম এতটুকু গুরুত্বহীনতায় পৌঁছে যে, ঘরের কোণে বা ইবাদতখানায় কিছুটা আশ্রয় পায়।

মোটকথা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানবজীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যষ্টিক, চৈন্তিক দিকসহ সকল ক্ষেত্র ধর্মের নিয়ন্ত্রণহীন। কেননা, পুঁজিবাদ ভিত্তিগতভাবে পুরোপুরি ধর্মকে মানুষের বাস্তবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে জীবন এক জিনিস, ধর্ম অন্য জিনিস। ধর্মের সাথে জীবনের কোনো সম্পর্কই নেই।

যদি সত্য, কল্যাণ, গুণগতমান বিবেচনার ক্ষেত্রে ধর্ম সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যায়, তবে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? নিঃসন্দেহে তখন অবস্থা এমন বেগতিক রূপ ধারণ করবে যে, আসমানি শিক্ষা থেকে মানবজীবন বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জীবন দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যে পূর্ণ হয়ে যাবে, জীবন ভরে যাবে দুর্দশায়।

এ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে :

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে।[৯২৭]

যখন সমাজ থেকে দ্বীনের সূর্য অস্তমিত হবে, কল্যাণের ঐশী আহ্বান বন্ধ হয়ে যাবে, এমনকি মানুষের মন-মানসিকতা থেকে আল্লাহভীতি লুপ্ত হয়ে যাবে, তখন কিসের সম্ভাবনার ঘনঘটা দেখা দেবে? হীনতা, নীচতা, ঔদ্ধত্য, পতনের আর কোন স্তরটি বাকি থাকবে?

৯২৭. সুরা তহা : ১২৪

পুঁজিবাদে কল্যাণ আছে কি?

যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ও অবাধ মুনাফা নিষিদ্ধ নয়; বরং এর ওপর ভিত্তি করেই এ ব্যবস্থার ভিত্তি, তাই যে কেউ যেকোনো পণ্য হারাম হোক বা হালাল, ক্ষতিকর হোক বা উপকারী, মোটকথা অর্থ উপার্জিত হয়, এমন সকল দিকই পুঁজিবাদে বৈধ।

নিঃসন্দেহে মানুষ এমন অবাধ সুবিধার ফলে বিকৃতমনা হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হবে। পুঁজিবাদের মাঝে বাহ্যত যে কল্যাণ আছে, তা খুবই সংকুচিত। এ কল্যাণ স্বার্থবাজ দাম্ভিকদের জন্যই সংরক্ষিত। নির্দয় জালিমরাই সে কল্যাণের অধিকারী হতে পারে। যাদের কোনো কিছুই তৃপ্ত করতে পারে না, এমন লালসাকামীদের জন্যই এ অধিকার প্রযোজ্য।

অন্যদিকে পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় যে পরিবার থেকে দ্বীনের আলো অদৃশ্য হয়ে যায়, সে পরিবার বিভিন্ন ফাসাদ ও ফাটলের কবলে পড়ে পদে পদে হোঁচট খায়। পরিশেষে পরিবারটি ভেঙে খান খান হয়ে যায়। যেমনটা আমরা পশ্চিমা বিশ্বের পরিবারসমূহে দেখি যে, তাদের প্রায় প্রতিটি পরিবারই আমিত্ববোধ, কলহ ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। পরিশেষে তালাক ও অশান্তিই তাদের শেষ পরিণতি।

এমনিভাবে ব্যক্তি ও পরিবার নিয়ে গঠিত একটি সমাজ যখন পুঁজিবাদ ব্যবস্থার অধীনে আসে, তখন তাতে কেবল বিরোধিতা ও বিশৃঙ্খলাই বিরাজ করে। বিভিন্ন ফাসাদ, অপরাধ ও নিকৃষ্ট কার্যকলাপে উত্তাল হয়ে ওঠে। সামাজিক রোগব্যাধির অন্ত থাকে না। এ সমাজে দুঃখ, হতাশা থেকে জন্ম নেয় আত্মহত্যার মতো ঘটনা।

অতঃপর বিভিন্ন নেশার প্রতি আসক্তি। যেমন : মদ, আফিম, ড্রাগ, ভেলিয়াম। যৌনাঙ্গসমূহে আক্রান্তকারী সংক্রামক যন্ত্রণাদায়ক রোগ। যেমন : হারপেস, সিফিলিস, গনোরিয়া। অতঃপর আসে শরিয়ত বহির্ভূত পন্থায় আসা সন্তানের কথা, যা হারাম পন্থায় ব্যভিচারের মাধ্যমে এসেছে।

অতঃপর তালাকের পরিমাণ, যা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। দিনদিন বৈবাহিক জীবন নিয়ে মানুষের মাঝে তাচ্ছিল্যতা বাড়ছে। দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে নিজেদের নিষ্কৃতি দিতে আগ্রহী হচ্ছে। যতদিন বাজারে বাজারে নারী, মদ্যশালা ও পতিতালয় সহজলভ্য হবে, ততদিনই এ অবস্থা বিরাজ করবে।

সারকথা, বহু পর্যবেক্ষণ ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে ব্যাপক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, যা ধ্বংস, বিনাশ ও বিপথগামিতার দিকে নিয়ে যায়। তারপর আসে বিভিন্ন স্বার্থপরতা ও আত্মিক রোগ। পরিবারের মধ্যে দেখা দেয় বিভেদ। ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আদালতের কক্ষে এনে দাঁড় করায়। পরস্পরের মাঝে মামলার ঠুকাঠুকি চলে। তালাক, ঝগড়া-বিবাদ ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা চলতে থাকে। এমনি করে একটি সমাজকে অধোমুখী করে ধ্বংস করে ফেলে। বিভিন্ন অশ্লীলতা, পাপাচারিতা সমাজকে নষ্ট করে ফেলে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এমন সব মাধ্যমকেই আশ্রয় করে চলে, যা সম্পদ অর্জনে তার প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। পুঁজিবাদ কর্তৃক গৃহীত এ সকল মাধ্যম দ্বীন ও তার প্রত্যাশার প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না। আসমানি কিতাবে নাজিল হওয়া হালাল-হারাম বিধানের ব্যাপারে মোটেও চিন্তা করে না; বরং হালাল-হারামের এ চিন্তার ব্যাপারে পুঁজিবাদের রায় হচ্ছে, এটি কেবলই পশ্চাদগামিতা, যাকে মোটেও তোয়াক্কা করা উচিত নয়।

এ ব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জনের যে প্রধান মাধ্যমগুলো রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো সুদ। এ বিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে আমরা এ আলোচনা করেছিলাম যে, ইসলাম বীভৎসতা ও ন্যাক্কারজনক অপরাধগুলোর মাঝে সুদকে জঘন্যতম বলে থাকে। কিন্তু সুদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদ অর্জনের একটি অভিজাত পন্থা বলে পরিগণিত হয়। এর মাধ্যমেই সম্পদ অর্জন ও তার প্রবৃদ্ধি ঘটানো হয়। এ সুদি ব্যবস্থার ফলে সুদগ্রহীতার অন্তরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে, যা তাকে ঘৃণ্য স্বার্থবাজে পরিণত করে। যার ফলে তার অভ্যাসে পরিণত হয় যে, সে ঋণগ্রহীতাদের নিকট

থেকে একে একে তাদের সবকিছু কেড়ে নেয়। তাদের অভাবকে সম্পদ উপার্জনের সুযোগ হিসাবে কাজে লাগায়। সুদি ঋণ দেওয়ার সময় একটি নির্দিষ্ট হারে তার সুদকে বাড়াতে থাকে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের রেট বসাতে থাকে। এ ঘৃণ্য সুযোগ গ্রহণকে ইসলাম হারাম করেছে আর পুঁজিবাদ তাকে বৈধতার মান দিয়েছে। এ ধরনের সুযোগ হরেক রকমের, যার মাঝে কয়েকটি হলো—বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য, ইন্স্যুরেন্স, জোরপূর্বক সম্পদ কেড়ে নেওয়া, ঘুষ গ্রহণ ও অন্যায়ভাবে সম্পদ হস্তগত করা।

কমিউনিজম

কমিউনিজম নাস্তিকতাপূর্ণ ও উগ্রপন্থী একটি মতবাদ; বরং অনেকাংশে এটি সকল কুফরি মতবাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘন্য। কমিউনিজম অন্যান্য মানবরচিত মতবাদের তুলনায় আল্লাহ, নবি-রাসুল ও ধর্মের ব্যাপারে অধিক পরিমাণে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে থাকে। শুধু নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়ই নয়; বরং এই গোষ্ঠীটি সমগ্র মানবতাকে ঘৃণা করে এবং একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে হত্যা-লুণ্ঠনের জন্য লেলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

কমিউনিজমের এমন অকল্পনীয় ও অদ্ভুত চরমপন্থার নেপথ্য কারণ সম্পর্কে জানার জন্য স্বয়ং এর প্রবর্তক কার্ল মার্ক্সের দিকে তাকালেই সহজে আমরা বুঝতে পারব। কার্ল মার্ক্স ছিল নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একজন মানুষ। অন্যদের সাথে যার কোনোই মিল ছিল না। সে ছিল বক্র ও অস্বাভাবিক হৃদয়ের অধিকারী মানসিক রোগের ব্যাধিমন্দির। অবশ্যই তার সবচেয়ে কাছের মানুষরাই তার সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে থাকবে। একই মতাদর্শে অনুপ্রাণিত তার ছাত্র ও সহচর, 'কার্লমার্ক্স : জীবন ও কর্ম' গ্রন্থের রচয়িতা অটো রুহুল[৯২৮] বলেন, 'কার্ল মার্ক্স মানসিক প্রফুল্লতাহীন ও রুগ্ন প্রকৃতির ছিল। সর্বদা অস্থিরচিত্ত ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে থাকত। সর্বদা কুমন্ত্রণায় পূর্ণ ছিল তার অন্তর। যেমন নাকি কেউ কুমন্ত্রণার বশবর্তী হলে তার অন্তর কূটকৌশলে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।'[৯২৯] ধারণা করা হয়, এমন হিংসা ও ঘৃণার ওপর তার বেড়ে ওঠার কারণ হয়তো ইহুদিদের সাথে তার সম্পৃক্ততা। আর সে সময় ইহুদিদের সাথে সম্পৃক্ততাকে খ্রিষ্টানরা কষ্টদায়ক ও অবিশ্বস্ততা বলে ভাবত।

কমিউনিজমের উৎপত্তি

পুঁজিবাদের উত্থানের পর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী যাবৎ পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলন বেগবান হলো। পুঁজিবাদের ফলে সৃষ্ট ধন-বৈষম্য থেকে

---

৯২৮. Karl Marx. His life and work by Otto Rühle translated by Eden Cedar Paul.

৯২৯. উস্তাজ আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ কৃত কিতাবুশ শুয়ুইয়্যাহ ওয়াল ইনসানিয়্যা : পৃ. নং ৩১

উত্তরণের জন্য সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের উৎপত্তি ঘটল। এর প্রবর্তকরা স্বপ্ন দেখেছিল, এমন একটি স্বর্গরাজ্যের যেখানে 'বুর্জোয়া সম্প্রদায়'-এর বিলুপ্তি ঘটে শ্রেণিবৈষম্যহীন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু ইতিহাস বলে, এ সব স্বপ্নদ্রষ্টারাই একসময় হয়ে ওঠে নতুন শোষকসম্প্রদায়।

কমিউনিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শনের মূলভিত্তি হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিছক কোনো দর্শন নয়; বরং তথাকথিত বিজ্ঞানের সমগোত্রীয়। যেহেতু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিজ্ঞান থেকে শক্তি আহরণ করেছে বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জগৎ ও জীবনের সার্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দান করে থাকে, তাই একে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদও বলা হয়।

জার্মান দার্শনিক হেগেলের তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথিসিস। আজকের বাস্তবতাই থিসিসের ফল। এই থিসিসের বিরুদ্ধে তৈরি হয় এন্টিথিসিস। দুয়ের সংঘর্ষে উদ্ভব হয় সিনথিসিসের। এই সিনথিসিসই পরবর্তীতে পুনরায় থিসিস হয়ে দাঁড়ায়। বিরোধমূলক বিকাশের ধারণার দ্বারা মার্ক্স বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মার্ক্স ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে তার তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস পায়। সেই প্রয়াসে বারবার শ্রেণি সংগ্রাম প্রসঙ্গকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তার মতে পৃথিবীর বিকাশ হয়েছে বিবর্তনবাদ ও শক্তিবাদের মধ্য দিয়ে। চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) ও প্রকৃতির নির্বাচন (Natural Selection) বা যোগ্যতমেরই বেঁচে থাকার অধিকার তত্ত্ব (Survival of the Fittest) মার্ক্সকে তার মতবাদে আস্থাশীল হতে বিপুলভাবে সহায়তা করেছিল। ফলে তারা জোরেশোরেই প্রচার করতে থাকে, পৃথিবীর ইতিহাসে শক্তিমানরাই শুধু টিকে থাকবে, অন্যরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের মতে পৃথিবীর ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে।

এখন আমরা মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দর্শনকে মার্ক্সের প্রস্তাবিত কমিউনিজম বা শ্রেণিহীন সমাজ দ্বারা বোঝার চেষ্টা করি। আমরা জানি, পুঁজিবাদের বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে মার্ক্স কমিউনিজমের প্রস্তাব দেয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদ ওই সময়ে বিরাজমান ছিল থিসিস হিসাবে। মার্ক্স পুঁজিবাদের বিপরীত এ্যান্টিথিসিস বা প্রতিপ্রস্তাব হিসাবে কমিউনিজমের প্রস্তাব দেয়। এই থিসিস (পুঁজিবাদ) এবং এ্যান্টিথিসিসের (কমিউনিজম) মিথক্রিয়ায় সভ্যতা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী হিসাবে নতুনভাবে বিকশিত হয়েছে। আর এই নতুন বিকাশটা একটা প্রস্তাব হিসাবে দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অর্থব্যবস্থার দ্বান্দ্বিকতার সংশ্লেষণে তৃতীয় এক অর্থব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। আর সেটা হলো মিশ্র-অর্থব্যবস্থা। এখানে এসে মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন দ্বান্দ্বিক উপায়ে নিজের প্রস্তাবকে নাকচ করে নতুন রিলেশন অব প্রডাকশন তৈরি করে।

এখন কথা হলো, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যেহেতু বৈজ্ঞানিক আর এদিকে মানব সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেহেতু চিরন্তন, তাই সভ্যতা বিকাশের এক পর্যায়ে মানুষের আচরণগত মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রেণিহীন সমাজ বিকাশ লাভ করতে পারে বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিক নিয়মে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মার্ক্স প্রস্তাবিত কমিউনিজম বা শ্রেণিহীন সমাজে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন কাজ করবে কিনা? মানবসমাজ যেহেতু গতিশীল, তাই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ শ্রেণিহীন সমাজেও একইভাবে কাজ করবে। একটা বিশেষ পর্যায়ে শ্রেণিহীন সমাজে দ্বন্দ্ব তৈরি হবে এবং নতুনভাবে ইতিহাস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী উপায়ে বিকাশ লাভ করবে। এই জায়গায় এসে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তার আবিষ্কারককেও অস্বীকার করে, তাকে টেক্কা দিয়ে নতুন রূপ লাভ করে।

ধর্মের উৎখাত

সমাজতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর হলো নাস্তিক্যবাদ (Atheism)। মার্ক্স-এঙ্গেলস গভীরভাবে বিশ্বাস করত যে, ধর্মই সব অনর্থের মূল। ধর্মের কারণে সমাজে শোষণ দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। তাই এর বিনাশ ও উচ্ছেদ অপরিহার্য।

৩. ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ

এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ ও মুনাফা অর্জন নিষিদ্ধ। এ মতবাদে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। ফলে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিশোষণ বিলুপ্ত হবে। ব্যক্তিগত সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হবে।

৪. নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, কলকারখানা, জমি, সম্পদ ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত থাকবে। এই অর্থব্যবস্থায় জাতীয় আয় বণ্টনের মূলনীতি হলো, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। এভাবে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. রাষ্ট্রীয় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা

এখানে ব্যক্তিসত্তার কোনো মূল্যই নেই। তার কথা বলার, প্রতিবাদ করার কোনোই অধিকার নেই। তার জীবনের সর্বক্ষেত্র—পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্র, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সবই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। যতটুকু স্বাধীনতা পার্টি অনুমোদন করবে, তার বেশি চাওয়ার অধিকার তার নেই। পার্টিই ঠিক করে দেবে, কেমন হবে তার আচরণ, কর্মক্ষেত্র, বিশ্বাস; এমনকি তার পরিবারও। এর ব্যত্যয় ঘটল কি না, তার তদারকি ও খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রয়েছে গোয়েন্দা বাহিনী। সে বাহিনী এতই বিশাল এবং এতই ব্যাপক তার নেটওয়ার্ক যে, সেখানে স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে, স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে, পুত্র তার পিতার বিরুদ্ধে ও পিতা তার পুত্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে। পার্টি বস—এলাকার কমরেড চীফের সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে দাঁড়ায় জীবনের সর্বপ্রধান বা একমাত্র ব্রত।

৬. শ্রেণিহীনতা

কমিউনিজম বা সাম্যবাদের মূলমন্ত্রটি হলো, এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সবাই সমান অধিকার লাভ করবে। ধনী-গরিব বলতে কোনো শ্রেণিবিভাগ থাকবে না।

৭. সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন

কমিউনিজমের এক পর্যায়ে এসে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, একদল বলে ওঠে, এ মতবাদ বিশ্বে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সবাইকে এ মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করতে হবে। অন্যদিকে অপরদল বলে, এ ব্যবস্থা যে দেশে প্রতিষ্ঠিত তাতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। প্রথম দলকে উগ্র সমাজতন্ত্রী বা উগ্র কমিউনিজম বলে। আর দ্বিতীয়টিকে নরমপন্থী কমিউনিজম বলে। উগ্র সমাজতন্ত্রী বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরবর্তীতে শক্তিশালী হয়ে বিভিন্ন দেশ দখল করতে থাকে। একসময় তারা আফগানিস্তানে তাদের নাপাক পা ফেললে এখান থেকেই তাদের ধ্বংসের ঘন্টি বেজে ওঠে।

কমিউনিজমপ্রীতির কারণ

প্রত্যেক বিবেকবান লোকই এই প্রশ্ন করে থাকবেন যে, এমন হিংসুটে, বক্র ও ব্যতিক্রমধর্মী মতাদর্শ কীভাবে সুপথ প্রদর্শক, মানবতাকে কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী এবং যুগের পর যুগ ধরে দেশ ও জাতির দর্শন হতে পারে? এমন পচা থিওরি কীভাবে জাতিকে ন্যায়পরায়ণতা, শান্তি-নিরাপত্তা ও সৌহার্দ্য-সহায়তা উপহার দিতে পারে? সেক্যুলারিজম মানবতার এসব প্রয়োজনীয় চাহিদার কোনোটিই এ পর্যন্ত জোগান দিতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। কারণ, স্বয়ং সেক্যুলারিজমের প্রবর্তক কার্ল মার্ক্সের মধ্যেই এসবের ছিটেফোঁটাও ছিল না। সুতরাং যার মধ্যে এগুলোর কোনোটিই বিদ্যমান নেই, সে কীভাবে জাতিকে ভ্রষ্টতার আঁধার থেকে তুলে এনে আলোর পথের দিশা দেবে!?

একমাত্র পথভ্রষ্ট ও অস্বাভাবিক স্বভাবের অধিকারীরাই মার্ক্সবাদের মতো ভ্রান্ত ও চরমপন্থী মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। এই প্রকৃতির মানুষগুলো

মূলত রোগাক্রান্ত। এখানে রোগ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ব্যতিক্রমধর্মী কিছু বাহ্যিক আলামত, যেগুলো চালচলনের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। যেমন : শক্ত হৃদয় ও কঠিন স্বভাবের অধিকারী হওয়া, নির্দয় ও নম্রতাশূন্য হওয়া, অধিক পরিমাণে ধোঁকাবাজি করা, নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা ও নাশকতামূলক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং উত্তম ও সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতিকে বর্জন করা।

এগুলো ছাড়াও কমিউনিজমপ্রীতির আরও চারটি উল্লেখযোগ্য কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

জুলুম-নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া

পশ্চিমা উপনিবেশের আগুনে দগ্ধ হওয়া বিভিন্ন জাতির ওপর চলা নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় অনেকে এ মতাদর্শের দিকে এসেছে। পশ্চিমাদের এই অবৈধ উপনিবেশের ভিত্তি ছিল অন্যায়-অবিচার, শত্রুতা ও সীমালঙ্ঘনের ওপর। চার্চের শোষণ-পীড়ন চলছিল সমগ্র ইউরোপ জুড়ে, এমনকি এ অত্যাচার আফ্রিকাতেও চলছিল নির্মমভাবে। সেই সাথে রাজ-ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় এই অত্যাচার সমাজের সর্বত্র দীর্ঘকাল যাবৎ স্থায়ী ছিল। এমন অকথ্য নির্যাতন ও অবিচারের ভয়ে নিপীড়িত মানুষগুলো এই ভেবে মার্ক্সবাদীদের প্রতি ঝুঁকতে শুরু করে যে, এতেই হয়ত আমরা এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে রেহাই পাব।

ধনীদের প্রতি ঈর্ষা

ধনী, জ্ঞানী, প্রভাবশালী ও বিচক্ষণ লোকদের প্রতি ঈর্ষাও এ মতবাদের সাথে যুক্ত হওয়ার একটাই কারণ। এমন লোকেরা দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও প্রাণবন্ত যোগ্যতার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ ও প্রাচুর্যতা অর্জনের জন্য নিম্নশ্রেণির লোকদের ওপর নির্যাতন করে থাকে। আর এদিকে অক্ষম ও অযোগ্য মানুষেরা জীবিকার স্বল্পতা ও কষ্টের ছায়াতলে জীবনযাপন করে। তাই অধিকাংশ দরিদ্র শ্রেণির লোকেরাই এ আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকে।

প্রাচুর্যময় জীবনের লোভ

যারা মার্ক্সবাদ নিয়ে আন্দোলন করে এবং এর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দোহাই দেয়, তারা নিজেদের মনোবৃত্তি, পদোন্নতি এবং উন্নত ও প্রাচুর্যময় জীবনযাপনের জন্য অতি নিকৃষ্ট পন্থাও অবলম্বন করতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না। তাদের অধিকাংশই মূলত এর মাধ্যমে কিছু অর্থ-সম্পদ উপার্জন করার লক্ষ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে সচ্ছল হতে এতে যোগ দেয়।

বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ

বিকৃতমনা হওয়া বা প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণে অনেকে নিজ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট ও সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, একমাত্র বক্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও অস্বাভাবিক হৃদয়ের অধিকারীরাই সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনাকে সানন্দে গ্রহণ করে নিতে পারে। আর কেমন যেন এমন প্রকৃতির মানুষগুলো মার্ক্সীয় চিন্তা-চেতনার মাঝে তাদের প্রাণময় ও সুখকর জীবনযাপনের সকল উপকরণ পেয়ে যায়। এ জন্যই অধিকাংশ সাম্যবাদীরা অন্যান্য মানুষের মতো স্বাভাবিক হয় না; বরং তারা অনেকটা অস্বাভাবিক প্রকৃতির, কুরুচি ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। কমিউনিজমের মাঝেই তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু খুঁজে পায়। তাদের এসব কার্যকলাপ, যেমন : দাহযুক্ত হিংসা, নির্বুদ্ধিতাময় প্রতারণা ও অপছন্দনীয় অন্ধত্ব খুবই নিন্দনীয় বিষয়।

এ আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট লোকেরা এর বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ। যদি তাদের সাম্যবাদের নিয়ম-নীতি, গতি-প্রকৃতি, চিন্তা-চেতনা ও ভিত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তাদের মুখ থেকে কেবল ধারণাপ্রসূত কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য শোনা যাবে। এরাই হচ্ছে ধোঁকাগ্রস্ত ও অজ্ঞ, যাদের ব্যাপারে ফ্রীম্যাসনিদের[৯৩০] দেওয়া অন্ধ উপাধিটি প্রযোজ্য।

---

৯৩০. ইহুদিদের গোপন একটি সংগঠন।

কমিউনিজমের মূলনীতিসমূহ

কমিউনিজমের চারটি মূলনীতি নিম্নরূপ :

দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রুপ

কমিউনিজম সম্পূর্ণ একটি বস্তুবাদী ও নাস্তিকতামনা মতাদর্শ, যা আল্লাহ, নবি-রাসুল ও দ্বীন-ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করে। মার্ক্সবাদের দর্শনতত্ত্ব বিষয়ে কার্ল মার্ক্স নিজেও বলত যে, এটি একটি বিতর্কিত, বস্তুবাদী, নাস্তিক্যমনা এবং ধর্মের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন মতবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের ইতিহাস যার উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে।[৯৩১]

মার্ক্সবাদের নীতির ব্যাপারে লেনিন বলেছে, এই মতাদর্শের পক্ষে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। অবশ্যই এটা সকল জড়বাদী মতাদর্শের প্রাথমিক নীতি। কিন্তু মার্ক্সবাদ এখানেই ক্ষান্ত থাকেনি; বরং তারা আরও অগ্রসর হয়ে বলে যে, আমরা ধর্মের জন্য কীভাবে যুদ্ধ করব, তা জানা আবশ্যক।[৯৩২]

আর মার্ক্সবাদ এমন একটি জড়বাদী ও অবিশ্বাসী মতাদর্শ, যা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে পরিপূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার ব্যাপারে তারা আল্লাহ তাআলার পূর্ণতাকে গ্রহণ না করে বস্তুবাদী ধারণা লালন করে। তাদের এমন চিন্তা-চেতনার পক্ষে প্রবৃত্তিপূজা ছাড়া কোনো প্রামাণ্য বা যুক্তিগত সনদ-সূত্র নেই। কোনো সুস্থ বিবেকেবান ব্যক্তি এমনটি মেনে নেবে না। মার্ক্সের এমন অস্বীকৃতি ও ঔদ্ধত্য শুধু চেতনাহীন গির্জার মধ্য থেকে উৎপাদিত ঘৃণিত কর্মের ফসল বৈ কিছু নয়। যে গির্জাগুলো ইহুদিদের বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন রকম শাস্তিতে ভুগিয়েছে। যেমন : হত্যা, লুণ্ঠন, ধ্বংস-বিনাশ, বিচ্ছেদ-বিভক্তি ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের কষ্টদান। ইসলাম ও আল্লাহ তাআলার প্রতি কার্ল মার্ক্সের অবজ্ঞার পেছনে গির্জার এ সমস্ত অমানবিক নির্যাতনের প্রভাব রয়েছে।

---

৯৩১. মুহাম্মাদ কিব্বা অনূদিত এবং আফিফ আখদার সম্পাদিত আল-মাওকিফ মিনাদ দ্বীন লি লেনিন : পৃ. নং ২৫

৯৩২. প্রাগুক্ত

আর নিঃসন্দেহে দ্বীনে ইসলাম ও আল্লাহ তাআলার প্রতি এমন অবজ্ঞা ও অস্বীকৃতি মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের বিপরীত। এটা অবশ্যই মানবজাতির আত্মিক ও মানসিক স্বভাবের সাথে এক নির্লজ্জ শত্রুতা। মানুষ অন্তরের অন্তস্থল থেকে স্বীকার করে যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা এবং দ্বীনে ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসের ওপর তারা জন্মগ্রহণ করেছে। এটা তাদের আকিদা-বিশ্বাস, মন-মস্তিষ্ক ও ধ্যান-ধারণার সাথে মিশে আছে। শুধু তাই নয়; বরং সত্য হলো, মানুষ সুখে-দুঃখে, আশায়-শঙ্কায়, সঙ্গতায়-নিঃসঙ্গতায়; এমনকি মৃত্যুর সময়েও এ কথা স্বীকার করে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব সত্য, তিনি বিপদে রক্ষাকারী এবং তিনি সকল কিছুর চেয়ে বড়। ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম হওয়ার সবচেয়ে সঠিক প্রমাণ হলো, সৃষ্টির সূচনা থেকেই মানুষ যেকোনো বিপদে আল্লাহ অভিমুখী হয়। সুতরাং যদি মানুষ আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্তি মেনে নাও নেয়, তবুও সে প্রয়োজনের সময় প্রভুত্ব দাবিদারদের মোকাবেলায় তাঁকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কার্ল মার্ক্সের মন্তব্য হলো, 'ধর্ম মানুষের জন্য আফিমস্বরূপ।' তার এমন মন্তব্যের কারণ হলো, দেশ ও জাতির প্রতি; বিশেষ করে ইহুদিদের প্রতি গির্জার জুলুম-নির্যাতন।

এমন অন্যায় নীতির ক্ষেত্রে কার্ল মার্ক্সের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই এবং খ্রিষ্টবাদের সাথেও আমাদের আকিদা-দর্শনের কোনো যোগসূত্র নেই। তবে খ্রিষ্টবাদের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, 'ইসা ﷺ প্রচারিত প্রকৃত খ্রিষ্টধর্ম একটি প্রাক্তন আসমানি ধর্ম, যা মানুষের ওপর জুলুম করে না; বরং মানুষকে শান্তি, কল্যাণ, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের প্রতি আহ্বান করে।' পক্ষান্তরে যদি কোনো জবরদখলকারী স্বৈরাচার পূর্বের সেই খ্রিষ্টধর্মের নামে মানুষের ওপর অন্যায়-অত্যাচার করে, তাহলে প্রকৃত আসমানি খ্রিষ্টধর্মের ওপর দোষ চাপানোর কোনো সুযোগ নেই। কেননা, প্রাক্তন হোক বা চলমান, কোনো আসমানি ধর্মেই অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের অনুমতি দেওয়া হয়নি। অবশ্য বর্তমানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আসমানি ধর্ম অবিকৃতভাবে বিদ্যমানও নেই।

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলাম মানুষকে উদ্যমতা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, দান-দক্ষিণার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সকল

অন্যায়-অত্যাচার, মিথ্যা-ভ্রান্তি, অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে প্রতিহত করার জন্য আহ্বান করে। পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলামই সকল মিথ্যা, অবিচার, জুলুম-নির্যাতন প্রতিহত করার সঠিক কর্মপদ্ধতি ঘোষণা করেছে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার অপরাপর সকল ধর্ম-দর্শন, তন্ত্র-মন্ত্র, নিয়ম-নীতির ব্যাপারে এমনটি ধারণা করা নিতান্তই ভ্রান্তি। এর পক্ষে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্বসূরি মুসলিমদের ইতিহাসে অগণিত প্রমাণ রয়েছে। প্রথমে পবিত্র কুরআনে কারিমের চিরসত্য সেই প্রমাণ পেশ করা হলো, যাতে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾

'তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।'[৯৩৩]

ইসলাম সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেছে। ইসলাম লাঞ্ছনা-অপদস্থতা থেকে উত্তরণের তরে আমরণ চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ জালিম-অত্যাচারী বাদশাহর সামনে সত্যের বাণী উচ্চকিত করাকে সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

'সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ হলো, স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্যের বাণী উচ্চকিত করা।'[৯৩৪]

৯৩৩. সুরা আত-তাওবা : ১৪

৯৩৪. সুনানু আবি দাউদ : ৪/১২৪, হা. নং ৪৩৪৪ (আল-মাকাতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

তারিক বিন শিহাব ﷺ বর্ণনা করেন :

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

'জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সওয়ারির রিকাবে পা রাখাকালীন জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, কোন জিহাদ অধিক উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।'[৯৩৫]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ، فَنَهَاهُ وَأَمَرَهُ، فَقَتَلَهُ

'কিয়ামতের দিন শহিদগণের সরদার হবেন হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ, এবং সেই ব্যক্তি, যে কোনো স্বৈরাচার শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে (শরিয়তের) কোনো বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ করেছে যাদ্দরুন শাসক তাকে হত্যা করেছে।'[৯৩৬]

এটি হলো এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা যে, ইসলাম কোনো অন্যায়-অত্যাচার, লাঞ্ছনা-অপদস্থতা বা দুর্বলের ওপর সবলের জুলুম-নির্যাতন সমর্থন করেনি; বরং সেগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। ইসলাম এসব কিছু থেকে মানুষকে মুক্ত রেখেছে এবং অন্যদের মুক্ত করার সুন্দরতম নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে।

অতএব, ধর্মকে আফিম বা নেশা বলে আখ্যায়িত করার কোনোই যৌক্তিকতা নেই। আফিম, ইয়াবা, গাজা প্রভৃতির নেশা এমনই এক মহামারি, যাতে কেবল মার্ক্সবাদীরাই টিকে থাকতে পারে। হিংসা, ধোঁকা, প্রতারণা ও

৯৩৫. মুসনাদু আহমাদ : ৩১/১২৬, হা. নং ১৮৮৩০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

৯৩৬. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৪/২৩৮, হা. নং ৪০৭৯ (দারুল হারামাইন, কায়রো) ইমাম আবু হানিফা ﷺ সূত্রে হাদিসটি সহিহ।

অন্ধবিশ্বাস এদের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে এবং হৃদয়াত্মার শুষ্কতা, মনুষ্যত্বশূন্যতা ও চরিত্রহীনতা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

সব উন্নতির মাধ্যম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

সাম্যবাদীদের দৃষ্টিতে অর্থনীতিই হচ্ছে একমাত্র ভিত্তি, যার ওপর ভর করেই মানুষের জীবন ও সমাজ গড়ে ওঠে। সুতরাং যেকোনো ধরনের উন্নতি, অগ্রগতি, প্রভাব ও পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে, উৎপাদনের উপকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

তাদের এমন চিন্তাধারা নিরর্থক প্রলাপ বৈ কিছু নয়। যার সামান্যতম চেতনা ও অনুভূতি আছে, সেও এমন চিন্তাধারা গ্রহণ করবে না। তাই এ ধরনের বাস্তবতাবিবর্জিত নীতি নবি-রাসুল ও সালাফে সালিহিনের দিকে সম্বোধিত করা বস্তুত তাঁদের মান ক্ষুণ্ণ করারই নামান্তর। যাঁদের কথা ও চিন্তা-গবেষণায় মানুষের কর্ম ও বিশ্বাসে আমূল পরিবর্তন ও উন্নতি আসে, যাঁদের আদর্শ বাস্তবায়নে ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায় এবং যাঁদের অনুসরণে সমাজের পাপ-পঙ্কিলতা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাদের থেকে কখনো এমন অজ্ঞতাপূর্ণ বাণী বা নীতি প্রকাশের কল্পনাও করা যায় না।

অতএব, কমিউনিজমভিত্তিক অর্থনীতিকে নবি-রাসুল, সালাফে সালিহিন ও উম্মাহর বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের সাথে সম্পৃক্ত করার অর্থ হচ্ছে তাঁদের অপমান করা এবং ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণাকে তুচ্ছ করা। তা ছাড়াও তাদের এটি মারাত্মক একটি ভুল চিন্তা যে, অর্থনীতিই মানুষের অগ্রগতি, উন্নতি ও পরিবর্তনের মূলভিত্তি ও উপাদান। বস্তুত বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস ও সঠিক চিন্তা-চেতনার মাধ্যমেই মানুষের জীবনে পরিবর্তন, উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়ে থাকে।

মানুষের মন ও মস্তিষ্কের গভীর থেকেই আকিদা বা বিশ্বাসের উৎপত্তি। আর মানুষ তার ভেতরে বদ্ধমূল আকিদা-বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কোনো কিছুর প্রতি ধাবিত হয়। অন্তরে থাকা সে আকিদাই মানুষকে কোনো কাজ করা বা না করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অতএব, মানবজীবনে অর্থের ভূমিকা শুধু এতটুকুই যে, মানুষ এর দ্বারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু এটা কখনোই একজন মানুষের উন্নতি, অগ্রগতি বা আমূল পরিবর্তনের মূলভিত্তি হতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে দারিদ্র্যপীড়িত নিরক্ষর এক জাতির মাঝে। অতঃপর অর্থের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছাড়াই তা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলাম স্বমহিমায় নিজ গতিতেই বিস্তৃতি লাভ করেছে। কখনো অর্থনীতির উন্নতির ওপর নির্ভর করেনি; বরং ইসলামের যত উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা কেবল ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস হৃদয়ে গেঁথে নেওয়ার কারণেই হয়েছে। ফলে ইসলামই মুসলমানদের যেকোনো কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধকারীর ভূমিকা পালন করেছে।

সুতরাং বুঝা গেল, মানুষের যেকোনো ধরনের পরিবর্তন বা কোনো কিছুর প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া অর্থনীতির প্রভাবে হয় না; বরং তা কেবল তাদের আকিদা বা বিশ্বাসের কারণেই হয়ে থাকে।

ব্যক্তি মালিকানা বলতে কিছুই নেই

ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা। ব্যক্তি মালিকানার ব্যাপারে কার্ল মার্ক্সের ধারণা ছিল নিতান্তই ভুল। তার ধারণামতে, এটি হচ্ছে অন্যায় হস্তক্ষেপ, ছিনতাই-লুণ্ঠন ও জুলুম-নির্যাতনের প্রাথমিক স্তর। তাই ব্যক্তি মালিকানার পরিধি যত বড় বা ছোটই হোক না কেন, সাম্যবাদী দৃষ্টিতে তা নিন্দনীয়। তারা মনে করে যে, মানুষকে যেই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ও পোশাকাদি রাষ্ট্র জোগান দিয়ে থাকে, তাদের সেই পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয় না। অতএব, জনগণের পরিবর্তে সকল সম্পত্তির অধিকারী হবে একমাত্র রাষ্ট্র। তাতে কারও সামান্যতম মালিকানাও থাকবে না। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তাদের এমন মতবাদ মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা ও আগ্রহের পরিপন্থী; অথচ মানুষ সৃষ্টিগত ও বস্তুগতভাবেই ব্যক্তি মালিকানার প্রতি আগ্রহী হয়। প্রত্যেকেই স্ত্রী, ছেলে-সন্তান নিয়ে জীবনযাপন করে। তাই সকলেই চায় প্রয়োজন পূরণের জন্য তার কিছু সম্পত্তি থাকুক। কমিউনিজমের এমন অযৌক্তিক নীতি মানুষকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তি মালিকানা থেকে জোরপূর্বক বঞ্চিত করেছে। আর মানুষের সাথে এমন অসংগতিপূর্ণ আচরণ স্বয়ং মানুষ

ও দেশের জন্য তাদের অবদানের ওপর অশুভ পরিণতি বয়ে আনবে এবং নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ ধরনের নীতি মানুষের উদ্যমতাকে নষ্ট করে দেয়, ইচ্ছাশক্তিকে নির্বাপিত করে দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভক্তির সময় পরিলক্ষিত হয়েছে, যার মালিকানায় ৩০% ভূমি ছিল, তাকে ৭০% ভূমির মালিকের মতোই ফসলের কর দিতে হতো। মূলত এই জমিগুলোর মালিক ছিল রাষ্ট্র। জনগণকে তা চাষাবাদ করার জন্য দেওয়া হতো। এর পতনের মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ কারণ এটিও। যেমনিভাবে এর প্রথম কারণ ছিল ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা।

মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তির মালিক হবে—এটিই হলো বাস্তবতা এবং মানুষের অপরিবর্তনীয় ফিতরাত বা স্বভাবজাত চাহিদা, যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র অজ্ঞ ও অত্যাচারীরাই এটিকে অস্বীকার করতে পারে। অতএব, মানুষের ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা শেষ পর্যন্ত দেশ ও জাতিকে দেউলিয়া করে ছাড়ে। ফলে অন্যান্য দেশের কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরপাক খেতে হয়; যেমনটা করছে বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়ন। অথচ এই সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল এক সময়ের সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধশালী, উৎপাদনশীল, বিস্তৃত ও পানিসমৃদ্ধ দেশ। সমাজতন্ত্রের আগমনের পূর্বে এই সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সবচেয়ে বেশি ফসল উৎপাদনকারী রাষ্ট্র। কিন্তু আজ তা সমাজতন্ত্রের প্রভাবে ভিক্ষুকপ্রায় এবং আমেরিকা কানাডাসহ আরও বহু দেশ থেকে তারা এখন পণ্য আমদানি করে; অথচ তারা ছিল একসময়ের রপ্তানিকারক।

শ্রেণি বিভাজনের মূলোৎপাটন

শ্রেণি সংগ্রাম। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মাঝে এই প্রজ্বলিত দ্বন্দ্বের পদ্ধতি কার্ল মার্ক্সের দেওয়া নোংরা ধারণাপ্রসূত। খেয়াল-খুশিপূর্ণ মতবাদ ও বাস্তবিক কার্যকরী মতবাদের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো দেশের দিকে লক্ষ করলেও কার্ল মার্ক্সের এমন নিরর্থক নিয়মনীতি চোখে পড়বে না।

মার্ক্স ও তার অনুসারীদের নিকট মানুষ শৃঙ্খলিত ও বশীভূত কর্মী মাত্র, যাকে প্রয়োজন হলে নির্যাতন বা বঞ্চিত করা যায় এবং তার ওপর আক্রমণ করার জন্য এবং তাকে ধ্বংস ও নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য যেকোনো সুযোগই গ্রহণ করা যায়।

অপরদিকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকারের লক্ষ্যে, তাকে খুশি ও নিশ্চিন্ত করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগ কাজ করে থাকে। যদিও পুঁজিপতি সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হলো, অন্যান্য জনগোষ্ঠির কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করা, বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা এবং আমাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ লালন করা। অর্থাৎ পুঁজিপতি সমাজব্যবস্থার সাথে ইসলামের এত অমিল থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকের অধিকারের বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা কিছুটা উন্নত। অথচ একই বিষয়ে কমিউনিস্টদের বাস্তব কর্ম তুলনামূলক অনেক ভয়ংকর।

পুঁজিবাদীরা গণতন্ত্রের মিথ্যা বুলিকে আশ্রয় করে শাসন চালায়। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের মিথ্যা বুলিরও নাম-নিশানা থাকে না; বরং সেখানে চালু হয় একনায়কতন্ত্র, যা আরও ভয়ংকর, আরও বিভীষিকাময়। সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমের ধ্বজাধারীরা গণতন্ত্র উচ্ছেদের ডাক দিয়ে 'জালিমশাহি নিপাত যাক' স্লোগান দিয়ে, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' আওয়াজ তুলে রক্তপাত, শঠতা ও ধূর্ততার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়েই তাদের বোল পাল্টে ফেলে। সর্বহারাদের নামে দখল করা ক্ষমতায় আর কেউ যেন ভাগ না বসাতে পারে সে জন্য একদিকে যেমন চালু হয় একদলীয় শাসনব্যবস্থা, তেমনই অন্যদিকে বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য চালানো হয় সাঁড়াশি অভিযান। এখানে শ্রমিকদের রক্তের ওপর গড়া শাসনব্যবস্থা কুক্ষিগত থাকে কতিপয় বুর্জোয়া ব্যক্তিদের হাতে। পৃথিবীর কোনো সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্ট দেশে এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। শ্রেণিহীন এক স্বপ্নরাজ্যের স্থলে গড়ে ওঠে শ্রেণি বৈষম্যপূর্ণ এক নির্যাতন ও অত্যাচারের রাজত্ব।

মার্ক্স শ্রমিকদের ওপর সবচেয়ে বেশি অবিচার করেছে। তারা পোল্যান্ডে স্বয়ং সমাজতন্ত্রের ওপর আক্রমণ করতে চেয়েছিল। যদি তাদের ও সন্ত্রাসীদের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা হতো, তাহলে তারা সম্পূর্ণরূপে তাদের

নীতিকে পরিবর্তন করে দিত এবং তাদের সেসব নেতাদের নির্মূল করে ছাড়ত, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ শক্তিমত্তা ও অস্ত্রবলে তাদের ভয় দেখাত। মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং মার্ক্সবাদী শাসক-বিচারকদের মিথ্যা ও ভ্রান্তির একটি উত্তম নমুনা এটি। যারা জনগণের উপেক্ষার স্বীকার হয়েছে এবং তাদের বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে।

তবুও এই সমাজতন্ত্রের নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের জন্য শ্রমিকরা এই পর্যন্ত বহুবার আন্দোলন করেছে। ১৯৫৬ ও ১৯৬৮ সালে হাঙেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়াতে যেমনটি ঘটেছিল। কিন্তু শাসকদের নির্দয়-নিষ্ঠুর আচরণ এবং হত্যা ও নির্যাতনের মুখে সেই আন্দোলনগুলো বারবারই সফলতার মুখ দেখতে পায়নি।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বর্তমান বৈশিষ্ট্য

১. সমাজতন্ত্রের বর্তমান গতি ক্রমাগত সংশোধনবাদের দিকে।

২. পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলো ক্রমাগত গ্রহণ (সুদ, ব্যক্তিমালিকানা, বাজারব্যবস্থা, মুনাফা ইত্যাদি)।

৩. শিল্প উৎপাদনে পুঁজিবাদী বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ।

৪. পার্টির এলিট ও জনসাধারণের মধ্যে শোষণমূলক সম্পর্ক।

৫. পীড়নমূলক, ধোঁকাপূর্ণ গোঁজামিলের দর্শনকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত।

৬. রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণির সৃষ্টি।

৭. অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য বিলুপ্ত করতে ব্যর্থ।

৮. পুঁজিবাদের সাথে সহঅবস্থানের নীতি গ্রহণ।

৯. ইসলামের মোকাবিলায় পুঁজিবাদের সাথে অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ।[৯৩৭]

৯৩৭. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান কৃত 'ইসলামি অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ' ও বিভিন্ন তথ্যসূত্র।

মোটকথা পৃথিবীতে মানবরচিত যত ব্যবস্থা রয়েছে সবগুলোই মানুষের কল্যাণ অথবা মানবতার মুক্তিতে ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সকল ব্যবস্থাই মানবজাতিকে ধ্বংসের ধারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। মানবজাতির জন্য উপকারী চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মানুষকে অকল্যাণ ও মন্দ থেকে রক্ষা ও সকল প্রকার ব্যাধি থেকে বাঁচাতে তো পারেইনি, উপরন্তু তাদের জাহান্নামের কিনারে পৌঁছে দিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ, উভয় ব্যবস্থাই মানুষকে সংকট থেকে মুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংকট। এগুলো হলো এমন সংকট, যা দিন দিন, বছরকে বছর অবিরামভাবে বেড়েই চলছে।

সমাজতন্ত্র সফল হয়নি; বরং মানবতার মুক্তি দিতে গিয়ে চরমভাবে বিফল হয়েছে। কেননা, তা মানুষের জমানো সম্পদকে ওয়াকফে পরিণত করার একটি পন্থা। তারপর মানুষকে দমন, পীড়ন, মানুষের বাক-স্বাধীনতা হরণের হাতিয়ার, যা কেবল দমন, আক্রমণ ও হিংস্রাত্মক জুলুমেরই প্রসার ঘটিয়েছে।

পুঁজিবাদও সফলতা পায়নি; বরং সেটাও ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, তা মানুষকে আত্মিক ও ব্যষ্টিকরূপে বিনাশ করে দিয়েছে। এ ব্যবস্থা কিছু স্বার্থবাজের স্বাচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। একবাক্যে সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র মানুষকে দমন ও নিঃস্ব করেছে। আর পুঁজিবাদ মানুষকে কলুষিত করেছে, ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। দুটোই মানুষকে নীচতা, হীনতা, ক্ষতিগ্রস্থতা ও বিনাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

অবিরামভাবে মানুষ সংকট ও ধ্বংসের দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছে। আর এভাবেই চলতে থাকবে যদি মানুষ অবক্ষয় ও অধঃপতনের এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আল্লাহর আদেশের দিকে, ইসলামের পথে ফিরে না আসে। ইসলামই হলো সমাধানের একমাত্র পথ। সকল সমস্যা সমাধানের সঠিক পদ্ধতি। মানুষের চারপাশে থাকা সংকট থেকে বের করার, মানুষকে ঘিরে থাকা দুর্ভাগ্য থেকে ফিরিয়ে আনার একমাত্র ও একক পন্থা। ইসলামেই রয়েছে মানবতার নিরাপত্তা, সুখ-শান্তি আনয়ন এবং এ ধরায় শান্তি ও ভালোবাসা ফেরানোর একমাত্র উপায়। ইসলাম ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ ও পদ্ধতি খোলা নেই।

গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার আকিদা বা বিশ্বাস হলো, ধর্ম ব্যক্তিজীবনে এবং ইবাদতখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে আর রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষের নিজস্ব মতামত দিয়ে পরিচালিত হবে। পক্ষান্তরে ইসলামি জীবনব্যবস্থার আকিদা হলো, মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছেন। জীবন ও রাষ্ট্র সকল কিছুই সে ব্যবস্থানুপাতে পরিচালিত হবে। আল্লাহর হুকুম কেবল ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

গণতন্ত্রের সূচনাকাল

খ্রিষ্ট সপ্তম শতাব্দী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় মুসলিমদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে যেমন উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় যেতে হয়, চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপবাসীদেরকেও তেমনই জ্ঞানের তালাশে মুসলিম অধ্যুষিত ঐতিহ্যবাহী আন্দালুসের (আন্দালুসের বর্তমান নাম স্পেন) আল-হামরা, কর্ডোভা ও গ্রানাডায় ভিড় জমাতে হতো। সেকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সকল ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব ছিল মুসলমানদের হাতে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে ছিল। সে সময় ইউরোপে খ্রিষ্টান পাদরিদের শাসন চলছিল। ইউরোপের পাদরি শাসকরা শোষণ ও নির্যাতন করার হাতিয়ার হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করত। পাদরিরা ধর্মের নামে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে রাজত্ব করছিল। তারা নিজেদের আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করত। তারা দাবি করত যে, আল্লাহ তাআলা তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও তা তত্ত্বাবধায়ন করার ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যখন নতুন জ্ঞানচর্চার উন্মেষ ঘটে, মানুষ অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে আলোর দিকে আসতে শুরু করে, তখন তাদের নিকট পাদরিদের মনগড়া মতামত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হতে থাকে। এখান থেকেই তাদের সাথে জনগণের সংঘাত শুরু হয়। পাদরিরা আর কোনো

উপায় না পেয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল। ধর্মের নামে পাদরিদের এ অধার্মিক আচরণ জনগণের মনে তীব্র ধর্মবিদ্বেষ সৃষ্টি করল। এরপর সাধারণ জনগণ জীবনের সকল বিভাগ থেকে পাদরিদের উৎখাত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হওয়া শুরু করল। ষোড়শ ও সপ্তদশ দীর্ঘ দুশতাব্দী ধরে এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে থাকে। ইতিহাসে এ সংগ্রামযুদ্ধ 'গির্জা বনাম রাষ্ট্রের লড়াই' নামে পরিচিত। এ সংঘাতের সমাধানের জন্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল নাস্তিক আর অন্যান্য কিছু লোক সরাসরি ধর্মকে অস্বীকার না করলেও রাষ্ট্রের মাঝে ধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার করল। এভাবে তারা সকলে ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আলাদা করে ফেলার সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করল। তাদের মতে ধর্ম নিতান্তই ব্যক্তিগত একটি বিষয়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মকে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যায় না। তারা শাসনব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করল এবং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে একটি আপস রফায় উপনীত হলো। এ আপসের প্রস্তাবে বলা হলো, 'ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং মানুষের ধর্মীয় দিকের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাদরিদের হাতে থাকবে। আর জনগণকে শাসন করার কর্তৃত্ব থাকবে জনগণের হাতে। তাদের ওপর আর কারও কর্তৃত্ব থাকবে না। জনগণই আইন প্রণয়ন করবে এবং এ আইন দ্বারাই তারা শাসিত হবে। তারা যে বিধান রচনা করবে, তদ্বারা পরিচালনার জন্য নিজেরাই নিজেদের শাসক নিযুক্ত করবে। অবশ্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে পাদরিদের হাতেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবার শপথ গ্রহণ করতে হবে। এভাবে জনগণকে পাদরিদের শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য মানবরচিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। এটি সম্পূর্ণরূপে মানবরচিত একটি শাসনব্যবস্থা। পশ্চিমা সভ্যতার এ বিশ্বাসের ফলে জীবন ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে ফেলা হলো। ধর্ম সঠিক কিনা, তা তাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল না; বরং তারা ধর্মকে সমস্যা মনে করে তাদের জীবন থেকেই তা সরিয়ে দিয়েছে। আর এখান থেকেই সেক্যুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি হয়।

আজ যারা সেক্যুলারিজমের কথা বলে তাদের এ কথা মনে রাখা উচিত যে, ধর্মনিরপেক্ষতা খ্রিষ্টান ধর্মের পাদরিদের সাথে জনগণের সৃষ্ট সমস্যা থেকে এসেছে, ইসলামের সৃষ্ট কোনো সমস্যা থেকে এর উৎপত্তি ঘটেনি। তারপরও তা জোর করেই মুসলমানদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, খ্রিষ্টান পাদরিরা ধর্মের নামে অন্যায় আচরণ ও মনগড়া নীতি প্রচার করত। আর তাই প্রকৃতপক্ষে জনগণের এ সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না; মৌলিকভাবে তা ছিল পাদরিদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাদরিদের মোকাবেলা করতে গিয়ে তারা জীবন থেকে ধর্মকে পরিত্যাগ করে বসল। যাকে বলে মাথাব্যথা দূর করার জন্য মাথা কেটে ফেলার পরামর্শ। এ গণতান্ত্রিক মতবাদ সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না বটে, তবে তাদের মতে দুনিয়ার জীবনে উন্নতি, শান্তি ও প্রগতির জন্য আল্লাহ বা নবি-রাসুলের কোনোই প্রয়োজন নেই। তারা ব্যক্তিগত জীবনে ঐচ্ছিকভাবে ধর্মীয় বিধান মেনে চলা এবং সমাজ জীবনে আল্লাহকে অস্বীকার করার সুবিধা সংবলিত মতবাদ তৈরি করে নিল। ফলে মানবসমাজের জন্য আল্লাহ তাআলাকে বিধানদাতা হিসাবে অস্বীকার করা হলো। এ বিশ্বের সকল কিছু যেহেতু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, তাই সে মহাশক্তিশালী স্রষ্টার বিধানকে বাস্তব জীবনে গ্রহণ না করা ও এতে বাধা দেওয়া সরাসরি আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার শামিল। আল্লাহ তাআলাকে যদি পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে মান্য করা না-ই যায়, তাহলে কেবল ব্যক্তিজীবনে তাঁর ইবাদত অর্থহীন হয়ে পড়ে। আফসোসের বিষয় হলো, মুসলমানরা আজ ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে পশ্চিমা প্রভুদের নিকট নৈতিক ও মানসিক আত্মা বিক্রি করে বিশ্বস্ত গোলামের মতো তাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছে।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

আভিধানিক অর্থ :

গণতন্ত্রের ইংরেজি Democracy শব্দটি মূলত গ্রীকভাষায় Demos এবং kratía শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত। Demos অর্থ জনগণ আর kratía অর্থ শাসন। তাহলে Democracy এর অর্থ হলো, জনগণের শাসন।

পারিভাষিক অর্থ :

ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে :

> DemocraticSystemofGovernment:Asystemofgovernment based on the principle of majority dicision-making.

> 'সরকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি : সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণের নীতির ওপর ভিত্তি করে সরকারব্যবস্থা।'[৯৩৮]

আধুনিক গণতন্ত্রের রূপদাতা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট অব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে :

> Government of the people, by the people, for the people.

> 'জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার।'[৯৩৯]

উইকিপিডিয়ায় গণতন্ত্রের বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে :

> 'গণতন্ত্র বলতে কোনো জাতিরাষ্ট্রের (অথবা কোনো সংগঠনের) এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান ভোটাধিকার থাকে। গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন ও

---

৯৩৮. Encarta 2009 Encyclopedia Britannica 2012
৯৩৯. President Abraham Lincoln, The Gettysburg Address (Nov.19,1863)

তৈরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়ে থাকে।'[৯৪০]

সুতরাং গণতন্ত্র বলতে জনগণের স্বার্থে জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বুঝানো হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা তৈরি করে এবং তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেদের সার্বভৌমিক ক্ষমতার মধ্যে আইন রচনা করে। এভাবে জনগণ নিজেদের ক্ষমতার অনুশীলন করে এবং নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করে। গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে আইন প্রণয়ন ও শাসক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার রয়েছে।

জনগণই এ ব্যবস্থায় বিধান ও আইন প্রণয়ন করে এবং তারা নিজেদের তৈরি কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কারও কাছে জবাবদিহি করে না। জনগণই সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা ধারণ করে এবং জনগণই তাদের সার্বভৌমত্ব চর্চা করতে পারে। তাই বলা যায়, জনগণই এ ব্যবস্থার প্রভু। আর জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি। এ বিশ্বাস থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ইসলাম এ বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামি আকিদার ভিত্তি হচ্ছে, দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় আল্লাহ তাআলার আদেশ এবং নিষেধ অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে এবং আল্লাহ তাআলা যে ব্যবস্থা দিয়েছেন, সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা বাধ্যতামূলক। এর বিপরীত গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি ব্যবস্থা, যার সাথে ইসলামের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হতে বাধ্য। আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিধিবিধান নাজিল করেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে আল্লাহর বিধিবিধানকে অস্বীকার করা হয়। তাই এটি মূলত আল্লাহর বিধানকে অস্বীকারকারীদের ব্যবস্থা বা এককথায় কুফরি ব্যবস্থা। তাই তাদের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না; বরং সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা এ সকল কিছুকে বর্জন করার কঠোর নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন :

৯৪০. https://bn.wikipedia.org/wiki/গণতন্ত্র

﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ﴾

'তারা বিচার-ফয়সালার জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায়; অথচ তাগুতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার জন্য তাদের আদেশ করা হয়েছে।'[৯৪১]

যে আকিদা থেকে এ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যে ভিত্তির ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত এবং যে চিন্তা-ধারণার সে জন্ম দেয়, তা সম্পূর্ণরূপে মুসলিমদের আকিদা বা বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক।

গণতন্ত্রের আকিদা থেকে নিম্নোক্ত দুটি ধারণার উদ্ভব হয় :

১. সার্বভৌমত্ব জনগণের জন্য।

২. জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।

উপরিউক্ত দুটি ধারণার ওপর ভিত্তি করেই ইউরোপের দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ তাদের ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। এর দ্বারা পাদরিদের কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে জনগণের হাতে তা সমর্পণ করা হয়। পোপদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফসল হিসাবে ধর্মীয় আইন-কানুনের অবসান করা হয়। ফলে সার্বভৌমত্ব হলো জনগণের জন্য এবং জনগণই হলো সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ দুটি ধারণাই বাস্তবায়ন করা হলো। ফলে জনগণই হয়ে গেলো সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং সকল ক্ষমতার উৎস।

পক্ষান্তরে ইসলামে সার্বভৌমিক ক্ষমতা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কিছু শাখাগত বিষয় বাহ্যিকভাবে এক মনে হলেও বাস্তবে এই দুটি দ্বীন বা জীবনব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একটি মেনে নিলে অপরটি আপনাপনি বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য। কোনো অবস্থাতেই উভয়টির সংমিশ্রণ হতে পারে না। হয় ইসলাম থাকবে; নচেৎ গণতন্ত্র।

৯৪১. সুরা আন-নিসা : ৬০

শরিয়তের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বরূপ থেকে বোঝা গেলো যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অর্থ, মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রণীত বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা। আর এটা সুস্পষ্ট কুফর। শরিয়তের দলিল—কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস সবকিছুর দ্বারা এর কুফরি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নিম্নে পর্যায়ক্রমে দলিলসমূহ পেশ করা হলো।

কুরআন থেকে দলিল :

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

'আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর তাআলার-ই। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'[৯৪২]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

'আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, সেসব লোকই কাফির।'[৯৪৩]

হাদিস থেকে দলিল :

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন :

يَكُوْنُ فِيْ أٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَحْضُرُوْنَ السُّلْطَانَ فَيَحْكُمُوْنَ بِغَيْرِ حُكْمِ اللهِ وَلَا يَنْهَوْنَ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ.

৯৪২. সুরা ইউসুফ : ৪০
৯৪৩. সুরা আল-মায়িদা : ৪৪

'শেষ যুগে একটি জাতি আসবে, যারা এমন শাসকের কাছে যাতায়াত করবে, যারা আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার ও শাসন করবে। তারা সে শাসককে এ থেকে বাধা দেবে না। তাদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।'[৯৪৪]

মুআজ বিন জাবাল ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ.

'...সাবধান! অচিরেই এমন কিছু শাসক আসবে, যারা তোমাদের ওপর বিচারকার্য পরিচালনা করবে। তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করে দেবে। আর যদি তাদের বিরোধিতা করো, তাহলে তারা তোমাদের হত্যা করবে।'[৯৪৫]

ইজমা থেকে দলিল :

উম্মতের সকল উলামায়ে কিরাম গণতন্ত্র কুফরি হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বিখ্যাত ইমাম ও মুফাসসির আল্লামা জাসসাস ﵀ নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

আহকামুল হাকিমিন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

'কিন্তু না, তোমার রবের কসম! তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের

৯৪৪. আল-ফিরদাউস বি-মাসুরিল খিতাব (দাইলামি) : ৫/৪৫৫, হা. নং ৮৭২৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।
৯৪৫. আল-মুজামুস সগির, তাবারানি : হা. নং ৭৪৯ (আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি জইফ।

অন্তরে কোনো দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে।'[৯৪৬]

ইমাম জাসসাস ؒ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِ اللهِ تَعَالَى أَوْ أَوَامِرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِيهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقَبُولِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسْلِيمِ, وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَّةَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي حُكْمِهِمْ بِارْتِدَادِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ; لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى حَكَمَ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَهُ وَحُكْمَهُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ

'এ আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা অথবা তাঁর রাসুল ﷺ-এর আদেশ-নিষেধসমূহ থেকে কোনো একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক এবং মেনে নেওয়া থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক জাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের হত্যা ও তাদের পরিবার পরিজনদের বন্দী করার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর বিচার ও বিধানকে মেনে নেবে না, সে ইমানদার নয়।'[৯৪৭]

আল্লাহ তাআলার একটি বিধান মেনে না নেওয়ার কারণে সাহাবায়ে কিরাম ؓ উক্ত ব্যক্তিদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাসসাস ؒ-এর ভাষ্যমতে 'যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।' অতএব

---

৯৪৬. সুরা আন-নিসা : ৬৫

৯৪৭. আহকামুল কুরআন, জাসসাস : ২/২৬৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

যে শাসনব্যবস্থা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে দিয়ে এ স্লোগান প্রচার করছে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' এবং আল্লাহপ্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে—এসব পদ্ধতি কি স্পষ্ট কুফর নয়?!

কিয়াস থেকে দলিল :

সকলের জানা, রাসুল ﷺ-এর ওফাতের পর আবু বকর ؓ খিলাফতের গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলেন। তখন একদল লোক জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানাল। তাদের নিকট কারণ দর্শানোর আদেশ করা হলে তারা কুরআনের এ আয়াত থেকে দলিল পেশ করল, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً 'আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা (জাকাত) গ্রহণ করুন।' [সুরা আত-তাওবা : ১০৩] তারা যুক্তি পেশ করে বলল, এখানে জাকাত আদায়ের আদেশ রাসুল ﷺ-কে সম্বোধন করে দেওয়া হয়েছে। আর এখন তো রাসুল ﷺ নেই, তাই আমরা জাকাত দেবো না। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম ؓ তাদের বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র জিহাদ করে তাদের মাল-সম্পদ গনিমত হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করেন। ইমাম জাসসাস ؒ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ؒ, কাজি আবু ইয়ালা ؒ, ইমাম ইবনে তাইমিয়া ؒ-সহ অসংখ্য ফকিহ ও মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম ؓ তাদের মুরতাদ আখ্যায়িত করেই তাদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। অনেক ফকিহ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ؓ-এর ইজমা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম ؓ-এর যুদ্ধের ধরনও এর সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম ؓ তাদের পরিবার-পরিজনকে যুদ্ধবন্দী করেছিলেন। তারা কালিমা পাঠ করত, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করত। নামাজ, রোজা, হজ, তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য সকল বিধানও পালন করত। কিন্তু শুধুমাত্র একটি বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে সাহাবায়ে কিরাম ؓ সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মুরতাদ ঘোষণা করেছিলেন। এরপর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং দ্বীনের একটি মাত্র বিধানকে অমান্য করলে যেখানে মানুষের ইমান থাকে না, তাহলে যে শাসনব্যবস্থা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে দিয়েছে এবং স্লোগান তুলছে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার', শুধু তাই-ই নয়; বরং নিজেদের স্বপক্ষে কুরআনের এ আয়াত থেকে দলিলও পেশ করছে যে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই' [সূরা বাকারা : ২৫৬]; একটি নয় দুটি নয়, আল্লাহর শত শত বিধানকে অমান্য করা হচ্ছে; শুধু অমান্য করছে এমনটি নয়, বরং গণতান্ত্রিক পন্থায় সবকিছু করেও দাবি করছে, মদিনা সনদ অনুযায়ী দেশ চলছে; যে ক্ষমতায় যায় সেই বলছে, আমরা কুরআন সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করিনি, করব না; অথচ কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী অসংখ্য আইন বিদ্যমান রয়েছে। যদি একটি বিধান প্রত্যাখ্যানের কারণে মুরতাদ হয়, তাহলে এত অসংখ্য বিধান অমান্য ও নিষিদ্ধ করার পরও কি এ গণতন্ত্র কুফরি না হয়ে থাকতে পারে?!

সংখ্যাগরিষ্ঠতা কি হকের মানদণ্ড?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা-ই হচ্ছে সকল সিদ্ধান্তের মানদণ্ড। এ ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই সকল জনগণের মত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, আইন প্রণয়ন করা, প্রতিনিধি নির্বাচন করা, সরকারের অবস্থা যাচাই করাসহ সকল ক্ষেত্রেই যেদিকে বেশি ভোট পড়ে, সেটিই সঠিক বলে বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও অশিক্ষিত লোকদের মতামত সব এক পাল্লায় মাপা হয়। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতেই আল্লাহ তাআলার হালাল বিধানকে হারাম আর হারাম বিধানকে হালাল করা হয়। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে যদি দুনিয়ার সকল মানুষও একত্রিত হয়ে কোনো হারাম কাজের পক্ষে মতামত দেয়, তাহলেও তা গ্রহণ করা যাবে না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অপব্যবহার

পশ্চিমা রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন ধর্ম থেকে তাদের জীবনকে আলাদা করে ফেলল, তখন সে তার নিজের সিদ্ধান্তকে আল্লাহর হুকুমের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল। তাদের সিদ্ধান্তের মূল চালিকাশক্তি হয়ে গেল লাভ-লোকসান। তারা ভালো-মন্দ, পছন্দ-অপছন্দ কোনো কিছু করা বা না করা,

সকল কিছু নির্ধারণ করতে লাগল লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে। এভাবে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে নিম্নোক্ত চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে।

ক. বিশ্বাসের স্বাধীনতা

খ. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

গ. মালিকানার স্বাধীনতা

ঘ. ব্যক্তি স্বাধীনতা

বিশ্বাসের স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষকে বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থার আওতায় কোনো মানুষ যেকোনো কিছুকে আকিদা বা বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। যেকোনো কিছুর ওপর ইমান আনতে পারে কিংবা যেকোনো বিশ্বাস প্রত্যাহারও করতে পারে। একজন মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করতেও পারে আবার ইচ্ছে করলে না-ও করতে পারে। অনুরূপ একইসাথে একজন মানুষ নামাজ পড়তে পারে, আবার মূর্তিপূজাও করতে পারে। এ হচ্ছে তার বিশ্বাসের স্বাধীনতা। আজকাল গণতন্ত্র চর্চার ফলে আমাদের সমাজে এ প্রভাব স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন অনেক মুসলমান যুবক কদরের রাত্রিতে রাত জেগে ইবাদত করে আবার পহেলা বৈশাখে মঙ্গল প্রদীপের নামে অগ্নিপূজাও করে। একইভাবে তারা যেমন ইদের নামাজে দলবেঁধে শামিল হয়, তেমনই দুর্গাপূজাকে সর্বজনীন বলে তাতেও অংশগ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। যেমন আমাদের দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ এক নেতা বিগত ১৩ জুলাই ২০১১ এক অনুষ্ঠানে বলেছিল, 'আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই।' সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিজের জীবনব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেছে বলেই তার আকিদার স্বাধীনতা থেকে এ কথাগুলো বলতে পেরেছে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় যে কেউ-ই তার আকিদা-বিশ্বাস পরিবর্তন করতে পারে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। এ ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তি যে সকল চিন্তা-চেতনা ধারণ করে, তা সে প্রকাশ করার অধিকার রাখে এবং এ মতের দিকে অন্যদেরকেও আহ্বান করতে পারে। এ ব্যাপারে সে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। এ ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রায়শই অন্য মতামত বা ব্যক্তি আক্রমণ করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গণতন্ত্রীরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার আশ্রয় গ্রহণ করে নানা অপকর্ম করে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতীয় বংশদ্ভূত সালমান রুশদি satanic verses লিখে ইসলামকে আক্রমণ করেছিল এবং এটাকে তার মত প্রকাশের অধিকার বলে চালিয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমা মিডিয়াগুলোও জিগির তুলেছিল যে, সে তার মতামত প্রকাশের অধিকার রাখে। একইভাবে ডেনমার্কের কার্টুনিস্ট এবং আমাদের দেশের প্রথম আলো পত্রিকা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করে এটাকে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে প্রচার করেছিল। এভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মূলত ভিন্নমত বা বিশ্বাসকে আক্রমণ করার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে।

পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে, মুসলমানদের সকল মতামত শরিয়ার আলোকে হতে হবে। ইসলামি শরিয়া অনুমোদন করে না—এমন কোনো মতামত বা বক্তব্য মুসলমানরা প্রদান করতে পারবে না। কেউ যদি সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মালিকানার স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু অবাধ ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা আছে এবং এর মূল বিশ্বাসই হচ্ছে, যেকোনো উপায়ে অধিক পরিমাণ লাভ পাওয়া, তাই এ ব্যবস্থায় কেউ ইচ্ছা করলে প্রচুর পরিমাণ পণ্য মজুদ করে পণ্যের দাম বাড়িয়েও ব্যবসা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাছে, সে কোনো অপরাধী নয়।

পক্ষান্তরে ইসলাম জনগণের ভোগান্তি হতে পারে—এরকম সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। কেউ এরকম কোনো কাজ করলে রাষ্ট্র তাকে প্রতিহত করবে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা কোনো ব্যক্তিকে সকল প্রকার বিধিনিষেধ থেকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি হচ্ছে মুখ্য। এ স্বাধীনতার ফলে সে যেভাবে জীবনের চাহিদা মেটাতে পছন্দ করে, সেভাবে তা উপভোগ করবে এবং সেখান থেকে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা সমাজে যে অধঃপতিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এবারে তার গুটিকয়েক নমুনা তুলে ধরা যাক।

এক. অবাধ যৌনাচার

ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে পশ্চিমা সমাজে যৌনাচারের বিস্তার লাভ করেছে। কিশোর-কিশোরীরা যথেচ্ছা যৌনাচারে লিপ্ত হলেও মা-বাবারও কিছু করার থাকে না। কারণ, এ অধিকারটি তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আওতায় পড়ে। পশ্চিমা দেশের রাস্তা-ঘাটে, পার্কে, বাসে, অনুষ্ঠানে, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের জড়াজড়ি, আলিঙ্গন ও চুম্বন মহড়া কারও দৃষ্টির তোয়াক্কা করে না। তারা নগ্ন হয়ে চলাফেরা করতে পারে, মাতাল হতে পারে, অনেক নারী-পুরুষ একত্রে একই স্থানে একই সময়ে যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারে, যা বনের জীব-জানোয়ারকেও হার মানায়। অস্ট্রেলিয়াতে এক বাবা তার মেয়েকে সাত বছর আটকে রেখে জিনা করেছে, যা অনেকেই মিডিয়াতে লক্ষ করেছেন। এটা হলো তার ব্যক্তি স্বাধীনতা। তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না; এমনকি তারা আত্মীয়-স্বজন মা ও বোনের সাথে পর্যন্ত যৌনাচার করে থাকে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক।

পক্ষান্তরে ইসলামি জীবনব্যবস্থায় মানুষ কীভাবে তাদের যৌন চাহিদা মেটাবে, তার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ইসলাম মিলনের ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল বিবাহব্যবস্থা প্রদান করেছে। বিবাহ বহির্ভূত কোনো নারী বা পুরুষ অন্যের সাথে মিলিত হতে পারবে না। এ শৃঙ্খলা রক্ষায় ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান আরোপ করেছে।

দুই. সমকামিতা

যেহেতু গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে, তাই পশ্চিমা পার্লামেন্ট আজ তাদের বিকৃত চাহিদা মেটানোর জন্য সমকামী বিবাহের বৈধতা দান করেছে। আর এটি গণতান্ত্রিক দেশের স্বাভাবিক আচরণে পরিণত হয়েছে। এমনকি আজ পশ্চিমা সমাজ বর্বরতার এমন স্তরে গিয়ে উপনীত হয়েছে যে, তারা কুকুর, বিড়াল ও বিভিন্ন পশুর সাথে জিনা করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

পক্ষান্তরে ইসলাম এই গর্হিত কাজকে চরমভাবে ঘৃণা করে। এমনকি শরিয়া তার জন্য যথাযথ ও কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছে। পূর্ববর্তী একটি জাতিকেও আল্লাহ তাআলা শুধু এ জঘন্য অপরাধের কারণেই ধ্বংস করে দিয়েছেন।

তিন. লিভ টুগেদার

পশ্চিমা ব্যবস্থায় আজ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে চলছে লিভ টুগেদারের রমরমা প্রচলন। পবিত্র বিবাহব্যবস্থাকে ঝামেলাপূর্ণ মনে করে অনেক মানুষ এখন বিবাহ ছাড়াই এক ছাদের নিচে রাত কাটাচ্ছে। যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে, তখন প্রত্যেকে যার পথ সে বেছে নিচ্ছে। এভাবে বৈবাহিক জীবনকে তাদের সমাজব্যবস্থা থেকে ছুঁড়ে ফেলায় তাদের বার্ধক্যে কোথাও ঠাঁই মিলছে না। একপর্যায়ে হতাশায় কেউ আত্মহত্যা করছে, কেউ ইউগার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে আর কেউ বা পথে পথে ঠোকর খেয়ে ফিরছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম বিবাহ বহির্ভূত সকল যৌন সম্পর্ককে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। এর জন্য ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। শরিয়ায় বিভিন্নভাবে বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আর তাই আজও মুসলিম সমাজকে এ ভাইরাস সংক্রমণ করতে পারেনি। এখন পর্যন্ত এটা ব্যাপকভাবে মুসলিমদের কলুষিত করতে পারেনি।

ফিরাউনি ব্যবস্থার আধুনিক সংস্করণ

এ বিষয়টি আজ উপলব্ধি করা বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে যে, ফিরাউন একজন রাষ্ট্রপ্রধান ছিল। সে নিজেও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করত। কিন্তু সে নিজের রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব দাবি করার ফলে রব সেজে

বসল। কুরআনের মাধ্যমে ফিরাউনের কাহিনী আমাদের নিকট পেশ করার কারণ হলো, আমরা যেন এমন কোনো রাজা-বাদশাকে বা এমন কোনো ব্যবস্থাপনাকে না মানি, যারা সার্বভৌমত্বের দাবি করে বসে। আমরা যেন ফিরাউনের মতো কোনো শাসককে মেনে শিরকে নিপতিত না হয়ে যাই। কারণ, আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে অন্য কারও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার মানেই হচ্ছে, তাকে রব বলে স্বীকার করে নেওয়া। যদি ফিরাউনকে মানলে শিরক হয়, তাহলে এ গণতন্ত্র মানলেও শিরক হবে। মুসলমানেরা এসব নব্য ফিরাউনদের অনুসরণ করে যাতে আবার শিরকের মধ্যে হাবুডুবু না খায়, তা থেকে সতর্ক করার জন্যই আল্লাহ তাআলা ফিরাউনের কাহিনী আমাদের কাছে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আজ গণতন্ত্ররূপী নব্য ফিরাউনরা জনগণকে আল্লাহর মুখামুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করলে অনেকখানি-ই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১. ইসলাম আল্লাহর দেওয়া পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনব্যবস্থা। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তৈরি ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতের পূর্ণতা দান করেছি এবং ধর্ম হিসাবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করেছি।'[৯৪৮]

২. ইসলামি শরিয়তে সর্ব বিষয়ে যাবতীয় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই হলো সকল ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।'[৯৪৯]

৯৪৮. সুরা আল-মায়িদা : ৩
৯৪৯. সুরা আল-বাকারা : ১৪৮

৩. ইসলামে আইনের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে আইনের উৎস হলো অধিকাংশ মানুষের বিবেকপ্রসূত রায় ও মতামত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾

'বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।'[৯৫০]

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানানুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির, তারাই জালিম, তারাই ফাসিক। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছে, কোর্ট-কাচারিতে দেশের সাংবিধানিক আইন চলে, আল্লাহর বিচারব্যবস্থা চলতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

'যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণ আইনানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।'[৯৫১]

৫. ইসলামের শিক্ষা নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। আর গণতন্ত্রের শিক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ ভোগবাদ। সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে । আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।'[৯৫২]

৯৫০. সুরা ইউসুফ : ৪০
৯৫১. সুরা আল-মায়িদা : ৪৪
৯৫২. সহিহুল বুখারি : ১/১২, হা. নং ১৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৬. ইসলামে তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস এবং আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা অপরিহার্য। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব উপেক্ষিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

'আর তাদের কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। কাফিররা যেসব অংশীদার সাব্যস্ত করে, তিনি তা থেকে পূত-পবিত্র।'[৯৫৩]

৯৫৩. সুরা আত-তাওবা : ৩১

ক্রুসেড

ক্রুসেড হলো খ্রিষ্টানদের পবিত্র ধর্মযুদ্ধ। ক্রুসেড বলতে এমন আক্রমণ বোঝায়, যার উৎপত্তি সংকীর্ণমনা গোঁড়ামির ঘৃণ্যতা থেকে। যার ভিত্তি শিক্ষার আলোপ্রাপ্ত কোনো চিন্তাধারা থেকে নয় অথবা মানবতা রক্ষাকারী কোনো সম্মানার্হ্য বিশ্বাস থেকে নয়; বরং এর ভিত্তি হলো অন্ধ ও বধির গোঁড়ামি, যার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলো ইসলাম ও মুসলিম।

ক্রুসেড কাকে বলে?

১০৯৫ থেকে ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফিলিস্তিন ভূখণ্ড, বিশেষ করে বাইতুল মুকাদ্দাস খ্রিষ্টানদের কর্তৃত্ব বহাল করার জন্য ইউরোপের খ্রিষ্টানরা অনেক যুদ্ধ করে। ইতিহাসে এগুলোকে ক্রুসেড যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু এ সংজ্ঞা আংশিক সত্য। কারণ, ক্রুসেড ও তার মনোভাব শুরু হয় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ও খিলাফতে রাশিদার সময় বাইজান্টাইনদের পরাজয়ের পটভূমিতে।

ক্রুসেড নামে নামকরণের কারণ

ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা পোপের নির্দেশে বুকে ক্রুসচিহ্ন নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ক্রুসকেই যুদ্ধের পতাকা হিসাবে ব্যবহার করেছিল বলে এ যুদ্ধ ইতিহাসে ক্রুসেড নামে পরিচিত।

ক্রুসেডের কারণ বিবৃতি

মূলত ক্রুসেড হলো, মুসলিমদের কাছে হেরে যাওয়ার ফলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসাপরায়ণতা, খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত ও উগ্র মন-মানসিকতার ফলাফল।

সচেতন পর্যবেক্ষক ও অনুসন্ধানকারী মাত্রই অবগত যে, খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা লালন করে আসছে ইসলামের উত্থানের দিন থেকেই। ক্রুসেডের মূলভিত্তি হলো, ইসলামের বিজয়ের সূচনাকাল থেকে লালন করা সে মনোভাব। বাইতুল মুকাদ্দাস দখলে

নেওয়া নিয়ে একাদশ শতকে তৈরি হওয়া কোনো বাস্তব সংঘাতের নাম মূল ক্রুসেড নয়; বরং ইসলামের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই চলে আসছে এ ক্রুসেডের ধারাবাহিকতা। ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের মাঝে চলমান সামরিক ও আদর্শিক দ্বন্দ্বই একসময় সর্বগ্রাসী যুদ্ধের রূপ ধারণ করে। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ক্রুসেড সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মৌলকভাবে কাজ করেছে নিম্নে সংক্ষেপে তাদের বিভিন্ন কালের কর্মপ্রক্রিয়া উল্লেখ করা হলো :

ক. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কালে মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান শক্তি, যা দেখে খ্রিষ্টানরা চাইছিল, মুসলিমদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। আর এর ফলেই সংঘটিত হয় তাবুক যুদ্ধ।

খ. ইউরোপীয়দের মনে প্রতিশোধের আগুন ও ক্রুসেডীয় মনোভাব চাড়া দিয়ে উঠেছে, যখন রোমান খ্রিষ্টানরা ইয়ারমুকের যুদ্ধে চরমভাবে পরাজয় বরণ করেছিল। যে যুদ্ধের ফলে রোমান শাসন শাম ও এতদঅঞ্চল থেকে পুরোপুরি ধুয়ে মুছে যায়।

গ. ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টানদের হাত থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলিমদের হাতে চলে আসে। এটিও খ্রিষ্টানদের উগ্রপন্থাকে উসকে দেওয়ার অন্যতম কারণ। মূলত এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে ও এটাকে পুঁজি বানিয়ে পোপ ও খ্রিষ্টান রাজারা সাধারণ খ্রিষ্টান জনগণকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকে দিতে থাকে।

ঘ. খ্রিষ্টবাদের এ গোঁড়ামির আগুন ফের প্রবল হয়ে ওঠে যখন সমগ্র ইউরোপ জোট ফিলিস্তিন ও শাম দেশে পরাজয় বরণ করে। যেদিন ইসলামের মহান সেনানায়ক সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﷺ-এর হাতে লজ্জাজনকভাবে পরাজয় বরণ করে। যে হারের ফলে শাম ও বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে খ্রিষ্টানদের কর্তৃত্ব দূর হয়ে যায়। মুসলমানগণ পুনরায় শ্রদ্ধা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আসনে সমাসীন হন।

ঙ. পরবর্তী সময় দীর্ঘকাল যাবৎ বাইতুল মুকাদ্দাস খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের দখলমুক্ত থাকে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে আরব জোটের সাথে ছয়দিনের যুদ্ধে ইসরাইল জয়ী হওয়ার পর ইসলামি ওয়াকফ ট্রাস্টের হাতে

মসজিদের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। কাগজে-কলমে তা মুসলিমদের অধিকারে দেওয়া হলেও মূল কর্তৃত্ব ইহুদিদের হাতেই বহাল থাকে।

একাদশ শতকে ক্রুসেড সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহ

ক. ধর্মীয় কারণ

ফিলিস্তিন ইসা ﵇-এর জন্মস্থান। ফলে খ্রিষ্টানদের জন্য তা পবিত্র ও বরকতময় একটি স্থান। তাদের জন্য এটি ছিল পর্যটনের স্থান। উমর ؓ-এর খিলাফতকালে ফিলিস্তিন ভূমি ও বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের অধীনে চলে আসে। তখন থেকেই খ্রিষ্টানরা তা পুনর্দখল করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

খ. অমুসলিম দর্শনার্থীদের কটু আচরণ

যেহেতু মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিষ্টান—তিন ধর্মের লোকদের জন্যই এ স্থানটি পবিত্র, তাই অমুসলিমরা যখন বাইতুল মুকাদ্দাস দর্শনের উদ্দেশ্যে এখানে আসত, তখন মুসলমান প্রশাসন তাদের সুযোগ করে দিত। অমুসলিমদের গির্জা ও খানকাগুলো তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রশাসন তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইসলামি খিলাফতের দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলার যুগে এসব পর্যটক স্বাধীনতার এ সুযোগকে নিয়ে অপচেষ্টা চালায়। তাদের উদ্দেশ্যমূলক আচরণের কারণে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে ছোটখাট দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কিন্তু এই ফিতনাকারীরা দেশে ফিরে মুসলমানদের দুর্ব্যবহারের বানোয়াট কাহিনী প্রচার করে ইউরোপবাসীকে উসকে দিতে শুরু করে। ইউরোপের খ্রিষ্টানরা তো আগে থেকেই মুসলমানদের বিরোধী ছিল। এখন এ পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা আরও বেড়ে যায়। তাই খ্রিষ্টীয় দশম শতকে ইউরোপের ইতালি, ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যান্ডসহ অনেক খ্রিষ্টান রাষ্ট্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ড পুনরায়াত্ত করার একটি পরিকল্পনা তৈরি করে, যাতে এটাকে আবার খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়।

গ. ইসা ﵇-কে নিয়ে গুজব রটনা

এ সময় গোটা ইউরোপে একটি সংবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, ইসা ﵇ আবার নেমে এসে খ্রিষ্টানদের সব দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। কিন্তু তাঁর অবতরণ হবে তখন, যখন জেরুজালেমের পবিত্র শহর মুসলমানদের হাত থেকে স্বাধীন করা হবে।[৯৫৪] এই সংবাদ খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উত্তেজনা অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয় এবং ক্রুসেড যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। এটা ছিল অনেকটা আগুনে ঘি ঢালার নামান্তর।

ঘ. পোপদের কুপ্রচারণা

খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে যে, যদি কোনো চোর, দুষ্কৃতি ও পাপীও বাইতুল মুকাদ্দাস দর্শন করে আসে, তাহলে পরকালে সে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে যাবে। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বড় বড় দুষ্কৃতিকারীও পর্যটক হিসাবে বাইতুল মুকাদ্দাস আসতে শুরু করে। এরা শহরে প্রবেশের সময় নাচ-গান ও শোরগোল করত এবং প্রকাশ্যে শরাব পান করত। তাদের এসব অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও অশোভনীয় আচরণের কারণে তাদের প্রতি কিছু নৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কিন্তু এসব পর্যটক দেশে ফিরে মুসলমানদের কঠোর ব্যবহারের মনগড়া কাহিনী লোকদের শোনাতে থাকে, যাতে তাদের ধর্মীয় উত্তেজনা চাঙ্গা করা যায়।

ঙ. পোপের লিপ্সা

খ্রিষ্টানজাতি তখন দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একভাগের সম্পর্ক ছিল পশ্চিম ইউরোপের গির্জার সাথে। তাদের কেন্দ্র ছিল রোম। আর দ্বিতীয় ভাগের সম্পর্ক ছিল কুসতুনতুনিয়া বা কনস্টান্টিনোপল বা বর্তমানের ইস্তাম্বুলের সাথে। দুই গির্জার অনুসারীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ছিল। পশ্চিম ইউরোপ বা রোমের পোপের কামনা ছিল, পূর্ব ইউরোপ বা বাইজেন্টাইন গির্জার কর্তৃত্বও যদি পাওয়া যেত, তাহলে পুরো বিশ্বের

---

৯৫৪. মূলত, ইসা আ. আকাশ থেকে অবতরণ করে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি এসে দাজ্জালকে খতম করবেন। আর তার এ আগমন খ্রিষ্টানদের জন্য নয়; বরং মুসলিমদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হবে। এ সংক্রান্ত অনেক বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

খ্রিষ্টান জাতির আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব তার হাতে চলে আসত। সে অনুসারে ইসলামের বিরোধিতা ছাড়াও তার নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য সে ঘোষণা করল, সারা দুনিয়ার খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের হাত থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এই যুদ্ধে যে মারা যাবে, সে জান্নাতের অধিকারী হবে, তার সব পাপ মুছে যাবে এবং বিজয়ের পর যেসব ধন-দৌলত পাওয়া যাবে, তা তাদের জীবতদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। পোপের এ ঘোষণার ফলে সারা পৃথিবীর খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

পশ্চিম ইউরোপের গির্জার প্রধান ছিল পোপ দ্বিতীয় আরবান। সে ছিল অত্যন্ত সম্মানপূজারি ও যুদ্ধবাজ ধর্মীয় নেতা। ইউরোপের শাসকদের কাছে তার মর্যাদা ও গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। তাই সে নিজের মর্যাদা আবার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টানদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়াতে শুরু করে এবং যুদ্ধের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের প্রাধান্য ফিরিয়ে আনা ও মুসলমানদের পরাজিত করার প্রচারণা চালাতে থাকে। গির্জার প্রভাব শক্তিশালী করার জন্য সে খ্রিষ্টান বিশ্বে ধর্মীয় যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়াই উত্তম উপায় মনে করল। আর এভাবেই সে ক্রুসেড যুদ্ধের পথ তৈরি করে দিল।

চ. রাজনৈতিক কারণ

বাইজেন্টাইন শাসক মাইকেল ডোকাস ১০৯০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোকে তুর্কিদের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির প্রতি মনোনিবেশ করে এবং তাদের কাছে সাহায্য চায়। সারা খ্রিষ্টান বিশ্ব তার আহ্বানে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয় এবং ময়দানে নেমে আসে। এভাবে অল্পদিনের মধ্যে খ্রিষ্টানদের বিশাল এক বাহিনী মুসলমানদের দিকে স্রোতের বেগে ধেয়ে আসে। নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থে প্রাচ্যের বাইজেন্টাইন গির্জা ও পাশ্চাত্যের গির্জার মধ্যে পরস্পর সমঝোতা হয়ে যায় এবং উভয় গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধে অংশ নেয়।

এদিকে ইসলামি বিশ্বে ছিল ঐক্যের অভাব। বাগদাদের আব্বাসি খিলাফত, মিসরের ফাতিমি খিলাফত, সেলজুকি সালতানাত ও স্পেনের শাসন—সবাই

পরস্পর বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে ঐক্যের কোনো পরিস্থিতি ছিল না। সুতরাং ক্রুসেডারদের জন্য এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কী হতে পারত?

ছ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ

মুসলমান সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব বিরাজমান ছিল, ইউরোপের খ্রিষ্টান সমাজ তখনও তা থেকে বঞ্চিত ছিল। ক্ষমতাসীন ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এসব মানুষের ক্ষোভের লক্ষ্য নিজেদের পরিবর্তে মুসলমানদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। নৈতিক অধঃপতনের কারণে জনসাধারণের অবস্থাও ছিল শোচনীয়।

ইউরোপের সরকারব্যবস্থায় সামন্তপ্রথা ছিল মৌলিক বিষয়। অভাবী ও দরিদ্র লোকেরা বিভিন্ন ধরনের বিধি-নিষেধের জালে আবদ্ধ ছিল। ইউরোপের সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল সামন্ততন্ত্রের ওপর। সামন্ত প্রভুরা দরিদ্র জনসাধারণের রক্ত চুষে নিত; অথচ তাদের কোনো অধিকার পরিশোধ করত না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামন্তপ্রথার অনিষ্টতা ও কুপ্রভাব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অর্থের সমস্ত উৎস মহাজন, গির্জার যাজক ও জমিদারদের আয়ত্তে ছিল। জনসাধারণ ছিল দুর্দশার মধ্যে। কৃষকদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। তাই ধর্মীয়শ্রেণি ধর্মের আচরণে জনগণের প্রতিক্রিয়া রোধ করার চেষ্টা চালায়, যাতে তাদের মনোযোগ দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলির দিকে না যায়। তা ছাড়া উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী যারা বঞ্চিত হয়েছিল, তারাও নিছক অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের স্বার্থে এতে বাতাস দেয়।

ইতালির বাসিন্দারা চাইছিল ফিলিস্তিন ও সিরিয়া দখল করে আগের মতো নিজেদের ব্যবসায়িক উন্নতি সাধন করতে। কেননা, ইসলামি বিজয়ের কারণে ইতালির ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য তাদের ধারণা ছিল ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে যদি ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার এলাকাসমূহ মুসলমানদের হাত থেকে আবার ছিনিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। ইউরোপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলি ও দুর্দশা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরানোর জন্য বাইরের সমস্যাবলি সম্মুখে নিয়ে আসে। ধর্মীয় নেতারা তাদের বিলাসী জীবন লুকানোর উদ্দেশ্যে জনগণের

মনোযোগ সামাজিক ও অর্থনৈতিক এসব অনাচার থেকে সরিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনার দিকে ফিরিয়ে দেয়।

জ. তাৎক্ষণিক কারণ

তাৎক্ষণিক কারণ ছিল পোপ দ্বিতীয় আরবানের ধর্মযুদ্ধের ফতোয়া। ফ্রান্সের পিটার যখন বাইতুল মুকাদ্দাস জিয়ারতে গেল, তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব তার মনে প্রবল আঘাত সৃষ্টি করল। ইউরোপে ফিরে গিয়ে সে খ্রিষ্টানদের দুরবস্থার মিথ্যাকাহিনী বর্ণনা করল এবং এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য সে গোটা ইউরোপ সফর করল। পিটারের এ সফর সেখানকার লোকদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। কিন্তু এই ধর্মযাজক বাইতুল মুকাদ্দাস দর্শন করতে আসা খ্রিষ্টান লোকদের বিশৃঙ্খলা ও দুষ্কর্ম বেমালুম চেপে গেল। পোপ যেহেতু পশ্চিমা গির্জার আধ্যাত্মিক নেতা ছিল, এ জন্য সে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর একটি সম্মেলন ডাকল এবং সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সাথে এ মর্মে সুসংবাদ ঘোষণা করল যে, এ যুদ্ধে মারা গেলে সব ধরনের পাপ মোচন হয়ে যাবে এবং বেহেশতের অধিকারী হওয়া যাবে। লোকেরা দলে দলে সেন্ট পিটারের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে হামলা করার জন্য রওয়ানা হলো।

ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ

প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ (১০৯৭-১১৪৫ খ্রি.)

পোপ কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার পর একে একে চারটি বিশাল বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হয়।

প্রথম বাহিনী : পাদরি পিটারের অধীনে ১৩ লাখ খ্রিষ্টানের এক বিশাল বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। পথে তারা নিজ ধর্মের লোক খ্রিষ্টানদের ওপরই হত্যা, রাহাজানি ও লুটপাট চালিয়ে বুলগেরিয়া হয়ে যখন কনস্টান্টিনোপল পৌছে, তখন এখানকার রোমান সম্রাট তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কারণে তাদের গতি এশিয়া মাইনরের দিকে ফিরিয়ে দেয়। তারা যখন ইসলামি এলাকায় প্রবেশ করে, তখন সেলজুকি শাসক

কালাজ আরসালান এ বাহিনীটিকে নাজেহাল করে ছাড়ে। তাদের প্রচুর সৈন্য মারা পড়ে। ক্রুসেডারদের এ অভিযান একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বাহিনী : এ বাহিনী একজন জার্মান পাদরি গাউসফেলের নেতৃত্বে যাত্রা আরম্ভ করে। তারা যখন হাঙ্গেরি অতিক্রম করছিল, তখন তাদের অনাচারে হাঙ্গেরির লোকেরা নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং তাদের সেখান থেকে বের করে দেয়। এ বাহিনীটিও এভাবে অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে।

তৃতীয় বাহিনী : ক্রুসেডারদের তৃতীয় বাহিনীতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ফিনল্যান্ডের স্বেচ্ছাসেবকরা ছিল। এ বাহিনী যখন যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়, তখন এই স্বেচ্ছাসেবকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের শিকার হয় রাইন নদীর তীরবর্তী মুসেলসহ কয়েকটি শহরের ইহুদি বাসিন্দারা। এরা যখন হাঙ্গেরি অতিক্রম করতে থকে, তখন হাঙ্গেরির বাসিন্দারা তাদের কচুকাটা করে হাঙ্গেরির মাটিতে দাফন করে দেয়।

চতুর্থ বাহিনী : সবচেয়ে সুশৃঙ্খল বাহিনী ছিল দশ লাখ সৈন্যের চতুর্থ বাহিনীটি। ১০৯৭ সালে তারা যাত্রা শুরু করে। এ বাহিনীতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও সিসিলির রাজপুত্ররা ছিল। ফ্রান্সের গডফ্রের হাতে ছিল এ সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব। বিশাল এই বহিনী এশিয়া মাইনরের দিকে রওয়ানা হয় এবং প্রসিদ্ধ কুনিয়া শহর অবরোধ করে। কালাজ আরসালান পরাজিত হলেন। বিজয়ী খ্রিষ্টানরা অগ্রসর হতে হতে ইন্তাকিয়া পৌছে যায়। নয় মাস পর ইন্তাকিয়াও তাদের দখলে চলে যায়। সেখানকার সমস্ত মুসলমানকে তারা হত্যা করে। মুসলমানদের ওপর ক্রুসেডারদের নির্যাতন ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে লজ্জাজনক অধ্যায়গুলোর একটি। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ কেউই তাদের হাত থেকে বাঁচতে পারল না। প্রায় এক লাখ মুসলমান নিহত হয়। ইন্তাকিয়ার পর বিজয়ী বাহিনী সিরিয়ার কয়েকটি শহর দখল করতে করতে হিমস পৌছে।

বাইতুল মুকাদ্দাস পতন : হিমস দখল করার পর ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে। ফাতিমিরা বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষার জন্য সন্তোষজনক কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এ জন্য ১৫ জুন ১০৯৯ সালে

খ্রিষ্টান উন্মাদরা খুব সহজেই বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নেয়। তারা শহরের পবিত্রতার কোনো খেয়াল-ই করেনি। মুসলমানদের ওপর চালানো হয় গণহত্যা ও লুটপাট। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাও এই লজ্জাজনক অত্যাচারের কাহিনী স্বীকার করেছে। বাইতুল মুকাদ্দাসের আশপাশের এলাকা দখলের পর গডফ্রেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক বানানো হয় এবং বিজিত এলাকাগুলো খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোর মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। এসব এলাকার মধ্যে ছিল ত্রিপোলি, ইন্তাকিয়া ও সিরিয়ার অংশসমূহ। মুসলমানদের পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল মুসলমানদের পরস্পরের অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা।

সেলজুকিদের বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন ইমাদুদ্দিন জিনকি ﵀-এর মতো মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি জিনকি শাসনের গোড়াপত্তন করেন এবং মুসলমানদের নবজীবনে ফিরিয়ে আনেন। তিনি হারবান, হালাব ইত্যাদি এলাকা জয় করে নিজের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি যে সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে ক্রুসেডারদের প্রতিহত করেন এবং তাদের পরাজিত করেন, তা ইসলামের ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় হয়ে রয়েছে। ইমাদুদ্দিন ﵀ ইথারব দুর্গ ও মিসরের সীমান্ত এলাকা থেকে খ্রিষ্টানদের বিতাড়িত করেন। সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে তিনি সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করেন। ইমাদুদ্দিন ﵀-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল বালবাক্কে পুনরায় মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ (১১৪৪-১১৮৭ খ্রি.)

ইমাদুদ্দিন ﵀-এর ইনতিকালের পর ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তার যোগ্যপুত্র নুরুদ্দিন জিনকি ﵀ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ক্রুসেডারদের প্রতিহত করার ক্ষেত্রে তিনি পিতার চেয়ে কম তৎপর ছিলেন না। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেন এবং খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে প্রচুর এলাকা ছিনিয়ে নেন। প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি ক্রুসেডারদের পরাজিত করতে থাকেন। তার নেতৃত্বে রাওহা শহরটি পুনরায় মুসলমানদের দখলে চলে আসে।

ক্রুসেডারদের পরাজয়ের খবর সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লে পোপ তৃতীয় কনরাড ও ফ্রান্সের শাসক সপ্তম লুইয়ের নেতৃত্বে নয় লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবারও লড়াইয়ের জন্য ইউরোপ থেকে রওয়ানা হয়। এই বাহিনীতে নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। প্রথম ক্রুসেডের মতো এ বাহিনীর সৈন্যরাও অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। সপ্তম লুইয়ের বাহিনীর একটি বড় অংশ সেলজুকিদের হাতে ধ্বংস হয়। তারা যখন ইনতাকিয়ায় পৌছে, তখন তাদের তিন-চতুর্থাংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট সৈন্যরা অগ্রসর হয়ে দামেশক অবরোধ করে। কিন্তু সাইফুদ্দিন জিনকি ﵀ ও নুরুদ্দিন জিনকি ﵀-এর সম্মিলিত বাহিনীর প্রচেষ্টায় ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। সপ্তম লুই ও কনরাডকে আবার ইউরোপের সীমান্তের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

মিসরে নুরুদ্দিন জিনকির দখল প্রতিষ্ঠা : ইতিমধ্যে পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয় এবং ইসলামের ইতিহাসে এমন এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, যার অসাধারণ কৃতিত্ব ও অবদান আজও মুসলমানদের জন্য ভোলার নয়। এ মহান ব্যক্তি ছিলেন গাজি সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀। মিসরের ফাতিমি খলিফা ফাইজ বিল্লাহর এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি খ্রিষ্টানদের স্রোত প্রতিহত করবেন। তার মন্ত্রী শাদির সাদি ক্রুসেডারদের বিপদ অনুভব করে নুরুদ্দিন জিনকি ﵀-কে মিসরে হামলার আহ্বান জানালেন। নুরুদ্দিন জিনকি ﵀ নিজ ভাই আসাদুদ্দিন শিরকোহকে এ অভিযানে নিযুক্ত করলেন। সে মতে আসাদুদ্দিন মিশরে প্রবেশ করে খ্রিষ্টানদের নাস্তানাবুদ করলেন। কিন্তু শাদির বিশ্বাসঘাতকতা করে শিরকোহের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের সাথে আঁতাত করল। ১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে শিরকোহ আবার মিসরে হামলা চালালেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া দখলের পর মিসরের অধিকাংশ এলাকা আয়ত্ত করে নিলেন। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀ এসব অভিযানে শিরকোহের সহযোগী ছিলেন। শাদির সাদিকে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় এবং শিরকোহ হন খলিফা আজিদের মন্ত্রী। তারপর সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀ তার স্থলাভিষিক্ত হন। খলিফা তাকে আল মালিকুন নাসির উপাধি দেন। খলিফা আজিদের ইনতিকালের পর মিসরের স্বাধীন সুলতান হওয়ার পর

সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﷺ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদকে নিজ জীবনের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেন।

হিত্তিন যুদ্ধ : মিসর ছাড়াও সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﷺ ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিরিয়া, মুসেল, আলেপ্পো ইত্যাদি এলাকা জয় করে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সময়ে ক্রুসেডার নেতা রিজনাল্ডের সাথে চার বছরের শান্তিচুক্তি হয়। সে মতে উভয়ে পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু এ চুক্তি কাগজ কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ক্রুসেডাররা যথারীতি বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা সৃষ্টিতে লিপ্ত থাকে এবং মুসলমানদের কাফেলার ওপর হামলা অব্যাহত রাখে।

১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে রিজনাল্ড এ ধৃষ্টতা দেখায় যে, সে আরও কয়েকজন খ্রিষ্টান নেতাকে সাথে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় হামলার উদ্দেশ্যে হিজাজে অভিযান চালায়। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﷺ তার তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য পদক্ষেপ নেন এবং অবিলম্বে রিজনাল্ডকে ধাওয়া করতে করতে তাকে হিত্তিন গিয়ে ধরে ফেলেন। সুলতান সেখানে শত্রুবাহিনীর ওপর এমন এক আগ্নেয় উপাদান নিক্ষেপ করেন, যাতে মাটিতে আগুন জ্বলে ওঠে। সেই আগ্নেয় পরিবেশে ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে হিত্তিনে সংঘটিত হয় ইতিহাসের ভয়াবহতম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ত্রিশ হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হয় এবং একই পরিমাণে বন্দী হয়। রিজনাল্ড নিজেও বন্দী হয়। সুলতান নিজ হাতে তার দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করেন। এ যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী খ্রিষ্টানদের এলাকাসমূহে প্রবল বেগে ছড়িয়ে পড়ে সব দখল করে ফেলে।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় : হিত্তিনে জয় লাভের পর সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﷺ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মনোযোগ দেন। এক সপ্তাহ ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর খ্রিষ্টানরা আত্মসমর্পণ করে এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করে। দীর্ঘ ৯১ বছর খ্রিষ্টানদের হাতে থাকার পর বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজয় ছিল সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﷺ-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। কিন্তু তিনি বিজিত জাতির সাথে ক্রুসেডারদের মতো আচরণ করলেন না। তিনি খ্রিষ্টানদের ওপর কোনো প্রকার অত্যাচার নির্যাতন করেননি; বরং চল্লিশ দিনের মধ্যে তাদের শহর ছেড়ে চলে যেতে অনুমতি

দিলেন। দয়ালু সুলতান মুক্তিপণ হিসাবে নির্ধারণ করলেন মামুলি অর্থ। তাও যারা পরিশোধ করতে অপারগ হলো, তাদের তিনি এমনিতেই মুক্তি দিলেন। কারও কারও মুক্তিপণ তিনি নিজের পক্ষ থেকে দিয়ে দিলেন। তখন থেকে প্রায় ৭৬১ বছর পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদেরই আয়ত্তে ছিল। তারপর ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ষড়যন্ত্রে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদিরাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাইতুল মুকাদ্দাসের অর্ধেক চলে যায় ইহুদিদের দখলে। এরপর ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বাইতুল মুকাদ্দাসের পুরো দখল নিয়ে নেয় ইসরাইল, যা আজ পর্যন্ত তাদের দখলে রয়েছে।

তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৯-১১৯২ খ্রি.)

বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতে চলে যাওয়া ক্রুসেডারদের জন্য মৃত্যুর পয়গামের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। মুসলমানদের এ বিজয়ের খবরে সারা ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ফলে তৃতীয় ক্রুসেডের আয়োজন শুরু হয়। পুরো ইউরোপ এতে যোগ দেয়। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারব্রোসা, ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড সবাই এ যুদ্ধে অংশ নেয়। পাদরি ও ধর্মযাজকরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের উত্তেজিত করতে থাকে।

খ্রিষ্টান বিশ্ব এত বিশাল সেনাবাহিনী আগে কখনো তৈরি করেনি। অসংখ্য সৈন্যের এ বাহিনী রওয়ানা হয়ে আক্কা বন্দর অবরোধ করে। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﷺ একাকী আক্কা বন্দর রক্ষার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রুসেডারদের কাছে ইউরোপ থেকে লাগাতার সাহায্য আসতে থাকে। এক যুদ্ধে দশ হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু তবুও ক্রুসেডাররা অবরোধ বহাল রাখে। যেহেতু অন্য কোনো ইসলামি রাষ্ট্র থেকে সুলতানের প্রতি সহায়তার হাত বাড়ানো হলো না, এ জন্য ক্রুসেডারদের অবরোধে শহরবাসীর সাথে সুলতানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সুলতান সব রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমানদের কোনো সাহায্য পৌছাতে পারলেন না। নিরুপায় হয়ে শহরবাসীরা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে শহরটি খ্রিষ্টানদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে মতে মুসলমানরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দুলাখ স্বর্ণমুদ্রা পরিশোধে সম্মত হয় এবং মহাক্রস ও পাঁচশ খ্রিষ্টান বন্দীকে ফেরত

দেওয়ার শর্ত মেনে নিয়ে মুসলমানরা অস্ত্র ফেলে দেয়। মুসলমানদের সব সহায় সম্পদ নিয়ে শহর থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু রিচার্ড বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং অবরুদ্ধ লোকদের হত্যা করে।

আক্কার পর ক্রুসেডাররা ফিলিস্তিনের আসকালান বন্দরের দিকে অগ্রসর হয়। আসকালান যাওয়ার পথে সুলতানের বাহিনীর সাথে খ্রিষ্টানদের বারোটি লড়াই হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আরসুভের লড়াই। সুলতান বীরত্ব ও সাহসিকতার উজ্জ্বল নমুনা পেশ করেন। কিন্তু যেহেতু কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে বাগদাদের খলিফার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য আসেনি, এ জন্য সুলতানকে শেষ পর্যন্ত পিছপা হতে হলো। ফিরে আসার সময় সুলতান নিজেই আসকালান শহর ধ্বংস করে দিলেন। ক্রুসেডাররা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন ইটের স্তুপ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। এরই মধ্যে সুলতান বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষার সব আয়োজন সম্পন্ন করলেন। কেননা, এবার ক্রুসেডারদের টার্গেট ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস। সুলতান তার ছোট একটি বাহিনী নিয়ে খ্রিষ্টানদের বিশাল বাহিনীকে অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে প্রতিহত করতে লাগলেন। বিজয়ের কোনো আশা দেখতে না পেয়ে ক্রুসেডাররা সন্ধির আবেদন জানালে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তাতে সাড়া দেন। আর এরই মাধ্যমে তৃতীয় ক্রুসেড শেষ হয়।

চুক্তির শর্তগুলো ছিল এরূপ :

১. বাইতুল মুকাদ্দাস যথারীতি মুসলমানদের হাতে থাকবে।

২. আরসুভ, হায়ফা, ইরাফা ও আক্কা ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়।

৩. আসকালান স্বাধীন এলাকা হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

৪. পর্যটকদের আসা-যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

এ ক্রুসেডে খ্রিষ্টানরা আক্কা বন্দর ও দু'তিনটি এলাকা ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারেনি। তারা বিফল হয়ে ফিরে যায়। রিচার্ড শেরদিল সুলতানের বদন্যতা, উদারতা ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়। জার্মান সম্রাট পালিয়ে যাওয়ার সময় নদীতে ডুবে মারা যায় এবং এ যুদ্ধে সব মিলিয়ে প্রায় ছয় লাখ খ্রিষ্টান সৈন্য প্রাণ হারায়।

চতুর্থ ক্রুসেড (১২০১-১২০৪ খ্রি.)

চতুর্থ ক্রুসেড মূলত সাজানো হয়েছিল মিশরে হামলা চালিয়ে জেরুজালেম জয় করার উদ্দেশ্যে।আইয়ুবি সুলতান আল-মালিকুল আদিলের হাতে খ্রিষ্টানরা দৃষ্টান্তমূলক পরাজয় বরণ করে এবং ইয়াফা শহর মুসলমানদের আয়ত্তে চলে আসে। পরিবর্তে এপ্রিল ১২০৪ সালে ক্রুসেডাররা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে। এটি ইতিহাসের সবচেয়ে লাভজনক ও অমার্জিত লুণ্ঠন বলে মনে করা করা হয়।

পঞ্চম ক্রুসেড (১২১৭-১২২১ খ্রি.)

পঞ্চম ক্রুসেড ছিল ইউরোপের খ্রিস্টানদের জেরুসালেম ও পবিত্র ভূমি পুনর্দখলের একটি প্রচেষ্টা, যাতে প্রথমে মিশরের শক্তিশালী আইয়ুবি রাজ্যকে পরাজিত করার চেষ্টা করা হয়।

ষষ্ঠ ক্রুসেড (১২২৮ খ্রি.)

ষষ্ঠ ক্রুসেড ১২২৮ সালে জেরুজালেম পুনরায় অধিকারের উদ্দেশ্যে শুরু হয়। পঞ্চম ক্রুসেডের ব্যর্থতার মাত্র সাত বছর পরে এটি শুরু হয়েছিল। পোপ এনভিসেন্টের নেতৃত্বে আড়াই লাখ জার্মান সৈন্যের বিশাল বাহিনী সিরিয়ার উপকূল আক্রমণ করে। আইয়ুবি শাসক আল-আদল নীলনদের মোহনায় প্রতিরোধ গড়ে তুললে খ্রিষ্টান বাহিনী নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

সপ্তম ক্রুসেড (১২৪৮-১২৫৪ খ্রি.)

আল-মালিকুল কামিল ও তার ভাইদের মধ্যে বিরোধের কারণে বাইতুল মুকাদ্দাস শহর ক্রুসেডারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কামিলের উত্তরসূরি সালিহ তা আবার ক্রুসেডারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। বাইতুল মুকাদ্দাস যথারীতি মুসলমানদের আয়ত্তে থেকে যায়।

অষ্টম ক্রুসেড (১২৭০-১২৭১)

ফ্রান্সের সম্রাট নবম লুই পরিচালিত একটি ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধ, যা ১২৪৮ হতে ১২৫৪ পর্যন্ত সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রাজা নবম লুই পরাজিত ও বন্দী হয়। আইয়ুবি রাজবংশের শাসক মোআজ্জেম তুরানশাহ এর নেতৃত্বে মিশরীয় বাহিনী রাজা নবম লুইকে বন্দী করে। যুদ্ধ শেষে লুইয়ের মুক্তির জন্য ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা (ফ্রান্সের তখনকার বাৎসরিক আয়ের সমান অর্থ) মুক্তিপণ হিসাবে দেওয়া হয়। এই ক্রুসেডে মিশরীয় বাহিনীকে বাহরি, মামলুক, বাইবার, কুতুজ, আইবাক ও কুলওয়ান গোষ্ঠী সহায়তা করে।

নবম ক্রুসেড (১২৭১-১২৭২ খ্রি.)

নবম ক্রুসেডকে অনেক সময় অষ্টম ক্রুসেডের সাথে একত্রে বর্ণনা করা হয়। এটিকে পবিত্র ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে মধ্যযুগে সংঘটিত শেষ ক্রুসেড হিসাবে গণ্য করা হয়। এটি ১২৭১-১২৭২ সালে সংঘটিত হয়েছিল।

ফ্রান্সের নবম লুই অষ্টম ক্রুসেডের সময় তিউনিস দখলে ব্যর্থ হলে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ইসরাইলের আকো বন্দরের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু ততদিনে ইউরোপের ক্রুসেডের জোয়ার ছিল শেষের দিকে। আর মিশরের মামলুক রাজবংশও ছিল বেশ শক্তিশালী। মুসলমানরা ইংরেজ ও ফরাসি যৌথবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। ফলে এডওয়ার্ডের এই ক্রুসেড ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পরপরই ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ক্রুসেডারদের বাকি ঘাটিগুলিরও একে একে পতন ঘটে। এ যুদ্ধের ফলে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে ক্রুসেডারদের অস্তিত্ব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ক্রুসেডারদের মধ্যে নতুনভাবে আর যুদ্ধের সাহস রইল না। এদিকে মুসলমানরা নিজেদের এলাকা রক্ষায় সচেতন হয়ে যায়।

নিজেদের দীর্ঘ যুদ্ধের ধারা শেষ হয় এবং খ্রিষ্টানরা ধ্বংস ও পরাজয় ছাড়া আর কিছু অর্জন করতে না পারায় তাদের যুদ্ধের উন্মাদনা থিতিয়ে যায়। একপর্যায়ে ধারাবাহিক ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের অবসান ঘটে।

অন্যান্য ক্রুসেড

এখানে যে নয়টি ক্রুসেডের বিবরণ দেওয়া হলো, এগুলো ছাড়াও আরও কয়েকটি ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছে। সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন ১২১২ খ্রিষ্টাব্দে বালকদের ক্রুসেড নামে এক বিশেষ যুদ্ধের আয়োজন করা হয়। খ্রিষ্টান পাদরিদের মতে বয়স্ক মানুষেরা পাপী হয়ে থাকে। পাপীরা থাকার কারণে ক্রুসেড বাহিনী জয় লাভ করতে পারছে না। যেহেতু বালকেরা নিষ্পাপ হয়, অতএব যদি তাদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করা হয়, তাহলে বিজয় আসতে পারে। সে মতে সাঁইত্রিশ হাজার বালকের এক বিশাল বাহিনী গঠন করা হয়। ফ্রান্স থেকে ত্রিশ হাজার বালকের বাহিনী রওয়ানা হয় সেনাপতি স্টিফেনের নেতৃত্বে। আর জার্মান থেকে নিকোলাসের নেতৃত্বে রওয়ানা হয় সাত হাজার বালক। কিন্তু এসব বালকের কেউ বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছাতে পারেনি; বরং ফ্রান্সের উপকূলীয় এলাকা ও ইতালিতে তাদের সবাইকে গোলাম বানিয়ে নেওয়া হয় এবং তারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তারা নিঃশেষ হয়ে যায়। বালকদের এ ক্রুসেড সংঘটিত হয় পঞ্চম ক্রুসেডের আগে। ইউরোপে উসমানি খিলাফতের সম্প্রসারণ ঠেকানোর জন্য চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে যেসব যুদ্ধ হয়, ইউরোপীয়রা সেগুলোকেও ক্রুসেড নাম দেয়।

১৪৫৬ খ্রিষ্টাব্দে উসমানিরা বেলগ্রেড অবরোধ করলে তা ভাঙার জন্য ইউরোপীয়রা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তখন উসমানি সুলতান ছিলেন কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ﵀। তিনি বেলগ্রেড জয় করতে সক্ষম হলেন না। এতে ক্রুসেডাররাই বিজয়ী হলো। অবশ্য অনেক পরে ১৫২১-এর ২৯ আগস্ট সুলতান প্রথম সুলাইমান ﵀ বেলগ্রেড জয় করে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ফলাফল

দুই শতাব্দী ধরে চলতে থাকা যে ক্রুসেডযুদ্ধ মুসলমানদের ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে ধ্বংস ও নাশকতা ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারেনি ইউরোপীয়রা। এভাবে এই ধর্মীয় উন্মাদনার ফলে বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়।

প্রথমত, এতে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ও ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে। এসব যুদ্ধ ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নেওয়ার জন্য, কিন্তু যথারীতি তা মুসলমানদের দখলেই থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মাঝে বৈরিতার মজবুত দেয়াল তৈরি হয়ে যায়। আর তা আজ পর্যন্ত বহাল আছে। এ দুধর্মের মানুষের মধ্যে স্থায়ী বিরোধের পেছনে রয়েছে এসব যুদ্ধ। বর্তমানে ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও নতুন বিশ্বব্যবস্থার নামে গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পশ্চিমা ও মার্কিন পরিকল্পনা সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।

তৃতীয়ত, ইউরোপে যখন যুদ্ধের উন্মাদনা থেমে যায়, তখন তারা গির্জাগুলোর প্রভাব ও কর্তৃত্ব অনুধাবন করতে পারে। ফলে গির্জার কর্তৃত্বের সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, যাতে প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে গির্জার প্রভাব কমে যায়।

চতুর্থত, ইউরোপের অসভ্য লোকেরা যখন মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে, তখন মুসলমানদের শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতি দেখে অভিভূত হয়ে যায়। ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয়ের কারণে তাদের মানসিকতায় বিপ্লব সৃষ্টি হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ইউরোপের পরিবেশ অনুকূল হয়ে যায়। তা ছাড়া ইউরোপে সামন্তপ্রথার অবসান ঘটে এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

পঞ্চমত, ইউরোপে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য লেনদেনের পরিবর্তে মুদ্রাব্যবস্থা চালু হয়। তা ছাড়া শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রেও ইউরোপে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। ইউরোপের স্থাপত্য শিল্পও ইসলামি স্থাপত্য রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।[৯৫৫]

৯৫৫. খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে ক্রুসেড উসকে ওঠার কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ থেকে ফলাফল বর্ণনা পর্যন্ত বাংলা, উরদু, আরবি উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত।

দশম ক্রুসেড (১৮৩০-১৯৬০ খ্রি.)

দশম ক্রুসেড শুরু হয়, তুরস্কের উসমানি খিলাফত ধ্বংসের আবর্তনের ঘটনাবলির মাধ্যমে। এ ক্রুসেড উসমানি খিলাফতকে আবর্তন করে হলেও এর সূচনা আরও আগ থেকেই হয়েছিল। যেমন ব্রিটিশ-ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ কর্তৃক উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা।

চরম উপনিবেশকৃত উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ :

মিশর : ১৮৮২ থেকে এটি ব্রিটিশ উপনিবেশ। ১৯১৪ সালে তা আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ব্রিটিশ অবিভাবকত্বের অধীনে ১৯২২ থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। ১৯৩৬ থেকে তার পরবর্তী বছরগুলোতে স্বায়ত্তশাসন। সর্বশেষ ব্রিটিশ বাহিনী সুয়েজ খাল এলাকা থেকে ১৯৫৬ সালে চলে গেলে মিশর স্বাধীনতা লাভ করে।

সুদান : ১৮৯৯ থেকে ব্রিটিশদের অধীনে মিশর-সুদান দুই সার্বভৌম সরকারের যুগ্ম শাসনে পরিচালিত হয়। এরপর ১৯৫৬-এর পর এসে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে।

তিউনিসিয়া : ১৮৮১ থেকে ফ্রান্সের উপনিবেশ বিদ্যমান ছিল। ১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

আলজেরিয়া : ফ্রান্স কর্তৃক বশীকরণ শুরু হয় ১৮৩০ সালে। এরপর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৯৬৩ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

মরক্কো : ১৯১২ সালে ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। এরপর ১৯৫৬ সালে স্বাধীন হয়।

লিবিয়া : ১৯১১ থেকে ইটালীয় উপনিবেশ চলে আসছে। যখন ইটালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হেরে যায়, তখন তাদের লিবিয়াও হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৯৫১ সালে এখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৬৯ সালে রাজতন্ত্রও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাধারণ উপনিবেশকৃত দেশসমূহ

এ সকল দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত উসমানি খিলাফতের অধীনে ছিল। সাইকস-পিকটের চুক্তিটি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। এমন দেশের সংখ্যা পাঁচটি। যথা :

সিরিয়া : ফ্রান্স কর্তৃক ১৯১৮ সালে উপনিবেশকৃত এলাকা ছিল। ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

ইরাক : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯৩২ সালের পর নামমাত্র স্বাধীনতা পায়।

জর্দান : ১৯১৮ সালে ব্রিটিশদের ম্যান্ডেড[৯৫৬] বা অধিকৃত ভূমি হিসাবে ছিল। অতঃপর ১৯৪৬ সালে তাদের উপনিবেশ উঠে যায়।

ফিলিস্তিন : ১৯১৮ সালে ব্রিটিশদের ম্যান্ডেড বা অধিকৃত ভূমি ছিল। ১৯৪৮-১৯৬৭ সালে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত।

লেবানন : ১৯১৮ সালে ফ্রান্সের ম্যান্ডেড বা অধিকৃত ভূমি ছিল। অতঃপর ১৯৪৩ সালে জাতীয় চুক্তির সাথে উপনিবেশ উঠে যায়।

উল্লেখ্য যে, ১৯১৮ সালের পূর্বে জর্দান, ফিলিস্তিন ও লেবানন দেশ তিনটি সিরিয়ার অংশ ছিল।

উপসাগরীয় অঞ্চলে সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্রসমূহ :

১৮৩০ সালের পর থেকে ব্রিটিশ সেনা ও নেভালের অধীনে থাকা কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, আরব আমিরাত অঞ্চলগুলো ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্বে আসে। সৌদি আরব ১৯৩০-এর দশকে অস্তিত্বে আসে। কুয়েত ১৯৫০-এর দশকে ইরাকি-ব্রিটিশ অভিভাবকত্ব থেকে বের হতে সক্ষম হয়। তেল আবিষ্কারের পূর্বে এ সকল অঞ্চল উপনিবেশকারীদের কাছে অর্থগত কোনো চাহিদাপ্রাপ্ত ছিল না।[৯৫৭]

---

৯৫৬. বিশ্বযুদ্ধের শেষে পরাজিতদের কাছ থেকে নেওয়া অঞ্চল।

৯৫৭.http://coldwarstudies.com/2013/01/11/history-of-colonization-in-the-middle-east-and-north-africa-mena-precursor-to-cold-war-conflict/

আরব উপদ্বীপের দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহ

দক্ষিণ ও উত্তর ইয়ামান : সমুদ্রপথে একটি ব্রিটিশ জাহাজের ধ্বংসাবশেষ চুরি হয়ে যাওয়ার অজুহাতে ব্রিটিশরা ১৮৩৯ সালে এডেন দখল করে। ১৯৩৭ সালে এ অঞ্চল ব্রিটিশ রাজশাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এডেন ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসাবে শাসিত হয়ে আসছিল। ১৯৬৭ সালের ৩০ নভেম্বর দক্ষিণ ইয়ামান স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৯০ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত এ দেশ দুটি আলাদা রাষ্ট্র উত্তর ইয়ামান এবং দক্ষিণ ইয়ামান নামে বিভক্ত ছিল। উভয় দেশ একত্রিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ইয়ামান গণপ্রজাতন্ত্রী এবং দক্ষিণ ইয়ামান কমিউনিস্ট শাসনাধীনে ছিল।[৯৫৮]

চলমান ক্রুসেড

এখনও অবিরতভাবে ইউরোপ ও আমেরিকা তাদের মনের গভীরে লুকায়িত হিংসা ও ঘৃণা থেকে উত্তেজিত হয়। যা তাদের অতীত সে পরাজয়গুলোর ফল, তাদের খ্রিষ্টীয় গোঁড়ামি ও চরমপন্থা থেকে যার উৎপত্তি। যা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা উসকে দেয়, যার ফলে তারা হিংসায় ফেটে পড়ে। ফলে যখনই তারা সুযোগ পায় মুসলিমদের নির্যাতন ও অত্যাচার করতে থাকে।

আমাদের অতীত ও বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের হাতে মুসলিমদের ওপর যে নজীরবিহীন নির্যাতন ও অত্যাচার করা হয়েছে, স্পেনে যে গণহত্যা ও রক্তের বন্যা প্রবাহিত করা হয়েছে, পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিমদের ওপর যে জুলম চলছে; নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতার ষোলকলায় পূর্ণ এ ভয়ংকর চিত্র বলিষ্ঠ যুবককেও শীর্ণকায় বৃদ্ধে পরিণত করে। এ চিত্র দেখে দুর্বল মনের অধিকারীরও প্রাণঘাতী হৃদরোগে আক্রান্ত হতে বেশি দেরি হয় না, যার আরেকটি চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে ফিলিস্তিনের শরণার্থীদের মাঝে।

মুসলমানদের ওপর জুলম-নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ, গণহত্যা, দীর্ঘকাল থেকে ইসলামের ভূমিগুলোতে তাদের উপনিবেশ, মুসলিমদের দেশে মুসলিমদের ওপর চলা ষড়যন্ত্র, ইসলামের ভূমি নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতাজনক সাইকস-

---

৯৫৮. https ://bn.wikipedia.org/wiki/ইয়েমেন#আধুনিক ইতিহাস

পিকট, বেলফো, ১৫ মে ১৯৪৮-এর বাণিজ্যিক চুক্তি ইত্যাদির মতো হাজারো অপরাধ ও ষড়যন্ত্রে ভরা ক্রুসেডের ইতিহাস। ক্রুসেডের এ ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা অতিদীর্ঘ, তাদের চরমপন্থার ফিরিস্তি বর্ণনাতীত।

২০০১ সালে আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকার হামলাকে বুশ ক্রুসেড হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। আমেরিকার জনগণ ব্যাপকহারে এ যুদ্ধকে সমর্থন জানায়। বর্তমানেও এ যুদ্ধে চলছে। এ ছাড়া ইরাক হামলা, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে হামলা অব্যাহত রয়েছে। এমনকি আমেরিকা তার ক্রুসেডের জাল সারা বিশ্বেই বিছিয়ে রেখেছে।

কাফিরদের সাথে মুসলিমদের আচরণনীতি

চরমপন্থা ও গোঁড়ামিপূর্ণ এ ক্রুসেড খ্রিষ্টানদের এমন ঘৃণ্য করে তোলে যে, নিপীড়ন-অত্যাচারের সময় তারা সামান্য পরিমাণও দ্বিধাবোধ করে না, তাদের মনে একটুও দয়া বা মানবিক অনুভূতি জাগরুক হয় না। ইসলাম মুসলিমদের আদেশ দেয় এ ধরা থেকে শিরক ও জুলুম নিশ্চিহ্ন করার। তাই মুসলিমদের দায়িত্ব হলো এ ধরা থেকে কুফর-শিরককে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং ক্রুসেডের মতো প্রভৃতি জুলুম ও চরমপন্থা থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾

'আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে কারও প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই। কিন্তু যারা জালিম তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র।'[৯৫৯]

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

৯৫৯. সুরা আল-বাকারা : ১৯৩

'আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ করেন।'[৯৬০]

এমনিভাবে ইসলাম মুসলিমদের শিক্ষা দেয় দয়া-পরবশ হওয়ার, কল্যাণার্থে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার। ইসলামে মুসলিম ও অমুসলিম সবার ওপর জুলুম করাকে হারাম করা হয়েছে। সর্বাবস্থায় কল্যাণের চিন্তা করতে ও কল্যাণের কাজ করতে আদেশ দিয়েছে। সকল ক্ষেত্রে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করতে বলেছে; যদিও তা কোনো ইহুদি, খ্রিষ্টানের পক্ষে বা কোনো নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে যাক না কেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো; এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে জ্ঞাত।'[৯৬১]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

৯৬০. সুরা আল-আনফাল : ৩৯
৯৬১. সুরা আল-মায়িদা : ৮

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও আল্লাহর সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়। কেউ যদি সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের চেয়ে তাদের ব্যাপারে অধিক কল্যাণকামী। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কেই অবগত।'[৯৬২]

উপসংহার

এই ছিল ইসলামি জীবনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ন। বস্তুত ইসলামের সর্বজনীন এ নিজাম বা ব্যবস্থা এতটাই বিস্তৃত যে, সংক্ষিপ্ত ও ছোট্ট এ পরিসরে তা আনা পুরো সমুদ্রকে একটি গ্লাসে রাখার নামান্তর। আর তাই বইটি লিখতে গিয়ে বারবার এ উপলব্ধি এসেছে যে, এতটুকুতে কি পাঠকের তৃপ্তি মিটবে? বস্তুত ইসলামের সামগ্রিক বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ এখানে আনা সম্ভব ছিল না। শুধু পাঠককে এ মেসেজ দেওয়ার জন্যই বইটি লেখা হয়েছে যে, তারা যেন বুঝতে পারে, ইসলামের বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি কত বিশাল! প্রতিটি অঙ্গনেই রয়েছে এর সুনিপুণ নির্দেশনা। বইটিতে আমরা ছয়টি অধ্যায়ে আকিদা, শরিয়াব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থায়নব্যবস্থা ও বিভিন্ন বাতিল মতবাদ নিয়ে সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সামগ্রিক জীবনে ইসলামের এ ব্যবস্থাপনা যদি আজ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে পৃথিবীর মানুষ সকল ফিতনা, বিবাদ ও অশান্তি থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু আফসোস! বিধর্মীরা তো দূরে থাক, স্বয়ং মুসলিম দেশের শাসকদেরই এ ব্যবস্থাপনার ওপর পূর্ণ আস্থা বা কোনো ধারণা নেই। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টির সাথে চ্যালেঞ্জ করছি, পুরো বিশ্ব বা ন্যূনতম বিশ্বের কোনো একটি দেশ যদিও এ জীবনব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে, তবে এক বছরও লাগবে না ইনশাআল্লাহ, দেশ থেকে সকল দুর্নীতি, অরাজকতা,

৯৬২. সূরা আন-নিসা : ১৩৫

খুন, রাহাজনি, চুরি, অশ্লীলতাসহ অশান্তির সব উপকরণ পুরোপুরি বিদায় নেবে। এতে আমাদের এক চুল পরিমাণও সন্দেহ নেই।

তিক্ত বাস্তবতা হলো, ইসলামের জীবনব্যবস্থার মধ্যে যে এমন নিখুঁত ও সবচেয়ে নির্ভুল নির্দেশনা রয়েছে, তা অনেকে জানেই না, বা জানলেও বিশ্বাস করতে চায় না। অধিকাংশ মানুষের ধারণা, ইসলাম মানে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, দান-সদকা, সত্য কথা বলা, হালাল খাওয়াসহ ব্যক্তিক জীবনের কয়েকটি আমলের নাম। ইসলামের যে প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা আছে, ইসলাম যে সমাজব্যবস্থা নিয়েও কথা বলেছে, ইসলাম যে অর্থায়নব্যবস্থার ব্যাপারেও নিখুঁত দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, তা আজ কজনেই বা জানে! এজন্যই বক্ষ্যমাণ বইটিতে ইবাদতের চেয়ে অনালোচিত এসব বিষয়েই অধিক আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, বইটি থেকে একজন সত্যানুসন্ধানী পাঠক ইসলামি জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ না পেলেও সম্যক ধারণা পেয়ে যাবে যে, ইসলামের ব্যাপ্তি ও গভীরতা কতটা সুবিস্তৃত!

বাহ্যত ইসলামি জীবনব্যবস্থা শুনতে বা বুঝতে যতটা কঠিন মনে হয়, বাস্তবিক অর্থে ততটা জটিল নয়। কেননা, এটি মানবপ্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যবস্থার সাথে মানুষের সম্পৃক্তি না থাকায় এটিকে অনেকে কঠিন ও কষ্টকর বলে মনে করে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে সে ভুল ধারণা দূর করে আমরা দেখিয়েছি যে, ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত জীবনব্যবস্থাই সবচেয়ে সহজ ও সরল; সবার জন্য উপযোগী ও যথোপযুক্ত; সর্বযুগে প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য। তাই ইসলামি জীবনব্যবস্থা জেনে তা ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

আশার কথার হলো, ইসলামি জীবনব্যবস্থার বিপরীত মানবরচিত মতাবাদ-মতাদর্শগুলোর কুৎসিত স্বরূপ দিনদিন মানুষের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে। জনগণ আজ ভালোভাবেই উপলব্ধি করছে যে, বিশ্বজুড়ে চলমান জুলুম, নির্যাতন, নগ্নতা, অশ্লীলতা, দুর্নীতি, লুটতরাজ—সকল অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দূর করে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ইসলামি শাসনব্যবস্থা ব্যতিরেকে ভিন্ন কোনো পথ নেই। ইসলামের আলোকিত জীবনব্যবস্থাই নিশ্চিত করতে পারে সকলের সুখ ও শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা। এ সত্য বুঝতে পেরেই মানুষ

তাদের মধ্যে বিদ্যমান কুফরি জীবনব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে প্রস্তুত হচ্ছে। নিজেদের দ্বীনি মৌলিক বিশ্বাসকে যথাযথভাবে ধারণ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় বসবাস করতে চাচ্ছে।

আর ইসলামের এ আলোকিত জীবনব্যবস্থাকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আমাদের মুসলিমদেরই নিতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হিসাবে অবশ্যই আমাদের বিশ্বমুসলিম তথা মানবতার সমস্যাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। ইসলামি জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের থাকতে হবে পরিষ্কার জ্ঞান। যখন আমরা ইসলামের সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতা অনুধাবন করতে পারব, তখনই এর জন্য নিজেদের সর্বস্ব কুরবান করার মতো মানসিকতা লালন করতে সচেষ্ট হবে।

বস্তুত, ইসলাম এমন জীবনব্যবস্থার নাম, যার পরতে পরতে রয়েছে দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ছোঁয়া। প্রতিটি সিদ্ধান্তে রয়েছে ওহিভিত্তিক নিখুঁত পরিচর্যার পরশ। সূচনাকাল থেকে চৌদ্দশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু বিরোধীরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এতে কোনো ছিদ্র খুঁজে পায়নি। এটিই প্রমাণ করে যে, এ জীবনব্যবস্থা ও নির্দেশিকা মানবরচিত হতে পারে না। এটি সমগ্র জাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহ তাআলার দেওয়া নির্দেশনার আলোকে গঠিত এক সর্বজনীন ব্যবস্থার নাম, যা কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য স্থায়ী বিধান হিসাবে কার্যকর ছিল, আছে এবং থাকবে।

তাই মুসলিম-অমুসলিম, আলিম-জাহিল, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ—সবাইকে বিনত অনুরোধ করব, ইসলামকে জানুন। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য ও এর সর্বজনীনতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ ইসলামের বিজয় অত্যাসন্ন; যদি আমরা ইসলামকে সঠিকভাবে জেনে তদনুযায়ী কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের প্রতিটি অঙ্গনে ইসলামি জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের তাওফিক দিন এবং তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামের ওপর অটল রাখুন। আমিন।

গ্রন্থপঞ্জি

ক্রমিক নং	গ্রন্থের নাম	লেখক
১.	আল-কুরআন	
২.	তাফসিরুত তাবারি	ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি ؒ (মৃ. ৩১০ হি.)
৩.	তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম	ইমাম ইবনু আবি হাতিম আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরিস আত-তামিমি আর-রাজি ؒ (মৃ. ৩২৭ হি.)
৪.	আহকামুল কুরআন	ইমাম আবু বকর আহমাদ বিন আলি আর-রাজি ؒ (মৃ. ৩৭০ হি.)
৫.	তাফসিরুল বাগাবি	ইমাম আবু মুহাম্মাদ হুসাইন বিন মাসউদ বিন মুহাম্মাদ আল-বাগাবি ؒ (মৃ. ৫১০ হি.)
৬.	আহকামুল কুরআন	ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আবু বকর ইবনুল আরাবি আল-মালিকি ؒ (মৃ. ৫৪৩ হি.)
৭.	তাফসিরুল কুরতুবি	ইমাম শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কুরতুবি ؒ (মৃ. ৬৭১ হি.)
৮.	তাফসিরু ইবনি কাসির	ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল বিন উমর বিন কাসির আদ-দিমাশকি ؒ (মৃ. ৭৭৪ হি.)

ইসলাম বলতেই আমরা বুঝি কেবল নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ গুটিকয়েক ইবাদতকে। সংকীর্ণ চিন্তায় বেড়ে ওঠা সমাজে ইসলামের ধারণা এমনই সীমাবদ্ধ ও হ্রস্বীকৃত। সমাজের মানুষও ভাবে, শুধু মসজিদ-মাদরাসা নিয়ে পড়ে থাকাই ইসলামের কাজ। এভাবে সামগ্রিক জীবনব্যবস্থায় উপেক্ষিত ইসলাম আজ আমাদের চেতনা-চেতনায়ও ভুলভাবে চিত্রিত হচ্ছে। অথচ ইসলামের গণ্ডি এমন অপ্রশস্ত নয়। ইসলাম এত ক্ষুদ্র ও স্বল্পায়তনের নয়। ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র—সর্বত্রই রয়েছে ইসলামের পূর্ণ বিচরণ। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, বিচারনীতি—সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে ইসলামের পূর্ণ দিকনির্দেশনা। এককথায়, মানবজীবনে চলার পথে ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ এক জীবনব্যবস্থা।

কিন্তু হতভাগা মুসলিম জাতি যখন শরিয়াপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ছুড়ে ফেলে মানবরচিত জীবনব্যবস্থাকে সফলতার চাবিকাঠি বানিয়েছে, তখন দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় ক্ষেত্রেই তারা ব্যর্থতা ও বিফলতার শিকার হয়েছে। আজ বিশ্বের সর্বত্রই যখন গ্লানি ও অশান্তি তাদের গ্রাস করে নিয়েছে, যখন প্রতিটি অঙ্গনেই বিশৃঙ্খলা ও হতাশার ছাপ স্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে তখন দেরিতে হলেও মানবরচিত জীবনব্যবস্থার কুফল, স্বৈরাচারিতা ও অপূর্ণতা তারা অনুধাবন করতে পারছে। ধীরে ধীরে অনেকের মধ্যেই এ বোধ ফিরে আসছে যে, ইসলামই এসব সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। আর তাই বর্তমানে ইসলামের প্রতি অনেকের আগ্রহ এবং জানার পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের ধারণা পেতে অনেকেই এখন বিভিন্ন সোর্স ও মাধ্যম খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এবারের আয়োজনে থাকছে 'ইসলামি জীবনব্যবস্থা' নামক বৃহৎ কলেবরের এ গ্রন্থটি। ব্যাপক চিন্তা ও সুদূরপ্রসারী ভাবনা থেকে বইটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের পাশাপাশি সময়ের মাজলুম ও অবহেলিত বিধানগুলোও দলিলের আলোকে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। আশা করি, গ্রন্থটি ইসলাম সম্পর্কে মানুষের অনেক ভুল ধারণার মূলোৎপাটন করবে, ঘুমন্ত চেতনাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলবে এবং সামগ্রিক জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মনোবল পুরোপুরি ফিরিয়ে আনবে। তাহলে আর দেরি কেন? চলুন, আপ্লুত হৃদয়ে অবগাহন করি ইসলামের এ সরোবরে আর নতুন স্বপ্ন ও বিশুদ্ধ আকিদার চেতনায় গড়ে তুলি আগামীর ইসলামি সমাজ...